মনোজ বসুর

রচনাবলি

[প্রথম খণ্ড]

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-৭০০০৭৩

সম্পাদক ঃ

দীপক চন্দ্র—মনীষী বসু

প্রথম খণ্ডের গ্রন্থসূচী ঃ

তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৫৯

প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারী, ১৯৭৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি. ১৯৭৮

প্রকাশক : নন্দিতা বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক : প্রশান্ত কুমার মণ্ডল
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন কথাশিল্পী মনোজ বসুর বহুমুখী প্রতিভার সঙ্গে বাংলার বিদ্বজ্জন এবং রসিকজনের পরিচয়কে আরো সুনিবিড়সূত্রে গ্রথিত করার মহৎ উদ্দেশ্য ও প্রেরণা থেকেই মনোজ বসুর রচনাবলী প্রকাশের পরিকল্পনা। বলাবাহুল্য, মনোজ-সমসাময়িক প্রতিষ্ঠিত প্রভাবশালী বেশ কয়েকজন লেখকদের রচনাবলী ইতিমধ্যেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সেদিক থেকে "মনোজ বসুর রচনাবলী" প্রকাশের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। মনোজ-অনুরাগী পাঠকদের কাছে "মনোজ বসুর রচনাবলী" সেই প্রত্যাশিত প্রয়োজন মেটায়। কালজয়ী শিল্পীর বহু দুষ্প্রাপ্য অমূল্য গ্রন্থরাজি এবং প্রকাশিত রচনায় সমৃদ্ধ এই রচনাবলী সুধী পাঠকমহলের অনুরাগ ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করবে বলে বিশ্বাস।

মনোজ বসুর জন্ম ১৯০১ সালের ২৫শে জুলাই; বঙ্গাব্দ ১৩০৮ সাল, ৯ই শ্রাবণ। পৈত্রিক বাসভূমি যশোহরের ডোঙাঘাটা গ্রামে। দুই পুরুষের সাহিত্যচর্চা ছিল তাঁর লেখক হওয়ার পথের পাথেয়। পিতার সাহিত্যানুরাগ, দেশপ্রেম, দৃঢ় ব্যক্তিত্ব বালক বয়স থেকেই মনোজ বসু উত্তরাধিকারীসূত্রে লাভ করেছিলেন। কিন্তু পিতার সান্নিধ্য খুব বেশিদিন পাননি তিনি। আট বছর বয়সে পিতৃহীন হওয়ার দরুন সমস্যায় পড়তে হয় তাঁকে। গোটা পরিবার ভেঙে পড়ার উপক্রম। অগত্যা গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এলেন পড়াশুনার জন্য। রিপন কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯১৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অনেকগুলি লেটারসহ ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করলেন। তারপর, বাগেরহাট কলেজে আই. এ. ভর্তি হলেন। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া হল না। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাক তাঁর তাজা তরুণ প্রাণকে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত করে তুলল। আই. এ. পরীক্ষা বন্ধ রেখে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পরের বছর অসমাপ্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করলেন। বি. এ. পড়তে এলেন কলকাতায়। সাউথ সাবারবণ কলেজ (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) থেকে ডিস্টিংসনসহ ১৯২৪ সালে বি. এ. পাশ করলেন। তারপর, আইন পড়ার জন্য ল' কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু দারুণ অর্থনৈতিক সংকট তাঁকে পড়া ছাড়তে বাধ্য করল। স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে এলেন সাউথ সাবারবণ স্কুলে।

জীবনের দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও সাহিত্যচর্চা বাদ পড়েনি। আত্মপ্রকাশের তীব্র ব্যাকুলতা অল্প বয়স থেকেই বালক মনকে অধিকার করেছিল। বিদ্যালয়ে থাকতে উৎসাহী বন্ধুরা মিলে হস্ত মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশ করেছিল। স্কুল জীবনের

একটি রচনা 'বিকাশ' পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়। বাগের-হাট কলেজে পড়বার সময় পাঁচজন সাহিত্যানুরাগী বন্ধু মিলে একটি বারোয়ারী উপন্যাস রচনা করেন। কিন্তু সে-সবের কোন নিদর্শন আজ নেই। মোটামুটিভাবে ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬-এর মধ্যে তিনি সাহিত্যিক খ্যাতির অধিকারী হন।

চরিত্রধর্মে মনোজ বসু ছিলেন কল্লোলের বিপরীত প্রান্তের লেখক। মনে-প্রাণে গ্রামীন তিনি। গ্রামীন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। অচিন্ত সেনগুপ্ত তাঁর শিল্পী স্বভাবের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে লিখেছেন : কল্লোল যে রোমান্টিসিজম খুঁজে পেয়েছে শহরের ইঁট কাঠ লোহা লক্কড়ের মধ্যে, মনোজ তাই খুঁজে পেয়েছে বনে কাদায় খালে-বিলে পতিতে-আবাদে। সভ্যতার কৃত্রিমতায় "কল্লোল দেখেছে মানুষের ট্রাজেডি, প্রকৃতির পরিবেশে মনোজ দেখেছে মানুষের স্বাভাবিকতা। একদিকে নেতি, অন্যদিকে আপ্তি। যোগবলের আরেক দৃপ্ত উদাহরণ মনোজ বসু।"

গ্রামই ছিল তাঁর সাধনার পীঠস্থান। গ্রামজীবনের সঙ্গে সরল সুন্দর দিকটা মনোজের মমতা মাখানো অনুভূতি, উপলব্ধির নিবিড়তায় অনুরাগসিক্ত। মনোজের দৃষ্টির সম্মুখে ছিল নদী-বিধৌত গ্রামে বাংলার বিস্তৃত ভূখণ্ড, প্রান্তর, বনানীশোভিত নিসর্গরাজ্য এবং নর-নারীর জীবনে নিহিত এক অপার শান্তি, সহজ সরল জীবনযাপনের নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ। শিল্পীসত্তার এই ভিত্তিভূমি রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণের মধ্যে ছিল। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে মনোজের মননের পার্থক্য সূক্ষ্মরেখায় বিধৃত। রবীন্দ্রনাথের গভীর উপলব্ধি এবং কবি মনের তীব্র আবেগ তাঁর মধ্যে ছিল না। ছোট ছোট জীবনের সহজ সরল অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর জীবন উপভোগের কেন্দ্রবিন্দু। এদিক থেকে বরং বিভূতিভূষণের সঙ্গে তাঁর মানস সামীপ্য বেশি। দু'জনেই পল্লীপ্রাণ। দুজনের জীবন কেটেছে দারিদ্র্যের মধ্যে। দুঃখকষ্টকে দু'জনেই হাসিমুখে মানিয়ে নিয়েছেন জীবনে। এবং দুঃখ-মুক্তির জন্য ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। গ্রামকে অবলম্বন করেই কথাশিল্পীদ্বয়ের প্রতিভা মূলত বিকশিত। পল্লীর প্রাণলীলার মধ্য দিয়ে উদ্ভুত হয়েছে লেখকদ্বয়ের পল্লীপ্রীতি, অতিপ্রাকৃত চেতনা। গ্রামের শান্ত নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার মধ্যে উভয়েই আস্থাবান, চিত্তভূমি খুঁজে পেয়েছিল এক নিরাপদ আশ্রয়, প্রত্যাদৃপ্ত জীবন। তথাপি একথা সত্য, মনোজ বসু বিভূতিভূষণের মত প্রকৃতিপ্রাণ নন। মননের দিক দিয়েও বিভূতিভূষণ ছিলেন অনেক বেশি নির্লিপ্ত। জীবনমুখীনতা মনোজ বসুর রচনায় এক করুণ, মধুর, শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। মনোজ বসুর রচনায় স্রষ্টার আনন্দই প্রধান। মন কখনও ক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদে উত্তেজিত হয়ে ওঠে না। শরৎচন্দ্রের

মত পুঞ্জীভূত বিদ্রোহ, বিদ্বেষ, ঘৃণা নিয়ে তিনি আঁকেননি কোন মনের চরিত্র। সৃষ্টি করেননি কুটিল হিংসুটে মানুষের ছবি, অথবা পল্লীসমাজের আপোষ পাপচক্র। নীতি, সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে নেই কোন প্রশ্ন উত্থাপনের প্রয়াস, সৃষ্টি-সুখের উল্লাস উপভোগই তাঁর একমাত্র চরিতার্থতা। "অনাড়ম্বর ভোগের আয়োজন মাধুর্যপূর্ণ বলেই লেখক সংক্ষুব্ধকালের প্রশ্নজর্জর জটিল কালসত্তাকে তেমনভাবে রচনার বিষয়ীভূত করেননি। মানুষের সমস্ত সাজসজ্জা খসিয়ে দেহ মনের এবং সমাজের নগ্নরূপকে উৎকটভাবে দেখানোর আগ্রহ নেই তাঁর। হাতের আলতো ছোঁয়ায় টেনেছেন দু'একটি রেখা, তাতেই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়েছে সমাজের চেহারা।" (মৎলিখিত "মনোজ বসু : জীবনও সাহিত্য" পৃ-৩৬)।

কিন্তু স্বাধীনোত্তর কালের জীবন সমস্যা, নগর-নির্ভর মধ্যবিত্তের জীবন শিল্পীমানসে নতুন রূপ নিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। অস্থির অনিশ্চিত জীবন-জিজ্ঞাসা তাৎপর্যপূর্ণ কোন জীবনাদর্শের প্রতি বিশ্বাস সঞ্চয় করতে পারেনি। অবক্ষয়িত জটিল সমাজের মরুরিক্ত জীবনের ধূসরতা, শূন্য পরিণামকে তিনি দেখেছেন সম্পুর্ণ ভিন্নতর দৃষ্টি ও রীতিতে। মানসিক রুগ্নতায় তাঁর মানুষগুলি বিকৃত ও বিবর্ণ হয়ে ওঠেনি।

সাহিত্যসাধনায় এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে রচনাবলীর অন্তর্ভুক্তি গ্রন্থাবলী নির্বাচন করা হয়েছে। এক : ভুলিনাই (১৩৫০ আশ্বিন) তাঁর প্রথম উপন্যাস। বাগেরহাট কলেজে থাকতে লেখক যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন তার অভিজ্ঞতা এবং অনেক মধুর স্মৃতি 'ভুলি নাই'র উপকরণ রূপে দেখা দিয়েছে। দুই : মানুষ গড়ার কারিগর (১৯৬০ সাল, মার্চ) তাঁর শিক্ষক জীবনের ইতিহাস। ঘটনা ও চরিত্র স্মৃতিভিত্তিক। হৃদয়ের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও প্রেম দিয়ে এঁকেছেন শিক্ষকদের দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভবের ছবি। তিন : চীন দেখে এলাম (১৩৬০ আশ্বিন)। পথিক মনোজের ব্যক্তি-মনের স্পর্শে সঞ্জীবিত।

দেখা যাচ্ছে, মনোজ বসুর সাহিত্য চিন্তা তাঁর জীবনচর্চার একান্ত অনুগামীরূপে দেখা দিয়েছে। শিল্পী-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সৃষ্টি-কার্যকে মিলিয়ে মোটামুটিভাবে রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের কাজটি শেষ করা হয়েছে। কথাকোবিদ মনোজের মনঃপ্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবার বক্তব্যের শিল্পমূল্য যাচাই করে দেখা যাক।

॥ ভুলি নাই ॥

সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ এবং আন্দোলন হল 'ভুলি নাই'র বিষয়বস্তু।

১৯৩৬ সাল অবধি এর কাহিনীকাল প্রসারিত। জাতীয় আন্দোলনের সেই সংগ্রামদৃপ্ত অধ্যায়ের যবনিকাপাত ঘটেছে। অতীত বিলীন হয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির গর্ভে। সম্পূর্ণ হারানোর আগে ঝাপসা স্মৃতি দিয়ে ঐতিহ্য-সচেতন লেখক তার চিত্র এঁকেছেন। স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠেছে অনেক চেনা মুখ। 'ভুলি নাই'-এর চরিত্রে চিরস্মরণীয় কয়েকটি শহীদ জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। কুন্তল, দৌলতপুর কলেজের ছাত্র কুন্তল চক্রবর্তী। বাগেরহাট কলেজের অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ নাগ, অধ্যক্ষ নীলকান্ত রায়ের প্রতিরূপ। সরোজ পাকড়াশির মৃত্যুবরণের দৃষ্টান্ত বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত'র অনুরূপ। নিরুপমা ও শঙ্করের অজ্ঞাতবাসের কাহিনীটি শশধর আচার্য ও সুহাসিনী গাঙ্গুলীর স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাসের ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত। এইরকম 'জানা অজানা কত সাথী যেন যুগান্তরের ঘুম ভেঙে উঠে আসেন।' (কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য মৎ লিখিত 'মনোজ বসু জীবন ও সাহিত্য' দ্রষ্টব্য, পৃ ৪২-৪৩)।

"ভুলি নাই" তাই সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের রাজনৈতিক উপন্যাস। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রাম নয়, সংগ্রামীদের ব্যক্তি-জীবন এর বিষয়বস্তু। স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা আত্মবলি দিল, যারা অংশ গ্রহণ করল, তারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কিন্তু এই স্মরণীয় ব্যক্তিদের জন্য যারা ত্যাগ স্বীকার করল, বঞ্চিত হল, নিঃস্ব-রিক্ত হল, অথচ পেল না কিছুই, কালান্তরের পৃষ্ঠায় থাকবে না তাদের কোন পরিচয়। এই গ্রন্থে লেখক শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের স্মরণ করেছেন। অনেক কালের পুরনো কথা—সেসব মানুষ নেই। সে পৃথিবীও নেই, কেবল আছে কতকগুলো স্মৃতি। স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে লেখক 'ভুলি নাই'-এর যে চিত্র আঁকলেন, তা বিচিত্র ও রমণীয়।

সরোজ পাকড়াশির ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়ে ফেলা, দল বাঁচানোর জন্য উমারাণীর নিরুদ্দেশ জীবন, আনন্দকিশোরের দধীচির মত আত্মত্যাগ, নিরুপমার স্ত্রীত্বের অভিনয়, সোমনাথ ও মায়ার পরস্পরের প্রতি ছলনা প্রভৃতি জীবনঘটনাতে আছে এই আকস্মিকতা।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর চরিত্রধর্মের সঙ্গে কুন্তল চরিত্রের অনেক মিল আছে। সব্যসাচীর মত কুন্তল পাষাণ-দেবতা। কোন দুর্বল মানবিক অনুভূতির দ্বারা অভিভূত হয় না, অনুরাগ বিরাগের মর্ম বোঝে না সে। এই নির্মম ঔদাসীন্যের মূলে কোন দুঃসহ অভিঘাতের ইংগিত আমরা পাই না। কোনরকম জীবনদ্বন্দ্বের ছবি ফোটেনি। কর্মক্ষেত্রে ঐন্দ্রজালিক শক্তির সাহায্যে যে তার সহকর্মী-সংঘকে সম্মোহিত করে। উপন্যাসে তার সক্রিয় কর্মনীতি অনুপস্থিত। কেবল দলের অনুগত কর্মীদের মুখে তার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা

এবং অতিমানবিক শক্তির প্রতি মুগ্ধতার বিবরণ পাই। কথার চেয়ে কাজের মধ্যে কুন্তলকে দেখলে তার চরিত্রটি হয়তো বেশি শক্তিশালী হতে পারত। কিন্তু লেখকের তা উদ্দেশ্য নয়। উপন্যাসে তাঁর ভূমিকা আদর্শবাদ সৃষ্টির। তার সংযত কথাবার্তায় নেতৃত্বসুলভ গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট। উপন্যাসে সে রণক্লান্ত সৈনিক।

॥ মানুষ গড়ার কারিগর ॥

সাউথ সাবার্বন ইস্কুলের নানা অভিজ্ঞতা হয়তো এই উপন্যাস রচনার প্রেরণা যুগিয়েছে। 'আমি একটা বই লিখতে চাই ইস্কুলে নিয়ে। খানিকটা আক্রোশ নিয়ে বইকি।··যৌবনের প্রতিটি মধুভরা দিনমানের অপমৃত্যু ঘটেছে কলকাতার একটি ইস্কুলের চতুঃসীমার মধ্যে।··বিদ্যাসাগর বলব না, মানুষ গড়ার কারখানা। ···আমি জনৈক কারিগর ছিলাম সেই কারখানায়।···মহামতি কত চাণক্য ও চার্চিল দিবানিদ্রাটা দুপুরের ক্লাসে সেরে নিয়ে রাত্রে ও সকালে গুপ্ত-অধ্যাপনা অর্থাৎ প্রাইভেট ট্যুইশানিতে ছুটোছুটি করেন, দুর্ধর্ষ কত হিটলার কলে কৌশলে কারখানার কর্তা হয়ে বসে কারিগরবর্গকে নাস্তানাবুদ করেন—পরিচয় পেলে চমৎকৃত হবেন।'

'মানুষ গড়ার কারিগর'-এ এই চমৎকৃত হওয়ার খবর পরিবেশন করেছেন লেখক। শিক্ষকতাকালে স্বল্প বেতনভুক শিক্ষকদের দুরবস্থার যে দৃশ্য দেখেছেন এবং নিজেও যার একজন শিকার ছিলেন, উপন্যাসে তারই বাস্তব আলেখ্য রচিত হয়েছে। লেখকের দৃষ্টির সম্মুখে ছিল সহকর্মী শিক্ষকবন্ধুদের ছবি। তাঁদের সীমাহীন দারিদ্র। পেটের দায়ে তাঁরা আদর্শ ও নীতি ত্যাগ করেছেন। উচ্চাশা-বর্জিত আত্মকেন্দ্রিক এই শিক্ষকদের জীবন-ট্র্যাজেডি রচনা করতে গিয়ে তাঁদের প্রতি সর্বসাধারণের সমবেদনাহীনতা ও ঔদাসীন্য লেখককে ভাবনায় আকুল করে তুলেছে।

মহিমকে সামনে রেখে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার মূল্য আবিষ্কার করা লেখকের উদ্দেশ্য। করালীকান্তবাবু, রামকিঙ্করবাবু, সলিলবাবু, গঙ্গাধরবাবু, দিব্যেন্দুধর দাশ, চিত্তরঞ্জন গুপ্ত, সেক্রেটারি অবিনাশ চাটুজ্যে প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষক সমাজের গতি-প্রকৃতির একটা পূর্ণ পরিচয় দিতে তিনি চেষ্টা করেছেন। বিদ্যালয়ে, শিক্ষক-ছাত্র পরিচালক-সমিতি, অভিভাবকদের নিয়ে যে শিক্ষা কাঠামো, তাঁর ফাঁকি গলদ ভণ্ডামি হৃদয়হীন কর্তৃত্ব সমস্ত শিক্ষকের ক্ষেত্রে একরকম হওয়ায় সহজেই তাঁরা এক পরিবারভুক্তের মত হয়ে যান। অস্বাস্থ্যকর শিক্ষা-পরিবেশে মানুষ গড়ার কারিগরদের ছবি আঁকতে গিয়ে লেখনী

কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ভৎসনায় কঠোর হয়ে ওঠেনি। শিক্ষক সমাজের প্রতি সহানুভূতিতে লেখকের হৃদয় আর্দ্র। 'মানুষ গড়ার কারিগরে' আছে শিক্ষা-কারাখানার কারিগরদের জীবন-সংগ্রামের কাহিনী।

সমাজের সর্বনাশা ভাঙনের রূপটি দেখাতে গিয়ে লেখক বেশি নিষ্ঠুর হয়েছেন। মহীমের আদর্শবাদ ও তার দৃঢ় ব্যক্তিত্বের পরাজয় দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য। এজন্য অর্থনৈতিক সংগ্রামকে প্রবলতর করে তুলেছেন। (বই প্রকাশিত হবার পর দু'টি শিক্ষক-পত্রিকা 'আঙ্কল টমাস ক্যাবিনের' সমগোত্রীয় সর্বকালীন উপন্যাস বলে অভিমত দেন)।

চীন দেখে এলাম (১ম পর্ব)॥

মনোজ বসুর রোমান্টিক ভাবধর্মী শিল্প-মানস ভ্রমণকাহিনীকে বস্তুসর্বস্ব করেনি। শিল্পকৌতূহল, সৌন্দর্যবোধ, সাহিত্য-জিজ্ঞাসা, রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক চিন্তা, ইতিহাস ও শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ ইত্যাদি অনুভূতির রূপে-রসে মধুস্বাদী হয়ে উঠেছে।

পিকিং শান্তি-সম্মেলনের একজন ভারতীয় প্রতিনিধি হয়ে তিনি চীনে যান। কাজেই, দুই দেশের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মান্য অতিথিরূপে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সম্বর্ধনা ও আপ্যায়নের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের ফাঁকে ফাঁকে চীনের সুদীর্ঘকালের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্মীয়-বিশ্বাস, কিংবদন্তী প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন লেখক। তাঁর সুগভীর ইতিহাসপ্রীতি এবং ঐতিহ্যপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যবোধ বিজড়িত। ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠা অপেক্ষা কল্পনা-সমৃদ্ধ সুন্দর মধুর চিত্ররূপই এখানে ফুটেছে বেশি। ঐতিহাসিক স্থানসমূহের নামমাহাত্ম্য এবং তাদের নয়নাভিরাম রূপ, সাহিত্যিক ও শৈল্পিক আকর্ষণ, স্থাপত্য সৌন্দর্য প্রভৃতি বর্ণনায় অভিনব লিপিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিপ্লবমুক্ত-চীনের জনগণকে দিয়েছে মুক্তির আনন্দ, বিপুল কর্মোদ্যম, অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য। সর্বত্র 'স্বাস্থ্য ও সুরুচির উল্লাস'। 'মুক্তির অবাধ আলোয়, নবজীবনের আনন্দস্বাদ।'

৬, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এভিন্যু
কলিকাতা-৩০

দীপক চন্দ্র
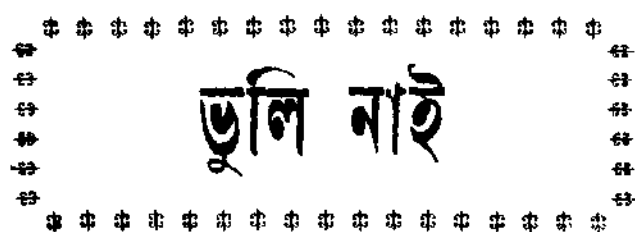
[উপন্যাস]

[রচনাকাল ১৩৫০]

কুন্তল-দা, তোমাদের ভুলিনি। পথে-ঘাটে ট্রামে-বাসে নিরুদ্বিগ্ন মানুষগুলোকে দেখি, খাচ্ছেদাচ্ছে, অফিস করছে, রোগে ভুগে নির্বিবাদে মরে যাচ্ছে। দিব্যি আছে। আমিও ওদের একজন হয়ে থাকব, মল্লিকার মুখ চেয়ে কতবার ঠিক করেছি। কিন্তু পারি কই? নিঃশব্দ রাত্রে তোমরা এসে হাজির হও, ফিস-ফিস কথাবার্তা···আমার পাতানো বউ নিরু হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ায়··· অভিমানাহত আনন্দ আসে···স্তব্ধমূর্তি সোমনাথের ছায়া দেখে তাড়াতাড়ি যুক্তকরে প্রণাম করি···জগৎ দত্ত, উমারানী, মায়া, সরোজ পাকড়াশি—জানা অজানা কত সাথী যেন যুগান্তরের ঘুম ভেঙে উঠে আসেন।

ভুলবার জো আছে তোমাদের?

আমার বাপ হলেন নীলকান্ত রায়। অমন ডাকসাইটের প্রিন্সিপাল তখনকার দিনে কোন মফস্বল কলেজে ছিল না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হয়, আমি তখন ছেলেমানুষ। মনে পড়ে, সেদিন রাখিবন্ধন—কোন বাড়ি রান্না হয়নি, অরন্ধন-ব্রত পালিত হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় ছেলে-বুড়ো স্বদেশী গান করছে, এ ওকে হলদে রাখি পরিয়ে দিচ্ছে। আমরা কলেজে-সংলগ্ন কোয়ার্টারে থাকি। গোলমাল হবে মনে করে মা ইস্কুলে যেতে দেয়নি, তাই স্ফূর্তির অবধি নেই। শত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উঠল; ছুটে সদর-দরজায় গেলাম।

প্রকাণ্ড মিছিল করে ছেলেরা বেরিয়ে যাচ্ছে। আচম্বিতে বাধা পড়ল, বাবা অফিস-ঘরের বারান্দায় এসে গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন, কুন্তল, শোন এদিকে—

সাড়ে চার'শ ছেলের মধ্যে কারও ক্ষমতা ছিল না, এ ডাক অমান্য করতে পারে। সেই আমি প্রথম দেখলাম কুন্তল-দাকে। বারান্দায় উঠে বাবাকে প্রণাম করে নিঃসঙ্কোচে দাঁড়ালেন। আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছিল, কী যে আছে ওঁর অদৃষ্টে! আজও মনে আছে সে ছবিটা।

ছাত্রের এ রকম বলিষ্ঠ ভঙ্গির সঙ্গে—বাবা বলে নয়, কলেজ সম্পর্কিত কেউ কোনদিন পরিচিত নন। ভ্রূকুঞ্চিত করে বাবা বললেন, ব্যাপার কি কুন্তল?

আপনার কলেজ ভেঙে নিয়ে যাব বলে এসেছি। বন্দেমাতরম্ বলতে দেবে না, সার্কুলার দিয়েছে। প্রাণে এ অপমান সইছে না।

সকলে হতবাক্। এই ভয়লেশহীন ছেলেটার মাথায় বজ্রপাত হল বলে—দু-এক ঘণ্টায় হোক বা দু-এক দিনের মধ্যে হোক—কারও এ সম্বন্ধে লেশমাত্র সংশয় রইল না। আর একটা কথাও না বলে বাবা নিজের ঘরে চলে গেলেন। গণ্ডগোল ও চিৎকার অতঃপর একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, অনেক ছেলে সুড়-সুড় করে ক্লাসে ঢুকল। অবশিষ্ট বোধ করি জন পঞ্চাশ নিয়ে কুন্তল-দা দৃঢ়পদে

বেরিয়ে গেলেন। কলেজ-সীমানার বাইরে অনেক রাত্রি অবধি সভা চলল, মাঝে মাঝে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল।

পরদিন অভাবিত ব্যাপার—দেখি আমাদের বৈঠকখানায় কুন্তল-দা এসে বসেছেন। আর পাঁচ-সাত জন বাইরে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল। সে সব কথার কিছু মনে নেই, মনে রাখবার বয়সও তখন আমার নয়। নানা ছুতোয় আমি ঘরের মধ্যে এসে অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধায় ঐ প্রদীপ্ত মুখ কিশোরটিকে বারংবার দেখেছিলাম। শেষ কথাটি মনে আছে, বাবা বলছেন, বড় কঠিন পথ—পারবে তোমরা ?

পারব মাস্টার মশাই, আপনি আশীর্বাদ করুন।

একজনও যদি ফিরে এস, আমাকে পাবে না তোমাদের মধ্যে।

কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন স্থানীয় সরকারি উকিল। তিনি খুব সহানুভূতি দেখিয়ে বাবাকে বললেন, আপনার মানা না শুনে বেরিয়ে গেল ? বড় অন্যায় কথা—

বাবা বললেন, মানা আমি করি নি। ব্যাপারটা শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

ভদ্রলোক বললেন, যাই হোক—মোটের উপর ঐ একই দাঁড়াল। দলের চাঁই ক'টার নাম লিখে দিন তো—

কাকে ফেলে কার নাম লিখি মশাই ? ভীতু ত-চারটে হয়তো ক্লাসে গিয়েছিল, কিন্তু মনে মনে তারাও ঐ দলের। আর সত্যি বলতে কি—আপনার আমারই কি কম বেজেছে ? নেহাৎ বুড়ো হয়ে পড়েছি বলে চেঁচাই নে—

সেক্রেটারি মুখ লাল করে বললেন, কলেজে ছেলে না থাকায় আপনি খুশি হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি।

ছেলে নেই বলে আমার এদ্দিনের গোলামি খসে গেল, এর জন্যে সত্যি খুশি হওয়া উচিত। এতগুলো টাকার মায়া নিজের ইচ্ছায় ত্যাগ করা মুশকিল হয়ে পড়ত।

এক কথায় বাবা চাকরি ছাড়লেন ; শপথ ভেঙে ছেলেরা ফিরে আসে কিনা, দেখবার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন না। স্ট্রাইক অবশ্য বেশি দিন টেঁকে নি, প্রায় সবাই কলেজে ফিরে এসেছিল—কুন্তল-দা পর্যন্ত। কিন্তু আর একটা পথে যে ঐ সঙ্গে যাত্রা শুরু হয়ে গেল, জীবনান্ত অবধি কারও ওঁদের ফিরে তাকাবার ফুরসৎ হল না।

জেলার কালেক্টর পর্যন্ত হাতে ধরে বাবাকে অনুরোধ করলেন, তিনি শুনলেন না। বাড়ির মধ্যেও তুমুল ঝড় উঠল। বাবা হাসিমুখে সকলকে নিরস্ত করতেন ; বলতেন, আমার ছেলেরা জীবন দিচ্ছে—আর মাস মাস নগদ তঙ্কা গুনে নিয়ে কি করে আমি রাজভোগে থাকি বল।

সব জায়গায় এমনই এত খাতির, তার উপর চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে বাবা দেবতাবিশেষ হয়ে দাঁড়ালেন। যেখানে স্বদেশি সভা, সেখানেই তাঁকে যেতে হয়। নিতান্ত অপারগ হয়ে দু-এক ক্ষেত্রে যদি 'না' বলেছেন, পা জড়িয়ে ধরে একরকম জবরদস্তি করে পাল্কিতে তুলে নিজেরা তাঁকে বয়ে নিয়ে যেত। বস্তুত ছেলেরা একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিল। কুন্তল-দা প্রভৃতিকে ভীষণ রকম শাস্তি দেবার জন্যে জল্পনা-কল্পনা হচ্ছিল, গতিক দেখে সেসব স্থগিত রইল। সেক্রেটারি একদিন কুন্তল-দাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি না যাওয়ায় শেষকালে উকিলবাবু নিজেই নাকি খুব গোপনে তাঁর হস্টেল-ঘরে আসেন। একথা কুন্তল-দার কাছে শোনা—অতএব মিথ্যা হতে পারে না। শুভার্থী অভিভাবকের মতো স্নেহের সুরে তিনি বলেছিলেন, তোমরা রাজনীতি করতে যাচ্ছ, অন্যায় কিছু নয়, তার একটা কালাকাল আছে তো! এখন শিক্ষার সময়, লেখাপড়া শিখে মানুষ হও। বয়স হলে রাজনীতি কোরো—

কুন্তল-দা জবাব দিলেন, আপনার রাজনীতি আর আমার রাজনীতি একেবারে আলাদা স্তর। আপনার রাজনীতির মানে টাকাকড়ি, মোটরগাড়ি, সরকারি খেতাব, সাহেবসুবোর কাছে প্রতিপত্তি, কাউন্সিলের মেম্বার হওয়া—আর আমাদের রাজনীতি হল অন্ধকার জেল, বেত খাওয়া, আপনার জনের সঙ্গ থেকে চিরবঞ্চনা, দ্বীপান্তর, হয়তো বা ফাঁসের দড়ি। আপনার ঐ বয়স অবধি টিকে থাকা কপালে নেই। যদি থাকে, তখন হয়তো আপনার রাজনীতিই করব।

বিপাকে পড়ে এমন কথাও উকিলবাবু হজম করে নিলেন, কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। কলেজের খাতায় যথারীতি কুন্তল-দার নাম রইল। পড়াশুনোর সময় নেই, সে ইচ্ছাও নেই—তবু নিতান্ত কাজের গরজে কলেজের আওতায় পড়ে থাকা। নূতন বছরে নূতন নূতন ছেলেরা আসে, দেখতে দেখতে তাদের মধ্যে কুন্তল-দার সম্পর্কে সম্ভব-অসম্ভব নানা কাহিনী ছড়িয়ে যায়,—তাঁর কাছে যাবার জন্য, তাঁর কথা শুনবার জন্য, এক ছত্র লেখা চিঠি পাবার জন্য সকলে ব্যগ্র। নূতন এক প্রিন্সিপ্যাল এলেন, কুন্তল-দাকে ঘাঁটাতে তিনি সাহস করতেন না—ছেলেদের সর্বদা কড়া শাসনে রাখতেন, যেন তারা লেখাপড়ায় অধিক মন-সংযোগ করে, আড্ডা দিয়ে না বেড়ায়—ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রকারান্তরে কুন্তল-দার সঙ্গে মিশতে মানা করে দেওয়া আর কি।

তখন কুন্তল-দা হস্টেল ছেড়ে কাছাকাছি গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে বাসা নিলেন, ছেলেদের যাতে অসুবিধা না ঘটে। একবার বামালসুদ্ধ ধরা পড়লেন। জেল হল। ঐ সঙ্গে কলেজ থেকেও নাম কাটা গেল।

সেই প্রথম ধরা পড়ে তিনি এক কীর্তি করেছিলেন, শুনেছি। পরবর্তী

কালে ঐ প্রসঙ্গে উঠলে কুন্তল-দা হাসতেন, আর যাঃ—বলে আমাদের তাড়া দিতেন। তাঁকে হাজতে আটকে রেখেছিল। সারারাত্রি তিনি দেওয়ালে মাথা কুটেছিলেন। সকালে দেখা গেল, রক্তারক্তি ব্যাপার। বৃত্তান্ত কি? তিনি কানে শুনেছেন, কর্তাদের নাকি নানা রকম মিষ্টি ও তেতো ব্যবস্থা আছে—যার জন্য এর আগে অনেক ছেলে দলের কথা ফাঁস করে দিয়েছে। সে যে কি ব্যাপার, কোন আন্দাজ ছিল না—পাছে তিনিও ঐরকম ফাঁদে আটকা পড়েন, তাই কুন্তল-দা মরতে চেয়েছিলেন···

স্বীকারোক্তির কথায় মনে পড়ে, আমাদের সরোজ পাকড়াশির কথা। গুলি-বেঁধা অবস্থায় সে ধরা পড়ে। প্রশ্ন হল, কি জান তুমি? দিনের পর দিন দলবদ্ধ হয়ে এসে তাকে উত্যক্ত করে, বল, তুমি কি জান?

অবশেষে একদিন সরোজ বলল, শুনবেন, না দেখবেন?

ওরা এ ওর মুখে তাকায়।

দেখুন তবে—শ্লথ হাত দু'খানা সরোজ বুকের উপর আনল—হয়তো কোন গোপন চিঠিপত্র আছে—নিঃশ্বাস নিরুদ্ধ করে ওরা প্রতীক্ষা করছে। কি? ও কি? একটানে সরোজ ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়ে ফেলে। রক্ত তীরবেগে ছুটছে। সে অচৈতন্য হয়ে পড়ল; চেতনা আর ফেরেনি।

ঐ সরোজের মা—কী হিংস্র মেয়েমানুষ! সরোজের মা বলে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত, মাথায় থাকুন তিনি—কিন্তু মোটেই সুবিধের লোক ছিলেন না, আমাদের যেন দাঁতে পিশে ফেলতে চাইতেন, অহরহ আঙুল মটকে বন্দেমাতরম্-ওয়ালাদের উদ্দেশ্যে গালি পাড়তেন, চেঁচামেচি করে একদিন হিরণকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন আর কি! অথচ তাঁর দু'টি ছেলেমেয়ে এই পথের পথিক হয়ে গেল, অত সতর্ক থেকেও মা-ঠাকরুন ঘরের আগুন সামলাতে পারলেন না···

শান্তিদিদির কথা মনে পড়ে। তাঁর স্বামী পুলিদের মধ্যে নামজাদা লোক; এদিকে অত্যন্ত অমায়িক ও ভদ্র। তাঁর বিশ্বাস-প্রবণতার দরুণ আমাদের হিরণ পালাবার সুবিধা পেয়েছিল। তাকে ধরবার জন্য ভদ্রলোক তোলপাড় করে বেড়াচ্ছিল। নারায়ণতলায় গিয়ে শান্তিদিদিকে সেই সময় গোপনে বলতে শুনেছি, ধরলে দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেবে ঠাকুর, যেন ধরা না পড়ে।

তোমার বরের চাকরী থাকবে না তা হলে।

শান্তিদিদি বললেন, একবেলা আধপেটা খেয়ে থাকব ভাই···

আবার কুন্তল দার মাকে দেখেছি, আমাদের দলসুদ্ধ সকলের মা। ছেলে চোখের সামনে তিলে তিলে মারা গেল, মায়ের মুখের স্নিগ্ধ হাসি কোনদিন

নিষ্প্রভ হতে দেখলাম না। বরঞ্চ সুরমাই এসে এক একদিন রাগারাগি করত, আপনি পাষাণ—

আমরা অনেকেই সেখানে বসে, সুরমা বলেছিল, নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছেন কুন্তল-দা, সেখানে সবাই সুখী—সবাই ভোগী। কিন্তু আপনি নিজে কি ভোগ করে গেলেন, বলুন তো—

কুন্তল-দা চাপা মানুষ; কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেদিন কি হল—যেন মনের দরজা খুলে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, এরজন্য আমারও কষ্ট হয় বোন। অনেকের অনেক দিনের জমানো অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হল আমাদের উপর দিয়ে। সংসার আমার জন্য নয়—শান্তি বল, সুখ বল, কিছুই আমি নিলাম না—পথে পথে ভেসে গেলাম। এই ভেসে যাওয়ার বদলে তোমাদের লক্ষ লক্ষ সংসার যেন আনন্দে ভরে ওঠে। নইলে বৃথাই আমাদের আত্মবঞ্চনা।

শোন আর এক গল্প। জেলে ছিলাম সে সময়টা। ভোরবেলা মিষ্টি রিনরিনে কণ্ঠে শুনতে পেলাম, যাচ্ছি দাদা, আপনারা দোয়া করুণ। আর একজন বলছে, নমস্কার—ভুলবেন না। স্বাধীন দেশে আবার আমরা জন্মাব।

দুই বন্ধু তারা, এর আগে চোখে চোখে তাদের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। দুজনে দৌড় দিল, কে আগে ফাঁসের দড়ি গলায় পরতে পারে!···

এদের দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। স্বাধীনতার আজ অভিনব সংজ্ঞা পেয়েছি। পন্থাও নূতনতম। তবু কি ভুলতে পারি—ছবি হয়ে এরা মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করে। বুড়ো হয়েছি, তোমরা দাদা বলে ডাক, উৎসুক মুখে বল, আগাগোড়া একটানা শুনতে চাও। কিন্তু বলি কি করে ভাই? প্রথম বয়সে স্বপ্ন নিয়ে পথে বেরিয়েছি, জীবনভোর তো প্রতীক্ষায় রয়ে গেলাম, আসছে···আসছে···আসছে···। দিন যখন আসবে, স্মৃতি যদি তখন একেবারে মরে না যায়, দস্তুরমতো আসর করে জাঁকিয়ে সকল কথা শোনাব। সবুর কর সে ক'টা দিন।

রানী

রানীর অপমৃত্যু হয়েছে, এই আমরা জানতাম। হয়েছেও তাই! বলছি শোন।

পুরী গিয়েছিলাম।

যাওয়ার কিছু ঠিক ছিল না, মেজমামাই যেতেন। তিনি রেলে কাজ করেন, পাশ পেয়েছিলেন। হঠাৎ বাতের অসুখ বেড়ে শয্যাশায়ী হলেন। তখন আমাকে ভরসা দিয়ে বললেন, তুমি যাও শঙ্কর, পাশটা নষ্ট হবে কেন? রেলের কেউ জিজ্ঞাসা করলে স্রেফ আমার নাম বলে দিও—কে কাকে চেনে?···

আর আমাদের রায়বাহাদুর রয়েছেন সেখানে, গিয়ে দেখা কোরো—কোন রকম অসুবিধা হবে না।

রায়বাহাদুর হলেন অনন্তপ্রসাদ চক্রবর্তী। তোমাদের মনে পড়বে কিনা জানি না, তাঁর বুড়ো বয়সে বিয়ে করা নিয়ে সেবারে খবরের কাগজে অনেক টীকা-টিপ্পনী হয়েছিল। ছেলেদের সঙ্গে ঐ নিয়ে খুব গণ্ডগোল হয়, এবং রায়বাহাদুরের সন্দেহ—ঐ লেখালেখির ব্যাপারে তাদের যোগসাজস ছিল। এখন অবশ্য সব মিটে গেছে। এক রকম সেই থেকেই রায়বাহাদুর নূতন বৌ এবং আগের পক্ষের কচি ছেলে-মেয়েগুলো নিয়ে পুরীতে বাস করছেন। তাঁর এক ছেলে যতীশ্বর মেজমামার কলেজের বন্ধু - অভিন্নহৃদয় বললে হয়। এখন আবার এক অফিসে কাজ করছেন। এঁদের কলকাতার বাড়িতে মেজমামার আড্ডা।

পুরী পৌঁছলাম সকালবেলা। একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। বিকালে রায়বাহাদুরের খোঁজে বেরিয়েছি। বহুকাল আছেন, অনেকেই চেনে দেখলাম। চক্রতীর্থের দিকে খানিকটা গিয়ে বাঁহাতি এক রাস্তা, সারি সারি বিস্তর ঝাউগাছ, তার মধ্যে প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডওয়ালা দোতলা বাড়ি।

রায়বাহাদুর বাইরের ঘরে ছিলেন, বেরোবার তোড়জোড় হচ্ছিল। ইনভ্যালিড চেয়ার এসেছে, দু'জন চাকর দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ছেলেপুলের পাল। একটি মহিলাও ছিলেন—নিশ্চয় দ্বিতীয় পক্ষের সেই স্ত্রী। আমায় ঢুকতে দেখে তিনি ভিতরে চলে গেলেন—তবু দামী সেন্টের গন্ধে ঘর আমোদ করে রেখেছে। বুড়ো বয়সের বউ কি না! রায়বাহাদুর বিরক্তভাবে আমার দিকে চাইলেন, অস্থিচর্মসার বিসদৃশ রকমের লম্বা মুখ—সাড়াশব্দ না দিয়ে এ রকম ভাবে ঢুকে পড়া উচিত হয়নি, বুঝতে পারলাম।

কি চাই তোমার?

জবাব না দিয়ে যতীশ্বরবাবুর চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলাম।

চিঠি, খালি চিঠি···। বিড়-বিড় করে বকতে বকতে পকেট হাতড়ে চশমা বের করলেন। এক নজর পড়ে অবহেলার সঙ্গে ফেলে দিলেন। রুক্ষ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, তা কি করতে হবে আমায়?

কিছু না। বলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি বেরিয়ে এলাম। বড্ড রাগ হল, এ ধরনের মানুষগুলোই এই রকম! আমি কি চাকরি চাচ্ছি, না ওঁর বাড়িতে অন্ন ধ্বংস করবার মতলবে এসেছি? এমন জায়গায় মানুষ আসে, মেজমামার যেমন কাণ্ড!

আর ও-মুখো যাই না। হোটেলেই শুয়ে বসে গল্প করে কাটাই, সন্ধ্যার দিকে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই। স্বর্গদ্বারের ওদিকে যে জায়গাটাকে গৌরবাটসাহি বলে, সেখানে লোকজন বড় বেশি যায় না। আমি একদিন গিয়েছি সেদিকে। দেখি বালির উপর চেয়ার পেতে রায়বাহাদুর বসে আছেন। আমি হন-হন করে এগিয়ে গেলাম, তাকালাম না। ফিরবার মুখে দেখলাম, তাঁর স্ত্রীও এসেছেন—বাড়ি ফিরবার উদ্যোগ হচ্ছে।

এর পর মাঝে মাঝে ওদিকে যাই। ঐ একটা জায়গাতেই তাঁরা রোজ এসে বসেন। সেই আমলের খবরের কাগজে লিখেছিল—'একটি পরমা-সুন্দরী কিশোরী বৃদ্ধের লালসায় আত্মাহুতি দিল'…এমনি কত-কি! তাই মহিলাটিকে দেখবার ঔৎসুক্য আছে, আড়চোখে দেখবার চেষ্টা করি। কিন্তু সন্ধ্যার পর ঘোর হয়ে গেলে তবে তিনি আসেন, সুবিধা হয় না। একদিন অবশেষে দেখে ফেললাম। গাড়ি রাস্তায় রেখে বালি ভেঙে তিনি আসছিলেন; একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। চমকে উঠলাম। এ মুখ যে আমার চেনা—খুব চেনা মনে হচ্ছে। অথচ ধরতে পারছি না, মনে পড়ে না—যেন পূর্বজন্মের পরিচিত কেউ, এ জন্মের নয়। মহিলাটিরও আমার দিকে নজর পড়ল, তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল টেনে মুখ ফিরিয়ে তিনি চলে গেলেন।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে লাগলাম। তারপর মনে হল, রানীর মুখের সঙ্গে এঁর আশ্চর্য মিল। কিন্তু রানী কি করে হবে? রানীর অপমৃত্যু হয়েছে। তার সম্বন্ধে সকল কৌতূহলের অবসান হয়ে গেছে।

আলো নিবিয়ে শুয়েছি, ঘর অন্ধকার। হঠাৎ অন্ধকারের পর্দা উঠে যায়… কাল পিছুতে পিছুতে বছর-তিরিশ পিছিয়ে গেল। সেই যখন আমরা থাকতাম হস্টেলে। হস্টেল মানে গোলপাতার ঘর, মাটির মেঝে। শীতকালে মাটিতে শুতাম, বর্ষার সময় বাঁশের মাচা তৈরি করে নেওয়া হত—ঠাণ্ডার জন্য নয়, পিছনের জঙ্গল থেকে রাত্রিবেলা সাপ উঠত, সেই আশঙ্কায়। কুন্তল-দা ফোর্থ ইয়ারে পড়তেন—কি রকম 'পড়তেন' সে তো আগেই শুনেছ ভাই। ফোর্থ ইয়ারের খাতায় নাম ছিল, কয়েক বছর ধরেই ছিল। তাঁর বাড়ি থেকে টাকা আসত হস্টেলের ঠিকানায়, তখন তিনি হস্টেল ছেড়েছেন। ওখান থেকে ক্রোশ-খানেক দূরে দ্বারিক চাটুজ্জে নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ি ছেলে পড়িয়ে খাওয়া-থাকা পান। বাড়ির লোক জানত, হস্টেলে আছেন, তারা তদনুযায়ী টাকা পাঠাত। সে টাকা দিয়ে কুন্তল-দা…না, যাকগে সেকথা। তখন আমার আশ্চর্য লাগত, দুঃখও হত। কত কষ্ট যে করতেন কুন্তল-দা! দ্বারিক চাটুজ্জের অবস্থা সুবিধের নয়—চাকর বাকর ছিল না, খাওয়ার পর কুন্তল-দাকে

এঁটো পাড়তে হত, বাসন মাজতে হত। আর সে কি খাওয়া! সমস্ত বসন্তকাল ধরে চলত সজনের খাড়া, তার পরেই কাঁঠালবিচি আর নটের ডাঁটা একেবারে আশ্বিন অবধি।

কলেজের পর আমরা প্রায়ই যেতাম কুন্তল-দার ওখানে, রবিবারের দিন তো নিশ্চয়ই। রানী অর্থাৎ উমারানীর সঙ্গে চেনাশোনা সেখানেই, সে ঐ বাড়ির মেয়ে। বয়স আঠার-উনিশ—তবু বিয়ে হয়নি। ওঁরা কুলীন, পালটি ঘর খোঁজ করে মেয়ের বিয়ে দেওয়া একটু কঠিন ব্যাপার। আর সেরকম টাকা-পয়সা থাকলে অবশ্য আলাদা কথা।

রবিবারে রবিবারে সেখানে নানা রকম বই পড়া হত—গীতা, আনন্দমঠ, বিবেকানন্দ ও দেউস্করের বই—এই সমস্ত। কুন্তল-দার হুকুম ছিল, প্রত্যেক দিনই সবাইকে গীতা পড়তে হবে। যার যেখানে খটকা লাগত, দাগ দিয়ে রেখে দিত; রবিবারের দিন কুন্তল-দা তার মানে বুঝিয়ে দিতেন—একেবারে নিজের মতো করে, ছাপানো বাংলা ব্যাখ্যার সঙ্গে তা মেলে না। এমন পড়াশুনার মধ্যে আমরা এক-একদিন দেখতাম—কুন্তল-দাও দেখেছেন নিশ্চয়—রানী কামরার মধ্যে বসে তন্ময় হয়ে শুনছে, তার যেন সম্বিৎ নেই। সে ছবি আজও মনে করতে পারি। মনে রেখ, পাড়াগাঁ জায়গা, আর রানীরাও কিছু বড়লোক নয়—সেজন্য পর্দার কড়াকড়ি ছিল না, সহজ ভাবেই সে আমাদের সঙ্গে মিশত। একেবারে বাড়ির গায়ে ভৈরব নদী, মাঝে মাঝে আমরা নদীর ঘাটে বসতাম। তখন লক্ষ্য করেছি, রানী জল আনা, কাপড়-কাচা এই রকম নানা ছুতো করে বারবার সেখানে আসা যাওয়া করত।

বর্ষার সময়টা একদিন সকাল থেকে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। আমার এ রকম হয়েছিল, কলেজ না থাকায় দুপুরবেলা হস্টেলে বসে কিছুতে সোয়াস্তি পেতাম না। ভিজতে ভিজতে গিয়ে উঠলাম সেই চালাঘরখানায়, যেখানে কুন্তল-দার অনন্তশয্যা বারো মাস তিরিশ দিন পাতাই থাকত। একে মেঘলা দিন, তার উপর সে-ঘরে জানালার হাঙ্গামা না থাকায় ভিতরটা আঁধার-আঁধার হয়ে ছিল। ঘরে ঢুকে প্রথমটা শুধু কুন্তল-দাকে দেখতে পেলাম—খুব গম্ভীর হয়ে বিছানার উপর বসে আছেন। তারপর অবাক হয়ে গেলাম—এ রকমটা আর কোনদিন হয়নি—দেখি মেজের উপর মুখ নিচু করে রয়েছে রানী, দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। কুন্তল-দা বললেন, এই যে শঙ্কর এসে গেছিস। ভালো হয়েছে, বোস। পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। বসতেই আমার ডান হাতখানা মুঠোর মধ্যে নিলেন। চুপচাপ, কথাবার্তা নেই—তিনি বিচলিত হয়েছেন বুঝতে পারছি।

এমন অবস্থায় আমি যে কি করব, বুঝতে পারি নে—কাকে কি বলব। একটু পরে কুন্তল-দা বললেন, আচ্ছা শঙ্করই বলুক, তোমাকে দিয়ে আমাদের কি কাজ হবে? আমি তো ভেবে পাই নে। তুমি মিথ্যে দুঃখ করছ রানী।

উমারানী কান্নার স্বরে বলে, আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই বলুন। ভাবছেন, আমাকে দলে নিলে দেশের কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।

কুন্তল-দা আমার দিকে চেয়ে বললেন, আচ্ছা এক পাগল! একটু বুঝিয়ে দে তো শঙ্কর।

আবার নিজেই বোঝাতে লাগলেন, দেশ মানে কি খানিকটা মাটি আর দুটো গাছপালা? দেশ হচ্ছে তোমরা সকলে মিলে। স্বাধীন দেশে তোমরা স্বচ্ছন্দে থাকবে, তাই আমরা খেটে মরছি। বিনা লাভে কেউ কখনো কষ্ট করে···বল, তুমিই বল। তার চেয়ে শোন—যখন ছেলেপুলে হবে, একটা-দুটো আমাদের দিও। দেশ-উদ্ধার তো এক দিনে হয়ে যাচ্ছে না।

রানী তর্ক করে, আর তোমরা? তোমরা বুঝি দেশের মানুষ নও কুন্তল-দা? তোমরা যে না খেয়েদেয়ে জীবনের মায়া না করে এই রকম ভাবে বেড়াচ্ছ—

কুন্তল-দা হো-হো করে হেসে কথা উড়িয়ে দিলেন। বললেন, দেখ একবার। এই জন্যে তোমাদের নিতে চাই না। তোমরা এলে মহা আয়োজনে খাওয়াতে বসে যাবে, জীবনের সম্বন্ধে যাতে মায়া করি তার সদুপদেশ ছাড়বে। ঐ-সব বুঝেই স্বামীজী কামিনী কাঞ্চন সম্পর্কে সাবধান করে গেছেন।

দেওয়ালে বিবেকানন্দের ছবি, পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, গেরুয়া পাগড়ি—বীরমূর্তি। কুন্তল-দা সেই দিকে হাস্যমুখে চেয়ে রইলেন। আমাকে বললেন, আর যে কাউকে দেখছি নে। বৃষ্টি বাদলায় সাহেবদের পরে রাগ হঠাৎ কমে গেল নাকি?

উমারানী এই সময় কথা বলে উঠল। বলে, আমি আপনাকে একটা প্রণাম করব কুন্তল-দা? তাতেও কি আপত্তি আছে?

কুন্তল-দা যেন চমকে উঠলেন। আমার দিকে চেয়ে সহজভাবে বলতে লাগলেন, বুঝলি শঙ্কর, দেশ স্বাধীন হলে আমায় যদি তোরা রাজা করিস—এই সেন্টিমেণ্টাল মেয়েগুলোকে সকলের আগে আন্দামান পাঠাব।···শোন রানী, তোমার বাবাকে আমি বলে দেব কিন্তু—সত্যি বলে দেব। বামুনের মেয়ে হয়ে কায়েতকে প্রণাম করছ, জাত জন্ম রইল না আর!

কিন্তু আমি কুন্তল-দার সঙ্গে হাসতে পারলাম না। রানী যে কিরকমভাবে কুন্তল-দার পায়ে মাথা রেখে নিস্পন্দ হয়ে রইল, সে কেমন করে বোঝাই? অনেকক্ষণ পরে উঠে মুখ নিচু করে নিঃশব্দে সে বেরিয়ে গেল।

এরই দিন কয়েক পরে, দেখলাম, রানী আর হাসি ধরে রাখতে পারে না, যেন পাখির মতো হাওয়ায় উড়ছে। আমি উঠানে পা দিতেই ছুটে এসে কানে কানে বলে, শুনছ শঙ্কর-দা, কুন্তল-দা রাজি হয়েছেন, আমায় কাজ করতে দেবেন।

কুন্তল-দা বললেন, আগে পরীক্ষা দাও দিকি, তারপর সে-কথা।

বলুন, কি করব ?

রানী তখনই প্রস্তুত।

চট করে চাট্টি মুড়ি ভেজে আন। বর্ষার দিনে খাসা লাগবে।

রানী ছুটে চলল। কিন্তু সন্দেহ করেছে, মুখ ফিরিয়ে বলল, আমায় এখান থেকে সরাতে চান ?

কিছুক্ষণের মধ্যে গরম মুড়ি এল। অত তাড়াতাড়ি কি করে করল জানি না। মহানন্দে আমরা থালার চারপাশে বসে গেলাম।

কুন্তল-দা হেসে বললেন, দলের মধ্যে তোমার রইল এই মুড়ি ভাজার কাজ। খুব বড় কাজ এইটে—জান ?

কিন্তু ওর চেয়েও বড় কাজ সে পেয়েছিল।

একদিন রাত্রে ঘুমচ্ছি, এমন সময় ধাক্কাধাক্কিতে দোর খুললাম। বাইরে কুন্তল-দা বাইকে করে এসেছেন, চোখ জ্বলছে। আমায় বললেন, শোন—খবর পেয়েছি, পুলিসে বাড়ি ঘেরাও করেছে, ভোর রাতে সার্চ হবে। কিছু মাল সরাবার দরকার। ওপারে জগৎ দত্তর ওখানে—পৌঁছে দিতে হবে। তুই আমাদের খালিশপুরের ঘাটে গিয়ে নৌকো ঠিক করে গাবতলায় দাঁড়িয়ে থাকবি। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে মাল পৌঁছবে—বুঝলি ? আমি বাড়ি চললাম।

অতএব নৌকা ঠিক করে যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। অমাবস্যার কাছাকাছি একটা তিথি, তার উপর আকাশে মেঘ করেছে—বড় ভয়ানক অন্ধকার। ভৈরবে জোয়ার এসেছে, কোটালের টান। দেখতে দেখতে সেই গাবতলা অবধি জল এসে পৌঁছল। চেয়েই আছি—অনেকক্ষণ পরে দেখি, রাস্তা দিয়ে নয়—বাগানের ছায়ায় ছায়ায় ঘোমটা-ঢাকা আবছা মূর্তি দ্রুতপদে আসছে। কাছাকাছি এসেছে, এমন সময় কোন্ দিক দিয়ে হঠাৎ জন দুই-তিন তার পথ আটকাল।

দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছ ?

আলো ফেলেছে মুখের উপর। আমার জায়গা থেকে যতটা দেখা যায়, দেখলাম—অতি নির্ভীক অপূর্ব উমারানীর মুখ। বলল, ঘাটে যাচ্ছি।

কেন ?

ঝাঁঝালো স্বরে রানী জবাব দিল, একটু জিরোব বলে। বাবা বকেছে বড্ড। পথ ছাড়ুন।

তোমাকে থানায় যেতে হবে।

কিন্তু থানায় সে গেল না। তাদের পাশ কাটিয়ে চক্ষের পলকে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোটালের টানে সুতীব্র স্রোত চলেছে, তার উপর একই রকম অন্ধকার। আমি গাবতলা থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়লাম।

খবর পেলাম, সকালবেলা দ্বারিক চাটুজ্জের বাড়ি সত্যিই সার্চ হয়েছিল, কিছু পাওয়া যায় নি। পাওয়া যাবে না, সে তো জানতামই। বেলা একটা-দেড়টার সময় কুন্তল-দা হস্টেলে এলেন। আমায় বললেন, কলেজে যাচ্ছিস ? আজ আর যাস নে শঙ্কর, কামাই কর্। চল্ দুজনে বেড়িয়ে আসি।

ঠিক দুপুরে বেড়াবার সময় নয়। আর কুন্তল-দার যে-রকম উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, বেড়াবার মতো অবস্থাও নয়, বুঝতে পারি। একটু দূরে খালের উপর একটা কাঠের পুল। তারই উপর কুন্তল-দা বসে পড়লেন, আমাকে বসালেন। বললেন, কি রকম সাহস আর বুদ্ধি মেয়েটার! দলটা তো সে-ই বাঁচাল। বাড়ি থেকে সাঁ করে বেরিয়ে গেল, তখন ওরা বুঝতে পারে নি। আর মেয়ে-মানুষের সুবিধা আছে, হঠাৎ কেউ ধরতেও পারে না।

আমি বললাম, রানীর বাবা খুব বকেছিলেন বুঝি ?

কুন্তল-দা বললেন, সে তো হরদম চলেছে। আমাকেও নোটিশ দিয়ে রেখেছেন ভাদ্র মাস কাটলে বিদায় হতে হবে। কিন্তু বকাবকির জন্য জলে ডুবে আত্মহত্যা করবে, এরা কি সেই ধরনের মেয়ে ? তোর হাতে যখন দিতে পারল না, রানী ঠিক ভেবেছিল—সাঁতার দিয়ে ও-ই জগৎ দত্তের কাছে যাবে। তা পারে নি, আমি ওপার থেকেই আসছি। আহা, কাজের জন্য এমন করত বেচারি—গোড়াতেই চলে গেল!

অনেকক্ষণ ধরে এই সব কথাবার্তা হল। বলতে বলতে একবার কুন্তল দা চোখ মুছে ফেললেন। পাষাণে জল আছে, এই প্রথম দেখলাম।

রানীর কথা কতদিন ভেবেছি! পাড়াগাঁয়ের স্বল্পশিক্ষিতা সাধারণ মেয়ে কী-ই বা বুঝত, কতটুকু জানত—আঁধার রাতে নির্ভয়ে ভৈরবে ঝাঁপিয়ে পড়ল, পুলিসের টর্চ-আলোয় তার শেষ মুহূর্তের চেহারা কেবল আমিই দেখেছিলাম। সে আবার ভৈরবের জলশয্যা থেকে উঠেছে, এবং অন্তুতপক্ষে দু-শ ভরি পরিমাণ জড়োয়ার-গহনায় সর্বাঙ্গ মুড়ে রায়বাহাদুরের ঘর আলো করে আছে, এ একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। অথচ নিজের চোখ দুটোকেই বা অবিশ্বাস করি কি করে ?

পরদিন গিয়ে পথের উপরে দাঁড়িয়ে রইলাম। দূর থেকে দেখছি, রায়বাহাদুর যথারীতি সমুদ্রের ধারে চেয়ারখানিতে উবু হয়ে আছেন। মহিলাটি এলেন—সে রানীই। আমায় দেখে একটু আগেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। বলে, শঙ্কর-দা, কবে এলে এখানে? কোথায় উঠেছ?

আমি বললাম, রানী, উমারানী, তুমি বেঁচে আছ?

রানী হেসে বলে, দস্তুরমতো, বেঁচে আছি। আমার স্বামী কত বড়মানুষ—যেমন টাকায় বড়, তেমনি বয়সে। মস্ত খেতাব, প্রকাণ্ড জমিদার।

কথা বলতে বলতে দুজনে এগিয়ে চলেছি। রানী বলে, সেদিন এক নজর দেখেই চিনেছিলাম, তুমি কিন্তু চেননি।

আমি বললাম, চিনলেও যার অপমৃত্যু হয়েছে জানি, তার সঙ্গে হঠাৎ কথা বলতে সাহস হবে কি করে?

রানী খিলখিল করে হেসে উঠল। বয়স হয়েছে রানীর, কত মোটা হয়ে গেছে, তবু আগেকার মতো হাসির সেই রকম মিষ্টি আওয়াজ, গালের উপর তেমনি টোল পড়ে। বলে, তা হলে আমি ভূত হয়ে চলছি তোমার সঙ্গে? তা সত্যি। আমি কি স্বপ্নেও জানতাম, এত সুখ আমার কপালে আছে!

গম্ভীর হয়ে গেল। আর খানিকটা এসে বলে, এবার সরে যাও শঙ্কর-দা। আমার সঙ্গে আর কেউ কথাবার্তা বলছে দেখলে রাগারাগি করবে। বুড়ো হয়ে মেজাজের ঠিক নেই। এমন ভাব দেখাবে, যেন আমাদের চেনাজানা নেই। কাল সকালবেলা একবার আসবে এদিকে? অত্যন্ত করুণ চোখে চেয়ে সে বলতে লাগল, যদি আসতে পার শঙ্কর-দা—মন্দিরে যাবার নাম করে, আমি চলে আসব। কত কথা জমে আছে বুকের মধ্যে···বুক ফেটে বেরুতে চাচ্ছে।

সকালবেলা নিরিবিলি বসে অনেক কথা হল। রানীর বিয়ের কাহিনী শুনলাম। অনন্তপ্রসাদ তখন খুলনায় ডেপুটি। এরই আগে এক দুর্ঘটনা হয়ে গেছে, হঠাৎ কলেরা হয়ে তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী সতীলোকে চলে গেছেন। থাকল একপাল ছেলেপুলে। অনন্ত সরকারী কাজ নিয়ে ব্যস্ত কে তাদের দেখে, তাঁকেই বা কে সেবা-যত্ন করে! ঝি-চাকর দিয়ে ঠিক হয়ে ওঠে না, মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন, ভেবে কূলকিনারা পান না। আত্মীয়েরা বিয়ে করতে বলেন, কিন্তু বিয়ে বললেই তো হয় না! তাঁরা শ্রোত্রীয়, এমনি সাধারণ ভাবে একবার বিয়ে করার মেয়ে পাওয়া কঠিন—তার উপর এতগুলো ছেলেপুলে থাকা অবস্থায়, এই বয়সে···চুল সমস্ত পেকে সাদা হয়ে গেছে। লোকে বলে, বাংলাদেশে মেয়ে সস্তা; তবু তো কোনো মেয়ের বাপ এগোয় না!

কিন্তু ভগবদ্বিশ্বাসী লোক—সকল কাজের মধ্যেও তিনি-সন্ধ্যা আহ্নিক করতে ভুল হয় না—ভগবানই উপায় করে দিলেন। একদিন গিয়েছিলেন বাগেরহাট অঞ্চলে একটা তদন্ত করতে। নৌকা করে ফিরছেন। শেষ রাত। একজন দাঁড়ি দাঁড় তুলে আ-হা-হা করে উঠল।

কি, কি ব্যাপার ?

মানুষ একটা ডুবে যাচ্ছে।

অনন্ত বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি টর্চ ফেললেন জলে। কে একজন জলে দাপাদাপি করছে, হয়তো নৌকার কাছাকাছি আসবার মতলব, কিন্তু পারছে না—তার হাত-পা যেন অসাড় হয়ে এসেছে, সাঁতার দেবার জো নেই। দাঁড়িরা লাফিয়ে পড়ল। সেখানটা চরের মতো জায়গা, জল বেশি নয়। তোলা হল।

অনেক কষ্টে রানীর চেতনা হল। অনন্ত তাকে খুলনার বাসায় নিয়ে তুললেন। বিকেলের দিকে দ্বারিক চাটুজ্জেকে খবর দিয়ে আনা হল।

অনন্ত বললেন, গোলমালে কাজ কি বলুন। আপনার গ্রামের মধ্যেও তো নানা কথা উঠেছে, মেয়ের বিয়ে দেওয়া শক্ত হবে। তার চেয়ে আমাকেই সমর্পণ করুন। কাক-পক্ষীও জানতে পারবে না।

আপনাকে ? দ্বারিক ইতস্তত করতে লাগলেন।

তা নইলে কিন্তু জেলে নিয়ে পুরবে। ওর কোমরের সঙ্গে রিভলবার বাঁধা ছিল। জেলের চেয়ে কি আমার ঘর করা খারাপ হবে ? বুঝে দেখুন ব্যাপারটা। মানী ঘরের মেয়ে—খবরের কাগজে নাম বেরুবে. আর এই প্রসঙ্গে সত্যি-মিথ্যে কত কি রটে যাবে।

বাপ নিরুত্তর হলেন। রানী বললে, হোক জেল, আমার জেলই ভালো।

মৃদু হেসে অনন্ত বললেন, তা হলে অ্যালুমিনিয়ামের কৌটোয় শীলমোহর করে যে কাগজগুলো যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছিলে, তা-ও পুলিসের হাতে পড়বে। তাতে তুমি একা নও—দলসুদ্ধ জালে পড়বে।

রানী রেগে আগুন হয়ে উঠল।

সেটাও পেয়েছেন ? আমি ভাবলাম জলে পড়ে গেছে। দিন আমাকে, দিন বলছি—

অনন্ত পাকা লোক···ছেলেমানুষের রাগ দেখে তাঁর হাসি আরও বেড়ে যায়। বললেন, তাড়াতাড়ি কি ! আমার কাছে থাকা যা, তোমার কাছে থাকাও তাই।···আচ্ছা বউভাতের দিন দেব। অবশ্য সে পর্যন্ত যদি এগোয়। আর নইলে দিয়ে আসব থানায়।

বউভাতের দিনও অনন্ত দেননি সে কাগজগুলো। রানী মাঝ মাঝে

চাইত, কুন্তল-দা দেব-দেব করতেন। তখনও তাঁর ভয় ঘোচেনি, জিনিসটা হাতে পেলে রানী কি এই রকম সেবাযত্ন করবে! এখন অনেক বছর হয়ে গেছে, চাইলে হয়তো দিয়ে দেন, কিন্তু রানীরই খেয়াল হয় না। কী হবে তা দিয়ে? দেশের রাষ্ট্র-সংগ্রামে সে এক বিচিত্র অধ্যায়। কাগজগুলো হয়তো ছিন্ন বিবর্ণ হয়ে পড়ে আছে আয়রণ-সেফের এক কোণে। কিংবা হয়তো নেই।

গল্প শেষ করে রানী চুপ করে কীসব ভাবে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, কুন্তল-দা কোথায় এখন?

বললাম, জানি না।

কথাটা মিথ্যা জেনেও বললাম না। কুন্তল-দা মারা গেছেন। কেউ জানে না, অমন বিরাট প্রাণ বরানগরের এক এঁদো গলির আধো অন্ধকারে কেমন করে আস্তে আস্তে মৃত্যুতে মিলিয়ে গেল। কিন্তু সেসব খবর দিয়ে লাভ কি? কুন্তল-দা পৃথিবীতে নেই—রানীর মনের মধ্যেও সেরকম ভাব নেই, বুঝতে পারছি।

তারপর আমার নিজের কথাও অনেক হল। রানী বলে, যতীশ্বরের চিঠি নিয়ে এসেছিলে, তবে আর কি! সেই সূত্রে আজকে আবার যেও আমাদের বাড়ি। আমি ওঁর সামনেই তোমার সঙ্গে আলাপ করব, তোমাকে রাত্রে খাবার কথা বলব। সেই গরম-গরম মুড়ি ভেজে দিতাম। উঃ, কতদিন দেখিনি তোমাদের কাউকে। যাবে তো?

ঘাড় নেড়ে বিদায় নিলাম। বিকেলে যেতে বলেছে, রানী নিমন্ত্রণ করবে। এখন বড়লোকের বউ—মুড়ি খাওয়াবে না, আয়োজন গুরুতর হবে নিশ্চয়। হোটেলের ঘ্যাঁট খেয়ে এই ক'দিনে অরুচি জন্মে গেছে। কিন্তু চলতে চলতে সাব্যস্ত করলাম, যাব না ওদের বাড়ি। বরঞ্চ আর যাতে দেখা না হয়, পুরী ছেড়েই চলে যাব। এই ক'টা দিন ভুলে যাই—রানীর অপমৃত্যু হয়েছে, এই কথাই থাক আমার মনে। গাঢ় আঁধারের মধ্যে বিনা দ্বিধায় করাল ভৈরবে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল—পুলিসের টর্চের আলোয় সেই ছবি দেখেছিলাম, সেইখানে রানীর কাহিনীর সমাপ্তি হয়ে থাক।

আনন্দকিশোর

এক সাধু মহারাজের গল্প বলছি এবার, আমাদের আনন্দকিশোর। তোমাদের হাসি পাবে, আবার চোখে জলও আসবে নিশ্চয়।

কুন্তল-দা তখন তৃতীয়বার জেল খেটে বেরিয়ে এসেছেন। কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি চুকে গেছে। এবার শহরে আস্তানা গাড়বার ভয়ানক দরকার।

বাবা তখন বেঁচে। তাঁকে বললাম, মফস্বল কলেজে পড়াশুনা কিছু হয় না। এতদিন যা হোক চলেছে, এখন বি-এ পড়ার সময় কলকাতা না গেলে নির্ঘাৎ ফেল হব।

বাবা হেসে সম্মতি দিলেন। ব্যাপারটা তিনি আন্দাজ করেছিলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। মহাস্ফূর্তিতে শহরে এলাম। কলেজে ভর্তি হয়েছি। বিকেল বেলা প্রায় রোজই বরানগরের নদীর কাছাকাছি একতলা ভাড়া বাড়ির ছাতে গিয়ে সকলে জুটি। কখন বিকাল হবে, সেজন্য মন পড়ে থাকে। কেবল কুন্তল-দা নয়, ঐ বাড়িতে মা থাকেন। কুন্তল-দার মা—তোমার আমার সকলের মা—অসীম ধৈর্যের মূর্তি। হাসিমুখে মা আমাদের আহ্বান করতেন। তাই তো ভাবি, অমন মা না হলে কুন্তল-দার মতো ছেলে জন্মায়!

মাস দুয়েক পরের কথা। একদিন দেখি, সবাই এসেছে—কুন্তল-দা নেই। সন্ধ্যার পর তিনি এলেন—সঙ্গে বছর কুড়ি বয়সের ফুটফুটে একটা ছেলে। অবাক হয়ে চেয়ে আছি। কুন্তল-দা বললেন, বড্ড নাছোড়বান্দা—কী করা যায় বল! কিন্তু খাসা বেহালা বাজায়।…বেহালাটা আননি বুঝি আনন্দকিশোর?

বেহালা না এনে যেন মস্ত অপরাধ করে বসেছে, এমনিভাবে ছেলেটি ঘাড় নিচু করে রইল।

এই বেহালা পরে একদিন শুনেছিলাম। যতক্ষণ বাজনা চলছিল, চেয়ার ঠুকে ঘাড় নেড়ে কুন্তল-দার সে কী তারিফ! তারপর বললেন, কেমন, ভাল লাগল না? সত্যি বল—

হুঁ, এখন লাগছে—খুবই ভাল লাগছে। থেমেছে বলে।

কুন্তল-দা আনন্দকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই। ওরা সব অসুর—সুরের কি বুঝবে?

হিরণ বলল, স্বদেশি ছেড়ে এবার যাত্রার দল খুলে দাও কুন্তল-দা, চৌরঙ্গি-পাড়ায় গাওনা শুরু কর, ইংরেজ ডাক ছেড়ে পালাবে।

বেহালা বাক্সবন্দি করে আনন্দ ম্লানমুখে নেমে চলল। কুন্তল দা ডাকলেন, হল কি তোমার? শোন—শোন।

আনন্দ মুখ ফিরিয়ে বলে আপনার সমস্ত ফাঁকি কুন্তল-দা। বাজনা খারাপ হয়েছে, বেশ হয়েছে। বাজাতে তো আসিনি। কাজ চাচ্ছি, সে সম্বন্ধে একটা কথা নেই—

মজা লাগছিল বেশ। আমি গিয়ে আনন্দর হাত ধরলাম।

কাজ? কী কাজ করবে ভাই? গায়ে দেখছি তো হাড়-মাংস নেই, তুলো দিয়ে তৈরি বুঝি। কী কী করতে পার, বল—

কুন্তল-দা বললেন, পারে ঐ বেহালা বাজাতে আর ঝগড়া করতে।

দিন-রাত আমার সঙ্গে ঝগড়া করছে, বলে—কাজ দিন, কাজ দিন—

আনন্দ বলল, ঝগড়া না করলে আপনি কি শায়েস্তা হন কুন্তল-দা ? আপনি বড্ড একচোখো।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে থাকি, বলে কি ! কুন্তল-দাকে এতবড় কথা বলবার সাহস ওর হল কি করে ? কুন্তল-দা মৃদু মৃদু হাসছিলেন। বললেন, শুনলি শঙ্কর ? কথার শ্রী দেখ। এই রকম যখন-তখন গালি দেয়।

অতএব বুঝে ফেললাম, ঐ হতভাগারও মরণ হয়েছে আমাদের মতো। নিতান্ত কচি নিষ্পাপ মুখখানার দিকে চেয়ে নিশ্বাস পড়ল। কুন্তল-দার মতো হইনি এখনো, চোখের জল বুকের নিশ্বাস একটু-আধটু আছে। বললাম, অন্যায় বলেনি কুন্তল-দা।

তোমাদেরও এই মত নাকি ?

হ্যাঁ, সত্যি, তুমি একচোখো। এত বছর গুরুমান্য দিয়ে আসছি, আর আজ কোত্থেকে একরত্তি ঐ ননীর পুতুল জুটিয়ে আনলে, এনেই কোল বাড়িয়ে দিলে। এতে হিংসে হয় না ?

কুন্তল-দা ভালোমানুষের মতো আমায় দেখিয়ে বললেন, আনন্দ, এই হল সেক্রেটারি। ও যতক্ষণ না দেবে, কেউ কোনো কাজ পায় না। একে ধর, কিছুতেই ছাড়বে না, বুঝলে ?

তাই বিশ্বাস করল ছেলেটা। তারপর সে যে কী মুশকিল, তোমাদের কী বোঝাই ভাই। সকাল নেই, দুপুর নেই, যখন-তখন গিয়ে ধরণা দেয়। আর ঐ এক কথা, কাজ দিন।

অবশেষে কুন্তল-দাকে ধরে পড়লাম, আর পারি না। দোহাই দাদা বাঁচাও—

কুন্তল-দা হেসে উঠলেন। কেমন জব্দ ! নিন্দে করবি আমার ? নাকে খত দে আগে !

ভাদ্র মাস পড়ল। খবরের কাগজে যথারীতি বন্যার খবর বেরুচ্ছে। নানারকম সমিতি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে—হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে রাস্তায় গান গেয়ে গেয়ে বন্যাত্রাণ করে বেড়াচ্ছে। এই সময় কয়েকটা দিন আমি গ্রামে ঘুরে এলাম। কেন তা বলব না। যা হোক একটা আন্দাজ করে নাও। সবাই জানত, জন্মাষ্টমীর ছুটিতে বাবাকে দেখতে গিয়েছিলাম। চাষাপাড়ায় ঘুরে বেড়াতাম। আলাপ করে দেখেছি, দুবেলা ভাত খাওয়া এবং আস্ত

অথণ্ড কাপড় পরা মানবজীবনের চরম বিলাসিতা বলে তারা জেনে রেখেছে।

সেই সব কথাই হচ্ছিল। বললাম, মানুষ সব না খেয়ে মরছে।

কুন্তল-দা বললেন, মরুক।

বাড়িয়ে বলছি ভাবছেন? মোটেই নয়। চালের দর কত জানেন?

অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে কুন্তল-দা বললেন, আমি তো তাই বলছি। মরে যাক। খাওয়ার মানুষ না থাকলে চালের দর কমবে।

হিরণ রাগ করে বলে, তুমি পাষাণ—একেবারে পাষাণ—

সেটা কি আজ জেনেছ? বলতে বলতে কুন্তল-দা কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বললেন, ও-কথা সকলের আগে বলেছিলেন আমার ঠাকুরমা। তিনি আমায় মানুষ করেছিলেন, দেখা হলেই কাঁদা-কাটা করতেন। সেই ঠাকুরমা মৃত্যুশয্যায়—খবর এল। আমি বাড়ি গেলাম না—চললাম কুঠির বস্তিতে।

আনন্দকিশোরও ছিল সেখানে, সে আমার হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে গেল। চুপি চুপি বলে, এইবার আমায় কাজ দিতে হবে শঙ্কর-দা, নয় তো আপনার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো।

হয়েছে কী?

আপনার ঐ চাষাদের ব্যবস্থা আমি করব।

মড়া পোড়াবার ব্যবস্থা?

জিভ কেটে আনন্দ বলল, ছি ছি—কী যে বলেন! ওদের বাঁচাব। কত টাকা আদায় করে আনব দেখবেন।

কুন্তল-দা কী সব বললেন—শুনেছ তো?

ও আমি মানি না। ওঁর জুড়ি ভু-ভারতে নেই। ঐ কি ওঁর মনের কথা হতে পারে? কখনো নয়।

অবোধ ছেলে! মানুষটার মতো ভু-ভারতে নেই, কিন্তু মনটি ধরে নিয়েছে তোমার আমার দশজনের মতো! বড় বড় চোখ মেলে পরম আগ্রহে আনন্দ আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। বলে, একটা বার বিশ্বাস করে দেখুন না। প্রাণের আমি পরোয়া করি না। শুধু একটা।

হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিল। হাসি চেপে বললাম, রিভলবার?

দিয়ে দেখুন একবার। কাজ করতে না পারি ফিরিয়ে নেবেন—

আনন্দ আমার পিছু পিছু চলেছে। গলির মোড়ে এসে দোতলার ঘরটা দেখিয়ে দিলাম। আলো জ্বলছে, অর্গানের আওয়াজ আসছে। কানে কানে বললাম, সোজা উপরে চলে যাবে, বুঝলে? ঝি-চাকরেরা নিচে। বাড়িতে আছে একটি মাত্র মেয়ে—আর সবাই নেমতন্নে গেছে। পারবে তো?

ঘাড় নেড়ে আনন্দ বলল, খুব-খুব···একটা তো মেয়ে! ও আর শক্ত কি? আপনি তবে এইখানে দাঁড়ান—

দাঁড়াতে হবে? ফিরবার সময় ভূতের ভয় করবে বুঝি!

তার মুখ লাল হয়ে উঠল, গ্যাসের আলোয় দেখতে পেলাম। চলে যান, আপনি চলে যান শঙ্কর দা—না, কিছুতেই থাকতে পারবেন না।

হাসতে হাসতে পার্কের কোণে বেঞ্চির উপর বসি। এই একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। পার্কে জল জমেছে। মনে ভাবলাম, কাঁহাতক এ রকম ভিজে মরব। বাড়ি গিয়ে শুইগে। চেনা মানুষ – চেনা বাড়ি—জলে পড়ে নি তো।

বাড়িটা সরোজ পাকড়াশির, সরোজের কথা আগেই বলেছি ভাই—আমাদের সেই সরোজ। মাস তিনেক আগে তাকে জেলে নিয়ে পুরেছে। নিরুপমাও প্রায় সেই সঙ্গে কলেজে ইস্তফা দিয়েছে দাদার তাড়নার ভয় নেই, হস্টেল ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি এসে বসেছে।

পরের দিন ঐ গল্প হচ্ছিল। নিরু এসেছে—সে বড় একটা আসে না—কিন্তু বিশেষ করে ঐ রোমাঞ্চকর স্বদেশি ডাকাতির গল্প বলবার জন্য এসেছিল। হেসে হেসে এবং রীতিমত ডালপালা সংযোগ করে সে বলছিল। যা মেয়ে নিরুপমা—কোনো কথা সহজ করে বলা তার কুষ্ঠিতে নেই। আর আনন্দের সঙ্গে এর আগে জানাশোনাও হয় নি—

নিরু বলে, জানতে লেগেছিল মোটে এক মিনিট। একটা কথায় বুঝে ফেললাম, ডাকাত নয়—অত্যন্ত ভদ্রলোক, সাধুসজ্জন অমায়িক ব্যক্তি। দোতলায় উঠে দস্তুর করে তো আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন···

আনন্দ বলল, অত গয়না পরতে নেই। দু চারখানা দিয়ে দিন—

নিরু নাকি জবাব দিল, আপনি পরবেন? সাধ হয়েছে?

বিরক্ত কণ্ঠে আনন্দ বলে, ওসব শুনতে আসি নি। চাঁদা চাচ্ছি দেশের জন্য—

চাঁদা তো লোকে দু-চার আনা আদায় করে হোস্টেলে গিয়ে চপ-কাটলেট খায়। আস্ত গয়না চাচ্ছেন আপনি, দালানকোঠা বানাবেন বুঝি?

আনন্দ রিভলবার বের করে।

কী ওটা? বেশ তো! দেখি—দেখি—

নিরীহ মুখে নিরু এগিয়ে আসে। এসে একেবারে ঘাড়ের উপর পড়ে আর কি! অজানা অচেনা পরের বাড়ির এই রকম একটা কিশোরী মেয়ে—আনন্দের মুশকিলটা বোঝ একবার। সে পিছিয়ে যায়। পিছুতে পিছুতে ভিতরের দিককার দরজা অবধি গিয়ে পড়ে।

নিরু তবু রেহাই দেয় না। বলে, দুয়োর বন্ধ—যাবেন কী করে?

আমি যাচ্ছি কে বললে ?

ওঃ যাবেন না, থাকবেন বুঝি ? তাহলে বসুন। বড্ড হাঁপিয়ে গেছেন শরবত আনব ?

আনন্দ যথাসম্ভব কঠিন হয়ে বলে, এ-ঘর থেকে আপনার বেরুনো হবে না। বুঝতে পারছি, পুলিসে খবর দিতে চান—

নিরু খিলখিল করে হেসে ওঠে, হাসি আর থামতেই চায় না। বলে, রামোঃ! আপনি ভালো লোক—সাধু মহারাজ—পুলিস ডেকে আপনাকে বিব্রত করব, আমার পরকালের ভয় নেই ?

যা ভাবছেন, আমি তা নই—

মনের ভাবনা বুঝতে পারেন ? কী ভাবছি বলুন না, সত্যি বলুন—

হতভাগা মেয়েটা করল কি একেবারে তার হাত ধরে বসল। এক রকম জোর করেই আনন্দকে সোফার উপর বসিয়ে দিল। বলে, গান শুনবেন ? চুপচাপ বসে শুনুন। নড়বেন কি চেঁচিয়ে পুলিসে ধরিয়ে দেব।

নিরু অর্গানের ধারে গিয়ে বসল। আনন্দ বলে, বাঃ রে, আমাকে বোকা বানাতে চান ?

না না। আপনাকে কি আর বানাতে হয়!

আনন্দ উঠে দাঁড়াল। রুক্ষ কণ্ঠে বলল, এ সবে আমায় ভোলাতে পারবেন না, বুঝলেন ?

ভোলাতে যাব! বাপ রে, আমার ভয় করে না বুঝি! এই চুড়িগুলোর পরে আপনার ঝোঁক তো! খুলে দিচ্ছি—পকেটে রাখুন। আর আমিও ঘর থেকে নড়ছি নে। তাহলে গান শুনতে আপত্তি নেই তো ?

নিরু চুড়ি খুলে আনন্দের সামনে রাখল। বলে, এই দু-গাছা মাত্র দু-হাতে রইল। তাতে আপত্তি আছে ? বলুন—

এবার আনন্দ সত্যিই চটে উঠল।

আচ্ছা মেয়ে তো আপনি! ভয় করেন না ?

মুখ ভারী করে নিরু বলে, মিছিমিছি বকবেন না বলছি। ভয় না পেয়ে মেয়েলোক কখনো গায়ের গয়না খুলে দেয় ? আমি ভয় পেয়েছি, সত্যি বলছি, দিব্যি করে বলছি—

আনন্দ বলে, ভয় পেতে আপনার বয়ে গেছে। টিপি টিপি হাসছেন, আমি বুঝি না কিছু।

রাগ করে সে বেরিয়ে এল। পিছু থেকে নিরু ডাকাডাকি করে, চুড়ি পড়ে রইল যে! নিয়ে যান—

আনন্দ চেয়েও দেখল না।

গল্প শুনে সবাই হাসে, হিরণের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। বলে, এই রকম ঠাট্টা-তামাশায় মেতে যাচ্ছ শঙ্কর—জান, আমাদের এসব খেলা নয়।

নিরু ঘাড় নেড়ে বলে, নয়ই তো। তাই বলি কুন্তল-দাকে—ঐ সব সাধু মহাপুরুষ নিয়ে আসছেন, ওরা কি করবে শুনি ?

কুন্তল-দা চুপচাপ বসেছিলেন। বললেন, না—সাধুমানুষ থাকবে কেন, কেবল তোমরা থাকলেই হবে! পৃথিবীর মাটি এখনো নরম আছে, আনন্দকে দেখলে সে-কথা মনে পড়ে যায়।

এমন সময় আনন্দ এল সেখানে। নিরুকে দেখে থমকে দাঁড়াল। নিরু বলে, চিনতে পারেন ?

আনন্দ রাগ করে বলে, না—

আমি তো দিব্যি চিনে ফেলেছি।

সে জানি। চিনতেন আগে থেকেই। এঁরা বলে দিয়েছেন। এ একটা ষড়যন্ত্র আমি ধরতে পারিনি।

একটু চুপ করে থেকে আনন্দ আবার বলে, রিভলবারের সামনে দেমাক করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, সে মেয়ে আমাদেরই দলের। বাইরের কারো অত ভরসা হয় না। আমারই বুঝে নেওয়া উচিত ছিল।

আমি বললাম, না আনন্দ, রিভলভারই আদপে নয়। তোমার হাতে যা ছিল, ও জিনিস মুর্গিহাটায় পাওয়া যায়। টাকা আড়াই দাম।

কুন্তল-দা হেসে বললেন, পরীক্ষায় হেরে গেছ আনন্দ-ভাই। আর কোনো দিন কিছু ও সব ছাই-পাঁশ চাইতে পারবে না। ওদের মতো বাজে মানুষ কি তুমি! বুঝে দেখ, একটা মেয়েকেই তো ভয় দেখাতে পারলে না।

হুঁ মেয়ে! ভয়ানক মেয়ে! বলে আনন্দ গুম হয়ে বসে পড়ল।

নিরু আমাকে চুপিচুপি বলে, সাধু মহারাজের মুখখানা দেখ একবার। দুঃখ হয়েছে। হবারই কথা। সত্যিকারের রিভলভার কেন দিলে না শঙ্কর-দা—তাতেও বিপদ ছিল না, হলপ করে বলতে পারি। তোমারই অন্যায়—

আর তোমারও, নিরু। তুমি যদি একটুখানিও ভয় পেতে, এত কষ্ট ওর কখনো হত না।

তখন কুন্তল-দার সঙ্গে কথা হচ্ছে আনন্দর। কুন্তল-দা তাকে প্রায় বুকের মধ্যে এনে স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, তোর খুব মনে লেগেছে—না ?

না। বলে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আনন্দ প্রাণপণে চোখের জল সামলাতে লাগল।

কুন্তল-দা আমার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, তোমাদের সঙ্গে আর মিশবে না আমার এই ভাইটি। দুঃখকষ্টও নিজে বুক পেতে নেয়—কাউকে দুঃখ দিতে পারে না।

আনন্দ ফিসফিস করে কুন্তল-দার কানে কানে বলে, আর আপনিও—

বলিস কি ! নতুন কথা শেখাচ্ছিস যে ! পুলিশের রিপোর্ট দেখে আয় তো—

আনন্দ নিবিড় করে তাঁর হাত দুখানা ধরে। বলে, পুলিস মিথ্যে লিখেছে। আপনার কত মায়া ! আমি জানিনে বুঝি !

কুন্তল-দা হো-হো করে তুমুল হাসি হেসে উঠলেন। বললেন, শুনেছ তোমরা ? আমাকে নতুন সার্টিফিকেট দিচ্ছে—আমার নাকি ভয়ানক মায়া। আমার ঠাকুরমার গল্পটা শোনেনি বোধহয়।

আনন্দ বলে, শুনেছি দাদা। কুঠির বস্তিতে মানুষগুলোকে জানোয়ারের মতো রেখেছিল। আপনার মতো দরদ কার ! তাদের দুঃখে ঠাকুরমাকেও শেষ দেখা দেখতে পারেননি।

জানোয়ারের জন্য মানুষের দুঃখ ? কী যে বলিস—

হয় না ?

কুন্তল-দা নির্মম কণ্ঠে বললেন, না। দরদ বলিস—যা বলিস, যদি কিছু আমার থাকে, সমস্ত আগামী দিনের সোনার মানুষের জন্য। শিরদাঁড়া-ভাঙা ভার-বওয়া গরু-গাধার জন্য আমি এতটুকু ভাবিনে।

উষ্ণ কণ্ঠে আনন্দ বলল, তবে ঠাকুরমার কাছে না গিয়ে বস্তিতে ছুটেছিলেন কেন ?

হাঙ্গামা বেধেছিল, সেটা যাতে মিটে না যায়। আগুন আমি নেবাতে চাইনে।

দেশের বুকে দাবানল জ্বালিয়ে আপনার আনন্দ ?

কুন্তল-দা হা-হা করে হাসতে লাগলেন। বললেন, হাঁ, ভাঙা ডাল ঝড়ে-নড়া গাছ সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যাক। তারপর এই শ্মশান আবার সবুজ হয়ে উঠবে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে আনন্দ দু-হাতে মুখ ঢাকল। সে যে কী রকম অসহায়ের অবস্থা, তোমাদের বোঝাতে পারব না। কুন্তল-দা স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, নিরুপমা ঠিক নাম দিয়েছে, সাধু মহারাজ। তুমি কোনো আশ্রমে চলে যাও আনন্দ। জানাশোনা আছে, আমি বলে দিতে পারি।

কুন্তল-দা ফেরারি হলেন এই সময়টায়। ও রকম অবাক বিস্ময়ে তাকাচ্ছ

কেন তোমরা ? সে ভয়ানক কিছু নয়। নিরুদের দোতলায় দিব্যি পড়ে পড়ে ঘুমুতেন। নিরুর চোখের উপরে—কাজেই বুঝতে পারছ, অসুবিধা কোনো কিছুরই হবার জো ছিল না—মায় গদির বিছানা ও নেটের মশারি পর্যন্ত। কেবল এক একদিন অনেক রাত্রে পালিয়ে বরানগরে চলে আসতেন। আমরা রাগারাগি করতাম, বলতাম, সুখে থাকতে তোমায় ভূতে কিলোয় দাদা। একদিন মরবে—

কুন্তল-দা মুখ শুকনো করে বলতেন, তাই তো—তোমরা ভাবিয়ে তুললে। সর্বনাশ! একদিন নাকি মরব। একেবারে আপ্তবাক্যের মতো শোনাচ্ছে হে—

আনন্দ সেই থেকে বড় একটা আসত না। এলেও কোণের দিকে মুখ নিচু করে চুপচাপ থাকত, কোনো রকম কাজের কথা উঠলেই সরে পড়ত। তারপর একেবারে ডুব দিল।

মাস আষ্টেক দেখি নি তাকে। একদিন খুব ভোরবেলা আমার ঘরে এল প্রেতের মতো একজন। কথা না বললে চিনবার জো নেই—কী বীভৎস চেহারা!

চমকে উঠলাম, আনন্দ—তুমি?

সে হাসতে লাগল।

এ কী হয়েছে রে? কোথায় ছিলে এদ্দিন?

হাসপাতালে ছিলাম শঙ্কর-দা। ভালো থাকলে কি দেখতে পেতেন না? আপনারা আমাকে যতই ঘৃণা করুন, ঠিক আসতাম।

আমি বললাম, ঘৃণা করি না ভাই। কিন্তু সোনার মতো মুখ পুড়ে যে—

হনুমান হয়ে গেছে, না? হাসিমুখে সে বলতে লাগল, আমি বড্ড খুশি হয়েছি। এই মুখের জন্য কত ঠাট্টা করেছেন। বলতেন, মেয়েমানুষ···আরও কত কি! এবার?

কি ব্যাপার বল তো?

বাজি তৈরি করতে গিয়েছিলাম।

কি বাজি, ঠিক করে বল—লুকিও না।

অভিমানের সুরে আনন্দ বলতে লাগল, সে যাই হোক—আপনাদের তা শুনে দরকার কি শঙ্কর দা? আপনারা তো ভরসা করতে পারেন নি! আমি নিজে যদি কিছু করে থাকি। দেখুন—এবার আর মেয়েলি মুখ নেই তো?

আমি বললাম, মনটা তো বদলায় নি। তুমি যাও—লেখাপড়া কর গিয়ে। এ পথ ছেড়ে দাও।

আনন্দ স্তব্ধ হয়ে রইল খানিক। তারপর কাছে এসে হঠাৎ পায়ের ধুলো

নিল। বলে, তাই ঠিক। চললাম শঙ্কর-দা—আর কোনো দিন আপনাদের কাছে আসব না।

আবার ক-দিন ছিলাম না কলকাতায়। এসেই নিরুদের ওখানে গিয়েছি। কুন্তল-দা বললেন, আমি যে মরে গিয়েছি শঙ্কর। আজকের কাগজে দেখিস নি ?

সে কি ?

এই দেখ—

কাগজে কুন্তল সরকারের মৃত্যু-সংবাদ পড়লাম। শ্যামবাজারের এক বাড়িতে পুলিশের সঙ্গে স্বদেশিওয়ালাদের গুলি-ছোঁড়াছুঁড়ি হয়—ফলে কয়েকজন মারা পড়ে, তার মধ্যে কুন্তল সরকারও আছে।

সন্ধ্যাবেলা সমস্ত খবর নিয়ে ফিরলাম। নিরু বলে, আমাদের সেই সাধু মহারাজ, শঙ্কর-দা ?

হাঁ। কোত্থেকে কুন্তল-দার নামে ক'খানা চিঠি যোগাড় করেছিল। তাই পকেটে রেখে দিয়েছে। মুখ পুড়িয়ে আগেই এমন করে রেখেছে যে চেনবার জো নেই—

পাষাণ কুন্তল দা, তবু যেন তাঁর স্বর একটু কাঁপল। কিংবা হয়তো আমারই ভুল—ঐ হিমালয় ঝড়-ঝাপটায় কাঁপবার বস্তু নয়। বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন, মৃদুকণ্ঠে বললেন, বোকা ছেলে। অত সহজে কি কুন্তল সরকারকে ঠেকানো যায় ? মিছেই মারা পড়লি।

নিরু এত জ্বালাত, বিদ্রূপ করত—চোখের জল এখন আর তার বাধা মানছে না। বলল, একটা ফুল আগুনে পুড়ে গেল কুন্তল-দা।

কুন্তল-দা বললেন, নূতন সূর্য উঠবেই। তার আগে আনন্দ গেল, আমিও যাব—এইরকম কত চলে যাবে। কাঁদতে গেলে চলে কি বোন ?

সূর্য আজ উঠেছে। কুন্তল-দা নেই। পনের বছর আগে নিরুপমার বৃত্তান্তটা গোড়া থেকে বলে নিই শোনো। নিরুপমার সঙ্গে নিবিড়তম সম্পর্ক কি না—সে আমার বউ। কিন্তু খবরদার ভাই, মল্লিকার কানে কথাটা না যায়। সে জেলে যায় নি, কিন্তু ঘরে বসে যা সয়েছে তা তোমার আমার চেয়ে কম নয়। কী জানি, মল্লিকা কি মনে করে বসবে—আমার সেই ভয়।

নিরুপমা

তখন শ্যামবাজারের এক গলির মধ্যে ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছি। সেই গলির একটা বিশেষ বাড়ির কাছাকাছি আমাদের দু-একজনের থাকার দরকার। মাপ

করো ভাই, আজকের দিনে এর বেশি কিছু বলতে পারব না। মোটের উপর সকাল-সন্ধ্যা খোঁজাখুঁজির বিরাম ছিল না। কিন্তু গলির লোকগুলো অকস্মাৎ যেন বিষম বড়লোক হয়ে উঠেছে, বাড়ি ভাড়া দেওয়ার গরজ কারও নেই। ঘর পেলাম না, কিন্তু পেয়ে গেলাম নিরুপমাকে।

মেয়েটাকে এক নজর দেখলাম। লম্বা চওড়া গড়ন। তখন সন্ধ্যাবেলা, মই ঘাড়ে করে মিউনিসিপ্যালিটির লোক গ্যাস জ্বেলে জ্বেলে বেড়াচ্ছিল। বটতলায় সিঁদুর মাখা অনেকগুলি পাথর। তারই সামনে তাদের ছোট্ট দোতলা বাড়িটা। বাড়ি ঢুকে কোনো দিকে না চেয়ে সে দরজা বন্ধ করে দিল।

মাথায় এক মতলব এসে গেল। মেয়েটাকে যদি দলে টানতে পারি, ঘর না পেলেও চলবে। পিছু নিলাম। কয়েকটা দিন কেটে গেল। একদিন কলেজ-ফেরতা সে গটগট করে চলেছে, আমি খুব সন্তর্পণে দূরে দূরে যাচ্ছি, গলিতে ঢুকে সে চোখের আড়াল হয়ে গেল। মিনিট খানেক পরে আমি মোড় ফিরে যেই ঢুকেছি—দেখি, একটা বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে চুপ করে নিরুপমা দাঁড়িয়ে আছে আমার অপেক্ষায়। একেবারে রণ-রঙ্গিণী মূর্তি—রক্ষার মধ্যে হাতে কিছু নেই খান দুই-তিন মোটা বই ছাড়া।

পিছু নিয়েছ কেন তুমি?

আমি বললাম, পথ কি কারও একলার?

বল কি জন্যে?

ভদ্রলোককে যে ভাবে অনুরোধ করতে হয় সেইভাবে বলুন, তবে জবাব দেব।

আপনি ভদ্রলোক?

কি রকম ফিটফাট জামা-কাপড় পরে আছি—ভদ্রলোক মনে হয় না? দেখুন না—চেয়ে দেখুন একবার—

নিরুপমা মুখ একেবারে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। ইতিমধ্যে অবশ্য অনেকবারই সে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়েছে—দেখা বললে ঠিক হয় না, দৃষ্টি দিয়ে আগুন বুলিয়ে দিয়েছে। ব্যঙ্গের স্বরে সে বলে, বাংলাদেশ কি না—আপনাদের তাই ভদ্রলোক বলে।

সব দেশেই আমরা ভদ্রলোক। অসহায় মেয়েকে সঙ্গে করে বাড়ি এগিয়ে দিচ্ছি—এ কাজ বীরধর্মের কোঠায় পড়ে, জানেন?

আমি অসহায়?

নিশ্চয়। একলা চলেছেন, বিশেষ তো অস্ত্রসস্ত্র দেখছি নে। ধরুন, যদি কেউ আপনার একখানা হাত চেপে ধরে—

মুখ ফেরাল নিরুপমা। বলে, আমি চেঁচিয়ে উঠব। আমাদের পাড়া—

এতটুকু বয়স থেকে এখানে মানুষ—

তার আগে যদি মুখ বেঁধে ফেলে। হঠাৎ পিছন থেকে এসে আমার গলার এই চাদরটার মতো একটা কিছু দিয়ে মুখ বাঁধা তো শক্ত কিছু নয়।

নিরুপমা দাঁড়িয়ে যায়।

আপনার মতলব কি ?

আমি হেসে বললাম, আর যাই হোক, মুখ বাঁধা কিংবা হাত ধরাধরির জন্য চারটে থেকে দাঁড়িয়ে ছিলাম না।

তাদের বাড়ির সামনে এসে পড়েছি। দরজায় দাঁড়িয়ে সে বলে, আসবেন ?

না।

ভয় করছে ?

আমি বললাম, ভয়ের নমুনা দেখছেন কিছু ? রণে আর প্রেমে ভয় করলে চলে না।

এবার সে উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে উঠল। অসাধারণ মেয়ে—এই প্রথম আলাপে টের পেলাম। বলে, ইস্— সাংঘাতিক তো।

কিন্তু প্রেম নয়।

তবে বুঝি রণ ? কার সঙ্গে—আমারই সঙ্গে নাকি ?

প্রথম আলাপে না-ই শুনলেন সে কথা। কাল বিকেলে আবার আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকব।

পরদিন দেখা হল। তার পরদিনও। মনে রেখো, সেটা পঁচিশ ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা, এখনকার চেয়ে কড়াকড়ি ঢের বেশি ছিল। এক ধরনের কাজ মেয়েদের দিয়ে ভাল হয়, আমাদের মধ্যে দু-চারটি মেয়ের দরকার, পথে ঘাটে তাই ঐ রকম ওত পেতে থাকতে হত। নিরুর বাড়ি সম্বন্ধে যা শুনলাম, সে একেবারে আশাতীত। দুই ভাই আর বোনটি ; আর আছেন বুড়ো মা, তাঁর চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত কিছু নয়। ছোট ভাই নাবালক, আর বড় হলেন—নাম তো আগেই করেছি, সরোজ পাকড়াশি।

আমাদের সরোজ ? কুন্তল-দা বললেন, সরোজের বোন, তাই বল। এমন ইস্পাতের মেয়ে যেখানে-সেখানে পেয়ে যাবে, আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

তোমার সরোজকে আমরা দেখিনি তো।

কুন্তল-দা বললেন, দেখবে কি ? ক টা দিনই বা জেলের বাইরে থাকে !

একটু চুপ করে থেকে বলতে লাগলেন, হতভাগাটা বলে কি জান ? ছ টা মাস থাকতে দিক, তুড়ি মেরে দেশ স্বাধীন করব। তা কর্তারা ছ-টা দিনও

তাকে বাইরে রেখে সোয়াস্তি পান না।···বেশ হয়েছে, মেয়েটা একমনে এবার কাজে লাগুক।

কিন্তু মোটে আমাদের আমলই দেয় না কুন্তল দা—

বস্তুত নিরুপমা জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। বলে, মিথ্যা কথা, আপনারা সব ধাপ্পাবাজ—আমি ও-সব একতিল বিশ্বাস করি নে।

আমি বলি, এমন সব ঘনিষ্ঠ বিশেষণ প্রয়োগ করছ নিরু, এর মধ্যে এতখানি প্রত্যাশা করি নি।

নিরু কালো বড় বড় চোখ দুটো মেলে খানিক চেয়ে থাকে। শেষে বলে, বেশ, নিয়ে আসুন একদিন কুন্তল-দাকে। আমাদের বাড়ি নেমতন্ন রইল। তিনি নিজের মুখে বলবেন—

ঘাড় নেড়ে বলি, এখন তা হতে পারে না।

কেন? কলকাতায় নেই? কোথায় তিনি?

সরোজের বোনকে এটাও বোঝাবার দরকার যে, এ সমস্ত জিজ্ঞাসা করতে নেই?

নিরুর উচ্ছ্বাস থেমে যায়। লজ্জিত হয়ে সে চুপ করে।

আমি বললাম, অত সহজে কুন্তল-দাকে পাওয়া যায় না।

কি করতে হয়?

সাধনা। দেখছ না, সরকার বাহাদুর বছরের পর বছর কি অসামান্য সাধনায় লেগে আছেন!

আমি তো সরকারের কেউ নই।

অতএব একদিন দেখা পাবে। তাঁর কাজে লেগে যাও।

নিরু বলল, অন্তত একছত্র হুকুম চাই তাঁর হাতের।···মানে, তাঁকেই মানি, একমাত্র তাঁকে। আপনাদের কাউকে নয়।

বরানগরে সেই একতলার বাড়িতে তখন একটা তুলোর গুদাম হয়েছে। গুদামের পিছনটায় আধ-অন্ধকারে কুন্তল-দা বইয়ের গাদার মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতেন। যে ধুনারীর গুদাম, সে আমাদেরই একজন। সে ঘরে যে মানুষ থাকে, বাইরে থেকে বোঝবার জো ছিল না। একদিন ক-জনে একসঙ্গে হয়েছিলাম। কুন্তল-দা বললেন, মেয়েটা নেমন্তন্ন করেছে, তা যাই না কেন—একদিন ভালমন্দ খেয়ে আসি।

সবাই প্রবল ভাবে ঘাড় নাড়েঃ না—না—না—

তিনি হেসে বললেন, হিংসুটের দল তোমরা, আমার ভাল কি দেখতে পার?

দাও, তবে একটুকরো কাগজই দাও—

এবং তৎক্ষণাৎ শুরু করলেন, শ্রীচরণাম্বুজেষু—

আমরা হেসে উঠতে কুন্তল-দা কলম তুলে বললেন, কি, হল কি তোমাদের?

ও কি লিখছ? সতের-আঠার বছরের একরত্তি একটা মেয়ে যে নিরুপমা—

চিঠি নিরুপমার কাছে পৌঁছল। তারপর দেমাকে তার মাটিতে পা পড়ে না। বলে, দেখুন শঙ্কর-দা, খাতিরটা দেখুন একবার! আমি হলাম শ্রদ্ধাস্পদা। কুন্তল-দার সার্টিফিকেট—অতএব আপনারাও শ্রদ্ধা করবেন। বুঝলেন তো?

আবার বলে, আপনাদেরও উনি এই রকম লেখেন নাকি?

আমি বললাম, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাই নি, তেমন ভাগ্য হবে কোত্থেকে। বিবেকানন্দর চোখ দিয়ে দেশ দেখছেন ওঁরা—অনাত্মীয় মেয়ের ঐ একটি মাত্র মূর্তি ওঁদের কাছে।

মোটের উপর যা চেয়েছিলাম—হল। নিরুকে পাওয়া গেল।…এখন সে বেঁচে নেই। আহা যদি থাকত! তুমি আমি সকলে আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে চাচ্ছি, এ সমস্ত দেখে কত উৎসাহ হত তার! তার নির্ভীকতা তখনকার দিনে আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

মাস দুই পরে একদিন আমাদের আস্তানায় সে যেন আকাশ ফুঁড়ে উদয় হল। অনেক রাত্রি ছাদের উপর অল্প অল্প জোৎস্না এসে পড়েছে, কথাবার্তা হচ্ছিল, সব বন্ধ হয়ে গেল। কোথা থেকে কি করে জানল, কে-ই বা দুয়োর খুলে দিল। তারপর দেখি, হিরণ পিছনে রয়েছে।

নিরু জুতো খুলতে খুলতে সকলকে এক নজর দেখল। তারপর কুন্তল-দার পায়ে গিয়ে প্রণাম করল। আমার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলে, কেমন শঙ্কর-দা চিনতে পেরেছি কি-না বলুন—

আমি বললাম, আগে দেখেছিলে?

নিরু বলে, কক্ষনো নয়, সূর্যকে কি চিনে রাখতে হয়? হাজার লোকের মধ্যেও ওঁকে বেছে নিতে এক মিনিটও লাগে না।

কুন্তল-দা বললেন, সর্বনাশ, বল কি গো! ভয় ধরিয়ে দিলে।

নিরু বলে, আপনার ভয় আছে নাকি?

আমি বলি, ওঁর নেই—আমাদের আছে।…শুনে রাখলে তো? অতএব ঘর থেকে তোমার বেরুনো চলবে না—এক পা-ও নয়—

কুন্তল-দা বললেন, কেন—বেরুলে হবে কি?

চিনে ফেলবে। ধরে নিয়ে জেলে আটকাবে।

তোমরাই বা কী এমন স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছ! নিরু, জানিস নে বোন—

জীবনে এরা ঘেন্না ধরিয়ে দিল। কোন কাজ করতে দেবে না, কোথাও যেতে দেবে না—এ রকম বেঁচে লাভ কি?

নিরুপমা কুন্তল-দার পায়ের কাছে বসে পড়ল! আমরা এদিকে রাগে জ্বলছি। কুন্তল-দা না থাকলে সেইখানেই হিরণের টুঁটি চেপে ধরতাম। আমরা এত সাবধান করে মরি, আর হতভাগা মেয়েটাকে এনে জোটাল এই জায়গায়।

চোখ-ইশারায় হিরণকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি—দেখি, কুন্তল দাও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, হিরণের দোষ কি?

ও, তুমি বলে দিয়েছিলে?

কুন্তল-দা রাগতভাবে বলে উঠলেন, না বলে উপায় ছিল! যত সব বদরাগী মানুষ নিয়ে দল গড়বে, দোষের বেলা হরিণ আর কুন্তল-দা।

নিরুপমার কানে যেতে সে মাথা নিচু করল। আমরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠি, ইতিমধ্যে এমন কি ঘটে গিয়েছে যার জন্য তাড়াতাড়ি কুন্তল-দা হিরণকে পাঠালেন। রাত্রিবেলা আমরা সবাই তো আসব—পরামর্শের সবুরটুকুও সইল না!

আবার বসে পড়ে তিনি নিরুকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, দুঃখ পাচ্ছ কেন বোন, তোমার দোষ কি, তুমি কেবল থানা অবধি গিয়েছিলে, আমরা হলে মহানন্দটাকে শেষ করে ফেলতাম।

নিরু জিজ্ঞাসা করে, আপনি মানুষ মারতে পারেন কুন্তল-দা?

কুন্তল-দার যেন কানে ঢুকল না, তিনি বলে চলেছেন।

আমি বলি, এসব কথা কেন নিরু? ছিঃ—

নিরু ঘাড় নেড়ে বলে, উনি মোটে পারেনই না, আমি বলে দিচ্ছি। এত যাঁর স্নেহ—

কুন্তল-দা বললেন, তুমি পার?

মানুষ পারি না, জানোয়ার পারি। অন্তত পারা উচিত।

একটু চুপ করে থেকে নিরুপমা বলতে লাগল, একদিন এ দেশে জানোয়ারের বাড়াবাড়ি হয়েছিল। মা-বোনেরা স্নেহ দিয়ে লালন করেছিল তাদের। স্নেহ না দিয়ে মুখে বিষ তুলে দিলে ঠিক হত। হলে আজকের এ-রকম দিন আসত না। সেই রকম জানোয়ার একটা হচ্ছে আপনাদের মহানন্দ—

কুন্তল-দা বললেন, মহানন্দ তো আমাদের নয়—

আমি বললাম, বিশ্বাস করতে চায় না কুন্তল-দা, আমার সঙ্গে সে কী তর্ক!

মহানন্দের সঙ্গে ইস্কুলে কিছুদিন পড়েছিলাম। সেই থেকে আমাদের দু-একজনের সঙ্গে তার অল্পস্বল্প পরিচয়। মহানন্দ তাই নিয়ে গালগল্প করে

বেজাত। নিরুদের সঙ্গে তার দূরসম্পর্কের কি রকম একটু আত্মীয়তা ছিল। সেই দিনই সকালবেলা নিরু আমাকে খুব জেরা করছিল—আপনি যে বলেন, কুন্তল-দা এখানে নেই ?

ছিলেন না। এসেছেন ক-দিন হল।

মিথ্যে কথা। তিনি বরাবর রয়েছেন। মহানন্দ-কাকা বললেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করি, সর্বনাশ—ওর সঙ্গে এ-সব কথা হয় নাকি ? বাজে লোক।

নিরুপমা বলে, বাজে লোক হলে কুন্তল দা নিয়েছেন ?

কুন্তল-দা তাকে চেনেনই না

বলেন কি। কুন্তল দা গয়না চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, সে চিঠি পর্যন্ত রয়েছে—

গায়ে পরবেন বলে ?

নিরু বিরক্ত হয়ে বলে, পরবেন কে বলেছে ? হয়তো কাজে লাগাবেন বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে—

তালুক নিলাম হচ্ছে বুঝি কুন্তল দার—মেয়েমানুষের গয়না বন্ধক দেবেন ?

কিন্তু টাকার কি গরজ নেই ?

আছে। সে সামান্য ব্যাপার। আমরা বন্যাত্রাণ-সমিতি গড়িনি নিরু, যে তোমার কাছে দয়ার দান চাইতে যাব।

নিরু ক্ষণকাল যেন নিস্পন্দ হয়ে থাকে। তারপর বলে, মহানন্দ কাকা বলল, কুন্তল-দার সঙ্গে দেখাশোনা করিয়ে দেবে, তাঁর বাড়ি নিয়ে যাবে—

সাবধান নিরুপমা, কুন্তল-দার বাড়ি বলে তোমাকে থানায় নিয়ে তুলবে। খুব সাবধান।

থানায় মহানন্দ যায়নি, নিরু নিজে গিয়েছিল। বোকা মেয়ে!

সেই যে কবে কুন্তল-দার দু ছত্র লেখা দিয়েছিলাম, তারই সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছে। তারপর গয়না-চুরির জন্য রাগের মাথায় ডায়েরি করে এসেছে মহানন্দের নামে।

নিরু বলে, বেশ করেছি। দেশের কথা বলে আর সেই সঙ্গে অত বড় লোকের নাম জড়িয়ে মানুষ ঠকিয়ে বেড়ায়, ওর শাস্তি হবে না ?

কুন্তল দা বললেন, ওর আগে হত তোমারই। টের পেতে যদি ঠিক সময়ে খবরটা না পেতাম—

নিরু আশ্চর্য হয়ে তাঁর দিকে তাকাল। তিনি বলতে লাগলেন, ডায়েরি করে মনের আনন্দে বাড়ি ফিরলে। এনকোয়ারির সময় মহানন্দ ওদিকে সত্য-মিথ্যা একরাশ বলে মনের ঝাল ঝেড়েছে। ভাগ্যিস খবর এসে গেল, হিরণকে

দিয়ে তাই তোমায় গ্রেপ্তার করে এনেছি। বাড়িতে এতক্ষণ তোলপাড় চলছে।

আজ দিন তিনেক কুন্তল-দা একেবারে চৌকাঠ পার হন নি, অথচ খবর ঠিক ঠিক এসে যাচ্ছে। ইদানিং আর আমরা এত আশ্চর্য হই না। তিনি বলতে লাগলেন, গ্রেপ্তার—বুঝলে তো নিরু? হাতে বেড়ি, পায়ে বেড়ি—তোমার আর কোথাও যাওয়া হবে না।

নিরু মৃদু কণ্ঠে বলে, সবে ভাইয়ের জন্য আমি খাবার করতে বসেছিলাম। আজ ঠাকুর আসে নি কিনা!

ও সব ভেবো না। তোমার ভাইয়ের খাবারের বন্দোবস্ত হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু তোমার কি বন্দোবস্ত করি বল তো? বড্ড ভাবিয়ে তুললে।

নিরু রইল চিলেকোঠায়, আমরা ক'জন দোতলায়।

পরদিন নিরু জিজ্ঞাসা করে, কদ্দিন আটকে রাখবেন কুন্তল-দা?

কুন্তল-দা বললেন, দু-বছর, দশ বছর হয়তো বা চিরকাল—

অধীরকণ্ঠে নিরু বলে, সে আমি পারব না। ভাবছেন কেন, কোন চার্জ তো নেই—আর আমার কাছ থেকে কথা বের করবে, সে মানুষ ভূ-ভারতে জন্মায় নি।

কুন্তল-দা বললেন, তা পারবে না জানি···কিন্তু কোনো দিন যদি শুনি তুমি বিষ খেয়েছ! তোমার মতো মেয়েকে ছেড়ে দিতে পারি নে—কিছুতেই না। তুমি বোঝ না তোমার দাম অনেক।

আরও দিন দশেক কেটেছে। ইতিমধ্যে কিছুকালের মতো ঐ বাড়ির আস্তানা গুটাবার আবশ্যক হয়ে পড়ল। কুন্তল দা বলছিলেন, যত মুশকিল তোমাকে নিয়ে বোন। স্ত্রী হয়ে কারও অন্দর মহলে ঢুকে পড় দিকি। তা হলে নিরাপদ।

নিরু ঘাড় নেড়ে বলে, না।

কেন?

এমন মানুষ কে আছে যাকে স্বামী বলতে শরমে বাধে না।

শোন একবার দাম্ভিক মেয়েটার কথা! আবার কুন্তল দা তার কথাতেই সায় দিয়ে গেলেন, তা সত্যি। কিন্তু সত্যিকার স্ত্রী হতে যাবে কেন? সাজতে হবে, যেমন যাত্রা-থিয়েটারে হয়ে থাকে—

খিলখিল করে হেসে নিরুপমা বলে, তাই বলুন। তা পারব, খুব পারব। বলেন তো শঙ্কর-দারই স্ত্রী হয়ে ঘোমটা দিয়ে বসি।···দাঁড়ান শঙ্কর-দা, শুনুন—কথাটা শুনে যান।

আঃ নিরু! সে সময়টা ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। নিরু হাসতে হাসতে পথ আটকাল, তার পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম।

সমস্ত দিন বড় খাটুনি গেল। সন্ধ্যার পর ফিরেই শুয়ে পড়েছি। নিঃসাড় হয়ে ঘুমোচ্ছি, হঠাৎ মাথা ধরে জোরে জোরে নাড়া দিচ্ছে।

কে?

বউ, আপনার বউ গো—

প্রথমটা বুঝতে পারি নি, ঘোমটা-টানা কি না! কথাও বলছে ফিসফিস করে নববিবাহিতা লজ্জাবতী বউটির মতো। শেষে চিনলাম। ঘুম এমন এঁটে এসেছে যে চোখ মেলতে পারি নে। বিরক্ত হয়ে বললাম, তা এত রাত্রে কেন?··· না নিরু, বড্ড জ্বালাতন কর তুমি। বউ হও, যা হও—কাল দেখা যাবে। এখন যাও বিরক্ত করো না।

কুন্তল-দার হুকুম, এক্ষুনি—

সত্যি?

শুভস্য শীঘ্রম্। নইলে কালই হয়তো শুনবেন দ্বীপান্তরে নিয়ে গেছে। তখন বউ পাবেন কোথায়—বানর খুঁজে বেড়াতে হবে আন্দামানের সাগর বাঁধবার জন্য।

খুঁজতে হবে না, সে তো এই সামনেই। ঘুমন্ত মানুষ বলে করুণা নেই, রাত দুপুরে এসে আঁচড়াতে লেগেছে।

অভিমানের স্বরে নিরু বলে, মুখের উপর এ-রকম বললে দুঃখ হয় না বুঝি! সত্যি কি আমি বানরের মতো দেখতে? বলুন?

দেখে বলতে হলে তো চোখ মেলতে হয়। উপায় কি? তাছাড়া কুন্তল-দার নাম করেছে। চেয়ে দেখি, সে তৈরী। বাইরে অপেক্ষমান কুন্তল-দা। তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিলাম। আকাশে তারা ঝিকমিক করছে। স্তিমিত গ্যাসের আলো। কুন্তল-দা খানিকটা সঙ্গে গিয়ে ফিরে চলে গেলেন। দুজনে নিঃশব্দে চলেছি।

ভাল চাকরি হল আমার! নিরুকে অন্দরবর্তী করে স্বামী-পরিচয়ে আছি, দূর-দূরান্তরে যাবার হুকুম নেই। একদিন কুন্তল-দা এলেন। নাছোড়বান্দা হয়ে ধরলাম, মানুষের জেল হয়—দু-মাস হোক, ছ-মাস হোক তার একটা মেয়াদ থাকে। আমার মুক্তি কবে হবে বলুন।

হল কত দিন?

রাগ করে বলি, দেখ না হিসাব করে। তিন মাস পুরে গেছে। টবের গাছ আগলে থাকা আমার দ্বারা পোষাবে না, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।

আমার ভাব দেখে কুন্তল-দা মৃদু মৃদু হাসেন। বলেন, আচ্ছা—থাক আর ক'টা দিন। দেখি আর কাউকে।

কাউকে পাবে না। আমার মতো গাধা কি দুনিয়ায় আর একটা আছে?

যেখানে থাকতাম, সেটা আধা-শহরগোছের একটা জায়গা। সেদিন সন্ধ্যা থেকে বড় ঝড়বৃষ্টি। অনেক রাত্রে দরজার শিকল ঝনঝনিয়ে উঠল। নিরু ডাকছে। কি ব্যাপার? দরজা খুলে দেখি, তার হাতে হেরিকেনের আলো, কাঁখে ঝুড়ি; আমাদের পেছনের বাগানে বিস্তর আম পড়েছে শঙ্কর-দা। চল কুড়িয়ে আনি।

রাগের সীমা রইল না। বললাম, হ্যাঁ—এই সমস্ত করে বেড়াই। কাল থেকে তুমি কোমর বেঁধে আমের আমসি করতে লেগে যাও। আর বল তো গোয়াল বেঁধে দু-চারটে গোরু পুষবার বন্দোবস্ত করি।

তার হাসিমুখ মুহূর্তে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। হেরিকেনের ক্ষীণ আলোতেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম। পায়ের নখে মেজেয় দাগ দিতে দিতে সে বলে, আমি কি করব বলুন? আমার কি দোষ?

দোষ কারও নয়। চুপ করে শুয়ে থাকগে। কাটা ঘায়ে নুন দিতে এস না, এইটুকু দয়া কর। এ রকম থাকতে তোমার ফুর্তি লাগছে, আমার কান্না পায়।

ঝুড়িটা ধপ করে নামিয়ে রেখে নিরু ফিরে চলল। বলে, আপনি চলে যান, কালই—বুঝলেন?

আমি বললাম, তোমার কথায় এখানে আমি আসি নি নিরু, তোমার কথায় যেতেও পারি নে। যাঁর হুকুমের দরকার তাঁকে জানিয়েছি। ছাড়া পেলে এক মিনিটও দেরি করব না।

তা হলে আমিই যাব কাল। আর একটা দিনও নয়। কুন্তল-দা দাঁড়িয়ে হুকুম দিলেও না।

দরজার সামনে গিয়ে সে এক মুহূর্ত দাঁড়ায়। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলে, ফুর্তির কথা বলছিলেন, খুব ফুর্তি দেখছেন! দেখবার চোখ কি আছে আপনার? আমিই কি এ জীবন চেয়েছিলাম? মনের ভুলে একটুখানি হেসে ফেলেছি, মাপ করবেন।

দড়াম করে সে দরজায় হুড়কো এঁটে দিল।

আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু নিরুর কথাগুলো বার বার মনে আসছে, তার বিষণ্ণ চেহারাটা যেন চোখে দেখছি। গৃহস্থ-ঘরের ভাবপ্রবণ মেয়ে, লেখাপড়া

শিখছিল, তারপর দেশের কাজ করবে বলে সর্বস্ব ছেড়ে চলে এসেছে। এই নির্বান্ধব পুরী তার বুকে পাথর হয়ে চেপে থাকে। সমস্ত দিন আর দশটা বউ-ঝির মতো ঘরের কাজে নানা রকম ফাইফরমাস মুখ বুজে খাটে। নিষুতি রাতে অভিনয়ের খোলসটা একটু খুলতে চেয়েছিল, ছুটোছুটি করে আম কুড়োত, হাসত, আবোল তাবোল বকত খানিকটা···কী এমন অপরাধ যে এত কথা শুনিয়ে দিলাম, বেচারি মুখ চুন করে চলে গেল।

শুয়ে থাকতে পারি নে, নিরুর ঘরের সামনে এসে ডাকাডাকি করলাম। সাড়া নেই। সাড়া পাওয়া যাবে না জানি। ঝুড়ি নিয়ে একলা বেরুলাম। সকালে রাগ পড়ে যাবে, ঝুড়ি-ভরতি আম দেখে খুশি হবে সেই সময়। তখন বাতাস থেমেছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টির ঝাপটা আসছে। আমার এক পিসতুত বোন জয়া-দিদির কথা মনে পড়ছিল। ছেলেবেলায় পাঠশালা পালিয়ে তাঁর সঙ্গে ছুটোছুটি করে আম কুড়োতাম। সে-সব দিন কোথায় চলে গেছে! আজ আমি শঙ্কর রায়, দলের ছেলেমেয়েদের অতি-শ্রদ্ধেয় শঙ্কর-দা গভীর রাত্রে আম কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, এ দৃশ্য কেউ দেখলে কি রকম ব্যাপার হবে আন্দাজ কর তো!

ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল। নিরুর সামনে পড়তে সে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় ছিলেন রাত্রে?

কেন, ঘরে। এই তো উঠে আসছি।

সে হয়তো শেষ রাতে কখন এসে শুয়েছেন। আমি একবার উঠেছিলাম। দেখি, দুয়োর হাঁ হাঁ করছে।

হাঁ, তা বটে। কিন্তু বেশ ছিলাম হে—অত্যন্ত আরামে···মানে স্প্রিঙের খাটে শুয়েছি তো, যেন গলে যায়—

নিরু শান্তভাবে বলে, কোন্ জায়গায়?

চটপট মিথ্যে বানিয়ে বলা অভ্যাস করে আয়ত্ত করেছি, কিন্তু নিরুর সামনে কথা আটকে যায়। বললাম, ছিলাম গলির মোড়ের বাড়িটায়। করব কি··· কাপড় ভিজে গেল, ওদের কাছ থেকে একটা শুকনো কাপড় চেয়ে নিয়ে—

বাড়িটা কার, সেই কথা জিজ্ঞাসা করছি।

রাগ করে বলি, কার বাড়ি—কি বৃত্তান্ত, মুখস্থ করে আসিনি। অত শত বলতে পারব না।

নিরু বলে, আমি পারব। ছিলেন রান্নাঘরে। কাপড়ের ট্রাঙ্ক আমার ঘরে কি-না—তাই উনুনে কাঠ দিয়ে আগুন করেছেন, ভিজে কাপড় বসে বসে গায়ে শুকিয়েছেন। আমাকে ডেকে কাপড় চাইলে কি অপমান হত?

আবার বলে, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া করে রওনা হব। আপনি কি যাবেন কলকাতা অবধি?

আমি বললাম, যাওয়া-যাওয়া করছ, কী এমন বলা হয়েছে শুনি? মন খারাপ হলে মানুষ কত কি বলে! এই নিয়ে কুন্তল-দার কাছে একশ'খানা করে লাগাবে তো?

কিচ্ছু বলব না কুন্তল-দাকে। আপনি না যান, একাই চলে যাব। তিলে তিলে আপনাকে মেরে ফেলতে চাই নে—

আমি বললাম, তা বইকি! স্বাধীন হয়ে গেছ, কুন্তল-দাকে বলবে কেন? ···কিন্তু ঝগড়া পরে কোরো। আমি দাঁড়াতে পারি নে, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। কুইনাইনের বড়ি থাকে তো শিগগির গোটা দুই বের করে দাও, জ্বর আসতে পারে।

কুইনাইনে জ্বর ঠেকাল না। সেই গিয়ে শুয়ে পড়লাম, আর অনেক দিনের খবর জানি নে। অসুখের মধ্যে এমন অসহায় মানুষ! মাসখানেক পরে এক দিন কেউ কোথাও নেই, খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়েছি। লক্ষ্য দেয়াল অবধি—ঐ দেয়ালে যেখানে বালির জমাট উঠে অনেকটা মানুষের মুখাকৃতি হয়েছে, ঐ জায়গা আমি ছোঁব। ঠিক পারব।···পারছি, হাঁ, হাঁটতে তো পারছি! ও-ঘরে পায়ের শব্দ। রুগ্ন কণ্ঠ উল্লাসে জোরালো হয়ে ওঠে, নিরু দেখ নিরুপমা—

নিরু জানলায় মুখ বাড়িয়ে দেখে।

এ কি কাণ্ড আপনার?

হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। নিরু ছুটে এল। আমাদের দলের এক ছোকরা ডাক্তারি পাশ, তাকে এনে রাখা হয়েছিল, সে এল।

একটু পরে স্বাভাবিক হয়ে উঠলাম। নিরু তখনও আছে। বড় কড়া শাসন তার আজকাল। বার বার মিনতি করে বলি, লক্ষ্মী নিরু, খেতে দাও একটা আম। কাঁচা আম কুড়োতে গিয়ে এই দশা। এখন পেকেছে, টুকটুকে আম ঝুড়ি ঝুড়ি ঘরে রয়েছে, মিষ্টি দেখে বেছেগুছে একটা দাও, কিচ্ছু হবে না।

নিরু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তা বই কি! ডাক্তার কি বলেছে জানেন?

কিচ্ছু বলে নি, তোমার বানানো কথা। আমাকে খেতে না দেবার ষড়যন্ত্র।

নিরু তর্ক করে না। বলে, বেশ তাই—

নির্বিকার মুখে সে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝনাৎ করে শিকল পড়ল।

দুয়ারে শিকল দিলে যে?

বাইরে থেকে নিরু বলে, এ-ঘরে এত আম তো চট করে সরানো যাবে না, আপনাকে আটকে রাখাই সোজা।

কে তোমাকে মাতব্বরি করতে বলে? তুমি কে? আমার আপনার কেউ নও—

নিরু জবাব দেয়, আমি আপনার কেউ, তা বলেছি কোন দিন?

তুমি শত্রু, আমাকে মেরে ফেলবার মতলব তোমার।

বেশ, তাই। ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করুন তো—আমি বার্লি চড়িয়ে আসি।

ঝগড়াঝাটির ক্লান্তিতে চোখ বুজে পড়ে আছি। কুন্তল-দার গলা শুনতে পেলাম। তিনি আজ এসেছেন বুঝি, ও ঘরে কথাবার্তা হচ্ছে। কুন্তল-দা বলছেন ঢাকার ব্যাপারে আর দেরি করা চলে না বোন। শঙ্কর কাল অন্নপথ্য করেছে, আর কি! দু'টি ছেলেকে আমি এখানে পাঠিয়ে দেব, তারা দেখাশুনো করবে।

না, না—আর কয়েকটা দিন ছুটি দিন আমাকে···এই দিন দশেক, ভাত খেয়ে কেমন থাকেন, না দেখে যাই কেমন করে?

মুশকিল, এই ক'দিনের জন্য আবার একজনকে পাঠাব?

তাই করুন দাদা। তারপর আমি গিয়ে পড়ব, সমস্ত ভার মাথায় তুলে নেব—

কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি নিরু, সাবধান। তুমি জান না বোন, তোমার কত দাম। তোমায় ছাড়তে পারব না, শঙ্করের খাতিরেও না।

রাগ জল হয়ে গেল। মনে আনন্দের তুফান উঠেছে। সত্যি, অসুখের মধ্যে মন এমন দুর্বল হয়ে যায়। আধঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি যেন অনেক দূরে থেকে মিষ্টি গান ভেসে আসছে। বিশ্বাস কর ভাই, বাড়িয়ে বলছি নে, সেদিন কত কি ভাবতে লাগলাম! যেন পৃথিবী থেকে দুঃখ-দৈন্য চলে গেছে, মানুষ অনন্ত শান্তিতে রয়েছে। সাম্রাজ্য নিয়ে হানাহানি—সে যেন অতীত যুগের বিভীষিকা।

শিকল খুলে কুন্তল-দা দেখতে এলেন। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

দেখুন অত্যাচার! একেবারে কয়েদ করে রেখেছে।

সামান্য দু-এক কথা জিজ্ঞেস করে কুন্তল-দা উঠলেন। বড় ব্যস্ত। দুটো খেয়ে তখনই চলে যাবেন। বার্লির বাটি হাতে নিরুপমা এল। বললাম নিরু, আমরা চেয়েছি পৃথিবীকে ভাল করে ভোগ করব।

নিরু বলে, বেশ তো, তাই করবেন।

কাছে আসতে হাতে ধরে ফেললাম নিরুপমার।

দেখ, নাগা সন্ন্যাসী আমরা নই, নিবৃত্তির সাধনা আমাদের নয়।

আমার চোখে কি ছিল, এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে হাসিমুখে নিরু সায় দেয়ঃ হুঁ হুঁ—

আমাদের দুজনের বিয়ে হোক।

বেশ।

তাহলে কুন্তল-দা যাবার আগে তাঁকে বলো।

আচ্ছা। বলে নিরু চলে গেল। একটু পরেই ফিরল। হাতে আইস-ব্যাগ। কুন্তল-দা আসছেন। ডাক্তারকে খুঁজলাম। তিনি নেই।

ডাক্তার?

নিরু বলে, শুয়ে পড়ুন দিকি। আপনার মাথায় আইস-ব্যাগ বসিয়ে দিই—

কেন?

মাথা ঠাণ্ডা হবে। মাথার ব্যারাম না হলে অমন আবোল-তাবোল কেউ বকে?

কুন্তল-দা আসতে নিরুপমা বলল, এ গাড়িতে যাওয়া হবে কি করে? পরেরটায় যাব। একটু গুছিয়ে নিতে হবে। 'ওঠ' বললে মেয়েমানুষের যাওয়া কি করে চলে?

তুমি যাচ্ছ তা হলে?

হ্যাঁ, কালই ঢাকায় চলে যাই, তারপর আর যেখানে যেতে বলেন।

আমি কাতর কণ্ঠে বললাম, আর ক'টা দিন থেকে যাও নিরু। আমার রোগ এখনও সারেনি।

নিরু বলে, আমি থাকলে বেড়েই চলবে।

দেখ, যদি মরে যাই?

বড্ড দুঃখ হবে। আহা গালি দেবার আর ঝগড়া করবার এমন মানুষটাও চলে গেল।

কাল আমি অন্নপথ্য করব। এই একটা দিনও থাকতে পার না?

না।

যাবার আগে নিরু প্রণাম করতে এল। আমি মুখ ফিরিয়ে রইলাম। সে পায়ের গোড়ায় মাথা রাখল। আমি পা সরিয়ে নিলাম। পায়ের দিকে চেয়ে দেখি জলের দাগ। নিরুপমা কেঁদেছে। ও মেয়েও কাঁদতে জানে তাহলে!

ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেলাম। গাড়ির মধ্যে নিরু আর কুন্তল-দা সামনাসামনি বসে চলেছেন। তেঁতুলগাছের আড়ালে গাড়ি অদৃশ্য হল, আওয়াজ কানে আসে না···

সোমনাথ ও মায়া

জগৎ দত্তের কথা নিয়ে মহাকাব্য লেখা যায়, কিন্তু লিখছে কে? লেখার

যেদিন সময় হবে সেদিন অতীতের সাক্ষী আমরা যে ক'জন আছি আমাদের শক্তি থাকবে কি ? আমরা বেঁচে থাকব তো ? এখনই স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

সেদিন দুপুরে কালী সিংহের মহাভারতখানা নামিয়ে নিয়ে বসেছিলাম। এত পড়াশুনো ছিল বাবার, তার মধ্যেও এই বই তিনি নিয়মিত পড়তেন। বাবা মারা যাবার পর থেকে তাকের উপর তোলা ছিল। পাতা উলটাতে উলটাতে তার মধ্যে পেলাম, পুরনো কয়েক টুকরো খবরের কাগজ—আলপিনে গাঁথা, এখানে সেখানে লাল কালির দাগ দেওয়া। মনে পড়ে গেল, আমিই এই সব টুকরো কেটে রেখে দিয়েছিলাম। কোন্ বিস্মৃত যুগের কথা, সে সব মানুষ নেই, সে পৃথিবী নেই, কাগজ বিশ্রী বিবর্ণ হয়ে গেছে, পড়াই মুশকিল।

জজ এজলাসে আসিয়া বসিলেন। রায় কি দিবেন পূর্বাহ্নেই অনুমান করা গিয়াছিল। কিন্তু আসামী জগৎলাল কাঠগোড়ায় চেয়ারের উপর নিতান্ত নির্লিপ্তের ন্যায় বসিয়া আছে। আলস্যে মাঝে মাঝে তাহার তন্দ্রাবেশ হইতেছে —এইরূপ একটি ভাব।

বহু বাগাড়ম্বরের পর হুকুম জানিতে পারা গেল, ফাঁসি। জগৎ হাসিমুখে জজকে নমস্কার করিল। জজ বলিলেন, আপনি আপিল করিতে পারেন। দরকার নেই—বলিয়া জগৎ প্রবল হাস্য করিতে লাগিল।

মল্লিকা এসেছে, আমার কাঁধের উপর ঝুঁকে সে-ও পড়ছিল। বলে উঠল, ধন্য।

তার মুখের দিকে তাকালাম। এই ধরনের কথা শুনলে সচরাচর আমি হেসে উঠে তাকে অপ্রতিভ করি। কিন্তু আজ পারলাম না। মনে পড়ল, আমি আর কুন্তল-দাও সেদিন আদালতের এক কোণে দাঁড়িয়েছিলাম। জগতের হাসি দেখে সেই পাথরের মানুষটি পর্যন্ত অস্ফুট স্বরে মল্লিকারই মতো ঐরকম একটা কি বলেছিলেন।

মল্লিকা বলে, কুন্তল-দার দলের ছেলে ?

জগতের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চাই। দায়ে পড়ে সংক্ষেপ-করা কাহিনীর মধ্যে না-ই বা তাকে আনলাম! বললাম, এর চেয়েও তার বড় পরিচয় আছে। জগতের বাবা হলেন সোমনাথ দত্ত।

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে মল্লিকা বলে, বল কি ? হাত জোড় করে সে নমস্কার করল।

তুমি তাঁকে দেখেছ নাকি মল্লিকা ?

মল্লিকা বলে, না। কিন্তু ভগবানকেও তো দেখিনি।

ভগবান নিয়ে টানা-হেঁচড়া কেন?···সে আমলে লোকে ওঁদের সম্বন্ধে কি বলাবলি করত, জান?

কি?

ভয়ঙ্কর বাঘের দল। হাসতে হাসতে ঐ রকম যারা প্রাণ নিয়ে খেলা করতে পারে, তারা কক্ষনো মানুষ নয়।

মল্লিকা বলে, হাসতে হাসতে একদিন যারা এত বড় দেশটার সর্বনাশ করেছিল, তারাও মানুষ ছিল না। ভয়ানক পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভয়ঙ্করই হয়ে থাকে।

বারান্দায় গিয়ে বসেছি। উঠোনের উপরে রাস্তা, তার ওদিকে মাঠ··· কাশের সাদা ফুলে ফুলে সমস্ত মাঠ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। খররৌদ্রে হঠাৎ চোখে ধাঁধাঁ লাগে, মনে হয় সামনে দুস্তর বালু-সমুদ্র।

মল্লিকা এসে পাশে আসনের উপর বসল। বলে, সোমনাথকে দেখেছ তুমি?

কত! প্রথম দেখি, জগতের বিয়ের দিন। বৈঠকখানায় ঘুমিয়ে আছি, জগৎ বাসর ঘর থেকে পালিয়ে এল সেখানে—

নাছোড়বান্দা মল্লিকা, তার তাগিদে স্মৃতির সাগর মন্থন করতে হয়। নিজে আর কতটুকুই বা জানি, মায়ার মুখে যেমন শুনেছি সেই রকম বললাম। মায়া আমার মামাতো বোন, খালিশপুর থেকে মাইল তিনেক দূরে ওদের বাড়ি। কলেজে ঢুকে গোড়ায় জগতের সঙ্গে হস্টেলের এক ঘরে পাশাপাশি থাকতাম। কুন্তল-দার হুকুমে রাত দুপুরে হস্টেল পালিয়ে কতবার ভৈরব পাড়ি দিয়েছি! একবার ডিঙি ডুবে গেল, সাঁতরে ওপারে উঠে জগতের প্রতীক্ষায় ভোরবেলা অবধি চাঁদাকাঁটার ঝাড়ের পাশে বসে হি-হি করে কেঁপেছিলাম। জগৎ টানের চোটে দু'বাঁক এগিয়ে গিয়ে উঠেছিল। এর থেকে মোটামুটি বুঝতে পারছ, আমাদের বন্ধুত্বটা ছিল কি রকম। আমাদের সঙ্গে সে মায়াদের বাড়ি অনেকবার গিয়েছে। আর এরই প্রায় বছর দুই আগে থেকে সোমনাথ ফেরারি ছিলেন। কাজেই জগতের অভিভাবক সে নিজেই। জুত হয়ে গেল। আমি যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলাম।

মল্লিকা মুখ ঘুরিয়ে বলে, তুমি উপলক্ষ। যোগাযোগ নিজেরাই করেছিল, ভালবাসার বিয়ে, বুঝতে পারছি।

সে যাই হোক, শুভকর্ম তো নির্বিঘ্নে হল। পাড়াগাঁয়ের বিয়ের ব্যাপারে সাধারণত যত রাত্রি হয়ে থাকে, এখানে হাঙ্গামা চুকেছিল তার অনেক আগে। তার কারণ, মায়ার বাবা কলকাতায় এক জমিদারের বাড়ি চাকরি করতেন,

সেখান থেকেই রসুয়ে-বামুন এবং খাটনির লোকজন নিয়ে এসেছিলেন, গাঁয়ের লোকের উপর নির্ভর করেননি। মাঘ মাসের শেষ, দারুণ শীত পড়েছে, বাড়িসুদ্ধ সবাই লেপের নিচে ঢুকেছে, বিয়ে বাড়ি বলে বুঝবার জো নেই।

মায়ার ঘুম আসছিল না। কেন, যদি জিজ্ঞাসা কর মল্লিকা তা হলে আমাদের বিয়ের দিনটা মনে করে দেখ। দেশসেবক বলে সবাই হৈ-চৈ করে বেদীর উপর বসায়, কিন্তু ভেবে দেখ ঘরোয়া ব্যাপারে সবাই আমরা এক রকম। তুমি উসখুস করছিলে. সেন্ট পড়ে চোখ জ্বালা করছে। আমি তখন—

মল্লিকা আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। বলে, হচ্ছে ভাললোকের কথা। ওর মধ্যে ঐ সব ছাই-ভস্ম আনছ কেন বলো তো···

তারপর একটু ঘুমের আবিল এসেছে মায়ার! কাপড়ে টান পড়ায় সে চমকে উঠল। দেখে, চুপিচুপি গাঁটছড়া খুলে ফেলেছে। দরজা খুলে জগৎ সন্তর্পণে চোরের মতো বেরুল। মায়ার বড় ভয় করে, বাসর ঘর থেকে এ রকম বেরুনো অস্বাভাবিক এবং অত্যন্ত অলক্ষণের কথা। মায়ার চোখ ফেটে জল আসে আর কি! জগৎ গেছে তো গেছে, ফিরবার নামটি নেই। অনেকক্ষণ পরে পায়ের শব্দ পেয়ে মায়া চোখ বুজল, ঠিক যেন বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে।

কুলুঙ্গিতে রেড়ির তেলের দীপ জ্বলছিল। মায়া চোখ মিট-মিট করে দেখে। জগৎ শোয় না, একটু ইতস্তত করে, তারপর মায়ার গা ধরে নাড়া দেয়, শোন··· ওঠ তো একটিবার—

কপট ঘুম ভেঙে মায়া বলে, কি?

কিছু খাবার এনে দিতে পার লক্ষ্মীটি?

বিয়ের রাতে এই তাদের কথা। মায়া বলে, কোথায় পাব? সব রয়েছে ভাঁড়ারে চাবি দেওয়া। আর লোকে দেখলেই বা বলবে কি!

জগতের মুখের দিকে চেয়ে সে ফিক করে হেসে উঠল। বলে, খাবারের চেষ্টায় রান্নাঘরে গিয়েছিলে নাকি? যেমন লাজুক, একবার টের পাও। থালা ভরে এত খাবার দিয়েছিল, কিচ্ছু খাওনি বোধহয়।

জগৎ বলে, ঠাট্টা নয় মায়া, সত্যি বড় দরকার। ভাঁড়ার হোক, যে জায়গা হোক—তুমি না পার, ঘরটা শুধু দেখিয়ে দিয়ে যাও।

তার ভাব দেখে উদ্বিগ্ন মায়া বলে, হয়েছে কি?

বাবা এসেছেন।

কোথায় তিনি?

জগৎ বলে, আশীর্বাদ করবেন বলে এসেছেন। কেউ জানতে না পারে, খবরদার!

মায়া বলে, সে জানি। কিন্তু বাইরে কোথায় তাঁকে রেখে এলে এই শীতের মধ্যে? ওঁর কষ্ট হচ্ছে।

ম্লান হেসে জগৎ বলে, লেপ-কাঁথা শাল-দোশালা নিয়ে পুলিস তো দিনরাতই ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাগাল পাচ্ছে না বলেই এত কষ্ট।

অন্ধকারে আতাতলায় দাঁড়িয়েছিলেন সোমনাথ। নিঃশব্দ রাত্রি, কনকনে বাতাস বইছে, আকাশের তারাগুলোও যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। অযত্নে অত্যাচারে বয়সের চেয়ে অনেক বুড়ো দেখায় সোমনাথকে। খালি গা, সাজ-পোশাকের মধ্যে একটা তুলোর জামা আর সুতি চাদর।

মায়া গড় হয়ে প্রণাম করল। বলে, আসুন বাবা—

সোমনাথ চমকে উঠলেন। এই রকম ভাবে মায়া চলে আসবে, তিনি প্রত্যাশা করেননি। বললেন, অভ্যর্থনা করতে এসেছ···বোকা মেয়ে, আর সবাইকে ডেকে তুলছ নাকি?

কাউকে ডাকিনি বাবা। সে-বুদ্ধি আছে। ঘরের মধ্যে চলে আসুন, কেউ টের পাবে না।

আমায় ঘরে নিলে বিপদ আছে, জান?

মায়া বললে, ফাঁকি দিলে শুনব না। আঁধারে আপনাকে দেখতে পেলাম না, আলোয় নিয়ে দেখব, প্রাণ ভরে পায়ের ধুলো নেব বাবা।

হাত ধরে সে সোমনাথকে ঘরের ভিতরে নিয়ে এল। চুপি-চুপি জগৎকে বলে, সত্যি—খাওয়ানোর কি করা যায় বল তো?

জগৎ বলে, তোমাদের ঘর-বাড়ি, তোমরা যদি না পার···আমি হলাম নতুন মানুষ, তার উপর জামাই—

মায়া বলে, আমিও তো এই দিন চার-পাঁচ কনে হয়েই আছি। কোথায় কি রেখে দিয়েছে, আমার সঙ্গে যুক্তি করে তো করেনি, কোথায় এখন খুঁজে বেড়াই?

একটুখানি ভেবে মায়া বলল, এক কাজ করতে পার? শঙ্কর-দাকে তুলে নিয়ে এস। তিনি সমস্ত জানেন, তিনি উপায় করতে পারবেন।

মল্লিকা বলে, তখনই তোমার ডাক পড়ল?

ডাক কি বলছ। দিব্বি আয়েসের ঘুম ঘুমোচ্ছি, জগৎ এসে পিঠের উপর দমাদম ঘুষি চালাতে লাগল। বলে, ওর হতভাগা, বাবাকে দেখবি তো চলে আয় শিগগির।

মল্লিকা বলে, তারপর?

ভাঁড়ার জগুকাকার হেপাজতে। ভিয়েন-ঘরে চৌকির উপর পড়ে তিনি নাক ডাকাচ্ছিলেন। পৈতেয় বাঁধা চাবির গোছা, সাফাই হাতে সরিয়ে নেওয়া গেল। মিষ্টিমিঠাই প্রায় শেষ, হাঁড়ি তিন-চার মুখে নেকড়া বেঁধে চালির উপর তোলা ফুলশয্যার তত্ত্বের জন্য। তাই থেকে কিছু মায়াকে এনে দিলাম। সযত্নে শ্বশুরের সামনে সে রেকাবি সাজিয়ে দিল।

গল্পে গল্পে জানা গেল, তিনদিন খেজুর-রস আর পুকুরের জল ছাড়া আর কিছু জোটেনি সোমনাথের। কতক্ষণ ধরে কত রকমের কথাবার্তা হল। খালে জোয়ার এল। জেলেদের নৌকা ছাড়বার উদ্যোগ হচ্ছে, তাই সাড়া-শব্দ আসছে। সেই সময় তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

মায়া বলল, উঃ, কী কনকনে বাতাস! যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

সোমনাথ বললেন, ভারি তো! এরচেয়ে কত ঝড়-বাতাস মাথার উপর দিয়ে গেছে, জান?

কিন্তু কেন যায়, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

মৃদু হেসে সোমনাথ বলেন, আমার এমনি সব মায়াবিনী মা-লক্ষ্মীদের গায়ে যাতে ঝাপটাও কোনদিন না লাগে সেইজন্য।

আমার দিকে তাকিয়ে মায়া বলে, বাইরে কি রকম অন্ধকার, দেখছ শঙ্কর-দা?

সোমনাথ বললেন, সেই তো ভাল মা, আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে দিব্যি চলে যাব, কেউ দেখতে পাবে না।

তিনি চলে গেছেন। তারপর কি হল মায়ার, আর শুতে যায় না, জানালার ধারে বসে রইল সেই বিয়ের কনে। আমি আর জগৎ খাটের উপর বসে আছি, আমাদের বলবার মতো কথা জোগাচ্ছে না। খানিকটা পরে বাইরে চলে এলাম।

পরদিন মায়ার মুশকিলটা একবার বুঝে দেখ মল্লিকা। এইসব ব্যাপারে সমস্ত রাত ঘুম হয়নি—তার উপর মশার উৎপাত, মুখখানা রাঙা করে দিয়েছে। বেচারা যেখানে বসে, সেইখানেই চোখ বুজে ঝিমিয়ে পড়ে। মায়ার মা অর্থাৎ আমার মাসীমা পর্যন্ত মুখ টিপে হেসেছিলেন, আমি লক্ষ করেছি। কিন্তু—

মল্লিকা কিন্তু আমার এসব কথা শুনছিল না, সে খবরের কাগজের একটি টুকরো নিয়ে পড়তে শুরু করেছে:

"গতকল্য জগৎলাল দত্তের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, হুকুমের পরও তাহার দেহের ওজন বাড়িতেছিল। ফাঁসির পূর্বরাত্রেও সে নাকি অকাতরে

ঘুমাইয়াছিল। সকালবেলা জেলের কর্মচারী তাহাকে ডাকিতে গিয়া দেখেন সে তখনো নিদ্রাচ্ছন্ন। অনেক ডাকাডাকির পর সে লজ্জিত স্বরে কহিল, সময় হইয়া গিয়াছে বুঝি? আমার একটু গীতা পড়িয়া লইবার ইচ্ছা ছিল, তাহা আর হইল না। আচ্ছা চলুন—

তাড়াতাড়ি সে গেঞ্জি গায়ে দিল। চশমাটি মুছিয়া সে চোখে দিল, তারপর হাসিতে হাসিতে চলিল, যেন নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছে।

অপরাহ্ণে জেলের ফটকে বিপুল জনতা হইল। জগৎলালের দূর সম্পর্কের এক খুড়া কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে মৃতদেহ গ্রহণ করিলেন। শোভাযাত্রা সহকারে উহা শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। চিতাভস্মের জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। ঐ রাত্রে নাকি বহু গৃহে অরন্ধন-ব্রত পালিত হইয়াছিল।

জগৎলালের বৃদ্ধ পিতা ও স্ত্রী এখন কাশীধামে আছেন। কর্তৃপক্ষ সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা কলিকাতায় আসেন নাই।"

মল্লিকা মন্তব্য করে, বাজে কথা। বয়ে গেছে ওদের খবর দিতে।

আমি নিজেও মায়ার নামে তার করেছিলাম মল্লিকা, যদি দেখাটা হয়। সমস্ত চুকে-বুকে গেল, কেউ এল না। তারপর পেলাম মায়ার এক চিঠি, আমাকে বিশেষ করে যেতে লিখেছে। গিয়ে দেখি, আর এক তাজ্জব।

মল্লিকা বলে, কি?

মায়ার সিঁথিতে সিঁদুর, পরনে শাড়ি, হাত ভরা সোনার চুড়ি ঝিকমিক করছে।

বল কি!

সত্যি কথা।

অস্ফুট স্বরে মল্লিকা বলল, বেহায়া—

কে বেহায়া? মায়া?

মল্লিকা রাগতভাবে বলল, অমন স্বামী—শেষ দেখা দেখতে এল না। তার উপর ঐরকম ভাবে অন্তত তোমার সামনে আসতে একটু লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল।

শুধু মল্লিকা নয়, সবাই তোমরা ঐ এক কথাই বলবে। কি বল ভাই? আচ্ছা, শোন শেষ অবধি।

বাঙালীটোলায় মায়াদের বাসা। গলির গলি, তস্য গলি! টাঙাওয়ালারও ঘণ্টা তিনেক লাগল খুঁজে বের করতে। বেলা তখন ন'টা এই রকম হবে। আমায় দেখে সোমনাথ অবাক হয়ে গেলেন। আমিও দেখে চিনতে পারি নে।

লোহার শরীর ছিল, শুকিয়ে কঞ্চির মতো হয়ে গেছেন। তামাক খাচ্ছেন আর থকথক করে কাশছেন।

হবে না? ঐ তো একমাত্র ছেলে!

আমায় যে আসবার জন্য চিঠি দিয়েছে, সে-কথা মায়া সোমনাথকে জানায় নি। বললাম, আপনার নাকি ভয়ানক অসুখ কাকাবাবু?

সোমনাথ বললেন, তাই লিখেছে বুঝি। বুড়ো ছেলের মা কিনা, অল্পেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু তাকে দেখছি নে যে!

সোমনাথ বললেন, সিংহিদের মেয়েকে সেলাই শেখাতে গেছে। এসে তারপর রান্নাবান্না করবে।

গলা নামিয়ে বলতে লাগলেন, ভাল হয়েছে বাবা, এই ফাঁকে ছুটো কথা বলে নিই তোমাকে। আমি বউমাকে কিছু জানতে দিইনি। জানতে পারলে, একেবারে মরে যাবে। সে জানে, জগতের তিন বছরের জেল হয়েছে। তুমি টেলিগ্রাম করেছিলে, আমি তা দিইনি, গাপ করে ফেলেছি।

মল্লিকা সোয়াস্তি পেল। বলে, তাই বল! নইলে জেনে শুনে মেয়েমানুষ ঐ রকম অবস্থায় সেজে-গুজে থাকতে পারে?

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে সোমনাথ বলে উঠলেন। তারপর?···শেষ হয়ে গেছে, সে তো জানি। বল দিকি একটু সেইসব কথা। ভাল করে একটা নিঃশ্বাস ফেলবার সাহস হয় না বাবা, পাছে ধরে ফেলে। যে রকম চালাক মেয়ে বউমা! সিংহিদের মেয়েটার সঙ্গে চলে গেছেন, বল তো এই ফাঁকে।

আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। আমি আর কথা বলতে পারি না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছি। সোমনাথ বলেন, কাঁদছ শঙ্কর? ছিঃ! শোন তবে। আমার বড়দাদার ছুই ছেলে, অমল আর কমল। বেকার অবস্থায় তিন বছর ঘুরে অমলের শেষে যক্ষা হল, নিমতলার ঘাটে এখন শান্তি পেয়েছে! আর কমলও মরেছে; লেখাপড়া শিখেছিল কিন্তু ভাত জোটাতে না পেরে গাঁজা-গুলি খেয়ে বেঁচে আছে কোনখানে। আমার জগৎ তো এদের চেয়ে ভাল গেছে।

পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম, এই নরম মাটির দেশে আপনার জগতের মতো ছেলে জন্মাল কি করে, তাই ভাবি কাকাবাবু!

সোমনাথ এই সময় ইসারা করতে লাগলেন, যেন আনন্দের আতিশয্যেই হো-হো করে হেসে উঠলেন। সোমনাথের সম্বন্ধে অনেক অসম্ভব কাহিনী শুনেছো তোমরা, আমি নিজের চোখে এই একটা দেখলাম। মায়া ফিরে

এসেছে। সোমনাথ বলতে লাগলেন, আমার কী এমন অসুখ বউমা শঙ্করকে এতটা পথ টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এলে। অবিশ্যি, একটা সুবিধা হল, জগতের সব খবর ওর নিজের মুখে শোনা যাবে। সেই সব কথাই ও আরম্ভ করেছিল।

মায়ার মুখ মুহূর্তে সাদা হয়ে গেল। বলে, কি কথা? কথাবার্তা থাকগে এখন!

আমি বললাম, শান্তিতে আছে সে।

সোমনাথ বলে দিলেন, আর তিন বছর জেল হবার সে খবরটা শুনিয়ে দাও।

মুখস্থ কথার মতো বললাম, রায় বেরিয়েছে—তিন বছরের জেল।

আবার সোমনাথ হেসে উঠলেন: বুঝলে বউমা মোটে তিন বছর। ও তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

মায়াও হাসতে লাগল। বলে, তা ঠিক। তিন বছর আর ক'টা দিন? আপনি অমন কত তিন বছর তো আন্দামানে ছিলেন। তা হলে দেখুন বাবা, আমি গোড়া থেকে বলছি মামলা নিয়ে এতো যে হৈ-চৈ হল—

সোমনাথ বললেন, পর্বতের মূষিক-প্রসব। জজ একবর্ণও বিশ্বাস করল না। রায়ে কি বলেছে শঙ্কর? সেই যে তুমি বলতে যাচ্ছিলে? শঙ্কর খাঁটি খবর রাখে, বউমা।

মায়া বলে, তা তো বটেই। এক দলের ওঁরা। তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে কতকটা হুকুমের ভাবে বলে, রায়ের কথা পরে হবে দাদা। এতদূর থেকে এলে, আগে কলতলায় চল, গায়ে যে এক ইঞ্চি ধুলো জড়িয়ে গেছে।

কোথায় ধুলো? এসেছি কি এখন? হাত-পা ধুয়ে এসে বসেছি।

মায়া রাগ করে ওঠে। তুমি বড্ড তর্ক কর শঙ্কর-দা। ধুলো রয়েছে, নয়তো কি মিছে কথা বলছি? মাথার চুল অবধি ধুলোয় রাঙা হয়ে গেছে। এস—

কলতলা সামনে, কিন্তু আমাকে মায়া বারান্দা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যায়। বললাম, তোমার শ্বশুর একেবারে অথর্ব হয়ে গেছেন দেখছি, চলে ফিরে বেড়াতে পারেন না বুঝি?

ভাগ্যিস্!

তার মানে?

এ রকম না হলে বাঁচতে পারতাম না। তারপর মায়া অন্য কথা পাড়ল। বলে, কি রকম করে এলে শঙ্কর-দা? উড়ে এলে নাকি?

দিব্যি টাঙায় চড়ে। সিংহিদের বাড়ি না গেলে জানতে পারতে, এক মাইল দূর থেকেও ঝড়ঝড় আওয়াজ পেতে।

মায়া বলে, তুমি আসছ—তোমার চিঠি পেয়েছি, বয়ে গেছে আমার সিংহিদের

ওখানে যেতে। বাবাকে ঐরকম বুঝিয়েছিলাম। সিংহিদের মেয়েটার সঙ্গে তাদের মোটর নিয়ে ক্যান্টনমেণ্ট স্টেশনে এই এতক্ষণ হা-পিত্যেশ বসে—

আমি যে কাশী স্টেশনে নেমে চলে এসেছি।

শেষকালে আমারও তাই মনে হল। তোমার কিন্তু খুব বুদ্ধি শঙ্কর-দা।

কেন ?

তোমায় সামাল করে দেব বলে ছুটোছুটি করে স্টেশনে গিয়েছিলাম। কী ভয় যে হয়েছিল তোমাদের মুখোমুখি দেখে, তুমি কিন্তু আন্দাজে বুঝে নিয়েছ।

মায়ার গলার স্বর ভারি হয়ে আসে। বলতে লাগল, আমি একটা খবরের কাগজ বাড়িতে আনতে দিই নে শঙ্কর-দা, এই গয়না আর শাড়ির বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি। হু হু করে বুকের মধ্যে, তবু হাসিমুখে মিথ্যে কথা বলে যাই। বাবা চিরটাকাল কত নির্যাতন সয়েছেন জান তো! যে গিয়েছে সে আর ফিরবে না। কিন্তু খবর শুনলে বাবা কাটা-কবুতরের মতো চোখের সামনে ছটফট করে মারা যাবেন।

রান্নাঘরে বসে চা খাচ্ছি, মায়া রুটি সেঁকছে। বলে, খবরদার শঙ্কর-দা, বাবা যেন ঘুণাক্ষরে কিছু না জানতে পারেন।

না, তা পারবেন না।

তুমি বেশি দিন থেকো না শঙ্কর-দা, কখন হয়তো কথায় কথায় বলে ফেলবে। দু-একদিনের মধ্যে চলে যাও—

যাব! কিন্তু চিঠি লিখে আনলেই বা কেন ?

মায়া বলল, সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে চল সারনাথেই যাই। নতুন একটা মন্দির হয়েছে।

আমি বললাম, হাঁ, দেখবার জিনিস বটে! কিন্তু আজকে থাক, আজ বড় ক্লান্ত।

চোখের কোণে দু-ফোঁটা জল জমেছিল, বাঁ-হাতে মুছে ফেলে মায়া বলল, দেখতে নয়, মন্দিরের চাতালটা বড় ঠাণ্ডা। ঐখানে বসে বসে তোমার কাছ থেকে সব শুনব। না কেঁদে কেঁদে আমি যে মরে যাচ্ছি দাদা। তোমায় এইজন্য চিঠি লিখে আনিয়েছি।

বিকেলবেলা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, আমরা রওনা হবার তোড়-জোড় করছি, গোলমাল বাধালেন সোমনাথ। বললেন, ভাল হয়েছে। এ গাড়িতে আমি ঘুরে আসি। মন্দির তো উড়ে পালাচ্ছে না বউমা, আর একদিন যেও।

আপনি বেরুবেন ?

সোমনাথ বললেন, এক বাঙালি প্রফেসার পাঁচটার সময় চায়ে ডেকেছে, আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনবে বলে। অনেকবার এসে ধরাপড়া করে গেছে।

মায়ার দিকে একনজর চেয়ে আমি বললাম, তাহলে এই গাড়িতে আপনি চলে যান। আমরা রাস্তা থেকে আর একটা ডেকে নেব।

সোমনাথ হেসে বললেন, তবেই হয়েছে! যা চোরের উপদ্রব, বাড়ি দেখবে কে? আর তোমাকেও তো চাই শঙ্কর,—বুড়ো হয়েছি, নিজের উপর কি ভরসা আছে।

বোঝ ব্যাপারটা, সোমনাথের মুখে এই কথা! তাই তো কামনা করি, আর বুড়ো হবার আগেই যেন আমরা মরে যাই। মায়া বিশেষ আপত্তি করল না। তাই হোক শঙ্কর-দা। আমি থাকি বাড়িতে—

শহর ছাড়িয়ে ফাঁকায় এসে সোমনাথ আমার হাত ধরে নামালেন। বললেন, এবার বল দিকি আমার খোকার কথা—

মুখ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই।

বললাম, পাঁচটা বাজে যে! প্রফেসার অপেক্ষা করছেন।

ও সব মিথ্যে কথা। খোকার কথা শুনব বলে এসেছি।

বুড়োর বিশীর্ণ গণ্ড বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। স্বদেশি-যুগের সর্বত্যাগী নেতা—তাঁর নাম সকলের মুখে মুখে ফেরে, তিনি করলেন কি—সেই ধুলিমলিন পথের ধারে আমগাছের শিকড়ের উপর বসে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন। আর কেউ দেখে নি, দেখলাম কেবল আমি।

ফিরবার পথে তিনি বারম্বার সাবধান করে দিলেন বড্ড চালাক মেয়ে আমার বৌমা, খবরদার! সে বেটি বুঝতে পারে নি তো কিছু?

ঘাড় নেড়ে জবাব দিই, না।

বাড়ি আসতে মায়া জিজ্ঞেস করে, কি রকম মজলিস হল বাবা?

উৎফুল্ল কণ্ঠে সোমনাথ বললেন, আমি ভেবেছিলাম, এমনি দু-চার জন। মস্ত বড় ব্যাপার—ঘর ভরে গিয়েছিল। তোমার একা একা খুব কষ্ট হয়েছে—না মা?

মায়া হেসে বলে, একা থাকতে আমার বয়ে গেছে। সিংহি-বাড়ির মেয়েরা এসেছিল—খুব তাস আর কড়াই ভাজা চললো। এই একটু আগে তারা চলে গেছে।

বারান্দায় নিয়ে এসে আমায় চুপি-চুপি বলে, অভিনয়ের এই খোলসগুলো ছেড়ে একটুখানি বেঁচেছিলাম দাদা। কিন্তু যে রকম গল্প করা বাতিক তোমার —কিছু বলে ফেলে নি তো?

—জবাব দিই, না কিচ্ছু না।

সে রাত্রেই কাশী ছেড়ে এলাম

কুন্তল-দার মৃত্যু

বরানগরের ছাতটিতে যথারীতি আমরা গিয়ে জুটেছিলাম। আস্তিন গুটিয়ে মাদুরের উপর সশব্দে এক কিল মেরে কুন্তল-দা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিলেন, আর তিন বৎসরে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে।

এক কোণে মা হাসিমুখে চেয়েছিলেন। কুন্তল-দার মা, আমাদের সকলের মা। মায়ের কোলের কাছটিতে সুরমা। হঠাৎ সুরমা সোজা হয়ে বসে এসরাজে ঝনঝন আঙুল চালাতে শুরু করে। কুন্তল-দা তাড়া দিয়ে ওঠেন, থাম—

মা বললেন, তার চেয়ে তোরাই চেঁচামেচি থামা। আমার মায়ের হাতের বাজনা শুনেছিস কোনদিন ?

এটা কি বাজনার সময় ?

মা বললেন, কেন নয় শুনি ?

কুন্তল-দা বলেন, ঘরে আগুন লেগেছে, সব জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে—

সুরমা খিল-খিল করে হেসে উঠল। বলে, ঘরে নয়—গোয়ালে। আওয়াজ আমাদের উপরতলা অবধি গেছে।

হিরণ হাতমুখ নেড়ে আপত্তি জানায়। বলে, গোয়াল মানে ? আমরা তবে কি—শোন কুন্তল, উনি আমাদের গরু বলছেন।

সুরমা বলল, সত্যি সত্যি আমার বুকের মধ্যে কাঁপছিল। না জানি কি ভয়ানক ব্যাপার! একদম ছুটে এসেছি।

অর্থাৎ তুমি একটা ভয়ানক মিথ্যুক। ছুটে এসেছে, এসরাজ হাতে নিয়ে তো?

সুরমা তর্কে হারবার মেয়ে নয়।

এই এসরাজই খাড়া করলে লাঠি হতে পারে।

ব্যঙ্গের সুরে কুন্তল-দা বলেন, তা ঠিক। কিন্তু করবে কে ?

তোমরা ?

রাগে মুখ লাল করে সুরমা বলে, পারি কি-না পরখ করে দেখেছেন।

করছি, কাছে এস।

তারপর বলা নেই কওয়া নেই, একটা আলপনি তুলে নিয়ে কুন্তল-দা তার সুন্দর শুভ্র আঙুলে ফুটিয়ে দিলেন। মা হাঁ-হাঁ করে উঠেলেন, করিস কি, ওরে ডাকাত ছেলে ? দেখ দেখি কাণ্ডটা—

কুন্তল-দা বললেন, সামান্য একটা আলপিন, মা। বোমা নয়, মেসিনগান নয়। ইঃ, রক্ত বেরিয়ে গেল দেখছি!

কোথায় রক্ত? সুরমার বিরক্ত মুখ এতক্ষণে স্বচ্ছ হাসিতে ভরে গেছে। কুন্তল-দার এরকম পাগলামি আমরা আগেও দেখেছি। এমন গম্ভীর মানুষ, কিন্তু মাঝে মাঝে একটি শিশু যেন তাঁর মধ্যে খেলা করে বেড়ায়। সুরমা বলে, রক্ত কোথায় মাগো? রক্ত নয়, মধু।

আচ্ছা, দাও তো মধুর ফোঁটা কপালে পরিয়ে।

মা রাগ করে ওঠেন, বাহাদুরি কত! তিলক পরে সব জয়যাত্রায় বেরুবি নাকি?

সুরমার টিপ্পনীও সঙ্গে সঙ্গে। গোছাখানেক চুল কেটে দিতে হবে না কুন্তল-দা? মহাবীরদের ধনুকের ছিলা হবে?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এ চলবে না কুন্তল-দা। যাই বল, তোমার এ তিলক-টিলক একেবারে সেকেলে।

এতে আমাদের তো কিছু নয় শঙ্কর, এ কেবল ওরই জন্যে। কুন্তল-দার স্বর গম্ভীর হয়ে ওঠে। বলেন ফোঁটা পরে কেউ বাঘ-সিংহ হয় না—সে তোমরা জান, সবাই জানে। কিন্তু যে হাতে ফোঁটা পরিয়ে দেবে সে হাতে এসরাজ ধরতে ওর লজ্জা করবে।

সুরমা জ্বলে উঠল। গান-বাজনা আমোদ-আহ্লাদ কিছু থাকবে না, দেশের মানুষ সন্ন্যাসী হয়ে যাবে, এই আপনাদের সাধনা। দেশটাকে মরুভূমি বানাতে চান?

কুন্তল-দা বলেন, আমরা চাই ঐশ্বর্যবান দেশ। সকলে ভাল খাবে, ভাল পরবে। আর তার জন্য পরকাল অবধি অপেক্ষা করতেও বলি নে, মোটে এই তিনটে বছর। আমরা যা বলি, সেই মতো কাজ কর তো সকলে—

সন্ধ্যার পর সুরমা আবার এসেছে। ঘরে কুন্তল-দা। এসব পরে সুরমার মুখে শুনেছি; তার মুখে শোনা কাহিনী আমি নিজের মতো করে বলে যাচ্ছি। শেষের মাসখানেক ছাড়া মাঝের ব্যাপারে আমার কোন যোগাযোগ নেই।

মেঝের উপর ছড়ানো ছিল কুন্তল-দার কাপড়-জামা টুকিটাকি জিনিস-পত্রের বাণ্ডিল। একটা টিনের বাক্সে তিনি সমস্তগুলো ভরতি করার চেষ্টায় ছিলেন। সুরমার পায়ের শব্দে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, কি?

এসরাজ ফেলে দিয়েছি—

ওঃ! বলে কুন্তল-দা আবার নিজের কাজে লেগে গেলেন।

সুরমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক দেখে। শেষে বলল, সূঁচের ফোকরে হাতী ঢুকবে না, গায়ের জোর যতই থাক। সরুন।

কুন্তল-দা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আবার সাবধান করে দেন, সমস্ত দরকারি; কিছু যেন বাদ পড়ে না—

সমস্ত? এটা? এটাও? স্তূপের ভিতর থেকে বেরুতে লাগল ছেঁড়া গেঞ্জি, মাথা-ভাঙা ফাউন্টেন পেন যায় একটা পাথার বাঁট পর্যন্ত।

এসব এর মধ্যে এল কি করে?

এমনি এসে জোটে। সংসারে সব অকেজো কি বাদ দিয়ে চলে যায়? একটুখানি স্তব্ধ হয়ে সুরমা কুন্তল-দার জবাবের প্রত্যাশা করল। তারপর মুখ তুলে উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে, কিন্তু আপনি পারেন। আপনার পথে আপনার সঙ্গে ছুটতে গিয়ে যারা পেরে উঠল না, ধুলোর মধ্যে তাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলতে আপনার এতটুকুও বাধে না। আপনি তো মানুষ নন।

কুন্তল-দা বলেন, আমি জানোয়ার?

না পাথর—

তারপর সুরমা প্রশ্ন করে, ভোরে, চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

কোথায়?

কুন্তল-দা উত্তর দেন না।

সুরমা অধীরভাবে বলতে লাগল, তার মানে—বলবেন না, আমায় বিশ্বাস করে তা বলতে পারেন না! বেশ! ফিরবেন কতদিনে, সেটা বলতে আপত্তি আছে?

সুরমার উত্তেজনায় কুন্তল-দা মৃদু-মৃদু হাসতে থাকেন। বলেন, আমি তা জানি নাকি?

আপনি কিছু জানেন না! একটা কথা কেবল চূড়ান্ত করে জেনে রেখেছেন, তিন বছরে দেশ স্বাধীন হবে। আপনার হিসাবে ভুল হয় না!

মাইনে দিয়ে কলেজে পড়েছি, ভুল হলেই হল? অকস্মাৎ কুন্তল-দার কণ্ঠ অতি মধুর ও স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। বললেন, কেন আমাদের কথা এত ভাব সুরমা?

ক'টিই বা ছেলে, হয়তো কয়েক হাজার—

সুরমা বলে, কেন ভাবব না? এই তো, এই মাটিরই মানুষ,—অথচ দেশের পরে অত ভালবাসা কোথা থেকে আসে? কোথায় পায় এমন মনের জোর? এদের এক একজন যে এক একটা জাতের নতুন ইতিহাস গড়ে তুলতে পারে! একটু চুপ করে থেকে নিঃশ্বাস ফেলে আবার বলে, অথচ ক'জনই বা এদের জানে।

কুন্তল-দা গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, না-ই বা জানল। কিন্তু এদের অত ভালবাসা আজকে সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। বোন, মনের চেহারা যে দেখা যায় না—তাহলে দেখতে শান্ত সুস্থ লোক একটাও আজ এতবড় দেশের মধ্যে নেই।

কেউ নেই ?

না। নতুন সূর্য উঠেছে, মানুষ চোখ বুজে থাকতে পারে কতক্ষণ ?

দু'জনে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সুরমা সহসা আনত হয়ে কুন্তল-দার পায়ে প্রণাম করতে যায়। কুন্তল-দা সভয়ে পিছিয়ে গেলেন।

এই দেখ মুশকিল। পাথর বলে গালি দিলে, এবার পাথরের দেবতা বানাতে চাও বুঝি! না—না—না—

তারপর কতদিন গেল, কুন্তল-দার পাত্তা নেই। ইতিমধ্যে সুরমা দু-দুটো পাশ করেছে, একটায় স্কলারশিপও পেয়েছে। বাগবাজারের দিকে এখন নতুন বাড়ি হয়েছে, তারা সেখানে থাকে। মায়ের সঙ্গে তাই ইদানীং বড় একটা দেখা হয় না, তিনি সেই বালি-খসা পুরানো বাড়িতেই থাকেন। ছেলে নেই, কিন্তু মুখে সেই রকম হাসিটি আছে। পরের ছেলে আমরা অনেকে গিয়ে মায়ের ভালবাসা ভাগ করে নেই।

এরই মধ্যে একবার সুরমার মাসিমারা বড় মেয়ের বিয়ে দিতে কলকাতায় এলেন। মেসোমশায় সাব-রেজিস্ট্রার, কিছুকাল আগে ঢাকার দিকে গাঁয়ে বদলি হয়েছেন। এদের পাড়াতেই বাসা তাঁদের।

সকালবেলা সুরমা এবং মাসিমার মেজ মেয়ে আভা এক সঙ্গে গল্পগুজব করছে; জুতোর ভয়ানক রকম আওয়াজে মুখে ফিরিয়ে দেখে, এক গোরা সৈন্য ঘরে ঢুকছে। দালানটা আগাগোড়া মার্চ করে এসে সে এক লম্বা মিলিটারি সেলাম দিল।

আভা চেয়ে দেখে খিল-খিল করে হেসে উঠল। বলে, রাঙাদি ভাই, ভয় পেয়েছিস? বাঘ নয়—বাঘের মাসি, মিউ মিউ করে। আমাদের বিনয়-দা!

ছেলেটির কথা ইতিপূর্বেও হয়েছে তাদের মধ্যে। সে হস্টেলে থাকে, এবার এম. এ. দেবে, আভাদের পরিবারের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, আভার মাকে মা বলে ডাকে।

বিনয় অপ্রতিভ হয়ে গেছে। সে ভুল করেছিল; ভেবেছিল, আভা আর তার দিদি হাসি। একটা-কিছু বলে সে পালাবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু আভা ছাড়ে না।

সেলাম দিলে বিনয়-দা, তা সাহেব যে মুখ ফিরিয়ে রইল!

বিনয় বলে, কোথায় সাহেব ?

মোটে দেখতেও পাওনি ?

সুরমার মুখ লাল হল। এই রকম একটা শলাপরামর্শ চলেছে, সে আন্দাজে বুঝতে পেরেছে। সুরমার বাপ ছেলেটিকে বড্ড পছন্দ করেছেন। কিন্তু এখন এই বিনয়ের সামনে আভাটার কিছু করবার জো নেই কি-না, সে তাই খুব মজা পেয়ে গেছে। বলে, দেখ তো চারিদিকে খুঁজে, শাড়িটাড়ি জড়িয়ে সাহেব ছদ্মবেশে আছেন কি-না!

বিনয় বলল, সাহেব-টাহেব মানিনে। আমি কারো গোলাম নই।

আভা বলে, এখন না থাক, বাঙালির ছেলে যখন,—হতে তো হবেই। খামোখা মনিব চটিয়ে রেখো না। আর সে তুমি নিজেই বেশ জান। নইলে সেলামের রিহার্সাল দিয়ে রেখেছ কার জন্যে শুনি ?

বিনয় চটে যায়। বলে, কাচ আর হীরের তফাত বুঝতে বুদ্ধি লাগে বুঝলে ? ওকে সাহেব-সেলাম বলে না—আমাদের রেজিমেণ্টে সবচেয়ে নমস্য কেউ এলে—

হাসির চোটে আভা কথা শেষ করতে দিল না। বলে, ঠিক, ঠিক—এ রকম নমস্য আর কে তোমার আছে ? কিন্তু এই যাত্রা-দলের পোষাকটা খুলে ফেলে এবার ভদ্রলোক হয়ে এস দিকি!

বিনয় বলে, য়ুনিভার্সিটি ট্রেনিং-কোরের পোশাক—যাত্রার পোশাক বললে প্যাঁচে পড়বে, জেল হয়ে যেতে পারে। ভোরবেলা ময়দানে যেতে হয়েছিল; এই ফিরছি, রীতিমত প্যারেড হল—

আভা বলে, বাঁশের বন্দুক নিয়ে ?

বিনয় রাগ করে বেরিয়ে গেল।

আভার হাসি আরও উচ্ছ্বসিত হয়। বলে, কেমন মানুষ বল রাঙা-দি ? একটুতে রেগে যায়—রাগাতে মজা খুব। কিন্তু বুদ্ধি আছে—

এরই পাশাপাশি আজ কুন্তল-দাকে মনে পড়ে। কত ধৈর্য, কত সাহস—কিন্তু রাগাতে একটা মিনিটও লাগে না, তখন মনে হয় একেবারে ছেলেমানুষটি। হেমন্তের এই স্নিগ্ধ সকালবেলায় হয়তো কোন দূর-দুর্গম গ্রামপ্রান্তে—কোন্ জেলায় জঙ্গলে পাহাড়ের ধারে এখন তাঁরা কি ভাবছেন ? কবে উঠবে আকাশে তাঁদের অনেক প্রতীক্ষার নতুন সূর্য, ঘরের ছেলে সব আবার ঘরে আসবেন।

আভারা রইল প্রায় মাস তিনেক। যাবার ক'দিন আগে থেকে সে সুরমাকে বড় ধরে বসল, চল্ না ভাই—রাঙাদি, দিনকতক থেকে আসবি। বড়-দিদি বরের সঙ্গে ছুটল, কার সঙ্গে যে ঝগড়া করব!

আবার তাদের সেই জায়গাটারও অতি চমকপ্রদ বর্ণনা দিতে শুরু করল।

ব্রহ্মপুত্র থেকে বেরিয়েছে প্রকাণ্ড এক খাল। তারই কিনারে ওদের বাসা। জোয়ারের সময় জানালার নিচে জল ছল-ছল করে। ছাত থেকে দেখা যায়, অনেক দূর কালো মেঘনা—নৌকা দেখা যায় না, যেন সারবন্দি হাজার হাজার পাল মেঘনার উপর দিয়ে বুক ফুলিয়ে চলেছে।

এমনি আরও কত কি। সুরমা চঞ্চল হয়ে ওঠে, কিন্তু বাবার মত পাওয়া যায় না। মা-হারা মেয়েকে তিনি কাছছাড়া হতে দেন না।

কিন্তু বছর দেড়েক পরে সেই বাবাই সদয় হয়ে উঠলেন। বললেন, চল—হরিলাল বার বার লিখছেন যখন, ঘুরেই আসা যাক একবার। আর ঐ রকম খোলা-হাওয়ায় আমার শরীরের উপকার হবে।

সুরমা বলে, শরীরের ভাবনায় তো তোমার ঘুম নেই, বাবা। আসল কথাটা কি ? আপদ-বিদায়ের আবার নতুন ষড়যন্ত্র হচ্ছে বুঝি ?

বাবা বললেন, তা-ই যদি হয় সে-ও তো শরীরের জন্য। বয়স কম হল না, যদি হঠাৎ আজকে চোখ বুজি—

বুঝেছি। আমি তোমার ভার-বোঝা, কাঁধ থেকে না নামিয়ে শান্তি নেই। যেখানে হোক—

বাবা রীতিমত চটে ওঠেন, যেখানে হোক মানে ? বিনয় কি যে-সে ছেলে ? হাজারে অমন একটা মেলে না। হরিলাল লিখেছেন, তার বাপ-মাও ওখানে। যোগাযোগটা দেখ একবার।

তারপর পাশে বসিয়ে ছোট খুকুটির মতো সুরমার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। বললেন, বুঝে দেখ মা, আমার মনেও তো সাধ-বাসনা আছে। তোর মা চলে গেলেন···বাড়ি সেই থেকে অন্ধকার। চুনের কলি ফেরাইনি, দরকারের বেশি একটা আলো জ্বালাইনি কোনদিন।

সুরমার বড় ব্যথার জায়গাটিতে আঘাত পড়ল। বাপের খুশিমুখ দেখার জন্য সে পারে না, এমন কাজ নেই।

ঢাকা থেকে মোটরলঞ্চে ওরা গিয়ে পৌঁছল। প্রকাণ্ড এক বট-গাছের নিচে ঘাট। লঞ্চের আওয়াজ পেয়ে সবাই ছুটেছে, আভাও এসেছে—সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সুরমা কাছে গিয়ে তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরল। বাসা ঠিক খালের উপর না হলেও কাছাকাছি বটে। এদিকে সেদিকে সেকালের ভাঙাচোরা অট্টালিকা—পাতলা ইটের টুকরো স্তূপাকার হয়ে আছে।

আভার কানে কানে সুরমা বলে, তোদের সোনাগাঁয়ে সোনা নেই, কেবল ঢিল-পাটকেল।

আভা বলে, সোনা কি রাস্তায় ফেলে রাখবার জিনিস ?

অনেক দূরে সাদা রঙের একতলা খানকয়েক বাড়ি, সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, সোনা, ঐখানে মজুত আছে রাঙা-দি—

ঐটে বাসা ওদের ?

ওটা হল থানা, পিছনে কোয়ার্টার। সোনা পুলিশের হেফাজতে আছে—নিশ্চিন্তে থাকবে ভাই।

তোর বিনয়-দা পুলিশ হয়েছেন?—সুরমা একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

আভা বলে, নতুন বলেই গাঁয়ে আসতে হয়েছে। বাবা বলেছিলেন ওঁর যা বিদ্যেবুদ্ধি—একটু পাকা হলে সদরের মাথা হয়ে উঠবেন, ভাবনার কিছু থাকবে না।

ম্লান হেসে সুরমা বলে, যা বলেছিস আভা! দেশের এ কি হয়েছে আজকাল, ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাবনা আর কিছুতেই ঘোচে না। ছেলে নিয়ে বাপের দুশ্চিন্তা ···স্ত্রী নিয়ে স্বামীর দুশ্চিন্তা—কে কখন কি করে বসে। তবে হাঁ পুলিশ হলে নিশ্চিন্ত! সেগুনকাঠে ঘুন ধরার জো নেই।

বিকালে এরা খালের ধারে বেড়াত। বেড়াবার মতোই জায়গা। পাকা রাস্তা খালের ধারে ধারে চলে গিয়েছে সেই মেঘনা অবধি। বর্ষার খরস্রোত সুতীব্র ব্রহ্মপুত্রের দিকে একখানা নদী চলেছে—কিনারের শরবন থর-থর করে কাঁপে। ওপারে দিগন্ত-বিসারী ধান আর পাটক্ষেত! যতদূর নজর চলে—সতেজ সবুজ শ্রী।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে তারা অনেকটা দূর গিয়ে পড়েছে। সন্ধ্যা হয়-হয়। ভয়ের অবশ্য কারণ নেই, সঙ্গে রামচরণ আছে—পুরানো চাকর, গায়ে বল-শক্তিও খুব। একটা বাঁক ঘুরতেই দেখে, তেঁতুলতলার জঙ্গলের ধারে বিনয় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে—

আভা আশ্চর্য হয়ে বলে, এখানে ?

কপালে হাত দিয়ে বিনয় বলে, অদৃষ্ট! কি করব বল—খোঁজে খোঁজে আসতে হয়।

সুরমা বলে, কিন্তু মন বলে যে বস্তুটা আছে বিনয়বাবু, তাকে তেড়ে ধরতে গেলে বিগড়ে পালায়।

বিনয় জিভ কাটল। সর্বনাশ! আপনার পিছু নিয়েছি, তাই ভাবছেন তাহলে এটির কি দরকার ছিল, বলুন তো ?

কাপড়ের নিচে কোমরে রিভলবার বাঁধা ছিল, সন্তর্পণে খুলে দেখাল। তারপর দুঃখিত স্বরে বলতে লাগল, পুলিশে কাজ নিয়েছি—তাই বোধহয় এবার

এসে অবধি মন ভারি করে আছেন। পুলিশ না হয়ে পাটের মহাজন হলে খুব খুশি হতেন। তবুও আমরা দোষীর সাজা দিই, তাদের মতো নিরীহ নির্দোষ চাষীদের রক্ত শুষে মারি নে—

সুরমা হেসে বলে, না—পাটের মহাজনের উপরও আমার অচলা ভক্তি নেই। কিন্তু এখানে কাউকে তাড়া করে ফিরছেন?

একটু ইতস্তত করে বিনয় বলে, এক-আধটি নয়, আস্ত-একটা দল। আর তারা চোর ছ্যাচোড়ও নয়—

স্বদেশি ডাকাত?

বিনয় বলে, ডাকাতির কোন খবর পাওয়া যায় নি, মিথ্যে বদনাম দেব কেন। তবে স্বদেশি বটে—জলন্ত আগুন।

আগ্রহের স্বরে সুরমা জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা ধরা পড়লে তাদের কি ফাঁসি হবে?

বিনয় বলে, আপনি কি ভাবেন বলুন তো? ফাঁসি, কি অত সোজা? কোন চার্জ নেই তাদের বিরুদ্ধে।

তবে?

ঐ যে বললাম, ওরা আগুন। কখন খাণ্ডব-দাহন হয়, উপরওয়ালার হুকুমে তাই চোখে-চোখে রাখবার নিয়ম।

এরই দিন পাঁচ-সাত পরে একেবারে এক অসম্ভব কাণ্ড! বিনয়ের মা ভাবী পুত্রবধূকে ভাল করে দেখবেন বুঝি, আভা আর সুরমাকে বাসায় নিমন্ত্রণ করেছেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে খানিকটা রাত হল। এরা সব ফিরে আসছে। আঁধারের মধ্যে কে একজন জিজ্ঞাসা করল, থানাটা কোন দিকে?

রামচরণ সকলের আগে। নিরুৎসুক কণ্ঠে সে জবাব দিল, ডান হাতি চলে যাও বাপু।

আকাশ-ভরা মেঘ, গাঢ় আঁধার। লোকটা হঠাৎ কাশতে শুরু করল। সে কি কাশি, যেন হাপরের আওয়াজ হচ্ছে, পাঁজরার হাড়গুলো এইবার বাঁধন খুলে ছড়িয়ে পড়বে। সুরমার হাতে টর্চ, এক একবার টিপে পথ দেখে নিচ্ছিল— আলো সে লোকটার মুখের উপর ফেলল। এক মুহূর্ত, তারপর আর একবার। বিদ্যুতাহতের মতো সে থমকে দাঁড়াল। আবার আলো ফেলল সেদিকে—

আভা বলে, দাঁড়ালি কেন রাঙা-দি?

লোকটির দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সুরমা ডাকল, আমাদের সঙ্গে আসুন, আমরা পৌঁছে দেব—

উৎকট কাশির ফাঁকে কোন রকমে লোকটা বলে, আপনারা তো বাঁয়ে ফিরছেন—

দরকার হলে ডাইনেও যাওয়া যাবে। কিন্তু এই ঘুরঘুট্টি আঁধারে আপনি সমস্ত রাত ডাইনে ছুটোছুটি করলেও থানায় পৌঁছিবেন মনে করেন?

সুরমার ব্যগ্রতায় অবাক হয়ে আভা এসে তার হাত ধরল। সুরমা ফিসফিস করে বলে, কুন্তল-দা—

তাদের মধ্যে অনেক গল্প হয়েছে কুন্তল-দার সম্বন্ধে। কুন্তল-দার সঙ্গে চেনা পরিচয় আছে—সমবয়সীর মধ্যে এ একটা কত বড় গর্ব! আভা পিছনে তাকাল। অতি মন্থর পায়ে ছায়ামূর্তিটি আসছে। হঠাৎ কুন্তল-দা বলে ওঠেন, যাচ্ছি বটে, আমার কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে।

সুরমা বলে. থানায় পোলাও কালিয়া সাজিয়ে নিয়ে আছে বুঝি?

কুন্তল-দা জবাব দেন, তা বলে নিতান্ত তাচ্ছিল্য করবে না, তা-ও জেনে রাখবেন।

বাড়ি এসে দেখে সবাই নিঃসাড়ে ঘুমাচ্ছে। এই রাতে পথের আপদ জুটিয়ে আনায় রামচরণ খুব বিরক্ত হয়েছে। তিক্ত কণ্ঠে বলল যাও ঠাকরুনরা, ঘরে গিয়ে দুয়োর দাওগে। পাটসাহেবকে থানায় তুলে দিয়ে আসি।

আভা বলে, না— বৈঠকখানার পাশের ঘরটা খুলে দে। আর পা ধোবার জল নিয়ে আয়।

কুন্তল-দা সুরমাকে চেনেন নি। অন্ধকার রাত্রিবেলা, অনেকদিন দেখা নেই। তাছাড়া, ও-মানুষটার কাছে তুমি আমি সকলে একেবারে স্রোতের মতো, যতক্ষণ সামনে আছি দেখছেন. আড়াল হলে আর কেউ নই।

আশ্চর্য হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, কার বাড়ি এটা? আপনাদের মতলব কি, এখানে আপনি আটকে রাখতে চান নাকি?

সুরমা বলে, রাত্রিটা তো বটে! খিদে পেয়েছে, তা কিছু খেয়ে জিরোতে জিরোতেই তো সকাল হবে। অত ভয় কিসের? কি এমন সোনা-রূপো গায়ে পরে আছেন—

আভার কানে কানে বলে, গায়ে নয়—মনের মধ্যে ওঁর কত সোনা—সোনার পাহাড় রে আভা! পথের ধুলোয় সত্যি সত্যি এখানে সোনা কুড়িয়ে পেলাম।

দু বোন ছুটোছুটি করে খাবারের যোগাড়ে গেল। কি আর থাকবে এমন সময়—খই আর একটুখানি দুধ। কাঁধের উপর একখানা কোঁচান ধুতি এবং দু-হাতে দুটো বাটি নিয়ে আভা বলে, রাঙা-দি, তুই ভাই জলের গেলাস নিয়ে আয়। দেরি করিস নে—

সুরমার তবু একটু দেরী হল। চোখ-মুখ মুছে শান্ত হয়ে সে ঘরে ঢুকল।

বলে, খাওয়া হল, এবার শুয়ে পড়ুন—বিছানা হয়ে গেছে। তারপর তাঁর বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বলল, আমায় কি একেবারে চিনতে পারলেন না, কুন্তল-দা ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটুখানি চেয়ে কুন্তল-দার মুখে হাসি ফুটল। সুরমা বলতে লাগল, ঐ গোঁফ-দাড়ি আর উস্কো-খুস্কো পাগলের মত চেহারা, আমি তবু এক নজরে চিনে নিয়েছি।

কুন্তল-দা বললেন, গলা শুনে আমারও চেনা-চেনা লাগছিল হে। তখন তোমার চোখে আলো, আমার চোখে অন্ধকার। তাছাড়া এই রকম জায়গায় এই অবস্থায়···কথাটা বোঝ একবার—চলে এসেছি, সে-ও তো কম দিন হল না।

কতদিন ? বলুন তো হিসেব করে। এত দুঃখের মধ্যেও সুরমার কণ্ঠে কৌতুকের রেশ বেজে ওঠে। বলে, আপনার তিন বছরের আর কত বাকী কুন্তল-দা ?

কুন্তল-দা খাড়া হয়ে বসলেন, বিশীর্ণ মুখের উপরে কোটরাগত চক্ষু দুটি জ্বলজ্বল করে ওঠে। বলেন, তিন না হয় তিরিশ হবে ! তাতে কি আসে যায়। আমি মিথ্যা কথা বলছি মনে কর ? ঘর-বাড়ি আপন জন ছেড়ে মিথ্যার পিছনে পথে পথে ঘুরছি, আমি বোকা ?

সুরমা তাঁর পাশে গিয়ে পিঠের নিচে বালিশ গুঁজে দিল। কপালে মাথায় অতি ধীরে ধীরে সে হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, ঘাট মানছি দাদা, আপনার বুদ্ধির জোড়া নেই। এবার লক্ষ্মী হয়ে শুয়ে পড়ুন দিকি।

আভা বলে, কিন্তু আপনি তো ইচ্ছে করে জেলে যাচ্ছেন। স্বাধীনতার চেষ্টায় ইস্তফা তাহলে ?

আমি যাচ্ছি, সবাই যাবে না। জেলে কটা লোক ধরে ? জেলের পাঁচিলে কি মত আটকায়—কোন দেশে কেউ পেরেছে ?

আভা তর্ক করে, সত্যি সত্যি যদি এত ভরসা, তবে আপনিই বা যেতে চান কেন শুনি ?

ইচ্ছে করে বুঝি ! কুন্তল-দার কণ্ঠে অভিমানের সুর ধ্বনিত হল। বললেন, এতদিনে এত কষ্টের পর একটু বিশ্রাম নিতে যাচ্ছি, অমনি তোমরা নানা কথা বলবে। দেখ তো, এ শরীরে কি কাজ করা যায় ?

রাগ করে গায়ের শতছিন্ন জামাটি খুলে ফেললেন। শীর্ণ দেহ বললে কিছুই বলা হয় না, বীভৎস চেহারা। করুণাকে ছাপিয়ে ঘৃণাই যেন মনের মধ্যে মাথা তুলতে চায়। কুন্তল-দা বলেন, দেখ তো চেয়ে, টর্চ আছে—ফেলে দেখ। আমি কি ফাঁকি দিয়ে সরে পড়ছি ?

আভা তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিল। বলে, দাদা আপনি আমায়

চেনেন না। কিন্তু আমি জানি, ফাঁকি আপনি দিতে পারেন না, আপনার মধ্যে একতিল ফাঁকি নেই। আপনি কত বড়—

এ কথায় কুন্তল-দার রাগ থাকে না, হেসে ফেলে বললেন, তা বুঝেছি। এর মধ্যে ও-সমস্ত হয়ে গেছে? সুরমাকে দেখিয়ে বলেন, ওর একটা কথাও বিশ্বাস করো না ভাই, আমার বড্ড বদনাম রটায়, আমাদের কথা রাতদিন ভাবে।

সুরমা বলে, আপনারা যে ভোলবার নন, ভুলি কেমন করে? না ভেবে উপায় কি বলুন? আপনার হয়তো মনে নেই দাদা, আপনি বলেছিলেন, এখানে এই মাটির ধুলোয় ছোট-বড় সকলের মধ্যে সুখের বন্যা আসবে, কারও আর দুঃখ থাকবে না। ঘরের ছেলে সব আবার ঘরে আসবে। আমি যে প্রতিটি কথা বিশ্বাস করে দিন গুনছি।

আবেগে তার কণ্ঠ বুজে আসে। কুন্তল-দা স্তব্ধ নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থাকেন। তারপর গভীর কণ্ঠে বলেন, সেদিন আসবেই বোন, তার কোন ভুল নেই। একটু হয়তো দেরী হয়ে গেল। আমি দেখব না—কিন্তু তোমরা দেখবে। এই কথাটা নিশ্চিন্ত জেনে রেখো তোমার এই দাদারাই দেশের মধ্যে শেষ দুখীর দল।

রবিবার। সকালবেলা—খুব সকালে সুরমার বাপ আর মেসো বেড়াতে বেরিয়েছেন। ছুটির দিনে একটু বিশেষ খাওয়া-দাওয়া হয়, কর্তা নিজে কেনাকাটা করেন, জেলেপাড়া ঘুরে সওদা করে বাড়ি ফিরতে দুপুর হয়ে যাবে।

দুই বোন ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে দেখে, কুন্তল-দা হাত পা ধুয়ে বারান্দায় এসে বসেছেন। বললেন, খানিকটা চুন আনতে পার ভাই, গা গতর আর আস্ত নেই, খুঁচে খেয়েছে।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সুরমা প্রশ্ন করল, কে?

আমারই প্রজাবর্গ, যাদের অধিকারে ভাগ বসিয়েছিলাম। এই আমরা যেমন খোঁচাখুঁচি করি সরকার বাহাদুরকে, এই রকম আর কি! বলে তিনি হো হো করে করে হেসে উঠলেন। বলতে লাগলেন, ঐসব পাটের ক্ষেত দেখতে পাচ্ছ ওরই মধ্যে আমার রাজাসন পড়েছিল—একেবারে মেঘনা অবধি একেশ্বর রাজ্য। দিনে বিশ পঁচিশটা জোঁক ছাড়াতে হত, এছাড়া আর কোন অসুবিধা ছিল না। তোফা ছিলাম, কিন্তু অদৃষ্ট দেখ—আকাশের দেবতা বাদী হয়ে কিছুতেই টি কতে দিল না।

কুন্তল-দার ভঙ্গি দেখে এরাও হেসে ফেলে। সেই পাটের ক্ষেতের গল্প শুরু হল। দুটি বিমুগ্ধ শ্রোতার সামনে কতকাল পরে তিনি প্রাণ খুলে গল্প করছেন,

এ যেন আয়ুর প্রান্তে-এসে-পড়া অবসাদগ্রস্ত রোগশীর্ণ আমাদের কুন্তল-দা নন, আর কেউ—

খালের ওপারে এই পাটক্ষেতে যতদূর তাকাও, ক্ষেতের পর ক্ষেত চলেছে। সতেজ পাটচারা, জায়গায় জায়গায় একটা কেন দুটো আড়াইটে মানুষকেও ছাড়িয়ে যায়। তারই মধ্যে যেখানে খুশি ঢুকে পড়, খানিকটা পাট ভেঙে শুয়ে বসে দিবি৷ সারাটা দিন কাটিয়ে দাও। তারপর রাত হলে চুপি চুপি বেরিয়ে পড় —খালে জল রয়েছে, স্বচ্ছন্দে স্নান করতে পার। তালতলায় এ সময়টা দু-একটা পাকা তাল পাওয়া যায়, কপালে থাকলে গ্রামের মধ্যে কারও হেঁসেলে উৎকৃষ্টতর জিনিসও কিছু মিলতে পারে! এর উপর কুন্তলদার আবার বাবুয়ানা আছে, রাতে রাতে নারকেল পাতা কুড়িয়ে দিবি৷ এক গদি তৈরী করে ফেলেছেন। ছিল তো চমৎকার, কিন্তু শেষাশেষি বর্ষা বড্ড চেপে পড়ল, নারকেল পাতা পচে ডাঁটাগুলি কেবল রইল, ক্ষেতের উপর একহাত জল! জ্বর মাস ছয়েক ধরেই চলছিল। শেষে মোটে ছাড়ে না, কাশতে গেলে দলা-দলা রক্ত বেরোয়। এইসব নানা ঝঞ্ঝাটে পড়ে তবেই তিনি থানায় চেপে পড়বার ফিকির বের করেছেন।

কথার মাঝখানে সগর্বে কুন্তল-দা জিজ্ঞাসা করলেন, আনারস খেয়ে থাক তোমরা? বুকে থাবা মেরে বলেন, আমি—আমি খাই—

আভা বলে, এটা তো আনারসের সময় নয়। কলকাতায় মেলে তা, বলে এখানে কি—

হ্যাঁ এখানেও। বদরগঞ্জের হাট তো শনিবারে—গেল শনির আগের শনিতে আনারস খেয়েছি। একটা নয়, একজোড়া—এখনও ঢেকুর উঠছে।

সুরমা বলে, আনারসের লোভে হাটে ঢুকে পড়েছিলেন নাকি?

না হে, লোকে এসে ভেট দিয়ে গেল। কিন্তু হাটে ঢোকাই ভাল ছিল দেখছি। আদর করে চাই কি গাড়ি-পাল্কিতে তুলে আমায় থানা পৌঁছে দিত। তোমাদের খোশামোদ করতে হত না। তারপর ব্যস্ত হয়ে বলেন, তোমরা উদ্যোগ করছ না। এ ভাল কথা নয়। আমাকে রাখায় বিপদ আছে জান?

সুরমা বলে, রামোঃ, সে বুঝি জানি নে? থানা—এই এক্ষুনি এখানে এসে হাজির হবে, দেখবেন। কুন্তল-দার কপালে হাত রেখে বলে, এইবার কিন্তু জ্বরটা একেবারে ছেড়ে গেছে।

কুন্তল-দা বলেন, কিন্তু মায়া ছাড়তে পারবে না, আবার আসবে। সত্যি সুরমা, আজ কি ভাল লাগছে, কি বলব! তা বলে মরাটাকে আর কেয়ার করি নে। লোকে তো মরে ভূত হয়, আমি জ্যান্ত থাকতেই খুব প্রাকটিস করে

নিয়েছি। মরে গেলে কোন রকম অসুবিধা হবে না। তোমাদের চলাফেরা দিনের বেলা, আমি বেড়াতাম রাতের অন্ধকারে। বল, ভূতের সগোত্র হলাম কি-না? আনারস দিয়েছিল তারা ভূতকে, মানুষে চাইলে মানুষে কি সহজে দেয়?

আনারসের কথা বলতে গিয়ে কুন্তল-দা হেসে খুন। কি অন্ধকার তখন! কৃষ্ণপক্ষের রাত, এমনি দিনে তো মজা! কুন্তল-দা পাটক্ষেত থেকে বেরিয়ে রাস্তার উপর ধীর পায়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন···তারপর শ্মশানঘাটের কাছে এলেন। রাস্তায় খানিকটা দূরে চরের কিনারায় শ্মশান। একটা মড়া পুড়ছে, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। রাস্তার পাশে উল্টে রাখা এক পুরানো নৌকা মেরামতের জন্যে রয়েছে। শ্মশানবৈরাগ্যের মতো একটা কিছু হল বোধ হয়—কুন্তল-দা ঐ নৌকার উপর চুপচাপ বসে মড়া পোড়ানো দেখতে লাগলেন। মানুষজন কেউ নেই এ-দিকটায়, শ্মশানের আমগাছতলায় অনেকে তামাক খাচ্ছে, গল্পগুজব করছে, সে-সব অল্প অল্প কানে আসছে। হাটুরে লোকও সব চলে গেছে ; একটি দল কেবল কি জন্য পিছিয়ে পড়েছিল, তারাই হন-হন করে যাচ্ছিল। চিতা দেখে একজন বলে, ও মুচিপাড়ার আমদানি ; পাড়াটা সাফ হয়ে গেল গো! ওলাবিবি রোজ তিন-চারটে করে নিচ্ছেন।

আর একজন বলে, শুনে দেখ্ তো রে—মানুষ আমাদের ভিতর যেন কম হয়ে যাচ্ছে।

যেন বাড়ে না, সেইটে ভাল করে নজর রাখিস। মাঝে মাঝে ওরাই আবার পিছু নেন কি-না।

তারপর খুব একটা উদ্বিগ্ন স্বর। সত্যি, মিলছে না তো! মানুষ এগার জন।

তিনবার গোনা হল।

তাই তো, তাই তো! বেশ খানিকটা গোলমাল উঠল। শেষে একজন বলল, বোকারা নিজেকে বাদ দিয়ে সব গুণছিস যে!

কিন্তু তা সত্ত্বেও রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। কুন্তল-দা অন্ধকারে না দেখেও শব্দ-সাড়ায় টের পাচ্ছেন, এ-ওর পাশ কাটিয়ে আগে যেতে চাচ্ছে, শ্মশানের এইখানটায় কেউ পিছনে থাকবে না। কুন্তল-দার ছেলেমানুষি চাড়া দিয়ে উঠল, তা ছাড়া খিদেও পেয়েছে খুব। নাকিসুরে বলেন, এই আমায় কিছু দিয়ে যাঁ। আমি খাঁব।

আর যায় কোথায়, তুমুল চিৎকার!···কে কার ঘাড়ে পড়ে, কাঁধের ধামা-ঝুড়ি কতকগুলো ঠিকরে পড়ল। শ্মশানে মড়া পোড়াচ্ছিল, সেই লোকগুলো 'কি' 'কি'—বলতে বলতে এই দিকে ছুটল।

নাঃ, থাকতে দিল না আর। নৌকা থেকে লাফিয়ে কুন্তল-দা দৌড় দিলেন। পায়ে ঠেকল আনারস, অকালের ফল, কে আশা করে কিনেছিল। সেদিন পাটক্ষেতের ভিতর নারিকেল পাতার গদিতে বসে সমারোহে আনারস ভোজ চলল।

বিনয় এসে বলে, আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন? রামচরণ বলল, কি নাকি বড্ড জরুরী ব্যাপার।

সুরমা বলে, এই আমার দাদা। আলাপ করিয়ে দেব।

বিনয় হাসিমুখে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দেয়।

সুরমা বলে,—না—সেই যে অতি-নমস্তের জন্ত আপনাদের একরকম মিলিটারি-স্যালুট আছে—আমার দাদা কি সাধারণ মানুষ?

কুন্তল-দা রাগ করে ওঠেন, আবার?

বিনয় চোখের ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে। কুন্তল-দা বলেন, বিশ্বাস করবেন না—ও-সব নিন্দুকের কথা, সামান্ত মানুষ ছাড়া আর কি। আমি কুন্তল সরকার. ধরা দেবার জন্ত ছটফট করে বেড়াচ্ছি।

বিনয় বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকে। তারপর হেসে বলে, তাই যদি হয়—ভাগ্যে আমার পদোন্নতি আছে দেখছি।

আভা থাকতে পারে না, বিনয়ের কানে বলে, খুব—খু-উ-ব! বেশ হিসেব করে সমঝে চল দিকি, রাঙা-দির খোপাসুদ্ধ মাথাটা গড়াতে গড়াতে তোমার শ্রীপদযুগলের নিচে গিয়ে পড়বে।

বিনয় বলতে লাগল, কিন্তু বিশ্বাস হতে চায় না কুন্তল-দা—আপনার এ রকম সুবুদ্ধি—অনুতাপ নাকি?

অনুতাপ? রুগ্ন অশক্ত কুন্তল-দার চোখ জ্বলে ওঠে। বলেন, পাপ করলে অনুতাপ আসে, পাপ তো করিনি।

প্রবল কাশি এসে কথা আটকে যায়। সুরমা ছুটে এসে বাতাস করতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে কাশি থামল, তখন তাঁর সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে।

সুরমা ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, বিনয়বাবু, দাদা আমার বিশ্রাম নিতে চান। কাল তো আপনি কলকাতা যাচ্ছেন, ওঁকে নিয়ে যান। তাহলে নির্বিঘ্নে যেতে পারেন। এ আপনি সহজে পারবেন।

বিনয় সভয়ে বলে, বাপরে!

পারেন না?

বিনয় বলে, পারি, কিন্তু উচিত হবে না। আর ইনি নিজেই যখন জেলে যেতে প্রস্তুত—

সুরমা রাগ করে বলে, কিন্তু আমরা তো নই।

রাগ দেখে কুন্তল-দা হাসতে লাগলেন। শান্ত কণ্ঠে বলেন, এই দেখ বোন, মিছেমিছি ঝগড়া বাধাচ্ছ। একটা-ছুটো কুন্তলের জন্য ব্যস্ত হবার দিন কি আছে? বীরপূজা ততদিন চলে, যখন এক-আধটা মানুষকে আলাদা করে বেদির উপর তোলা যায়। এ রকম কুন্তল সরকার এখন ঘরে ঘরে। ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।

বিনয়ের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, অনেক ভেবেচিন্তে এই মতলব করা গেছে বিনয়বাবু। অকেজো হয়ে গেছি, এবার সরকার বাহাদুরের ঘাড়ে চেপে পড়াই ভালো। খেয়েদেয়ে ফুর্তি করে দিন কটা দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

সুরমার রাগ বেড়ে যায়। জেলখানা পিঁজরাপোল নাকি?

কুন্তল-দা বলেন, ঠিক তাই। যে গরু লাঙ্গল বয় না, কোন দিনই বইতে পারবে না, তাকে পিঁজরাপোলে দিতে হয়। এই রোগা দেহটা নিয়ে আমি অপরের কাঁধে চেপে থাকি কোন্ লজ্জায় বল তো বোন?

সুরমা বলল, বিনয়বাবু আপনার উপরওয়ালারা গোটা মানুষটিকে চাচ্ছেন—শুধু ঐ হাড় কখানা নিশ্চয় নয়। তাছাড়া, আপনি তো বলেছেন, এঁদের উপর চার্জ কিছু নেই।

তা বটে! বিনয় চুপ করে ভাবতে লাগল। শেষে বলে, আপনি যখন বলছেন, তাই হবে।

সুরমা বলে, আপনিও বুঝে দেখুন। বরানগরে ওঁর মা রয়েছেন। আমরাও ফিরে যাচ্ছি, আর কদ্দিন থাকব এখানে! আরও ভাই-বন্ধুরা আছেন। কুন্তল-দার জন্য না হলেও, উনিও এক মায়ের এক ছেলে—মায়ের কথা ভাবতে হবে তো!

বিনয় বলল, তাই ঠিক রইল। আপনি যখন বলছেন।

বিনয় চলে গেলে কুন্তল-দা বললেন, শেষ পর্যন্ত ঘরেই পাঠালে?... এখনও জ্বর এল না; আজ খাসা লাগছে। আজকাল এসরাজ বাজিয়ে থাক সুরমা?

কেন বাজাব না? আপনার ভয়ে নাকি। দিন-রাত বাজাই।

কুন্তল-দা আপন মনে হাসতে লাগলেন। বলেন, সুরমা, একদিন তোমার আঙুলে আলপিন ফুটিয়েছিলাম। কি পাগলই ছিলাম তখন! সে-সমস্ত ভুলে গেছ, না?

হাঁ হাঁ—ভুলেছি বৈ-কি! একি আপনারা যে, কাঁটার দাগ চিরজীবনে মিলায় না?

সুরমার ঠোঁট দুটি থরথর করে কেঁপে উঠল, সে মুখ ফেরাল।

কুন্তল-দা আবার জিজ্ঞাসা করেন, বিয়ে হয়ে গেছে নাকি?

কেন যাবে না শুনি ? আমি তো সন্ন্যাসী-ফকির নই।

আজা বলল, হয়নি এখনও, হবে। সাতাশে অগ্রহায়ণ—ঐ বিনয় দাদার সঙ্গে। পাকাপাকি হয়ে যায়নি অবিশ্যি।

কুন্তল-দা ভয়ানক খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, বেশ, বেশ। আমাকে নেমতন্ন করো কিন্তু। কলকাতায় হবে নিশ্চয়। সন্দেশ, রসগোল্লা, চপ, কাটলেট—কতদিন খাইনি ওসব।

সুরমা সামলাতে পারল না, ছুটে পালায়।

সেই পুরানো ঘর, পুরানো তক্তাপোশ, গলির ধারে পুরানো জানলাটি। আমরা সবাই আবার জুটেছি। হিরণ, আকবর আলি, নবীন—সকলে আসে। সুরমাও রোজ অন্তত একটিবার এসে দেখে যায়।

সকালবেলা কেউ নেই, একলা আমি মাথার কাছে বসে বাতাস করছিলাম। কুন্তল-দা বাইরের দিকে মুখ করে শুয়েছিলেন। মৃদু পায়ে এসে ঘরে ঢুকল সুরমা।

এসো বোন, এসো···মানুষ না দেখলে ভাল লাগে না। কোথায় যাব, মানুষ সেখানে আছে কি না আছে, তাই ভাবি। উঁহু, বিছানার উপর নয়, চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসো।

সুরমা নতমুখে আমি যে নেমতন্ন করতে এলাম।

তা বটে···সাতাশে এসে পড়েছে। আমার ক্যালেণ্ডারের পাতাটা ছেঁড়া হয়নি। প্রজাপতি মার্কা চিঠি আরও দুটো এসেছে। ঐ সাদা বাড়িটায় মেরাপ বাঁধছে, জানলায় বসে দেখি।

হাসিমুখে সুরমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, হাঁ বোন, তোমরা যেন দল বেঁধে ষড়যন্ত্র করেছ—সাতাশের পর কুমার-কুমারী কেউ আর থাকবে না ?

সুরমা বলে, আপনাকে যেতে হবে কিন্তু।

আমি ! ডাক্তারে কি বলে শোননি ! বিয়ে-বাড়ি, আত্মীয়-কুটুম্বরা আসবেন, তার মধ্যে তো যাওয়া চলে না। আমি এখান থেকেই আশীর্বাদ করব।

সুরমা বলে, না—বোনের কাছে ভাই যাবেই, আত্মীয় কুটুম্বের অপছন্দ হলে তাঁরা আসবেন না। আমি সাবধান করে নিয়ে যাব, খুব যত্নে রাখব। দুদিন আগে যেতে হবে আপনাকে।

কুন্তল-দা বললেন, তোমার এসরাজ সেই অবধি পড়ে রয়েছে সুরমা। ধুলোবালি জমে গেছে, নিয়ে যাও। কেন বাজাবে না—কি হয়েছে ? বিশেষ এই আমোদের সময়।

ধরা গলায় সুরমা বলে, নিয়ে যাব দাদা, লোক পাঠিয়ে দেব।

তাই দিও। আমার উপর রাগ করে আছ সেই থেকে? আরে, আমি একটা পাগল।

সে যাবার পরে আরও কতক্ষণ এসেন্সের মাদক সৌরভে ঘরের বাতাস মন্থর রইল। মা এসে বললেন, এমন চুপচাপ শুয়ে আছিস কেন বাবা? একটু ঘোরাফেরা কর তো ভাল।

কুন্তল-দা বললেন, ঘুরতে ভাল লাগে না মা।

আমার দিকে তাকিয়ে মা বললেন, শঙ্কর, সেই আগেকার মতো ওকে টেনেটুনে চিলের ছাতে নিয়ে বসো না কেন? রাতদিন পড়ে থাকে। দেখে দেখে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

কুন্তল দা বললেন, অভ্যাস করে নাও মা। ছাতে বসে শলা-পরামর্শ কতকাল ধরে তো হল, এবার বন্ধ হয়ে গেল, ঠেকাতে পারলে না—তুমি না, আমার আর আর ছেলেরা না, ডাক্তারেও নয়।

মা চেয়ে আছেন তাঁর দিকে, আমিও দেখছি। মুখখানা কী পাংশু দেখাচ্ছে···স্থির প্রভাহীন চোখ দুটি কোন দুর্নিরীক্ষের দিকে ভেসে বেড়াচ্ছে।

যেন আমাদের কুন্তল-দা চেয়ে চেয়ে দেখছেন, জীবনের অপরূপ বৈচিত্র্য। কত আশা কত আনন্দ মঞ্জরিত ফুলের মতো ধরণীর মাটিতে ঝরে পড়ছে। কত রৌদ্রালোক, মেঘমেদুর আকাশের কত স্বপ্ন মানুষের চোখে! মৃত্যু-পথিক শীতল তুহিনাচ্ছন্ন পথ থেকে ডান হাত তুলে আগামী দিনের সুখী ধরিত্রীকে নমস্কার জানাচ্ছেন।

সুরমা বিয়েয় নিয়ে যাবে কি, তার দিন তিনেক আগে থেকে কুন্তল-দা একেবারে সংজ্ঞাহীন। ডাক্তার, মা আর আমরা দিনরাত পালা করে কাছে আছি। সন্ধ্যার দিকে একবার কুন্তল-দার জ্ঞান হল। উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কে আছ তোমরা?

সবাই।

সুরমা এসরাজ নিয়ে এসেছে?

কে জবাব দেবে? আজকে বিয়ের দিন, তার কাছে কি খবর পাঠানো যায়? আমার ছ্যাঁৎ করে মনে পড়ে গেল, অনেক বছর আগেকার সেই বিকেলবেলার কথা। আমরা আটজন ছিলাম—আজও সবাই আছে, এসরাজও আছে, সুরমা নেই। কুন্তল-দা চীৎকার করে উঠলেন, সুরমা, আর ইউ দেয়ার? স্পিক।

ঝনঝন এসেরাজ বেজে ওঠে। তীব্রগতিতে আঙুল চালাচ্ছি। আর কখনো বাজাই নি, অনভ্যস্ত আঙুল ছিঁড়ে যাচ্ছে যেন, তবু বাজাতে হবে। শক্ত শক্ত অনেক কাজ করেছি জীবনে, কিন্তু আজকের এই বাজানো কঠিনতম কর্তব্য। সুরের ঝঙ্কারে ঘর ভরে উঠল। মৃত্যু-পথযাত্রীর বিশীর্ণ মুখে হাসি ফুটে উঠল।

গো অন, গো অন, সুরমা—

শান্ত মুখে মা গরম জলের সেঁক দিচ্ছেন, সকলে নিঃশব্দে ফাইফরমাশ খাটছে। তারপর গম্ভীর গলায় ডাক্তার বলে উঠলেন, স্টপ—

বাজনা থামালাম।

ডাক্তার বললেন, আর কাজ নেই, আর শুনবেন না ইনি।

তিনি ও ঘরে সাবান নিয়ে হাত ধুতে গেলেন। এসরাজটা থাপে ভরে ধীরে ধীরে কুন্তল-দার মাথার কাছে রাখলাম। ঘরে ম্লানায়মান আলোয় অকস্মাৎ মনে হল, শুধু সুরমাই নয়—আনন্দকিশোর, নিরুপমা, জগৎ দত্ত, হিরণ, রানী—সব্বাই আমরা এক জায়গায় বসে আছি, আমরা দলশুদ্ধ এসেছি।

মল্লিকা

মল্লিকার কথা বলে প্রসঙ্গ শেষ করি।

স্বদেশী আমলে আমি ছেলেমানুষ, ইস্কুলে পড়ি। বাবা চাকরি ছেড়ে তো ক্ষেপে উঠলেন। সে গল্প গোড়ায় বলেছি। নিশান উড়িয়ে দল বেঁধে এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে সভা করতে যেতেন, বক্তৃতা করতেন। বাড়ির কাজকর্ম সব দেখত যদু, জাতে নমঃশূদ্র, আসল কর্তা যেন সে-ই।

একদিন খুব সকালে বাবা আমাকে ডেকে তুললেন। যদু ও বাড়ির আরও অনেকে আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছে। হলদে রঙের এক-এক টুকরো সুতো নিয়ে তিনি সকলের হাতে বেঁধে দিলেন। বললেন, আমার হাতেও তোমরা কেউ বেঁধে দাও। যদু তুমিই দাও। কলমের খোঁচায় ওরা দেশের মাটি ভাগ করেছে, তা বলে মানুষ আমরা কি পৃথক হয়ে যাব?

সারা সকালটা ধরে কোলাকুলি চলে। যদু কিন্তু মোটের উপর খুশি নয়। সে বলে, দেখ বাবু, চাকরি ছেড়ে এই সব তো করে বেড়াচ্ছ, উদিকে ছিটেফোঁটা যা আছে—আদায়পত্তোর কিছু হচ্ছে না, বিষয় আশায় চুলোয় যাবে কিন্তু। এই সব হাঙ্গামার দরকার কি শুনি?

বাবা বললেন দরকার নেই? আচ্ছা বাপু, তো ছাঁচতলায় বেড়া দিয়ে কেউ কেউ যদি দুটো ভাগ করে বলে, এ-দিকটায় তুই থাকবি, ও-দিকটায় মানী থাকবে—চুপ করে থাকতে পারিস? আমরা ঝগড়া-ঝাঁটি করি ভাব করি নিজেরা করব—তুমি বাপু কে হে, বাইরে থেকে মাতব্বরি করছ?

এর অনেক দিন পরে আর কিছু বড় হয়ে বাবার বক্তৃতা শুনেছি। তার এক একটা কথা আজও যেন গান হয়ে কানে বাজে। মানুষের বিজয়-ঘোষণা…আঘাত-অপমানের মধ্যে মাথা উঁচু করে বেড়ানোর সঙ্কল্প…এমনি ধরনের সব কথা।

তারপর মল্লিকা এল। ষোল-সতের বছরের অজানা-অচেনা মেয়ে—সর্বাঙ্গ রূপ ভরা আর একমুখ হাসি···সে হাসি কারণে অকারণে ঝরণার জলের মতো ঝরে পড়ে। নতুন মেয়ে পেয়ে বাবারও বাইরের ঘোরাঘুরি খানিকটা কমে এল।

একবার রাখিবন্ধনের দিন সকাল সকাল স্নান করে আমরা সকলে এসে দাঁড়িয়েছি।

কই বাবা, রাখি বাঁধবে না ?

বাবা হেসে বললেন, মনে মনে সব বাঁধন পড়েছে—টুকরো দেশ তাই জোড় লেগে গেছে। বাইরের রাখির আর দরকার নেই। একটু চুপ করে থেকে বলতে লাগলেন, ম্যাকলিন সাহেব কুন্তলের কথা শুনে বলেছিল, ফুলের মত নরম দেহ, কিন্তু ভিতরটা যেন ইস্পাত—এইসব ছোকরা এ-দেশে এল কি করে, রায় ? আমি জবাব দিলাম, সাহেব, রয়াল-বেঙ্গল-টাইগারের দেশ এটা—জগতে এদের জুড়ি নেই।

আনন্দে গৌরবে বাবার গৌর মুখখানি জলজল করতে লাগল।

তারপর তিনি গত হলেন। আইন পড়ার নাম করে তখন কলকাতায় আছি। কিন্তু সে তাহা মিথ্যা। কলেজমুখোই হই নে। মল্লিকার সম্বন্ধে যে নেশা লাগে নি এমন নয়। স্বদেশী করি বলে কি মানুষ নই ? শনিবারে প্রায়ই বাড়ি আসি। আরও সুবিধা হ'ল, আমার উপর একটু বিশেষ কাজের ভার পড়ল, কাজটা আমাদেরই ঐ অঞ্চলে।

আমার ধরন-ধারণ যদুর ভাল লাগে না। সে কটমট করে তাকায়। কৈফিয়ৎ হিসাবে বলি, যদু ভাই, একা একা তুই কদিকে সামলাবি ? আমার তো একটা বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। তাই আসা যাওয়া করছি।

কাটখোট্টা যদু এ সব কথায় ভোলে না, ঘাড় নেড়ে সোজা জবাব দেয়, না ভাইধন, আমার সুখে কাজ নেই। এ-রকম ইস্কুল-পালাপালি করো না আর ; মানুষ হয়ে এসে একেবারে আমায় ছুটি দিও।

কিন্তু আসা বন্ধ করবার জো নেই যখন, যথাসম্ভব তাকে পাশ কাটিয়ে বেড়াই।

একবার সোমবারের দিন সকালবেলা ঠিক ফেরবার মুখে মেঘ করল, ঝড়-জল হওয়া অসম্ভব ছিল না। স্টেশন প্রায় মাইল চারেক পথ—ও রকম অবস্থায় কাপড়চোপড় ভিজে গেলে কলেজে যাওয়া চুলোয় যাক—বড় রকম একটা অসুখ-বিসুখও হতে পারত। কিন্তু যদু এসব বুঝবে না। দুপুরে খাওয়ার সময়টা মুখোমুখি পড়ে গেলাম। যদু বলে, এবারে পুরোপুরি ইস্তফা দিয়ে এলে ভাইধন ? তা ভাল—নিজের কাজকর্ম নিজে দেখ গে, আমি সরে পড়ি।

অপরাধীর ভাবে বলি, আচ্ছা, এ অবস্থায় যাই কি করে বুঝে দেখ—

যদু বলে, ও, চিড়িয়াখানার খাঁচা ভেঙে বাঘ বেরিয়েছে—

বেরিয়ে তার দুটো এসে গাঁয়ে ঢুকছে। তুই সেই সকাল থেকে তক্কে তক্কে আছিস, আর ওদিকে ঘরের মধ্যে আর এক নম্বর তিনি ওৎ পেতে রয়েছেন।

যদুর মুখ হাসিতে ভরে যায়। তবেই দেখ ভাইধন, আমার একরত্তি ঐ বউঠাকরুনের—খালি বিদ্যে নয়, বুদ্ধিও কত! বুকের উপর থাবা দিয়ে সগর্বে বলে, আমি—এই আমি খুঁজে পেতে এনেছিলাম, ঠাকুর আমার মান রেখেছেন।

তোর আর তোর বউঠাকরুনের জ্বালায় আমি দেশান্তরী হয়ে যাব, মোটে বাড়ি আসব না।

যদু ভয় পায় না, মহানন্দে বলে, সেই তো! বাপের বেটা হও ভাইধন। কর্তাই বা ক-দিন বাড়ি থাকতেন! কত বিদ্যে শিখেছিলেন, শেষকালে তাই তো মানুষ কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক থেকে এসে কথা শোনাবার জন্য ধরে নিয়ে যেত। হুঁ-হুঁ—বাড়ি থাকলে তোমাকে সেরেস্তায় বসতে হবে, হাটবাজার করতে হবে—

এই সময় এক কাণ্ড হয়ে গেল। যদুর ম্যালেরিয়া ধরেছিল। দিন দশেক ভুগে সবে ভাত খেয়েছে। ফসল কাটার সময়, নিতান্ত না দেখলে নয়—মাঠের দিকে যাচ্ছিল সেইসব তদারক করতে। থানার উপর দিয়ে রাস্তা। দেখে, গোকুল মোড়ল আর তার ভাইপো শুকনো মুখে বসে আছে; সামনে চেয়ারের উপর দারোগাবাবু। একটা কথা কাটাকাটি চলছিল। গোকুল সম্পর্কে তার পিসতুত ভাইরাভাই—ভাব-সাবও আছে। হাত নেড়ে গোকুল তাকে ডাকল। যদু বারান্দায় উঠে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে, সকালবেলা পীঠস্থানে—কি হয়েছে রে?

গোকুল বলে, কাল রাত্রে আমার সর্বস্ব চুরি গেছে। দক্ষিণের ঘরে সিঁদ কেটেছে, আবার রান্নাঘরেরও হাত দেড়েক বেড়া খসিয়ে ফেলেছে—পিতল-কাঁসা ঘরে এক টুকরো নেই। আজকে কলার পাতায় ভাত খেতে হবে।

দারোগা ঘাড় নেড়ে বললেন, যা-ই বল মোড়লের পো, হিসেব করে দেখলাম পাঁচটা টাকার কম কিছুতেই হয় না। এখন না পার, বরঞ্চ দুপুরের ইদিকে জমা দিয়ে যেও—নির্ভাবনায় যাও, সন্ধ্যা নাগাদ আমরা গিয়ে হাজির হব।

গোকুলের চোখ কেটে জল বেরুবার মতো হল। হুজুর, বিশ্বাস করছেন না—কি আর বলি! ঘরে একটা তামার পয়সা অবধি রেখে যায়নি।

যদুর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, এই এজাহার দিতে এসে বড্ড মুশকিলে পড়লাম! দারোগাবাবু নিজে না গেলে কিছুতে হবে না, অথচ কোথায় তার পালকি-ভাড়া, কোথায় কনেস্টেবলের বারবরদারি—এত টাকা এখন পাই কোথায়?

বাবার সঙ্গে যদু ঝগড়া করত, তবু তাঁরই হাতে মানুষ। কে জানত তলে তলে তাঁর বিদ্যা সে আয়ত্ত করেছে! যদুর মুখ কালো হয়ে উঠল, উগ্র কণ্ঠে বলে, কেন, তোমার গরু-বাছুর নেই গোকুল?

দারোগার দিকে তাকিয়ে বলে, সে তো ঠিক কথা! চোরেরা এত সমস্ত নিয়ে গেল, আর হুজুরের বেলায় ফক্কিকার! উনি না গেলে হবে কি করে? গরু বন্ধক দিয়ে রাহা-খরচের যোগাড় করগে—

দারোগা আগুন হয়ে উঠলেন। তুমি কে হে ফাজলামি করতে এসেছ? বেরোও—এই মহাদেব সিং, নিকাল দেও উসকো—

যদু উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে, আমরাই যাচ্ছি। সোজা সদরে চলে যাব. সে পথ চিনি। চল ভাই, বন্দেমাতরম্—

দারোগা হাঁকলেন, সদরে আমরা পাঠাব। তোদের চিনে যেতে হবে না। পাকড়ো—

দুপুরের পর গোকুল এসে চুপি চুপি মল্লিকাকে বলে গেল, যদুকে নিদারুণ মার মেরেছে, মেরে এখন অতুল ডাক্তারের উঠানে দেবদারু গাছে বেঁধে রেখেছে।

অতুল ডাক্তারের বাড়ি থানার লাগোয়া। ডাক্তারের সঙ্গে দারোগার গলায় গলায় ভাব এবং কু-লোকে রটনা করে, ভালবাসাটা নিতান্ত নিষ্কামও নয়। মল্লিকা প্রথমটা হতভম্ব হয়ে যায়। পাড়ার দু-চার জনের চেষ্টায় সাক্ষাতের বন্দোবস্ত হল। মল্লিকা চাদরে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে থানায় চলল, সঙ্গে যদুর মেয়ে মানী আর এক জ্ঞাতি-ভাসুরের ছেলে। আসামীকে তখন গারদঘরে রাখা হয়েছে। পিছনে উত্তরের রোয়াকে মল্লিকারা বসল।

হাতকড়ি লাগানো যদুর চেহারা দেখে মল্লিকার চোখে জল আসে।

এ কি করে বসলে মোড়ল-দাদু?

স্বর্গীয় কর্তার কথাগুলোই যদু মুখস্থের মতো বলে যায়।

কেন, অন্যায়টা কিসের? বন্দেমাতরম্ বলেছি, মাকে ডেকেছি—ছেলের মুখ চেপে ধরে মাকে ডাকতে দেবে না, এ আমরা মানব কেন?

দফাদার করালীচরণ এই গ্রামের বাসিন্দা, আমাদের সদর-পুকুরের ধারে বাড়ি। তাকে ডাকিয়ে এনে মল্লিকা বলে, মোড়ল-দাদাকে এবার ছেড়ে দাও। সবে জ্বর থেকে উঠেছে, দুর্বল শরীর—তার উপর দুপুরে কিছু খায়নি—

করালী বলে, দেমাক করে খায়নি। চিঁড়ে দেওয়া হল, তা ছড়িয়ে ফেলল। বুঝে দেখ তো মা, থানার পরে এসে হল্লা করে—ওর সাহসটা কি! বড়বাবু ওকে সদরে চালান দেবেন। দিন কতক জেলের ঘানি ঘুরিয়ে আসুক, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মল্লিকা আশ্চর্য হয়ে বলে, বন্দেমাতরমের জন্য জেল?

করালী হেসে ওঠে।

কি জানি, কি জন্যে! তুমি মা, ঘরে যাও—ওকে ছাড়া হবে না।

যদুও বলে, ঘরে যাও বউঠাকরুন। এরা কি সহজে ছাড়বার লোক? দুপুরে কতকগুলো সাক্ষি এনে কি-সব তালিম দিচ্ছিল—একটু একটু কানে গেল। আমি নাকি ভয়ানক ভয়ানক কাজ করেছি। তুমি ভাইধনকে চিঠি লিখে দিও। মাস পাঁচ-ছয় পরেই আসছি—ভাবনা নেই। মল্লিকা চোখ মুছে বলে, সদর তো দশ-বারো ক্রোশ পথ। মোড়ল-দাদু এই রোগা শরীরে যাবে কিসে?

করালী হাসতে লাগল। বলে, আসামীর জন্যে কি পক্ষিরাজের বন্দোবস্ত

হবে ? এই—জোছনা উঠলে রওনা হবে, সঙ্গে চার-পাঁচ জন কনস্টেবল থাকবে, পৌঁছুতে দুপুরও লাগবে না। দারোগাবাবু সকালবেলা পালকিতে রওনা হবেন, বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

মল্লিকা দৃঢ়কণ্ঠে বলে, আমার মোড়ল-দাদুও পালকিতে যাবে।

করালী দাঁত বের করে হাসে। বলে, ষোল বেহারার ?

তা দূরের পথ—বেহারা কিছু বেশী চাই বই কি।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে করালী হাসির জের টানতে সাহস পায় না। বলে, আচ্ছা মা দারোগাবাবুকে বলিগে—

হ্যাঁ বলোগে। রোগা মানুষকে বার ক্রোশ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলে হাড় ক'খানাও আস্ত থাকবে না। সে হবে না। তুমি বল পালকির খরচা আমরাই দেব।

রাত্রিবেলা থানা থেকে খবর এল, পালকির সম্বন্ধে দারোগাবাবুর আপত্তি নেই, সকালেই রওনা হয়ে যাবে। তবে বারোটা বেহারার দরুন চব্বিশ টাকা এক্ষুণি পাঠিয়ে দেওয়া চাই।

পাড়াগাঁয়ে যখন-তখন অত টাকা মেলে না। মল্লিকা হাতের একগাছা বালা খুলে যত্নর মেয়ের হাতে দিল। বলে, পোদ্দারের দোকানে ছুটে যা মানী, বন্ধক দিয়ে, বিক্রী করে, যে ভাবে হোক—টাকা নিয়ে আয়।

বালা হাতে মানী ইতস্তত করে। মল্লিকা তাড়া দিয়ে ওঠে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি, মানুষের চেয়ে কি গয়না বড় ?

তা অবশ্য নয়, এবং বালা নিয়ে মানী চলেও গেল। তবু মল্লিকা অনেকক্ষণ পর্যন্ত সুস্থির হতে পারে না। এই বালা তার শাশুড়ী হাতে পরতেন, সেকেলে জিনিস। শাশুড়ীকে সে চোখে দেখেনি—তিনি চিতায় উঠলে কর্তা খুলে রেখেছিলেন, মল্লিকা এলে তাকে পরিয়ে দেন। আবার সে যেদিন চিতায় উঠবে, হয়তো আর একজন সজল চোখে খুলে রেখে দিত। কিন্তু সে তো হল না—

আমার কাছে মল্লিকা চিঠি লিখল। সব কথাই খুলে লিখেছিল। তিন দিনের দিন বাড়ি এসে পৌঁছলাম।

হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে মল্লিকা বলে, দেখ তুমি রাগ করবে। ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে বসলাম, সব লিখেছি—সেইটে কেবল লিখিনি।

কি ?

মল্লিকা বাঁ-হাতখানা উঁচু করে দেখাল।

হাসিমুখে বলি, গয়নার শোক লেগেছে ?

অশ্রুজড়িত স্বরে মল্লিকা বলে, এ যে আমার হীরে-মাণিক-কোহিনুরের চেয়ে বেশি! তুমি তো জান···আচ্ছা, অন্যায় হয়নি আমার ?

নিশ্চয়, এক-শ বার—

মল্লিকা এতটুকু হয়ে যায়, বলে, বাবা বেঁচে থাকলে কত দুঃখ করতেন তিনি।

বাবার কথা উঠলে গর্বে বুক ভরে যায়। স্বাধীনতা আমরা অনেক কাল হারিয়েছি, কিন্তু মনে মনে আজও মরিনি—সে কেবল ঐ নমস্তেরা প্রাণের আগুন পুরুষ থেকে পুরুষান্তর জ্বালিয়ে যাচ্ছেন বলে। বললাম, বাবা যা মানুষ—হয়তো বলতেন, বউমা, এ তুমি কি করেছ!—মানুষের হাতে হলদে রাখি পরিয়ে বেড়াতাম, তুমি যে একটা হাতের বালা খুলে এক সঙ্গে হাজার মানুষের মনের উপরে রাখি পরিয়ে দিলে।

মল্লিকা লজ্জিত হয় একটু। বলে, এই দেখ তোমার কানেও গেছে তা হলে। সত্যি, এই অঞ্চল জুড়ে আমি মা হয়ে বসেছি।

তাই তো বলছি, ঘোরতর অন্যায়। আমি বেচারা কিছু খবর রাখি নে, কলকাতায় বসে পেনাল কোড মুখস্থ করে মরি। এখন পথ চলতে লোকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, ঐ মল্লিকা-মায়ের স্বামী যাচ্ছে। এতে ইজ্জত থাকে?

মল্লিকা ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে ওঠে। বেশ হয়েছে—এতকাল তোমরা মাথায় চড়ে থাকতে, এখন থেকে আমার নামে তোমার পরিচয়।

দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, ইজ্জত আমি বজায় রাখবই।

কি করবে?

একলা তোমায় দেমাক করতে দেব বুঝি! আমিও পাশে পাশে থাকব। হাজার মানুষের মধ্যেই এখন থেকে আমার কাজ।

আদর করে তাকে কাছে টেনে আনলাম। বলি, বাবার ঐ ছবির সামনে যেমন ছোট্ট এতটুকু তুমি এই আমার বুকের মধ্যে রয়েছ, তেমনি থাকবে রোজ—চিরকাল—বুড়ো হয়ে মরে যাওয়া অবধি। লোকে বলবে—নীলকান্ত রায়ের ছেলে ঐ শঙ্কর, রায়-বাড়ির বউ ঐ মল্লিকা···কেমন? বাবার কাজ—এখানকার সকল মানুষের কাজ আর আমি একা নই—দুজনে মিলে করব আমরা।

মল্লিকা তদ্গত চোখে ছবির দিকে চেয়ে থাকে, তারপর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উপুড় হয়ে প্রণাম করতে আসে। দেখ কাণ্ড, মেয়েরা এত অল্পে অভিভূত হয়ে পড়ে।

তাকে ধরে ফেললাম!

রাগে রাগে থানায় গিয়ে উঠি। দারোগাকে বললাম, আপনি নতুন এসেছেন, জানেন না। যদু মোড়ল আমার বাড়ি থাকে, ওর বাপও আমাদের কাজ করত—

দারোগা আপ্যায়ন করে বসালেন। বলেন, এসে পড়েছেন—বেশ হয়েছে মশাই। আমাদেরই বা গণ্ডগোলের গরজ কি? তবে এ-ও বলি, ছাইভস্ম কেস—কতদূর কি গড়াত? কথায় বলে স্ত্রী-বুদ্ধি···তাঁরা পালকি-বেহারার টাকা যোগাতে পারলেন, কিন্তু কনস্টেবলগুলোর দরুন কিছু ধরে দিলে তখনই যে খতম হয়ে যেত। ওর আধা খরচও লাগত না মশাই।

ব্যাপারটা কি বলুন তো?

দারোগা বলেন, পিঁপড়েগুলোর পাখনা উঠেছে, দেখেননি। থানায় এসে

চেঁচিয়ে গেল। সরকারী অফিস—সরকার এসব শায়েস্তা করতে জানে, করবেও। কিন্তু ছোটলোকে এই রকম বাড় বাড়লে ভদ্রলোকেরা টিঁকবেন কি করে, ভাবুন তো! আরে মশাই নিচু হয়ে না-ই যদি থাকবে তো ভগবানকে বলে-কয়ে আমার আপনার মতো বামুন হয়ে জন্মাল না কেন?

বললাম, আপনার কাছে ভাগবত-ভাষ্য শুনতে আসিনি দারোগাবাবু। নীলকান্ত রায়ের নাম নিশ্চয় শুনেছেন। আপনাদের নেকনজর তো ছিলই, তার উপর খাওয়া-ছোঁয়ার বাচবিচার নেই বলে সমাজেও তিনি পাঁচ বছর একঘরে হয়েছিলেন। আমি তাঁর ছেলে—যদু চাকর নয়, আমার বড় ভাই।

তা না হলে এই রকম কাঁধে চড়ে বসে! আপনারা দেশটা ডোবাবেন।

রূঢ় কণ্ঠে বলি, আজ্ঞে না, আপনারাই। শুধু দেশ নয়, বৃটিশ সরকারের সেবা করছেন, তাদেরও। সোজা কথায় বলি. পান-টান খাওয়ার সিকি পয়সা প্রত্যাশা করবেন না—মিথ্যে মামলা তুলে নিন।

দারোগা চটে উঠলেন। মিথ্যে কি রকম? ডাক্তারবাবুর গাছ থেকে চুরি করে নারকেল পাড়েনি?

না। তার কারণ অতুল ডাক্তারের নারকেলগাছই নেই।

আছে না আছে, সে-বিচার কোর্ট করবে।

তা করবে। আপাতত আমিও কিছু করে যাই। দারোগার গলায় ছিল কম্ফর্টার জড়ানো, রাগের মাথায় কম্ফর্টার ধরে এক হেঁচকা টান দিয়ে তারপর ছেড়ে দিয়ে এলাম। মাছি মেরে লাভটা কি।

তারপর হুলুস্থুল কাণ্ড। যদু ছাড়া পেল, কিন্তু স্বদেশি ব্যাপারে বাবার সুনাম এবং তার সঙ্গে এই ঘটনা যোগ হয়ে নানা দফায় সেবার আমার মোট দেড় বছর জেল হয়ে গেল। সে-আমলের খবরের কাগজে এসব কথা উঠেছিল, একটা কাগজে এক মল্লিকার নামেই দেড় কলম লেখা বেরুল—"মল্লিকা-কুসুমের মতো যিনি স্নিগ্ধ সৌরভে গৃহকোণ আমোদিত করিতেন. হতভাগ্য সন্তানবর্গের কল্যাণকল্পে তিনি আজ স্বদেশ-গগনে সবিতৃরূপ সমুদিত হইয়াছেন, এইবার নব-প্রভাতের অভ্যুদয় হইতে চলিল"···ইত্যাদি। মোটের উপর সমস্ত মিলে ব্যাপার এমন গড়াল, যে বেহারারা যদুর পালকি বয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তারা একদিন এসে পাই-পয়সা অবধি ভাড়া ফিরিয়ে দিয়ে গেল। সকলের যুক্তি-পরামর্শে বালা বিক্রির টাকায় রায়বাড়ির মণ্ডপে একটা নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হয়। কুন্তল-দার ছাতে যেমন আমরা আড্ডা জমাতাম কতকটা তাই আর কি! চাষীরা সন্ধ্যার পর বই-সেলেট নিয়ে আসে। মল্লিকা এইসব নিয়ে যেন পাগল হয়ে উঠল। ছোট ছেলেমেয়েদের সে নিজে পড়ায়।

জেল থেকে বেরুবার দিন ছেলেরা যথারীতি ফুলের মালা নিয়ে ফটকে বসে আছে, ভিড় ঠেলে মল্লিকা আর যদু এগোবার ভরসা পায় না। দুটো দিন যে বাড়িতে স্থির হয়ে থাকব, তার ফুরসৎ দেয় না তারা; এখানে সমিতি, ওখানে বৈঠক—নিঃশ্বাস ফেলতে পারি নে।···আবার পুলিশে ধরে, যথারীতি মামলা-

মোকদ্দমার পর জেল। শেষাশেষি আর কোর্টের দরকার হয় না, সোজা ডিটেনশন ক্যাম্পে চালান হয়ে যাই। কুন্তল-দার দলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এখন আর এ কথা গোপন ছিল না।

তখন বীরভূমের এক গ্রামে থাকতে দিয়েছিল। পুলিশ দুবেলা এসে তদারক করে যেত। গ্রামের লোক দস্তুরমতো হিংসা করত আমাকে। কাজকর্ম নেই, খাওয়া দাওয়া তোফা চলছে, সব সময় ধোপদুরস্ত কাপড়। মাঝে মাঝে বাজারে যাই সওদা করতে। মাছওয়ালাকে দর জিজ্ঞাসা করলে সে যদি বলে বারো আনা, ঝনাৎ করে পুরো টাকাটা ফেলে দিয়ে মাছ তুলে নিই। সে অবাক হয়ে থাকে।

একদিন লোকটা চুপি চুপি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, কি করলে এইরকম বন্দীবাবু হওয়া যায়—বলুন তো বাবু? অনেকখানি বিদ্যে শিখতে হয়—না?

বাড়ির চিঠি আসে মাঝে মাঝে। মল্লিকা নিজের কথা কিছু লেখে না—তাছাড়া সকল খবরই দেয়। মানীর বিয়ে হয়ে গেছে, জামাইটি লেখাপড়াও জানে একটু আধটু, সে-ই এখন যত্নর বাড়িতে এসে আছে, চাষ-বাস দেখে। যত্নকে খুব তারা টান টানি করছে. তাকে আর আমাদের বাড়ি থাকতে দেবে না···

একদিন মল্লিকার চোখ ফেটে সতি্য সতি্য জল এসেছিল। মানীই পরে বলেছে একথা।

আচ্ছা তোর বাবাকে যে নিয়ে যাবি মানী, এই পুরীর মধ্যে একা একা আমি থাকব কি করে?

মানী বলে, বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন, আর কত খাটবেন বলো।

তোর বাবাকে বুঝি বড্ড খাটাই?

মানী সমস্ত জানে, তার লজ্জা হয়। বলে, না খুড়িমা, তেমন কথা কে বলেছে? আসলে হল, বাবা এখানে থাকলে নানান কথা উঠে সমাজে মাথা নীচু হয়ে যায়। তাই তোমাদের জামাই বলেছে, সমাজের সকলকে ছেড়ে দিয়ে তিনটে মানুষ আলাদা থাকা যায় না তো!

জামাই সঙ্গে ছিল। তার সুর এরকম মোলায়েম নয়। বলে, কোথায় মানুষ? আমরা তো তোমাদের কাছে কুকুরের সামিল। আমাদের ঘরে ঢুকতে দাও?

ম্লান হাসি হেসে মল্লিকা বলে, দিই কি না, ওকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ দিকি অমূল্য।

মানী সামলে নেবার ভাবে তাড়াতাড়ি বলল, তোমরা দাও, কিন্তু সবাই দেয় না কি-না—সেই কথাই বলছে খুড়িমা।

দিন-কাল বদলে যাচ্ছে, যারা দেয় না তারাও দেবে।

অমূল্য আগুন হয়ে ওঠে, দয়া? দয়া চাই নে, আমরা আলাদা থাকব। কোম্পানি বন্দোবস্ত করে দিয়েছে, দালান-কোঠা চাকরি-বাকরি সব বখরা হয়ে যাবে···খাসা হয়েছে—

কিন্তু তাতে ভালবাসা হবে না, তফাতটাই শুধু বাড়বে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে মল্লিকা বলে, এদের অনেক দোষ আছে মানি, তবু এদেরই মধ্যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছেলে মানুষের অপমান প্রাণ দিয়ে বুঝেছে। এই বাড়িরই একটা লোক সব ছেড়েছুড়ে আজও ভেসে বেড়াচ্ছে···হ্যাঁ রে মানী, আজকাল তোর খুড়োমশায়কে একেবারে ভুলে গেছিস, না?

মানী লজ্জিত হয়ে সরে যায়। অমূল্য তখন চলল শ্বশুরের কাছে। মণ্ডপের সামনেটায় একটা নিড়ানি নিয়ে যদু ঘাস তুলছিল। সেখানে আর একদফা বচসা হল। অনেকক্ষণ পরে রান্নাবান্না হয়ে গেলে মল্লিকা গিয়ে দেখল, যদু ঘাসের উপর মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে।

মল্লিকা বলে, আর কেন মোড়ল দাদু? আমরা উঁচু জাত—ওদের যে ঘেন্না করি! কেউ আর ইস্কুলে পড়তে আসবে না, ঘাস তুলে পথঘাট যতই সাফ করে রাখ না কেন—

যদু বলে, তাই তো বউঠাকরুন, নতুন কথা শুনি—তোমরা আর আমরা একেবারে পর, কোন সম্পর্ক নেই—

থাকবে কি করে? কোম্পানি দাগ কেটে মার্কা মেরে দিয়েছে যে! এদিক-ওদিক হবার জো আছে?

সেইদিন মল্লিকা এক চিঠি লেখে আমাকে। যা কখনো হয় নি—দু-শ মাইল দূর থেকে কার কান্না শুনতে পেলাম। চিঠির প্রতিটি অক্ষর যেন কান্না। লিখেছে, অবস্থা ভাল নয়, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। স্বদেশী আমলের কথা শুনেছি, কিন্তু এমন দুর্দিন আর কখনো আসে নি। আমার এদিকে ক্ষেত-খামার খাঁ খাঁ করছে, ভয়ানক আজন্মা, লোকে এবার খেতে পাবে না···

যদুকে শেষ পর্যন্ত একরকম জোর-জবরদস্তি করেই নমঃশূদ্র-পাড়ায় নিয়ে গেল। মল্লিকা একা থাকে। এক-একদিন যদু সন্ধ্যার পর গা ঢাকা দিয়ে আসে, বেশিক্ষণ থাকতে ভরসা পায় না, খবরাখবর নিয়ে সরে পড়ে।

মাস ছয়েক পরে একদিন যদু ঘরের মধ্যে এসে চেপে বসল, বলে, ইঃ আমার কুটুম্বেরা! ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই। বুঝলে বউঠাকরুণ, দুপুরে আজ লবডঙ্কা হয়েছে।

মল্লিকা শিউরে ওঠে, সে কি?

তিক্ত কণ্ঠে যদু বলে, জুটবে কোথা থেকে? তের বিঘের বড় বন্দটা পতিত রয়েছে। তার কি চেষ্টা আছে? নবাবপুত্তুর তেড়ি কেটে লম্বা লম্বা বুলি আউড়ে বেড়াবে, সন্ধ্যার পর জুটবে গিয়ে অশ্বিনীনাথের গাঁজার আড্ডায়। গলা নামিয়ে চুপি চুপি বলে, আবার শুনি রাত্তিরে এদিক-ওদিক বেরুচ্ছে। পয়সার খাঁকতি, নেশার টান। শেষকালে জেলে-টেলে না যায়, তাহলে মানীর কষ্টের পার থাকবে না।

মল্লিকা বলে, এই আমার মতো?

যদু নাকি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল, হুঃ তোমার মতো! তুমি তো ভাগ্যধরী

বউঠাকরুণ, ঐ হারামজাদার কথার মধ্যে তুমি আমার ভাইধনকে টেনে আনলে ?

ভাতের থালা সামনে আসতে যদু গ্রাসের পর গ্রাস মুখে পোরে। কেবল যে দুপুরে খায়নি, সে-রকম মনে হয় না। হয়তো আরও কত বেলা—কত দিন, তার ঠিক কি ! মল্লিকার মনটা বড় খারাপ হয়ে রইল, রাত্রে খুব জ্বর এল। জ্বর এইরকম প্রায়ই হয়। ভাবনায় ভাবনায় কিছুতেই ঘুম আসে না। আলো জ্বেলে তখন আমাকে চিঠি লেখে, আর থাকতে পারি নে, তুমি চলে এসো—

এই সময়টা নতুন ভারত-শাসন আইন পাশ হল, স্বাধীনতার পথে নাকি বড় একটা লম্ফ দিলাম ! বড়লোকের বাড়ির আয়েশি কর্তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। খবরের কাগজে কলমের পর কলম তাঁদের অলৌকিক ত্যাগের বিবরণ বেরুতে লাগল। পুলকে রোমাঞ্চিত হতে হয়,—ডজন ডজন এরকম অবিসম্বাদী দেশনেতা রয়েছেন, ভাবনা কি আমাদের ? তাঁদের ভোট যোগাড় করতে আমাদের মতো জেলফেরত ছন্নছাড়ার দল কোমর বেঁধে লেগে গেল।

এই উপলক্ষে আমরা কয়েকজন আচম্বিতে ছাড়া পেয়ে গেলাম। আমাদের লাভ এইটুকু। প্রথম যে ট্রেন পাওয়া গেল, তাতে উঠে বসলাম।

সন্ধ্যার পর বড় কনকনে শীত—বাতাসের যেন দাঁত হয়েছে, গ্রামের কুকুরটা অবধি এরই মধ্যে খেজুর রস জ্বাল-দেওয়া উনানের ধারে গুটি-সুটি হয়ে শুয়েছে। এমনি সময়ে স্বল্পালোকিত স্টেশনে নেমে আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি।

কোথায় যাবেন বাবু ?

আমাদের গ্রামের নাম করলাম। বিছানার মোট ও সুটকেসটা দেখিয়ে বলি, বোঝা ভারী হবে না।

উঁহু ভারী কেন হবে ? শোলার আঁটি। চার আনা লাগবে—ষোলটি পয়সা, আধলা কম নয়।

টিকিটবাবু আলো হাতে সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

নতুন লোক দেখেছে, ঠগ-বেটারা অমনি ছুরি শানাচ্ছে। বলি, ষোলটি পয়সা কখনো দেখেছিস এক জায়গায় ? আপনি ব্যস্ত হবেন না, এগিয়ে দেখুন, কতজনে হা-পিত্যেশ করে আছে। চার পয়সা কি বড় জোর ছ-পয়সা।

লোকটা বলে, পাকা দু-ক্রোশ পথ, খাল পেরুতে হবে, মোটে ছ-পয়সা ?

তাইতো সবাই যাচ্ছে।

তবে আমিও যাব।

বোঝা মাথায় নিয়ে দ্রুতপদে চলল।

পাকা রাস্তা ছেড়ে আমরা শুঁড়িপথে নামলাম। খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে, মাঠ গাছপালা ঝুপসি-ঝুপসি জঙ্গলগুলো অনেকদিন পরে চোখে অপরূপ ঠেকছে।

তোমার নামটা ভাই ?

তা-ও-ছ পয়সার মধ্যে ?

চুপ করে যাই। মনে মনে ভাবি, ঐ তো রোগা চেহারার মানুষ, দুটো

বোঝা বয়ে খুব কষ্ট হয়েছে, মেজাজ তাই বিগড়ে গেছে। সহানুভূতির সুরে বললাম, এই ইয়ে···সুটকেসটা বরং আমার হাতে দাও দিকি।

বিরক্ত মুখে লোকটা বলে, তা হলে পয়সা তিনটে কম দেবে তো? পথ ছেড়ে এবার আমবাগানে ঢুকে পড়ল।

ওদিকে কেন রে?

লোকটি বলে, এইখানে দাঁড়াও বাবু, জল খেয়ে আসি একটু।

এত শীতে জল?

সে রুখে উঠল। জলও খাওয়া যাবে না? বাগানের দিকটায় জল, কতক্ষণ লাগবে!

মনে পড়ল, একটা খালের মতো আছে বটে এদিকে। চৈত্র মাসে একদম শুকিয়ে যায়, বর্ষায় হিঞ্চে-কলমি নিয়ে জেগে ওঠে, জলের চেয়ে শেওলাই বেশী। ছেলেবেলায় এইখানে দু-চার বার পুঁটিমাছ ধরতে এসেছি।

দাঁড়ালাম। আবার ভাবি দাঁড়িয়েই বা কি হবে! লোকটার গতিক সুবিধে লাগছে না। বাগানের মধ্যে খানিকটা গিয়ে একটা উঁচু জমি, সেখান থেকে বেশ দেখা গেল। চেঁচিয়ে ডাক দিলাম, জল খাবি—তা খালের মাঝখানে কি করিস?

আজ্ঞে ঘাটের জল ঘোলা।

কোমর জল হয়ে গেছে, এখনও এগুচ্ছিস?

জবাব না দিয়ে লোকটা ক্ষিপ্রবেগে শেওলা ছিঁড়ে পথ করতে লাগল। আমি বন-জঙ্গল ভেঙে সোজা খালের কিনারে ছুটলাম। ততক্ষণ সে ওপারে উঠে দৌড় দিয়েছে।

হেসে উঠি। পারবি নে বাপু, সাত বছর আটকা ছিলাম, তা পায়ে বাত ধরেছে ভাবিস নে। আচ্ছা, যত জোরে পারিস ছোট, আমিও ছুটছি।

নতুন করে আর শেওলা ছিঁড়তে হল না, চক্ষের পলকে খাল পার হয়ে প্রায় রশি দুই গিয়ে লোকটাকে জাপটে ধরলাম।

সুটকেশ ফেলে লোকটা কোমর থেকে বার করল এক ছুরি। ধস্তাধস্তি চলল খানিকটা। হেসে বললাম, ও ছুরিতে মাছ কোটা যায়, মানুষ কাটা যায় না, বুঝলি? হাত ধরে মুচড়ে দিতে ছুরি পড়ে গেল, লোকটা আর্তনাদ করে উঠল।

গ্রামের ধারে এসে পড়েছি। চেঁচামেচিতে লোক ছুটে গেল।

কি হয়েছে? কি হয়েছে?

লোকটা অসঙ্কোচে বলে, মেরে ফেলেছে ভাই রে, হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে। তেষ্টার জল খেতে দেয় না। যেই বলেছি গোপালদার ঐ বাড়ি হয়ে একটুখানি ঘরে যাই—

বোঝা গেল, তার বাড়ি এই গ্রামেই। ছোকরাদের মধ্যে তিন-চার জন বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এল। বলে, ঐ রকম! ভদ্দোরলোক কি না, আমাদের

ওরা জানোয়ার ভাবে। পড়ে পড়ে তুই মার খেলি, জবাবটা কি আমাদের জন্ত মুলতুবি রেখেছিস ?

ব্যাপার তুমুল হত নিঃসন্দেহে ! কিন্তু ওরই মধ্যে আধবুড়ো একজনকে চেনাচেনা ঠেকল। চৈতন্ত মোড়ল না ? কুশখালি এসে পড়েছি যে, বুঝতে পারি নি।

চৈতন্ত মোড়ল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। গোঁফ-দাড়িতে ভরা আমার মুখ চিনেও চিনতে পারে না।

আমি রায়-কর্তার ছেলে গো—শঙ্কর।

চৈতন্য বলে, সর্বনাশ ! এদ্দিন পরে এলে ? সেই লোকটার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, মেরে থাকে মেরেছে, বেশ করেছে। ইনি মারলে দোষ হয় না, সম্পর্কে তোর খুড়শ্বশুর।

চৈতন্ত পরিচয় করিয়ে দেয়, এ হল তোমাদেরই যড় মোড়লের জামাই। ওরে অমূল্য পেন্নাম কর্—

অমূল্য গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই সময়ে এসে পড়লেন জমিদারি কাছারির নায়েব, সঙ্গে চারজন বরকন্দাজ। তিনিও এই ট্রেনে নেমেছেন। বরাবর রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন, হৈ-চৈ শুনে কি ব্যাপার জানতে এসেছেন।

কী হে ? একেবারে থেমে গেল সব ! এই যে অমূল্যচন্দোরও রয়েছে দেখছি।

যারা বেশি বীরত্ব দেখাচ্ছিল তাদের আর পাত্তা নেই, কোন্ দিকে সরে পড়েছে, যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। নজরে পড়ে গিয়ে অমূল্য ঘাড় নীচু করে রইল।

আমার দিকে চেয়ে নায়েব বললেন, জামা যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে ! খুলুন দেখি, এঃ মশায়—

পিঠে এক জায়গায় লম্বালম্বি চিরে গেছে। সেদিকে এতক্ষণ কারও নজর পড়ে নি ! একজন বরকন্দাজ ছুরিখানা কুড়িয়ে নিল।

নায়েব বোমার মতো ফেটে পড়লেন। ব্রহ্মরক্ত পাত করেছিস, ভিটেয় ঘুঘু চরাব। শ্রাদ্ধের বন্দোবস্ত তো হবেই ভালো করে, কাল গিয়ে ফৌজদারি চড়াব। কালাপানি ঘুরিয়ে আনব, তবে আমার নাম মন্মথ শিকদার হ্যাঁ—

আমার হাত ধরে টানতে টানতে বলেন, চলে আসুন মশায়। আমি আছি, কোনো শালার উড়বার জো নাই। দায়ঝক্কি সমস্ত আমার। চৈতন্ত মোড়ল বাবুর জিনিস দুটো তোমার জিম্মায় রইল, পৌঁছে দিও। কাছারি গিয়ে ডাক্তার ডেকে আগে তো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হোক !

রাস্তায় এসে মন্মথ মনের উল্লাস চাপতে পারেন না, হাসতে হাসতে বলেন, একটুখানি ছাল উঠে গেছে মশায়। ডাক্তার লাগবে না হাতী ! তবে সাক্ষী হিসেবে ডাক্তার একটা চাই বটে—ডবল ফী ধরে দিলেই হয়ে যাবে, বন্দোবস্ত আছে।

চুপচাপ কয়েক পা গিয়ে আবার শুরু করলেন, ঐ অমূল্য বেটা হল পালের গোদা। আরে বাপু, মাতব্বর হবি ভাল কথা—গুছিয়ে চলতে পারলে দু-দশ টাকা আসেও। কিন্তু ঘর থেকে কিছু আগাম বের করতে হয়। সব ব্যবসায় ঐ এক রীতি। তোর হল ভাঁড়ে মা ভবানী, মুটেগিরি করবি—শুধু বামুন-কায়েতদের মুণ্ডপাত করে বেড়ালে কি শেষরক্ষে হবে?

জিজ্ঞাসা করলাম, এদিকে বুঝি ঐ-সমস্ত খুব আন্দোলন হচ্ছে।

নায়েব বললেন, হবে না? না দেবার কথা বড় মিষ্টি কি না। সব শেয়ালে এক রা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বামুন-কায়েত ওসব কিছু নয়, নায়েব মশায়। ওদের রাগ আসলে চড়া খাজনা আর জুলুমের উপর। সেইটেই এখন জাত-বেজাতের কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

নায়েব প্রতিবাদ করে উঠলেন, সেই আহ্লাদে থাকুন মশায়। একবার আনাচ-কানাচ থেকে শুনে আসবেন দিকি ওদের কথা।

এত সব ওরা তো তলিয়ে বোঝে না!

বুঝুক না বুঝুক, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই। আমরা কি ছেড়ে কথা কইব? আর তা-ও বলি, ধর্ম আছেন। নইলে দেখুন না কেন, দেওয়ানিতে আঠার মাসে বছর, আজ এক মাস ছুটোছুটি করে সময় বের করতে পারছি নে, কোত্থেকে পথের মানুষ আপনি এসে এই কাণ্ড। এর নাম ফৌজদারী মামলা, একেবারে কাঁচাখেগো দেবতা। সকালবেলা টক করে থানায় একখানি এজাহার ঝেড়ে দিয়ে সেকেণ্ড ট্রেনে সদরে সোজা মোক্তারের বাড়ি···কি মশাই, আবার এত রাত্রে বাড়ি যাবেন কি করতে? কাছারিতে দুটো শাক-ভাত খেয়ে ভোরবেলা বরঞ্চ এই পথে অমনি—

সোজাই চললাম আমি। ব্যস্ত হয়ে নায়েব ডাকছেন, তাহলে সকালবেলা আসছেন তো? না, আবার লোক পাঠাতে হবে?

আমি মামলা করব না।

তার মানে?

ফিরে দাঁড়িয়ে বলি, ভেবে দেখলাম নায়েব মশায়, দোষ আমারই। পেটে ভাত নেই, শীতের রাত্রে চারমাইল মোট বয়ে আনছে—মজুরি ছ-পয়সা। এতে মেজাজ খারাপ হলে দোষ দেব কার? আমি যদি বলতাম, চার আনাই পাবি বাপ, সেইটে ন্যায্য—আর তার উপর যদি এসব হত—

নায়েব শেষ করতে দেন না, গর্জন করে ওঠেন, তা বুঝেছি, আপনারা ঘরের ঢেঁকি সব কুমীর হয়ে উঠেছেন, তাই এইসব হাঙ্গামা।

হাঙ্গামা-হুজুত না হলেই বা আপনাদের দু-পয়সা আসে কিসে? হাতবাক্স কোলে করে নেহাৎ একেবারে দুর্গানাম লিখতে কি কাছারি এসে বসেছেন? বলুন সত্যি কি না?

চাঁদের আলোয় উঠানে বাদামতলায় এসে দাঁড়াই।

দুয়োর খোল, ও যদু—

এই উঠানে কত সন্ধ্যায় কত ছুটাছুটি করেছি, মা তখন বেঁচে। বাদামতলার এইখানটায় বিয়ের পর মল্লিকার পালকি এনে নামিয়েছিল। আজ যেন নতুন অতিথি, সবাই অবিশ্বাস করছে। এতকাল পরে ফিরে এসে মনে হচ্ছে, গ্রামের চেনা মানুষেরা বদলে গেছে, একেবারে নতুন পৃথিবী।

যদুভাই, শুনতে পাচ্ছ না? আমি—আমি—

মল্লিকার জ্বর। লেপের নিচে এক রকম বেহুঁশ হয়েছিল, ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ঘরে ঢুকে চমকে উঠি। ঠাণ্ডার ভয়ে দরজা-জানলা বন্ধ···মিটমিটে প্রদীপ···ভাঙাচোরা দেয়ালের ফাঁক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আরশুলা উড়ছে···বিশীর্ণ ভয়াবহ মুখ মল্লিকার। জ্যোৎস্না-পরিপ্লাবিত পথ অতিক্রম করে যেন কালো গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। হাত বাড়িয়ে দিলাম মল্লিকার দিকে। জীবন এসে কি মৃত্যুকে আদর করে ডাকল?

কেমন আছ?

ভাল, খুব ভাল! এই কদিন একটু জ্বর হয়েছে।

কদিন না, ক'বছর বল।

হোকগে। ম্যালেরিয়া জ্বর—ঐ রকম ভোগায়। মল্লিকা উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরে বসে পড়ে। কী-ই বা বয়স তার, তবু চুলে পাক ধরেছে, কুঞ্চন-রেখা পড়েছে সুকোমল মুখটির উপর। সেই ছিপছিপে হাসিমুখ মেয়েটি, চোখে-মুখে চঞ্চলতা—এখন কথা বলে কত আস্তে, হাঁটতে পারে না—কষ্ট হয়। বলল, মোড়ল-দাদু একা-একা কি যে করছে! আগে একটা খবর দিলে না, বেশ লোক?

বললাম, বড্ড মনে-প্রাণে চেয়েছিলে কি না, তাই হঠাৎ ছেড়ে দিল। চিঠিখানা পেয়ে অবধি এমন হয়েছিল মল্লিকা, খবর দেবার দেরি সইল না—ছুটে এসেছি।

এত দয়া—এমন শত্রুতা আর কার আছে বল। বলে মল্লিকা প্রগল্‌ভা হাসি হাসল।

যদু দেখা দিল। কুলোয় করে চিঁড়ে-পাটালি আর জামবাটি-ভরা দুধ এনেছে। সে থমকে দাঁড়ায়—রক্তের দাগ কেন?

মল্লিকা বলে, দেখি—এদিকে ফেরো তো!

হেসে উড়িয়ে দিই, দেখবার কি আছে? কাঁটায় ছড়ে গেছে, গরম জামায় চুপসে গিয়ে ঐ রকম দেখাচ্ছে।

আহা-হা, তাহলে আগে একটু আইডিন—

উঁহু, সকলের আগে এইটি। যদুর হাত থেকে এক রকম কেড়ে নিয়েই খেতে বসলাম। তারপর ইচ্ছে করে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাই।

আচ্ছা—আমি যখন ডাকছি, গলা শুনে কি ভাবলে মল্লিকা?

মল্লিকা বলে, অনভ্যাস হয়ে গেছে, ঠিক ধরতে পারিনি। ভয় হল, চোর-চোর বুঝি!

চোর এসে হাঁকাহাঁকি করে গেরস্ত জাগাচ্ছে—বুদ্ধি আছে দেখছি।

হেসে উঠলাম। তারপর বলি, চোর না হই, দাগি তো বটে! বাড়ি এলাম, কিন্তু ক'দিনই বা থাকব!

মল্লিকা গম্ভীর হয়ে গেল।—যদি বলি, যেতে দেব না আর—বাড়ি থেকে বেরুতেই দেব না?

এমন তো বলনি কোনদিন—

মল্লিকা বলে, তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, একটা কথাও কি গুছিয়ে বলতে পারতাম ছাই!…সত্যি, আমি ঠিক করেছি, তোমাকে আর বাইরে বাইরে থাকতে দেওয়া হবে না।

তবে ঘরেই থাকব।

হ্যাঁ, নতুন ভাবনা আজ মনে মনে, ঘরে থাকা এখন কাজ আমাদের। কার্তিক কামার, এরফান ঘরামি, বুধো শেখ, আমাদের ঐ অমূল্য, চৈতন্য মোড়ল —কেউ বাদ নেই, সকলকে নিয়ে আমাদের ঘর।

খাওয়া শেষ হল। হাত ধুয়ে হাসতে হাসতে খাটের উপর এসে বসি।

মল্লিকা ঠিক বিশ্বাস করেনি।—সত্যি বলছ গ্রামে থাকবে? তাহলে তোমার দেশের কাজ?

এই গ্রামও কি দেশ নয়? এরা সকলে, তুমি—দেশের মানুষ নও বলো।

মল্লিকা সহজভাবে নিল কথাটাকে। বলে, তা সত্যি! ধর, তুমি তো জীবনটা এক রকম এই পথেই দিলে। আরও মানুষ রয়েছে, তারা যাক না।

ঠিক কথা। তবে যায় না যে!

হয়তো ভাবে, মিছে আত্মবলি দেওয়া। এ-জাতের কি কিছু হবে? ক'দিন থাকো, দেখবে অবস্থা। দেশের ছেলেমেয়ে এতকাল এত দুঃখ স্বীকার করে কত কি করতে চেয়েছিল, সব চুরমার হয়ে গেছে।

মল্লিকার গলা ভারী হয়ে এল, সে এক দিকে মুখ ফেরাল। আমিও সহসা জবাব দিতে পারিনে। শেষে বললাম, পথের বাধা তো আসবেই মল্লিকা। বাধা শক্ত হচ্ছে, তাতেই মনে হয়, সূর্য উঠল বলে। যোগী-ঋষিরা শব-সাধনা করেন, শেষ রাত্রেই ডাকিনীর উপদ্রবটা বেশি হয়। গল্প শোননি?

মল্লিকার দিকে ব্যথাভরা দৃষ্টিতে চেয়ে আছি। আবার বলি, মল্লিকা, তোমার শাঁখা সম্বল, রোগা দেহ; আমিও বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। সংসারের উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছি—শ্মশানের উপর এবার ঘর বাঁধা হল না। কিন্তু ফুল ফুটবে—এ অবশ্যম্ভাবী, আমাদের এত কষ্ট বিফলে যাবে না।

সকাল না হতে দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা পড়তে লাগল। খিল খুলে দেখল, মানী, অমূল্য, চৈতন মোড়ল এবং আরও দু-তিনজন এসেছে। এরাই তাকে মারবে বলে শাসিয়ে বেড়ায়, কুশখালির দিকে যাবার উপায় নেই, জামায়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে পর্যন্ত পর হয়ে গেছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড—সেই

জামাই পরম ভক্তিমান হয়ে সকলের আগে-ভাগে টিপ করে যদুকে প্রণাম করল, পা আর ছাড়তেই চায় না।

চৈতন্য বলে, লজ্জায় আসতে চাচ্ছিল না। আমি বলি, ভগ্ন রায়কর্তার ছেলেকে নিয়ে তো নয় এর মধ্যে শিকদার ঢুকে পড়েছে। আস্ত কালিঠাকুর—ভাহা মিথ্যের উপর চুনকাম করে। এবারে এমন জুত পেয়ে গেছে, শুধু অমূল্য কি—পাড়াটা সুদ্ধ চষে ফেলবে।

যদু উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, কি হয়েছে? কি করেছে অমূল্য?

খুড়োমশায় বলেন নি কিছু? মানী কেঁদেই ফেলল। বুঝলে চৈতন-দা, এ-ও ঐ শিকদারের বুদ্ধি। বাবার কানে গেলে একটা খাতির-উপরোধের ব্যাপার হবে, একদম তাই চেপে গিয়েছেন। বেরিয়ে গেছেন নাকি?

যদু বলে, চেঁচাস নে, ওরা ঘুমুচ্ছে ঐ ঘরে। বউঠাকরুনের রাতে ঘুম হয় না, এখন বোধহয় একটু চোখ বুজেছে।

কিন্তু কেউ আমরা ঘুমিয়ে নেই। শুনছি।

চৈতন নিঃশ্বাস ফেলে বলে, তবু রক্ষে। রওনা হবার আগে আসা গেছে। আর তোকেও বলি অমূল্য, পই-পই করে বারণ করেছি—গায়ে-গতরে খাট্, অধর্ম কাজগুলো ছেড়ে দে—বিশেষ করে নায়েব যখন আদা জল খেয়ে লেগেছে—

কথায় কথায় যদু সব শুনল। হঠাৎ একসঙ্গে সকলে চুপ করে যায়, নিঃশব্দে আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছি তাদের মধ্যে।

রুষ্ট কণ্ঠে যদু বলে, এমন মিথ্যুক হয়েছে ভাইধন, ছুরির খোঁচা খেয়ে স্বচ্ছন্দে বলল কাঁটায় ছড়ে গেছে?

কাঁটা নয় কি মানুষ? কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে ফেলবার বন্দোবস্ত হয়েছে; সমঝে চলো। শেষ পর্যন্ত কিন্তু উভয়কেই আস্তাকুঁড়ে যেতে হবে।

হো-হো করে হেসে উঠি।

যদু আরও জ্বলে উঠে। হেসো না, আমার গায়ে জল-বিছুটি মারছে। হারামজাদা শেষকালে খুনে হয়ে দাঁড়াল! যা ইচ্ছে করুক গে শিকদার, তুমিও থানায় চলে যাও ভাইধন। কিসের জামাই? জামাই? জামাই বলে খাতির করো না।

জামাই না হোক, আমার দেশের মানুষ তো—খাতির আমাকে করতেই হবে। বলতে বলতে দুইহাতে যদুকে তুলে ধরলাম। ঝেড়ে ফেলুক সে মনের গ্লানি। বলি, বড় ভাইয়ের মতো আমায় মানুষ করলি যদু-ভাই, বাবার কাছে এতটুকু বয়স থেকে আছিস—তুই আজ ঐ কথা বললি? তোর বউঠাকরুন আঁধার ঘরে একা একা ধুঁকছে, আমারও কয়েদখানায় জীবনটা কেটে গেল—এ-সব শুধু কি নিজেদের জন্য, বামুন-কায়েতের জন্য, এই মোড়লদের জন্য নয়? যাদের চিনি নে কোন দিন দেখব না—তারাও বড় হবে, মানুষ হবে, জীবন দিয়ে কি আমরা এই চাই নি? বল যদু ভাই, বল—আমি মিথ্যে বলছি কি না?

বুড়ো যদু আজকের নয়—বলতে গিয়ে হাহাকার করে উঠে।

কে ভাবে এ-সব ভাইধন ? একদল কেবল আর এক দলকে উস্কিয়ে দিচ্ছে বই তো নয় ! কোথাকার ভট্টাচার্জিরা নতুন পাঁতি দিয়েছে—এখন থেকে তুমি আমার কেউ নও, আমি তোমার কেউ হলাম না। আজ যদি কর্তা থাকতেন !

আমরা তো আছি, মোড়ল দাদু। তাকিয়ে দেখে সবাই শিউরে উঠল। মল্লিকা উঠে এসেছে, পা টলছে, কালিমাখা কোটরাগত দুটি চোখে যেন আলো ফুটছে। সামনের বেঞ্চির কোণে ধপ করে সে বসে পড়ল। বলতে লাগল, সেবার মাটি ভাগ করেছিল, এবার মানুষ ভাগ করছে। সেবারে সহ্য করি নি, এবারেও করব না। বসো তোমরা, মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে। নিমু ময়রার দোকানে একটিবার যেতে পারবে মোড়ল-দাদু ?

খানিক পরে আবার মল্লিকা বেরিয়ে এল, হাতে হলদে সুতো ! বলে, আমার শ্বশুর এ-সব তুলে রেখে গিয়েছিলেন। এসো, তোমরা, পরতে হবে। তুমি এস… তুমি…তুমি…

অমূল্য কেবল মুখ ভারী করে থাকে। বলে, আমার হাতখানা মুচড়ে একেবারে ভেঙে দিয়েছে, এই হাতে পরব রাখী ?

আমি বললাম, কি করি—শুধু হাতখানাই হাতের মাথায় পেলাম যে ! মনের নাগাল পাই নে, নইলে বিষ-ভরা মনটাই মুচড়ে ভেঙে দিতাম।

মানুষের মন ছাপিয়ে বিষ উপচে পড়ছে আজ চারদিকে। কালরাত্রির প্রহর গুণছি, সামনে নির্মল প্রসন্ন প্রভাত। সমস্ত গ্লানি ঘুচে যাবে তখন।

েপথালির চাষীদের মধ্যে আজকাল আমার খুব যাতায়াত। তাই নিয়ে নানাজনে নানা টিপ্পনী কাটে।

দারোগা বলে, এবারে শায়েস্তা হয়ে এসেছেন শঙ্করবাবু। চুলে পাক ধরেছে কি-না, কত দিন ? তা ভালো, পথটা নির্ঝঞ্ঝাট—

রাজেশ্বর নামে গ্রামে একজন তালুকদার আছেন, সম্পর্কে তিনি আমার খুড়ো। হঠাৎ কেন জানি না বড় সদয় হলেন আমার উপর। একদিন তিনি ডেকে বললেন, কলকাতায় গিয়ে একটা কিছু বাগিয়ে বসো দিকি বাবাজীবন, তবে বলব বাহাদুর। সাহেবদের বল, একটা ভাল চাকরি দিন স্যার, নইলে আবার ডবল করে স্বদেশিতে লেগে যাব কিন্তু। এতখানি বয়স ধরে দেখছি, কত লোক গুছিয়ে নিল এইসব করে। তুমিই বা কেন ছাড়বে ?

আর ঐ নায়েব মন্মথ শিকদার বলেন, চাষীপাড়ায় ঘুরে ঘুরে আমরা জমিদারের খাজনার তাগিদ দিই, কলাটা মূলোটা আদায় করি। আপনি যে অহরহ ঘুরছেন মশাই ? আপনাদের ভারতমাতার স্বাধীনতাও আদায় হবে কি ঐ পাড়া থেকে ?

হ্যাঁ ভাই, আসল ঘাঁটি ধরেছি। সত্যিকার স্বাধীনতাই আনব আমরা গ্রামে শহরে—সকলের মধ্যে। মিথ্যে ভয় থেকে স্বাধীনতা, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার স্বাধীনতা, মানুষের মতো বেঁচে থাকবার স্বাধীনতা, রাজ্যেশ্বর কোম্পানিকে এসেম্বলিতে পাঠিয়ে ইংরেজের বিপক্ষে কড়া কড়া বক্তৃতা করানো, আর তাঁর আত্মীয় পরিজনদের জন্য ভালো ভালো কতকগুলো চাকরি বাগানোর স্বাধীনতা নয়।

শোন, শোন, আমার সেই স্বাধীন সুখী ভাবী ধরিত্রীর স্বপ্ন। মানুষে মানুষে বিরোধ নিঃশেষ হয়েছে, শোষক-শোষিত হাত মিলিয়েছে, জনে জনের মুখে হাসি, চারিদিকের পঙ্গু উঠে বসেছে—ঐ দেখ। প্রাণে তাদের আশার বিদ্যুৎ।

গোরু ও মানুষ ছিল প্রায় এক ধরনের; প্রহার-পীড়নে মাথা তুলত না—নিঃশব্দে সয়ে যেত অসহ্য হলে মুখ থুবড়ে পড়ত। জীবনের উন্মাদনা জেগেছে সেইসব মানুষের মধ্যে, মুখ তুলে উল্লাসে তারা ঐশ্বর্যবতী ধরণীর দিকে চাইছে।

মল্লিকা তর্ক তোলে, এই ধর আমাদের যদু, টাকার তো সে কামনা করে না। দরিদ্র জীবনই তার কাছে ভালো—

ভাল তো অনেকেরই কাছে। দারিদ্র্যের গর্ব নিয়ে নিঃশব্দে মরতে পারে।

মল্লিকা বলে, কিন্তু অমূল্যর পাশাপাশি তাকে দেখ। কত শান্তি মোড়ল-দাদুর জীবনে!

জীবন নয়, ওটা মৃত্যু। মৃত্যুর মতো শান্তি কি কিছু আছে।

কিন্তু সবাই ভোগের প্রত্যাশী হলে জগতের হানাহানি কি বেড়ে যাবে না?

না মল্লিকা, না। ধরণী কৃপণ নয়, অনন্ত তার সম্পদ। মানুষের প্রয়োজন মতো খাবার আছে, সকলের থাকবার জায়গাও আছে,—নেই কেবল মানুষের লোভের জায়গা।

যেন বাতাসে শোনা যাচ্ছে, দিন আসছে ঐ। সব সমান আলো-হাওয়া, পৃথিবীর বুকের রসে সিঞ্চিত শস্য-সম্পদ, গোপন মণিকোঠায় রেখে-দেওয়া কয়লা-ইস্পাত একলা কারো নয়। মেরে মেরে একের হাত চোস্ত হয়ে গেছে, আর একজনেরও মার না খেলে পিঠ উসখুস করে—এ অবিচারের শেষ হয়ে এল। বিরোধ অপ্রীতি দূর হয়ে যাবে। শান্তি আসবে, শ্রী ফিরবে। বিবাদের মধ্যে কত অন্যায় করেছি! রক্তপাত হয়েছে, আপন-পর কত লোকের চোখের জল ঝরছে! নতুন দিনে কারও এসব মনে থাকবে না। প্রভাতের আলোয় রাত্রির দুঃস্বপ্ন ভুলে যাব ভাই—

শেষ

দুই পুরানো পড়শি—মহাচীন আর বিশাল ভারত। হাজার হাজার বছর ধরে অচ্ছিন্ন সৌহার্দ্য। ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে কত শতবার আমাদের গমনাগমন চলছে। রণদুর্মদ সৈন্যবাহিনী নয় প্রবীণ বিদগ্ধজন—হাতে জ্ঞানের মশাল আনন্দ ও শান্তির পরম আশ্বাস। জ্ঞানগৌরবে দেদীপ্যমান আত্মসমাহিত সুপ্রাচীন দুটি দেশ। নির্লোভ আত্মসন্তুষ্ট।

ক্যান্টনে বুদ্ধ মন্দিরের প্রাঙ্গণে বটগাছ দেখলাম—শ্রমণ সগর্বে বললেন, ভারতবর্ষ থেকে এনে এ সব গাছ হাজার বছর আগে পোঁতা। আর বটগাছ শুধুই নয়—পুণ্য ও অহিংসার প্রতীক ঐ ভগবান বুদ্ধকে সর্বসমর্পণ করে দেবতা জ্ঞানে তাঁরা পূজো করে আসছেন। হ্যাংচাউয়ে, শুনে এলাম, হ্রদ-পরিকীর্ণ একটা গোটা পাহাড়ই উড়ে এসেছে ভারত থেকে। সাঁইত্রিশটা দেশের মানুষ পিকিনে জমায়েত হয়েছিল। আদর আপ্যায়নের অবধি নেই—কিন্তু ভারতের খাতিরটাই যেন সব চেয়ে বেশী। ঠারেঠোরে এই কথাই প্রকট, আহা—তোমাদের কথা আলাদা, তোমরা হলে একেবারে আপনার লোক। হয়তো-বা বাজারে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পড়েছি, সাধারণ লোক বিদেশীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে—ভাষা জানি নে, কিন্তু সর্বাগ্রে একটি কথা রপ্ত করে নিয়েছিলাম—ইন্দু, অর্থাৎ আমরা ভারতীয়। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে জনতার মুখে উল্লাসের ঝিকিমিক। মুহূর্তে তাদের হৃদয়ের মানুষ।

পাঁচতারার আলোয় বিভাসিত নূতন-চীন চাক্ষুষ দেখে এলাম। স্থবিরত্বের খোলস ঝেড়ে ফেলেছে। চিরকালের বোবা বশম্বদ ন্যুব্জপৃষ্ঠ মানুষগুলোর অপরূপ বীরমূর্তি! লোহার নাল বাঁধা পঙ্গুপদ ছিল যে মেয়েগুলো—তাদের দাপাদাপিতে অস্থির আজ চীনের ভূমিতল।

প্রথম পর্ব

(১)

নিমন্ত্রণটা এলো অপ্রত্যাশিতভাবে। আমাকে শান্তি-সম্মেলনে প্রতিনিধি করা হয়েছে। কেন হে বাপু? ভেবে চিন্তে তো কোন গুণের হদিশ পাইনে। রাজনীতি করিনে, কোন দলে নেই। পড়ি এবং লিখি। যা সত্যি বলে মনে হয়, সেটাই লিখে প্রকাশ—কোন দাদার ধার ধারিনে যে, যুক্তি-পরামর্শ করে রেখে ঢেকে লিখতে হবে। এত সমস্ত ধুরন্ধর ব্যক্তি যাবার জন্য তদ্বির তাগাদা করছেন, তাঁদের ভিড় ঠেলে এ অন্ত্যজনের নাম ওঠে কেমন করে?

যে বন্ধুরা এসেছিলেন, তাঁরা বললেন, আমরা যেতে পারছিনে—কিন্তু জানতে চাই সমস্ত কথা। যান আপনি—ফিরে এসে লিখবেন। সত্যি খবরগুলো পাবো, এই আমাদের প্রত্যাশা রইল।

তথাস্তু। মনে মনে ভারি লোভ ছিল—যে তাজ্জব কথা শুনি, কার না লোভ হয় বলুন। এই এক বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পাই—আমার জীবনের বাসনার জিনিসগুলো কেমন আপনা-আপনি জুটে যায়। কত যে পেলাম, তার অবধি নেই। ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে যাই।

১৮ই সেপ্টেম্বর রওনা হওয়ার তারিখ। একেবারে দিনক্ষণ পাকাপাক্ত করে দিল্লী থেকে ওরা প্যান আমেরিকান প্লেনে জায়গা করে রেখেছেন। কিন্তু পাসপোর্ট ভিসার ব্যাপার আছে—সরকারি ফাইলের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক চলেছে আমাদের। টেলিফোনে আর্তনাদ করছি: কি মশায়, পণ্ড করে দেবেন নাকি? থানায় গিয়ে বললাম, এনকোয়ারিটা তাড়াতাড়ি সমাধা করে দিন। খবর এখনো যদি থাকে তো দেখবেন, কংগ্রেসের কথাও আছে অনেক বইয়ে—সেকালের সেই ত্যাগব্রতী সংগ্রামশীল কংগ্রেস।

খুব ভদ্রতা করলেন তাঁরা। ভরসা দিলেন: না না—আমাদের এখানে আটকা পড়ে থাকবে না। কালকের মধ্যেই সেরে দিচ্ছি। তার পরে কপাল আপনার।

দিল্লি থেকে টেলিগ্রাম এলো ভারত গভর্মেন্ট পশ্চিমবঙ্গ কর্তাদের পাসপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জাঁদরেল একসারি অফিসার—আমার পরম স্নেহভাজন তিনি—পাসপোর্ট হাতে নিয়ে এসে হাজির। আর তরুণ বন্ধুরা তাগিদ করছিলেন—তাঁরাও ফোন করলেন: পেয়ে গেছেন পাসপোর্ট? এক্ষুনি তৈরি হন।

কিন্তু ওঠ বললেই বোঁচকা কাঁধে বেরুব—অতখানি মুক্তপুরুষ নই আমি। সবুর করো, দুটো-একটা ফাঁক দাও। আঠারোই অন্য কাউকে পাঠিয়ে দাও আমার জায়গায়।

তাই হল। ২১শে যাবার পাকাপাকি ব্যবস্থা—মাঝে তিনটে দিন। একুশে রাত্রিবেলা প্লেন ছাড়বে, টমাস কুক থেকে বলে দিল। এ নিয়েও বিভ্রাট হতে যাচ্ছিল। হেলথ-সার্টিফিকেট ও ভিসা ইত্যাদির জন্য বিশেষ হাঙ্গাম ও টানা-পোড়েন চলল শনিবার (২০শে) সমস্তটা দিন ধরে। কি ভাগ্যে ঐ পথে একবার প্যান-আমেরিকান এয়ার অফিসে গেলাম। জানা গেল, প্লেন ছাড়ছে সেই দিনই। রাত্রি সাড়ে-বারোটা, অতএব নিয়মতে তারিখটা একুশে হয়ে যাচ্ছে। রাত্রি দশটায় চৌরঙ্গি এয়ার-অফিসে হাজির হওয়া গেল। পাসপোর্ট দেখে-শুনে সাহেব ফিরিয়ে দিল।

আপনার যাওয়া হবে না।

অপরাধ?

হংকঙে নামবেন, তার ছাড়পত্র কই? এ যে দেখছি চীন ও দশটা আজে-বাজে দেশের নাম লিখে দিয়েছে। হংকং না হয়ে যাবেন কী করে।

কিন্তু অতগুলো টাকা গুনে নিয়ে টিকিট দিয়ে দিল—তারা একবার দেখল না।

টমাস কুক ভুল করতে পারে, আমরা পারিনে। পরশু সোমবার দিন চেষ্টা করবেন—কিছু বাদ-সাদ দিয়ে ভাড়ার টাকা ফেরত দিয়ে দেব।

সাহেব মুখ ঘুরিয়ে পরের জনকে নিয়ে পড়ল।

আকাশ-পথে ঢের ঢের ঘুরেছি, কিন্তু এমন মুশকিলে তো পড়িনি। লটবহর কাঁধে করে কোন্ লজ্জায় বাড়ি ফিরি এখন।

সাহেব।

দুঃখিত। আমাদের কিছু করবার নেই। হংকং লিখিয়ে নিয়ে আসুন, তার পর কথা শুনব।

নিশিরাত্রে পাসপোর্ট-সংশোধনের জন্য কে জেগে রয়েছে কোন্খানে? ব্যাপারটা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল।

'কমনওয়েথ কান্ট্রিস' বলে এই যে রয়েছে—হংকং নিশ্চয় এরই মধ্যে পড়ে যাবে।

সাহেব সচকিত হয়ে ঘাড় ফেরাল।

আছে নাকি? কোথায়?

ঐ কথা ক-টা রবার স্টাম্পে ছাপা ছিল, বাকি সমস্ত হাতের লেখায়। কি না কি ছাপা আছে—পড়ে দেখেনি সেটা।

ঠিকই আছে তবে। বড় দুঃখিত।

তবে যে সাহেব ভুল হয় না তোমার।

সাহেব যেন শুনতেই পেল না আমার কথা। মাল ওজন করতে বলল লোককে। আমার অনেক বই নিয়ে যাচ্ছি মিশিগান য়ুনিভার্সিটিতে দেবো বলে। একটা প্যাকেট দেবব্রত শাস্ত্রীর কাছে গছিয়ে দিলাম—তা সত্ত্বেও ওজন কিছু বেশি হচ্ছে। কিন্তু সাহেব দৃকপাত করল না, আমার দিকে তাকালই না আর মুখ তুলে।

বাস এগারোটায় ওখান থেকে এরোড্রোমে রওনা হবে—হা হতোহস্মি! প্লেনের নাকি খবর নেই। বারোটা বাজল, একটা বাজল—বসেই আছি, ঝিমুচ্ছি বসে বসে।

চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে অহরহ পরিভ্রমণ করে। আরও কিছু নতুন উপগ্রহ জুটেছে—তার মধ্যে পি. এ. এ., বি. ও এ. সি ইত্যাদি কোম্পানির প্লেন-

গুলি। চাঁদের মতো এদের গতিও সুনির্দিষ্ট—কোন্ কক্ষপথে কোথায় কখন উদয় হবে, টাইম টেবিলে ঘন্টা মিনিট ধরে ছাপা আছে। কি গোলযোগ ঘটেছে আজকে. প্লেন এসে পৌঁছচ্ছে না। নাঃ, ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনেক ভালো মানুষের চেয়ে—চাঁদের টাইম-টেবলে কখনো তো গোলমাল দেখিনে।

রাত প্রায় দুটো। ফোন বেজে উঠল। উঠুন—উঠে পড়ুন বাসে। খবর হয়েছে।

ঘনান্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। প্রবল ধারায় জল নামল এইবার। বন্ধ দরজা-জানলা কলকাতা শহরের রাস্তায় অসহায় আলোগুলো জলে ভিজতে লাগল। ঝড়-জল মাথায় করে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাস ছুটছে।

ঘুমন্ত নগর-সীমান্তে সদাজাগ্রত দমদম। আকাশে উজ্জ্বল সতর্ক আলোর চোখ মেলে আহ্বান করছে আকাশচারী আগন্তুকদের। আসছে যাচ্ছে সমুদ্র-পর্বত দেশ-দেশান্তর পার হয়ে—দিন-রাত্রির মধ্যে তার আর বিরাম নেই। পৃথিবীটা এখানে অতি-সঙ্কীর্ণ—আমেরিকা আর ইংলণ্ড নিতান্তই এপাড়-ওপাড়া। দেয়ালে নানা দেশের পোস্টার হাতছানি দিয়ে ডাকে। লাউড-স্পীকার যখন তখন হাঁক দিচ্ছে, কায়রোয় যাত্রীরা উঠুন এবার···চলে আসুন সিঙ্গাপুর···

দীর্ঘকায় শীর্ণদেহ এক বৃদ্ধ এলেন—কণ্ঠে মালার বোঝা, পিছনে অগণ্য লোক। ইনিও যাবেন আমাদের সঙ্গে? খালি পা, গান্ধিটুপি মাথায়—তুষারশুভ্র খদ্দরের ধুতি-কোর্তা পরনে। পিকিনের বিষম শীত—এই সজ্জায় সেখানে টিকবেন ইনি কেমন করে?

এঁর সঙ্গে চলেছেন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক গুজরাটের উমাশঙ্কর যোশি এবং অধ্যাপক যশোবন্ত প্রাণশঙ্কর শুকলা (গুজরাট বিদ্যাসভা)। পরে একদিন তাঁদের কাছে সবিস্তারে শুনেছিলাম সত্তর বছরের এই বুড়োমানুষটির কথা। রবিশঙ্কর ব্যাস—গুজরাটের আবালবৃদ্ধ সকলের কাছে মহারাজ নামে খ্যাত। গান্ধিজি তাঁকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করতেন—তিনিও গান্ধিজির পরম অনুরাগী। জন-উন্নয়ন বিশেষ করে হরিজন-সম্পর্কীয় কাজে নিবেদিতপ্রাণ। বল্লভভাই প্যাটেলের নামে ইস্কুল করেছেন।

মহারাজ শান্তি-সম্মেলনে যাচ্ছেন। পথের মধ্যেও লোকে কথা শুনতে চেয়েছে, তাই স্টেশনে স্টেশনে বক্তৃতা করে এসেছেন—কেন অতদূর পিকিনের শান্তি-সম্মেলনে যাচ্ছেন এই বয়সে। নিখিল পৃথিবীতে কখনো আর সংগ্রাম হবে না—এই চেষ্টা হোক আজ সকল দেশে সব মানুষের। গান্ধিজিরও এই বাণী। কলকাতা শহরেও গোটা দশেক সভায় বলতে হয়েছে মহারাজকে। সেকালের রাজা-মহারাজেরই সম্মান পাচ্ছেন, দেখতে পেলাম। কাস্টমসের

জাড়গড়ার মধ্যে ঢুকেছেন, তখনো হাত দিচ্ছে ওদিক থেকে।

রাত্রির অন্ধকারে অবিরল বৃষ্টিজলের মধ্যে প্লেন সগর্জনে আকাশে উড়ল। অতিকায় ক্লিপার বিমান,—মেঘ ভেদ করে উঁচুতে, অনেক উঁচুতে চাঁদ-তারার এলাকায় ঢুঁ মেরে এরা ওড়ে। সাধারণ আর দশটা প্লেনের মতো মানুষের দৃষ্টি-সামানার মধ্যে উড়ে বেড়ানো অপমানজনক এই-জাতীয় প্লেনের কাছে। ঝড়-জল দেখলে সেই স্তর ছাড়িয়ে আরও উপরে গিয়ে ওঠে, সেখানে গোলমাল বুঝলে নেমে এলো হয় তা বা খানিকটা। আপদ-বিপদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে জঠর-অভ্যন্তরে মানুষ ও মালপত্র নিয়ে মহাব্যোমে দিনরাত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

তারা দেখা যায় কাচ দিয়ে—তারারা মিটিমিটি তাকিয়ে দেখছে। চোখ বুঁজে এল। হোস্টেস এসে চেয়ার নামিয়ে গায়ের উপর কম্বল ঢাকা দিয়ে গেল। চোখে না লাগে সেজন্য পাশের আলো নেবানো। মাঝখানের কয়েকটা আলো ক্ষীণ ভাবে জ্বলছে শুধু। ধরণীর অনেক ঊর্ধ্বে কত জনপদ অরণ্য পর্বত লঙ্ঘন করে রাত্রির শেষযামে গর্জন করতে করতে প্লেন ছুটছে।

ঘুম ভাঙল এক সময়। অলস চক্ষু মেলে পাশের কাচ দিয়ে তাকালাম। তখন উপলব্ধি হল, ঘরবাড়ি নয়—আকাশের উপরে শুয়ে শুয়ে চলছি। খাড়া হয়ে বসলাম, চেয়ারটা দিলাম খাড়া করে। জানলা দিয়ে ভালো করে তাকাচ্ছি। ফর্সা হয়ে গেছে—সোনার রোদে ঝলমল করছে আকাশ। হাত-ঘড়িতে ছ'টা। উঃ, কত উঁচুতে এখন। মেঘপুঞ্জের উপর দিয়ে উড়ছি। ঘুমুচ্ছে পরম শান্ত মেঘদল আরাম করে রোদে পিঠ দিয়ে। ছোট্ট খাতাখানায় লিখে রাখছি। তুলি দিয়ে এঁকে রাখবার মতো ছবিটা। সে হয়তো হোসেন সাহেব (বম্বের শিল্পী মকবুল হোসেন) কচ্ছেন, আমার শক্তি নেই।

প্লেন নিচুতে নামছে। ভুবনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত ছুটছিলাম এতক্ষণ—ক্রমশ নদী আর খালের রেখা প্রকট হতে লাগল। হাল্কা ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ—যেন পেঁজা-তুলো বিছিয়ে দিয়েছে আকাশ জুড়ে।

ব্যাঙ্ককে নামছি এবার। মাটি আরও স্পষ্ট হচ্ছে। সুদীর্ঘ সরলরেখার মতো সংখ্যাতীত খাল—দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি বিস্তারিত। কয়েকটি মাত্র আঁকাবাঁকা—সেইগুলো স্বাভাবিক নদী, মাটি কেটে বানানো নয়। পুরোপুরি জ্যামিতির দেশ। চতুর্ভুজ ত্রিভুজ—সমস্ত ভূমিতল যেন টানা-টানা রেখায় ভাগ করা। আমাদের গ্রাম্য ইস্কুলের কাঁদনমাস্টার মশায় ব্লাকবোর্ডের উপর দাগ কেটে জ্যামিতি শেখাতেন—উপর থেকে সারা দেশটা তেমনি ছক-কাটা দেখায়।

অনেকেই জানলায় ঝুঁকে থাইল্যাণ্ড দেখছেন। 'শ্যাম' নামে জেনে এসেছি এ দেশকে এতকাল—চারিদিকে সুশ্যামল রূপ—ঐ নামই আপনি মুখে এসে যায়। অজস্র ধানক্ষেত—শেষ নেই, সীমা নেই। মাঝে মাঝে বড়পেসি গাছপালা—সুশোভন, শ্রেণীবদ্ধ। কাত হয়েছে প্লেন—কোমরে বেল্ট-বাঁধা, পড়ে যাবার ভয় নেই। নদী-নালা পথ-ঘাট ঘর উঠোন—সমস্ত পৃথিবীটাই যেন কাত হয়ে পড়েছে এক দিকে। আরও নিচুতে নামছে প্লেন—খেলাঘরের মতো ছগ.গত ঘর-বাড়ি। না, আর লেখা চলবে না—ভূমিলগ্ন হল এবার···

দেখ কাণ্ড! ব্যাঙ্কক-এরোড্রোমের ঘড়িতে সাড়ে আটটা বেজে রয়েছে। ঘড়িতে দম দেওয়া আমারও অভ্যাস নয়, প্রায়ই বন্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু সে হল একলা একটি মানুষের ব্যাপার। এত লোকের আসা-যাওয়া এখানে—ছি-ছি, এইটুকু হুঁশজ্ঞান নেই! আমাকে হার মানিয়ে দিয়েছে এরা!

না হে, ঠিকই আছে। সূর্যের পথ বেয়ে পুবের দিকে উজান চলেছি আমরা। আমার ভারতে সাতটা এখন—এ রাজ্যে সাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সূর্য পশ্চিমে ছুটেছে দেড় ঘণ্টা আগে। চলেছি আমরা যে-সব ঘণ্টা-মুহূর্ত অতীত হয়ে গেছে সেই অঞ্চলে। এমনি করে যদি যেতে থাকি! যেতে যেতে—ক্রমাগত গিয়ে—পৌঁছব কি জীবনের অতীত দিনগুলোয়, কৈশোর ও বাল্যের পরম বিস্মৃতির মধ্যে যে মণি-মাণিক্যগুলো ফেলে এসেছি বহুবর্ষ আগে?

আজ সকালে অনেক মজুর কাজ করছে, খোঁড়াখুঁড়ি চলছে চতুর্দিকে। ভাল রাস্তা হবে, নতুন আরও ঘর উঠবে—তারই আয়োজন। আমার গ্রামের বিলে রৌদ্র-বৃষ্টির মধ্যে চাষীরা যেমন টোকা মাথায় কাজ করে, এখানকার মজুরদের মাথায় অবিকল সেই বস্তু। ব্যাঙ্ককে নেমে ফোটো তুলবেন না কেউ খবরদার—প্লেনের ভিতর থেকেই বলে দিয়েছে। সত্যিই তো—কার কি মতলব বলা যায় না। আর আমরা হলাম এক নম্বর দাগি আসামি—নতুন-চীনে চলেছি, কম্যুনিস্টরা সেখানকার কর্তা। বললে কি হবে যে আমি লেখক মাত্র—রাজনীতিক নই। গল্প উপন্যাসে ভেবে-চিন্তে মিথ্যে কথা লেখার অভ্যাস আছে বটে, কিন্তু বেপরোয়া মিথ্যা বলতে বুকে কাঁপে। তাই রাজনীতি ধাতে সইল না; রাজ্যপাট জুটল না, কলম পিশে খেতে হচ্ছে।

দেয়াল ঠেস দিয়ে দিগ্‌ব্যাপ্ত মাঠের দিকে তাকিয়ে আছি, আর লিখছি একটু আধটু। টিনের ঘর দূরে দূরে। এত গরম যে ঘাম ফুটেছে গায়ে। প্লেনের ভিতরে নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া—সেখানে কষ্ট হয় না।

ছবি মনে আসছে, নেতাজি যেদিন নামলেন এখানে। হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে এসেছিল বাইরের ঐ জায়গায়। আমরা ঘূণাক্ষরে জানতে

পারিনি যে অনতিদূরে এত উৎসব সমারোহ; আমাদের মুক্তির জন্য দেশি ফৌজ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলটা জুড়ে কুচ কাওয়াজ করে বেড়াচ্ছে। চার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এই বিমুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে গৌরবময় সেই অতীত ছবিটা মনে আনবার চেষ্টা করি।

কাঁমট করে তাকাচ্ছে এরোড্রোমের এক অফিসার। পেন্সিলে যৎসামান্য দু-গা বুলাচ্ছি—সেই জন্যেই নাকি? না ও হতে পারে, মনের মিথ্যা সন্দেহ হয়তো! থাক গে, কাজ নেই এখন আর লিখে। এই রৌদ্রালোকিত দ্বীপময় মহা-ভারতের ছবি মনের পরতে আঁকা রইল— আর কী প্রয়োজন?

বিশ্রামাদির পর প্লেনের খোপে ঢুকে পড়েছি আবার। নতুন যাত্রীও উঠল এখান থেকে, কয়েকটি মেয়ে পুরুষ বিদায় দিতে এসেছে। রুমাল নাড়ছে তারা বেড়ার ওপারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। একটা মেয়ে বড় সুন্দরী—বারম্বার চোখে রুমাল দিচ্ছে, কান্নায়-ভেজা করুণ চোখের দৃষ্টি। আমরাও সেই অভি-নন্দন গ্রহণ করলাম নিজেদের মনে করে, কাচের এধারে তাদের উদ্দেশে রুমাল নাড়ছে আমাদের কেউ কেউ। প্লেন আবার আকাশে উঠে গেল।

অনেক বেলা—কিন্তু হাতঘড়িতে মাত্র সাতটা-পঞ্চাশ। ঘড়ি মেলাবো না এখন। আরও দূরে যাচ্ছি— হংকঙে সাড়ে-তিন ঘন্টার তফাত ভারতের সঙ্গে। সেইখানে একেবারে কাঁটা ঘুরাবো।

সিটের লাগোয়া একটুখানি টেবিল তৈরি করে নেবার ব্যবস্থা আছে। তার উপরে খাতা রেখে লিখে যাচ্ছি। পাশে পট্টনায়ক ওড়িশার লোক – তিনিও লেখক। ওপারে মবলঙ্কর—তার ব্যাগের উপর 'পার্লামেন্টের মাননীয় স্পিকার' পরিচয় দেখে চমকে গিয়েছিলাম। পরে টের পেলাম, স্পিকারের ছেলে তিনি। বাপের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। মবলঙ্কর বারম্বার তাকাচ্ছেন আমার দিকে। অর্থাৎ, আকাশে উঠেও লেখা ছাড়ে না—কেমনতরো কলমবাজ হে? তাই বটে! দীনেশ সেন মশায়কে শ্মশানে নিয়ে দেখা গিয়েছিল, তর্জনী ও বুড়োআঙুলে কালির দাগ। দুটো দিন আগেও তিনি লিখেছিলেন। তাঁর নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের তুলনা করতে চাইনে। মবলঙ্করকে বললাম, সাদা কাগজে বিস্তর কালি মাখিয়েছি—মরবার কালেও কিছু তার কলঙ্কচিহ্ন নিয়ে যাবো, এইমাত্র কামনা।

মেঘ ভেদ করে ছুটেছি। বেলা দশটা তখন আমার ঘড়িতে। কত জনপদ কত পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে সমুদ্রের উপর এলাম। সুনীল প্রশান্ত মহাসাগর—এতটুকু বীচি-বিক্ষোভ নেই। অন্তত উপর থেকে দেখতে পাচ্ছিনে। পরে একদিন পিকিন-হোটেল খেতে খেতে আমাদের সহযাত্রী এক মহিলা এই সময়

কার কথা বলেছিলেন, মা গো ! সমুদ্রের উপর দিয়ে যখন প্লেন যাচ্ছে, আমি তো ভয়ে কাঁটা ! এখানে যদি পড়ে, তবে আর ফিরে যেতে হবে না। আমি জবাব দিয়েছিলাম, তা ঠিক। ডাঙায় যদি প্লেন ভেঙে পড়ে, বেরিয়ে এসে কোন এক বাড়ি অতিথি হওয়া যেতো——কী বলেন ?

ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। মহাব্যোমে ভাসতে ভাসতে আরাম করে পরম পরিতৃপ্তিতে খাচ্ছি। ভারি একটা অদ্ভুত কথা মনে আসে—কী মজা, ক্ষুধায় বিবর্ণ বিক্ষুব্ধ ধরিত্রী হাত বাড়িয়ে নাগাল পাবে না আমাদের। কিংবা বাজপাখির মতো পৃথিবী থেকে আরাম-আনন্দ ছোঁ মেরে নিয়ে নানান দেশের কয়েকটি বিচিত্র মানুষ শূন্যলোকে সংসার রচনা করেছি। অদূরে একজোড়া মোটা সাহেব মেম। মেমটিকে প্রথম দর্শনে লাবণ্য ও যৌবনবতী মনে হয়েছিল। তখন বেলা আটটা। এখন সাড়ে-দশটায় কপালে বলিচিহ্ন প্রকট হয়েছে, রূপ-যৌবন ঝরে পড়ে গেছে। বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি একবার লাউঞ্জে গিয়ে ঘুরে এলো। একেবারে প্রস্ফুটযৌবনা—আগের চেয়েও চমকদার। ওদের লাবণ্য ভ্যানিটি ব্যাগে কৌটো ভরতি প্রচ্ছন্ন থাকে। সাহেব আর মেম দু'জনেই. দেখছি, বাঁ হাতে কারুকর্ম করে। রাগ্যেটিক আর কি। রাঙানো নখ মেম সাহেবের—আবার উখো জাতীয় এক বস্তুতে সাহেবের নখ ঘসে ঘসে সাফ করে দিচ্ছে। আর কী কাজ এখন ওদের ?

পাইলটের ঘর থেকে বার্তা এলো। প্লেন গতি বদলাবে এবার—চলছিল পূব দক্ষিণে, এবার থেকে পূব উত্তরে। নিচে তাকিয়ে দেখ প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ। একটু নিচু দিয়েই চলেছে, যাতে সকলে দেখতে পায়। ঝুঁকে পড়েছিল সকলে জানলা দিয়ে। সমুদ্র-জলের উপর বুঝি অজস্র মুক্তা ছড়িয়ে রেখেছে, রৌদ্র-লোকে ঝিকমিক করছে। ঠিক নামই দিয়েছে মুক্তা-দ্বীপপুঞ্জ।

চীন আর ভারত নিতান্ত পাড়াপড়শি। এবাড়ি ওবাড়ির মাঝখানে একটু খানি পাঁচিল—হিমালয় পর্বত। প্রাচীনেরা সমুদ্র দিয়ে যেতেন, আবার ঐ পাঁচিল গলেও যাতায়াত করতেন। বৌদ্ধ শ্রমণরা এবং হুয়েন সাং, ফা-হিয়ান প্রভৃতির নখদর্পণে ছিল ঐ সোজা পথ। পশ্চিমি অক্টোপাসরা তারপর ভারত, চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া শক্ত পাকে বেঁধে ফেলল—সোজা পথ একেবারে অগম্য হয়ে উঠল তখন থেকে। আর বন্ধ হল চিরকালের সহজ মেলা-মেশা। পাছে এরা সব একজোট হয়ে যায়, এই ভয়ে হয়তো। যুদ্ধের সময়টা সংক্ষিপ্ত পথ বেরিয়েছিল, আকাশ-পথে প্রায় ছ-ঘণ্টায় কলকাতা থেকে চীন পৌঁছানো যেত। রাস্তাও তৈরি হয়েছিল আসাম ও বর্মা হয়ে চীন অবধি। সে সব বাতিল; এখন ব্রিটিশ-এলাকা হংকং ঘুরে চীন যেতে হয়। যাওয়া

উচিত সোজাসুজি উত্তর মুখো—কিন্তু আমরা যাই দক্ষিণ পূবে, তারপর উত্তর-পূবে এবং হংকং পৌঁছে পশ্চিমমুখো সেখান থেকে। অর্থাৎ নাক দেখানো হচ্ছে কান ও মাথাটা বেড় দিয়ে।

হংকঙের কাছাকাছি একটু বিপদ। চারিদিক ঘনান্ধকার। দিন-দুপুরে অকস্মাৎ দুপুর-রাত্রি নেমেছে। প্লেন উঠছে, নামছে। ঝড়-বাদলের সঙ্গে লড়াই চলছে ভিতর থেকে বুঝতে পারছি। গোত্তা মারছে ঝড়ের উপর, ঘূর্ণি গর্তের মধ্যে পড়ে হুড় হুড় করে নেমে যাচ্ছে এক-একবার। যাত্রীদের মুখ শুকনো নামতে নামতে মাটিতে পড়ে যাব নাকি এমনি ভাবে? মাটিই বা কোথায়, সমুদ্র-জল। অনেক নিচুতে নেমে এসেছে এবার। সমুদ্রের প্রান্তসীমা দেখা দিয়েছে। পাহাড়—ধাপে ধাপে অগণ্য ঘর-বাড়ি, আকাশ ছুঁয়ে বড় বড় প্রাসাদ সমুদ্রের খাড়িতে সংখ্যাতীত নৌকো-জাহাজ, এপারে ওপারে বিচিত্র জনপদ। হংকঙে এসে গেছি তবে। ঐ তো বিমানঘাঁটি। মানুষজন সুস্পষ্ট দেখছি, চলাফেরা করছে। শহরের উপরে চক্রাকারে ঘুরছি আমরা—মৃত্যুর পর নিরালম্ব প্রেতদলের মতো। প্লেন আবার উঁচুতে উঠে দূরে চলে গেল। আধ ঘণ্টারও বেশ এমনি লক্ষ্যহীন ঘুরে ঘুরে ফাঁক বুঝে এক সময় নেমে পড়ল। ঠিক হংকং নয়, হংকঙের উল্টো পারে—কাই-তেক বিমানঘাঁটি। ঘড়িতে একটা। সাড়ে-তিন ঘণ্টা এগিয়ে সাড়ে-চার করে দিলাম।

কাস্টমসের ঝাড়গড়া পার হয়ে বেরুচ্ছি—

আসুন। ভারত থেকে আসছেন আপনারা? ক'জন আজকে? উঠে পড়ুন ঐ বাসে। প্যান-আমেরিকান এয়ার-টারমিন্যাল নিয়ে যাবে। আমরা থাকব সেখানে। পথে অসুবিধা হয়নি তো? আচ্ছা—হোটেলে গিয়ে কথাবার্তা হবে। কয়েকটি চীনা যুবক। ইংরেজি ভাষায় তাঁরা আপ্যায়ন করলেন। সিংহুয়া সংবাদ প্রতিষ্ঠানের লোক—হংকঙে অভ্যর্থনার ভার এদের উপর।

(২)

ছোট্ট দ্বীপ হংকং। দ্বীপের আসল নাম ভিক্টোরিয়া। চীনের মূল ভূখণ্ড আর দ্বীপের ব্যবধান অতি সামান্য। মাইলখানেক হবে বড় জোর। এপারে জায়গাটার আসল নাম কৌলুন। এখানেই আছি আমরা—কৌলুন হোটেলে। এই কৌলুন—এবং চীনের মূল ভূমির আরও মাইল তিরেক ব্রিটিশের দখলে। অবাধ বন্দর হংকং—আমদানি জিনিসপত্রের ট্যাক্স লাগে না, তাই অকল্পিত রূপ সস্তা। কিন্তু নতুন কারো পক্ষে সুবিধা নেওয়া শক্ত। দোকানদারদের চক্ষুলজ্জার বালাই নেই—ডবল কি তারও বেশি দর তো হেঁকে বসল, তার পর কত কমাবে কমাও। এক নজর দেখেই তারা খদ্দেরের ধরন বুঝতে পারে।

গায়ক ক্ষিতীশ বসু ছিলেন আমাদের দলে—তিনি এক ঘড়ি কিনলেন। ঘড়ির গায়ে দর সাঁটা আছে পঁয়ষট্টি ডলার—সম্ভ্রান্ত দোকান, সিকি পয়সাও নাকি ওর থেকে কম হবার জো নেই। সেই ঘড়ি শেষ অবধি রফা-নিষ্পত্তি হল এক-ত্রিশ ডলারে। সকলেই জিনিসপত্র কিনেছি দরাদরি করে—তবু শেষ পর্যন্ত খুঁতখুঁতানি থেকে যায়, আরও হয়তো কমে পাওয়া যেত।

এই আন্তর্জাতিক বন্দরে হাজার রকম মানুষের আনাগোনা। যেখানে সেখানে বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে—পকেটমার সাবধান! খেয়া স্টিমারে পার হব, ভাড়া কত জিজ্ঞাসা করছি— কাউন্টারের ভদ্রলোক বললেন, ব্যাগ সামাল করুন আগে। কৌলুন হোটেলের ম্যানেজার দম্ভোক্তি করলেন, মনিব্যাগটা অমন আলগাভাবে রেখে খানিকক্ষণ ঘুরে আসুন তো রাস্তায়—তার পরেও ব্যাগ যদি আপনার থাকে, তবে বলব বিষম বাহাদুর।

শুধু কি ওঁরাই, দেশ-বিদেশের যত বেপরোয়া আর স্ফূর্তিবাজেরা এসে জোটে। আগে সাংহাইও ছিল এমনি—নতুন চীন ঝেঁটিয়ে পরিচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাই ময়লা আরো বেশি জমেছে এখানে। ভাল লোক যে নেই, তা বলিনে; কিন্তু পাপচক্ষে দেখতে পেলাম না। হৈ-হুল্লোড় চলছে অহোরাত্রি। মদ ভারি সস্তা, এবং মালেও অতি চমৎকার—এমনটি নাকি ত্রিভুবনে আর নেই। আমি নিতান্তই 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস'—তাই হলপ করে কিছু বলতে পারব না। তবে রসিক জনের মুখে শ্রবণ করেছি। আর পণ্যমেয়েদের ভিড়ে দিনমানেই পথে চলা দায়। এটা স্বচক্ষে দেখা।

যাবার সময় একটা রাত্রি মাত্র, কিন্তু ফিরতি মুখে পাঁচ-পাঁচটা দিন এখানে কাটাতে হয়েছিল কলকাতার প্লেন না পাওয়ায়। সেই সময় আসল মূর্তি দেখেছি। পালাই-পালাই ডাক ছেড়েছিলাম। অথচ চীন ঘুরতে দিন চল্লিশেক কাটিয়ে এসেছি—বলুক না ওরা, আরও দিন থাকতে রাজি আছি। হংকঙের ব্যাপার আগেভাগে তাড়াতাড়ি সেরে নিচ্ছি। চীনের প্রোজ্জ্বল কাহিনী শেষ করে তখন এসব বলবার আর রুচি হবে না। আমেরিকান ডলার ভাঙিয়ে হাতে বিস্তর টাকা। সমস্ত নিঃশেষ খরচ করতে হবে, এই মহৎ সঙ্কল্প নিয়ে পথে বেরিয়েছি। আমি ক্ষিতীশ, শিল্পপতি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী নীলিমা দেবী এবং মাদ্রাজের সিনেমা-ডিরেক্টর কৃষ্ণস্বামী। ঘোরাঘুরিই সার, কিছুই কেনা যাচ্ছে না—দর শুনে আতকে উঠতে হয়।

বৈদ্যনাথ এমনি সময় আঙুল দেখালেন, ভারতীয় পতাকা উড়ছে। নির্ঘাৎ সেখানে ভারতের মানুষ থাকে। সওদার ব্যাপারে তাঁরা সাহায্য করবেন। তাই বটে! একটা ব্যাঙ্ক— ঢুকেই পারেখ মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হল।

অত্যন্ত ভদ্র ও সদাশয়। হংকঙের পথে-ঘাটে সহযাত্রী হয়ে আমাদের প্রচুর সহায়তা করেছেন। একটি বাঙালীও আছেন—শ্রীযুক্ত মিত্র। কিন্তু কী কারণে জানিনে, তাঁকে তেমন কাছাকাছি পাওয়া গেল না।

রূপসী হংকং। স্টার কোম্পানির খেয়া-স্টিমার অবিরত এপার-ওপার করছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দুটো ক্লাস—স্টিমারে ঢুকবার পথও দুটো। প্রথম পথে ঠিক উপরে পৌঁছে যাবেন, দ্বিতীয় পথে নিচের তলায়। ঢুকবার পথে ভাড়াটা দিয়ে যান জানলার খোপে, তার পর জাহাজে চেপে বসুন। বসবার আরাম-প্রদ ব্যবস্থা। কত লোক যে পারাপার হচ্ছে, তার সীমাসংখ্যা নেই। এ ছাড়া মোটর-লঞ্চ ও অন্যান্য খেয়ার ব্যবস্থা আছে এদিকে-সেদিকে। ইচ্ছে হলে মোটর-লঞ্চ নিয়ে যেকোন প্রমোদ-ভ্রমণ—ঘন্টা হিসাবে ভাড়া ঠিক করা আছে। পাহাড়ের উত্তুঙ্গ চূড়ায় অসংখ্য অট্টালিকা। ট্রাম আছে সেই চূড়া অবধি পৌঁছবার—মোটরের পথও আছে। ট্রামে যাওয়াটা ভারি মজার। পারের সঙ্গী আছেন—তাঁর কথামতো রাত্রিবেলা চলেছি। আলোকোজ্জ্বল এপার-ওপারের শহর ও সমুদ্র অপরূপ দেখাচ্ছে।

এই পিক-ট্রাম [Peak Tram] এক বিস্ময়কর শিল্পকীর্তি। জায়গায় জায়গায় রাস্তা একেবারে খাড়া উঠে গেছে—আমরা কাত হয়ে পড়েছি বেঞ্চিতে। পাতলা জামা গায়ে ছিল—পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে উপরে উঠে হি-হি করে শীতে কাঁপছি। কনকনে হাওয়া বইছে গিরি-চূড়ায়। কিছুক্ষণ ঘুরে-ফিরে দেখলাম। নেমে আবার উষ্ণলোকে এসে বাঁচি।

আর এক দ্রষ্টব্য স্থান টাইগার পার্ক। সেখানে বুদ্ধ-মন্দির আছে—টাইগার-প্যাগোডা নামে খ্যাত। প্রচুর বিত্তবশালী এক চীনা ব্যবসায়ীর কীর্তি, ভদ্রলোকের বাড়িও এই পার্কের মধ্যে। কাজ শেষ হয়নি, যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ চালাবেন এই তাঁর ইচ্ছা। প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে কাজ চলছে। শুনলাম, সিঙ্গাপুরে তাঁর বড় ব্যবসা—সেখানে অবিকল এই রকম আর একটা পার্ক তৈরি হয়েছে। বাঘ, ড্রাগন—এসব অতি পবিত্র চীন অঞ্চলে. বাঘের নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে সেই জন্যে। পাহাড়ের উপর পাথর কেটে তৈরি। দেব-দেবীর মূর্তি—ওঁদের পৌরাণিক দেব দেবীর সঙ্গে আমাদের দেবতাদের আশ্চর্য রকম মিল। দেয়ালে দেয়ালে অসংখ্য ছবি—আর বিস্তর সদুপদেশ। জুয়াখেলা, আফিং-চরস খাওয়া ও গণিকা-সঙ্গের দোষ দেখানো হয়েছে ছবির মধ্য দিয়ে। নতুন-চীনে এসব পথের পথিক কেউ নেই আজকাল. হংকং বলেই ছবি দেখানোর প্রয়োজন হয়েছে। পাপ করলে মৃত্যুর পর কি রকম নরকভোগ করতে হয়, নানা বীভৎস মূর্তির মাধ্যমে তা-ও আছে। বাংলা

দেশে পটুয়ারা পটের শেষ দিকে পাপের শাস্তি দেখায়—সেই ব্যাপার।

সওদা করতে গিয়ে এক চীনা দোকানদারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। পিকিন থেকে ফিরছি শুনে বলল, আচ্ছা, বলো কী দেখে এলে—

পাঁচ-দশ মিনিটে বলবার বস্তু নয়। তবু বললাম দু-এক কথা। হংকং আর আসল চীনে কতটুকুই বা দূরত্ব। অথচ কিছুই মেলে না—আকাশ আর পাতালের পার্থক্য। তোমরা যেন চীনের মানুষ নও, এ আর একটা দেশ। দোকানি বলল, বাছাই-করা কতগুলো জিনিস তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, আসল কিছুই জানো না। লোকের ভারি কষ্ট, সব-কিছু ওরা কেড়েকুড়ে নিচ্ছে। গলায় আঙুল ঘুরিয়ে কাটবার ভঙ্গিতে বলল, টাকা-পয়সা থাকলেই সাবাড় করে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে—

এসব নতুন নয়, দেশে থাকতেও এমন অনেক শুনেছি। উ-য়ুন-চু'র সঙ্গে একত্র বেড়ালাম, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া (সম্প্রতি মারা গিয়েছেন, কিছু দিন আগে যে চীনা সাংস্কৃতিক দল এসেছিলেন, তাঁদের কাছে শুনলাম। আহা, অতি মহাশয় লোক।) পাঁচটা ফ্যাক্টরির মালিক অথচ নতুন-চীনের বিশিষ্টদের একজন তিনি—অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য। এমন ধনী আরও অনেক আছেন। তবে বেপরোয়া মুনাফা লুঠবার উপায় নেই—এই যা। কিন্তু শুনছে কে? প্রোপাগাণ্ডার বিচিত্র মহিমা—অতি নিখুঁত তার কারুকর্ম। কান ও মন এমন বিষিয়ে দেয় যে এত কাছে থেকেও সত্যি খবর এরা শুনতে পায় না।

আবেগে একটা কথা না বলে পারিনে। ঐ যে মেয়েগুলো সেজেগুজে রং মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে—দিন নেই রাত নেই, শীত নেই, বর্ষা নেই, নানান দেশের বদমায়েশরা কয়েকটা ডলার ছুঁড়ে দিয়ে ছিনিমিনি খেলছে ওদের নিয়ে—ওরা তোমার নিজের জাত নয়, চোখের উপরে দেখছ তবু অপমান গায়ে বেঁধে না তোমাদের?

লোকটা জবাব দিল না, হিসাবপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমার মুখের দিকে আর তাকাবে না বুঝতে পারছি। কী-ই বা আছে জবাব দেবার!...

কোন জন্মে আমি কোট-প্যান্টলুন পরিনে, এবারে চীনের বন্ধুরা এক গরম স্যুট উপহার দিয়েছে। বাক্সবন্দি ছিল জিনিসটা। হংকঙে এসে দুদিন পরে সেটা পারলাম। পিকিনের অত শীত ধুতি-পাঞ্জাবী-আলোয়ানে কাটিয়ে দিয়েছি, আর হংকঙের প্রায়-গরম আবহাওয়ায় ঐ ভারি উষ্ণ সজ্জা গায়ে চাপিয়ে সাহেব সাজবার প্রয়োজন হল।

বুদ্ধিটা ক্ষিতীশের। মাল ওজন করতে গিয়েছিলাম এয়ার-অফিসে। চক্ষু

কপালে উঠল। ত্রিশ কিলোগ্রাম বেখরচায় নিয়ে যেতে পারব। সেটা বাদ দিয়েও এত ওজন উঠেছে যে অতিরিক্ত শ' দুয়েক টাকা মালের ভাড়া দিতে হবে। অনেক জিনিস উপহার পেয়েছি, আরও অনেক কিনেছি ওঁদের উপহারের টাকায়। সাতটা বইয়ের প্যাকেট তবু ডাকযোগে পাঠিয়ে এসেছি পিকিন থেকে।

কমাও—যে উপায়ে যত পারো ওজন কমিয়ে ফেল। ক্ষিতীশ বলল, ধুতি পাঞ্জাবির কি-ই বা ওজন—ওই স্যুটে সজ্জিত হয়ে কাঁধে ওভারকোট চাপিয়ে প্লেনে উঠবেন, তাতে বিস্তর ওজন কমে যাবে।

চমৎকার যুক্তি। কিন্তু স্যুট পরা আগে ভাগে একটু রপ্ত করে নেবার দরকার। নতুন চীনের সার্বজনীন পোশাক এই রকম—কাটছাঁট অবিকল তাই। আমিই বলে চলেম, দেবে তো দাও তোমাদেরই মতন। পোশাক পরে তোমাদের এই বিপুল উদ্দীপনায় ছোঁয়াচ যদি লাগে মনে।

সাজসজ্জা সমাপন করে বেরুনো গেল। হোটেলের লোকজন কেমন কেমন চোখে আমার দিকে তাকায়। রাস্তায় পড়েছি, সেখানেও তাই। ভালই তো, পোশাকের দৌলতেই না হয় হংকং শহরে একটু অসাধারণ হওয়া গেল!

ব্যাপার কিন্তু আরো কিঞ্চিৎ ঘোরালো। এয়ার টার্মিনালে প্লেনের খবরাখবর নিতে গিয়েছি। জাতে ইংরেজ কি ইয়াঙ্কি জানিনে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, মাও-সে তুঙের তুমি খুব বন্ধু বুঝি?

বিরক্ত হয়ে বললাম, নিশ্চয়। নতুন-চীন যে দেখবে, সেই তাঁর বন্ধু হয়ে যাবে।

সে কিছু বলল না আর, নিজের মনে কাজ করতে লাগল। এক চীনা কর্মচারী এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত দিল। আর একজনকে কী বলছে আমার অবোধ্য ভাষায়। অবস্থাটা অপমানজনক মনে হল। কাঁধ থেকে সজোরে লোকটার হাত ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, কী বলতে চাও তুমি!

গটমট করে বেরিয়ে এলাম।

প্যাং টাক-সেং সিংহলী সাংবাদিক দলের নেতৃস্থানীয়—হংকঙে ওদেরই তত্ত্বাবধানে আছি। তাকে ঘটনাটা বললাম। প্যাং গম্ভীর হল। বলে, ও পোশাক খুলে রাখো—প্লেনে উঠবার সময় পোরো। তার আগে দরকার নেই। চারিদিকে কত শত্রু ঘুরছে, কত দেশের গুপ্তচর! বেশি প্রকট হয়ে কাজ নেই এ জায়গায়।

স্তব্ধ হয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর ধীরে ধীরে বলে, হংকং আমাদের নয়। দেখ না, আমরাই কিরকম অতিথি-জনের মতো রয়েছি।

ভৌগোলিক হিসেবে এক বটে, হংকং তবু চীন নয়। আমাদের যেমন পাণ্ডিচেরি বা গোয়া—উঁহু, এর চেয়ে নিঃসম্পর্কিত। ১৯৫০ অব্দে বিরাট ষড়যন্ত্র হয়েছিল নতুন চীনের নায়কদের মেরে ফেলবার জন্য। তার উদ্ভব, শুনতে পেলাম, এই জায়গাতেই। কোন্ মানুষ কী মতলবে ঘুরছে, কে বলবে? কোরিয়ায় লড়াইয়ে চীনের ভলান্টিয়ারদের উপর বোমা মেরে সৈন্যরা এইখানে হাত পা মেলে বিশ্রাম নেয়। তার জন্য, আরামপ্রদ ঘরবাড়ি ও নানাবিধ ব্যবস্থা রয়েছে। কত মতবাদের খবরের কাগজ, খবরের যোগানদারই বা কত বিচিত্র ধরনের। হংকঙেই এক কাগজে বেরিয়েছিল, পিকিনের শান্তি সম্মেলনটা কম্যুনিস্টদের একটা হৈ চৈ মাত্র। মাওসেতুঙ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। খবর তৈরি করতে জানে বটে! চিরজন্ম তো গল্প উপন্যাস লিখে গেলাম—কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করি, এতদূর কল্পনার দৌড় আমাদের নেই।

হংকং চীন নয়—নতুন চীনে পা ছোঁয়াবার আগেই টের পেয়েছিলাম। হোটেলে সেই একটি রাত কাটিয়ে গিয়েছিলাম—তখন ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল, পট্টনায়ক পাশের শয্যায় বিভোর হয়ে ঘুমচ্ছেন। চারতলার বারান্দার অনেক নীচে পিচ-ঢালা ঝকঝকে রাস্তা। সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম অনেকক্ষণ। ওপারে পাহাড়ের উপরে লাল নীল সাদা আলোর বিচিত্র মালা পরে হংকং শহর রূপের বিভায় বিত্ত আর আনন্দ পিয়াসী দূর দূরান্তরের মানুষজনকে হাতছানি দিয়ে প্রলুব্ধ করছে।

মোটরের সুতীব্র হেডলাইট জ্বলে উঠল হঠাৎ। সেই আলোয় দেখলাম, বৃষ্টিস্নাত রাস্তার উপর সৈন্য আর মেয়ে কতকগুলো। আর রিকশা ছুটোছুটি করছে শিকার ধরবার আশায়। রিক্সওয়ালারা জাতে চীনা, কালো হাফ প্যান্ট-পরা—আলোয় ঝকমক করছে তাদের ফরসা গায়ের রং। অন্তরাত্মা অবধি কেঁপে ওঠে। নিশিরাত্রে মনে হল, শহর নয়, ভয়াল অরণ্য, ডোরা-কাটা বাঘের দল রক্ত ক্ষুধায় ক্ষেপে উঠেছে। দরিদ্র সর্বরিক্ত হতভাগা মেয়েরা, আর লালসাতুর্বল কাপুরুষ যুবার দল। অবিরল বৃষ্টিধারার মধ্যে উচ্ছল নরনারীর উৎকট হাস্যধ্বনিতে আকাশব্যাপ্ত হাহাকার উঠছে যেন। প্রশান্ত মহাসমুদ্রতীরে আলো ঝলমল রূপসী হংকং নগরীর নিঃশব্দ নিশীথ ক্রন্দন।

(৩)

সমুদ্রের পাড়ি। পারঘাটার এ-ধারে রেলস্টেশন। জলের একেবারে উপরে স্টেশনটা। সকালে ৭ ২০ মিনিটে ট্রেন ছাড়ল।

খাড়ির কিনারা ধরে গাড়ী চলেছে। ডানদিকে জল, বাঁদিকে শহর। শহর শেষ হয় বস্তি অঞ্চল। জলাশয় ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে। দুই পাহাড়ের

মাঝখানে এসে পড়েছি। পাহাড়, পাহাড়—দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে আছে রক্তাভ পাহাড়ের সারি। সহসা অবারিত হয়ে গেল ডান-হাতের দিকটা। বিস্তীর্ণ জলরাশি—জলের উপর নৌকা-স্টিমার। কী গাঢ় নীল জল! সীমাহীন প্রশান্ত মহাসাগর হাত বাড়িয়ে মহাচীনের এক মুঠো মাটি আঁকড়ে ধরেছে। তারই নাম হংকং।

না-সমুদ্র কার্তিক ঠাকুরটি—আজ্ঞে না, খাঁটি নাম কিছুতেই বলছি নে। বাপ-মা ঠাহর পান নি, ভাবীকালে ছেলের চেহারা এমন খুলবে। তাই অন্য একটা নাম রেখেছিলেন। কার্তিকই ভদ্রলোকের নাম হওয়া উচিত।

একদিককার বেঞ্চ থেকে কার্তিক ঘাড় লম্বা করে ঝুঁকে পড়ল।

কী লিখছেন?

খরচগুলো টুকে রাখছি—

খরচ আবার কি? হেঁ-হেঁ, ও বললে কী শুনি? আমি তবু ট্রাউসার কিনলাম আঠারো ডলারে। আপনি কৃপণের জাসু, খরচ করার ভয়ে বেরুলেন না মোটে। দেখেছেন আমার ট্রাউসার?

আমি একা নই এবং শুধুমাত্র ভারতীয়রা নয়। কার্তিকের ট্রাউসার অনেক জনকে দেখতে হয়েছে। এবং শুনতে হয়েছে দাঁও মেরে ঐ বস্তু আঠারো ডলারে কেনবার আদ্যন্ত ইতিহাস। সেই ব্যাপার আবার উঠে পড়ে বুঝি! ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে তাকালাম।

না, কার্তিকের মতি এখন অন্যদিকে। বলে, বই লিখছেন তা বুঝতে পেরেছি। আমার কথা লিখবেন কিন্তু।

ভোঁতা-বুদ্ধি এই মানুষগুলোর ভারি ঝোঁক, ফাঁকতালে নাম করে নেবার। নামের নেশায় কোন এক মওকায় হঠাৎ বীরত্বের কাণ্ড করে বসে। কিন্তু আপাতত হাত এড়ানোর দরকার। মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। বললাম, শ—মশায়ও এক ট্রাউসার কিনেছেন। বেশ ভালো জিনিস।

দেখেছেন আপনি, ভালো আমার চেয়ে?

তাই তো মনে হল—

ব্যস। মুহূর্তে উধাও। শ—ওদিকে, কামরার একেবারে শেষ প্রান্তে। অতএব নিশ্চিন্ত আপাতত।

পাহাড় আরো ঘনীভূত হয়েছে। টানেল পার হচ্ছি মাঝে মাঝে। একটা টানেল অত্যন্ত বড়। আলো জ্বলে উঠল কামরার মধ্যে। চলেছে তো চলেইছে—শেষ আর হতে চায় না টানেল।

স্টেশন—কী নাম? চীনা অক্ষর—ইংরেজিতেও লেখা আছে ওদিকে। সা

তি। একটা মেয়ে ঐ পাহাড়ের উপর পা ছড়িয়ে বসে রেলগাড়ি দেখছে। জেলে জাল ফেলছে খাড়ির জলে। পাল-তোলা কত নৌকো যাচ্ছে সারবন্দি —মেঘনার উপর দিয়ে এমনিধারা বহর দেখছি। কলাগাছ, ঝাউগাছ। নাম না-জানা রকমারি গাছের জঙ্গল কলকেফুলের মতো হলুদে হলদে ফুলে আলো হয়ে আছে। পাহাড়ের গা বেয়ে পিচ-ঢালা এক পথ উঠে গেছে কচ্ছপের সু-মসৃণ পিঠের মতো। খাড়ি চওড়া হচ্ছে ক্রমশ। বাঁদিকের উত্তুঙ্গ পাহাড় থেকে কলোচ্ছলিত ঝরনা এ-পাথর থেকে ও-পাথরে নাচতে নাচতে নেমে এসে আমাদের রেললাইনের নিচে গুড়ি মেরে খাড়ির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে—পাটনার দৈনিক 'নবরাষ্ট্রের' সম্পাদক দেবব্রত শাস্ত্রী। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল কংগ্রেসের কাজ করেছেন ; এখন আর কংগ্রেসে নেই। চমৎকার মানুষ, আমার সঙ্গে খাতির জমেছে কলকাতা থেকেই। একবার গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়ালাম।

শাস্ত্রী বলেন, স্বর্গ না পাতাল—কোথায় চলেছি বলুন তো?

জবাব দিলাম, মর্তেই নিঃসন্দেহ। জড়বাদীর দেশ বলে মাটি কিছু কঠিন হতে পারে।

সারা দেশ রক্তে ভেসেছে এই তো সেদিন অবধি—

মাটিতে দাগ আছে কি না, খুঁজে দেখতে হবে। এত দেশের এতগুলো কড়া চোখে নিশ্চয়ই এড়াতে পারবে না।

মনোভাব অনেকেরই এমনই। কৌতূহল, সন্দেহ—একটু-আধটু আতঙ্কও যে নেই, এমন কথা হলপ করে বলতে পারি নে। সবজান্তা হিতৈষীদের অভাব নেই, ঘরে বসেই এক এক দিক্‌পাল। যাত্রার মুখে তাঁরা মুষলধারে সদুপদেশ ছেড়েছেন।

সমাজতান্ত্রিক নতুন ব্যবস্থা—দেশজোড়া দেখবে শুধু এক বিরাট মেশিন, মানুষ-গুলো সেই মেশিনের ইসক্রুপ-নাট। ব্যক্তি-সত্তা বলে কিছু আর নেই। কথা-বার্তা সামাল হয়ে বোলো হে, দেখে বুঝে চলাফেরা কোরো। বেফাঁস কিছু ঘটিলে কচ করে মুণ্ডটা ধড় থেকে নামিয়ে নিতে বাধে না ওদের…

কত রকমের উদ্ভট ধারণা। শুধু প্রয়োজন ছাড়া আর কিছু নেই নাকি সেখানে। ফুলের মধ্যে হয়তো ফুলকপি—মানুষের যা ক্ষুধা-নিবৃত্তির কাজে লাগে। হাসি আনন্দহীন উৎকট বস্তু সর্বস্বতা। যাওয়া পণ্ডশ্রম ওসব দেশে। রীতিমতো ওজনদার পর্দায় ঘেরা চতুর্দিক। সে পর্দার যেটুকু ওরা প্রয়োজন মাফিক তুলে ধরবে, ঝাপসা ঝাপসা আলোয় তাই দেখে এসো। আর শুনে এসো দম দেওয়া পুতুলের মতো কলের মানুষগুলোর মুখে কয়েকটি শেখানো

কথা। এই মাত্র, এর বেশি নয়।

সে যাই হোক, আর যে লেখা চলে না। প্লেন নয়, রেলগাড়ি। জোরে ছুটেছে। যে চীনে চলেছি, হাতের বাংলা অক্ষর এখন থেকেই তার লিপির প্রতিরূপ নিতে শুরু করেছে। লেখা অবশ্য চালিয়ে যেতে পারি, কিন্তু পড়ে দেখে কে?...

পাহাড় জমে আসছে, খাড়ির ওপারেও পাহাড়। ক্রমশ পাহাড়-ঘেরা হ্রদ হয়ে দাঁড়াল ঐ খাড়ি। পাহাড়ের ছায়া পড়ে মসীকৃষ্ণ দেখাচ্ছে জলের রং। জলের নীচে থেকেও ছোট ছোট পাহাড় মাথা উঁচু করছে। পাহাড়ের গায়ে একেবারে হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে এক নিশ্চল ষ্টিমার—চিমনি দিয়ে মৃদু ধোঁয়া উড়ছে ঘুমন্ত জনের শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো।

তারপর কখন এক সময়ে হ্রদ থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়েছি, জল আর কোন দিকে নেই। সমতল জনপদ, একটা ছুটো পাহাড় কদাচিৎ। স্টেশন, হাট বাজার ইস্কুল-মাঠ সাঁ-সাঁ করে পার হয়ে যাচ্ছি। সীমান্তে এসে গাড়ির গতি স্তব্ধ হল। আর এগোবার এক্তিয়ার নেই।

লাউ-হু—স্টেশনের নাম। ব্রিটিশ-প্রভুত্বের শেষ। মহাচীনের প্রান্তভাগে কীটদষ্ট কয়েকটা টুকরো এমনি রয়ে গেছে এখনো। অনেক দিন ধরে বিস্তর আরাম করেছে, যাই যাই করে হাই তুলছে।

ছোট্ট খাল। খালের উপর পুল। খাল-পারে অনেক দূর অবধি কাঁটাতারে ঘেরা। নতুন-চীনের আরম্ভ পুলের ও-পার থেকে।

রোদ প্রখর। মালপত্র নামিয়ে স্তূপাকার করে রেখেছে। তারই মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে যে যার জিনিস দেখে নিতে ব্যস্ত। শুধু চোখের দেখা দেখলেই হল যে ঠিকমতো সমস্ত এসে পৌঁছেছে। আর কোন হাঙ্গামা নেই। এখান থেকে বয়ে নিয়ে ও-পারের গাড়িতে তোলা এবং ক্যান্টনে পৌঁছে দেওয়ার যাবতীয় দায়ঝক্কি ওদের। সর্বদা হাতের কাছে প্রয়োজন, গাড়ির গাদার মধ্যে দিলে চলবে না, সেই ক'টি জিনিস শুধু হাতে করে নিন।

আমি ছোট স্যুটকেসটা নিয়েছি। কে আবার ওর থেকে আজেবাজে জিনিস বের করে আলাদা ভরে দিতে যায় এখন? কিন্তু আলস্যটুকু না করলেই ভাল হত! ভাবা উচিত ছিল, এক-এলাকা থেকে একেবারে পৃথক আর এক এলাকায় ঢুকছি—পথ কিছু বেশিই হবে! আরও মুশকিল, কাস্টমসের নানা আগড় অতিক্রম করে গজেন্দ্রগমনে এগুতে হচ্ছে। মাথায় চড়বড়ে রোদ—ছুটে গিয়ে বসব ও-পারে, তার জো নেই।

পুলের মাঝামাঝি এসে পিছনে তাকাই একবার। ছোট্ট খাল—এপারে-ওপারে

তবু কি দুস্তর ব্যবধান! কার্তিক পাশে এসে পড়েছে। বলে উঠল, ট্রাউজার পনেরো ডলারে কিনেছে বটে, কিন্তু কাপড় অতি খেলো। সওদায় আমার সঙ্গে পারবে? উনি তো শ—, ওঁদের মাথা রাজাগোপালাচারীকে ডেকে নিয়ে আসুন না!

পুল পেরিয়ে নতুন-চীনের মাটিতে পা দিলাম। উঁচু টিলার উপর এখানে এক জন ওখানে একজন বন্দুকধারী সৈন্য ঘাঁটি আগলাচ্ছে। নিচের মাঠে শুয়ে বসে ছিল একদল—গায়ে পোষাক কিন্তু হাতে অস্ত্র নেই। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে তারা হাততালি দিচ্ছে। হাততালি দিয়ে অভ্যর্থনা করছে আমাদের। আর ওদিকে তারের বেড়ার ওধারে পদ্মবন। পদ্মফুলের সময় এখন নয়, ডাঁটার উপর বড় বড় পাতা ছত্রাকারে মেলা। দুলছে প্রসন্ন বাতাসে।

না দাদা, ঠকিয়েছে আমায়। তাই ভাবছিলাম এতক্ষণ ধরে। কাপড় হয় তো উনিশ-বিশ—গালে চড় মেরে আমার কাছ থেকে আঠারো ডলার নিয়ে নিল। ট্রাউসারের দাম পনের-ষোলর বেশি হতেই পারে না।

দ্রুত হেঁটে দূরবর্তী হই কার্তিকের কাছ থেকে। এ হাহাকার শুনতে পারি নে। আরও যে কত ঠকে যাচ্ছ, হুঁশ নেই। দূরবিস্তৃত প্রান্তর, প্রান্তর-শেষে ছবির মতন ঐ সব ঘরবাড়ি, উদার সূর্যালোক, আনন্দ-ভাসিত পদ্মবন—তিন ডলারের শোকে আচ্ছন্ন হয়ে আছ, কিছুই এ সব তাকিয়ে দেখলে না একটি বার! রাজ-মহারাজাদের অভ্যাগম হচ্ছে—এমনি খাতির! উঁহু, ভুল বললাম—অনেক কালের অদেখা আপন মানুষদের পেয়ে এরা উল্লাসে মেতে গিয়েছে। তাই বটে! প্রশান্ত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইদানীং যারা চীনের তটে উঠেছে, লুঠেরা প্রায় সবাই; আফঙের মৌতাতে অজ্ঞান করে রেখে সর্বস্ব পাচার করে দিত নানান দিকে। আজকের এই ব্যাপার নিতান্ত অভিনব। সাঁইত্রিশটা দেশের নির্বিরোধী মানুষেরা শলা করতে আসছে, আনন্দ এবং মান-ইজ্জত নিয়ে কী করে সকলে শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারে।

বাজনা বাজছে। শিল্পী পিকাসোর পরিকল্পিত সুবৃহৎ কবুতরের ছবি—তারই নীচে দিয়ে তোরণদ্বার অতিক্রম করে এগিয়ে এলাম। স্টেশনের নাম সেন-চুন। মোভি-ক্যামেরায় চলন্ত ছবি নিচ্ছে। দুজন মহিলা ছিলেন, কার্তিক এগিয়ে তাঁদের কাছে জুটল। হাত নেড়ে ব্যস্ত ভাবে কী কথা বলছে। আমি কিন্তু জানি। কথোপকথন লোক-দেখান—আসল দরকার বুঝতে পেরেছি। মেয়েদের সঙ্গে ক্যামেরার মুখে দাঁড়াবে। মেয়েদের খাতিরে ক্যামেরা নিশ্চয় একটু বেশীক্ষণ থাকবে ওদের উপর, কার্তিক ঐ সঙ্গে ভালমতো ছবিতে উঠবে।

স্টেশনে পা দিয়েই তাজ্জব। ওয়েটিংরুম না লাইব্রেরি? টানা-টেবিলের ধারে বেঞ্চি, লোকে সারি সারি বসে পড়েছে। বই সাজানো আছে একদিকে, রেল-কোম্পানীর লোক আছে লেনদেন ও খবরদারির জন্য। মহাব্যস্ত তারা। চীনা ভাষা অবোধ্য, উল্টেপাল্টে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে বোঝা গেল, শিশু-পাঠ্য থেকে উঁচু রাজনীতি-সংক্রান্ত—সকল রকমের বই আছে। কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস লেনিন, স্টালিন প্রভৃতির ছবি থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছে মার্কসবাদ ও কম্যুনিজমের বই বিস্তর। একেবারে চুপচাপ—মাটিতে সূঁচ ফেললে বুঝি শোনা যাবে। হৈ-হুল্লোড়ের জায়গা স্টেশন—কিন্তু এই প্রান্তটুকুতে যেন ধ্যানস্তব্ধ তপস্যার ক্ষেত্র বানিয়েছে। ট্রেনে যাবার জন্য স্টেশনে এসেছে, গাড়ীর দেরি আছে—আহা, মিছে সময় নষ্ট করে হবে কী? পড়ো বসে বসে—শিখে নাও এই ফাঁকে যতটুকু পারো।

সবাই যে পড়ছে, তা নয়। পড়তে জানেও না কত জন! ক্যারামবোর্ড আছে ভূমিতে নয়—খানিকটা উঁচুতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলতে হয়। খেলছে কয়েকজন চারিদিক ঘিরে। আর ওদিকে সারি সারি বেঞ্চি পাতা, পিছনে ঠেশ দেবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের ইস্কুলে যেমন ক্লাস সাজানো থাকে। অনেকে বসে আছে সেখানে। যাত্রীদের মালপত্র একদিকে পাশাপাশি সাজানো। শৃঙ্খলা সর্বত্র।

দেয়ালে-দেয়ালে ছবি ও পোস্টার। ইতস্তত নয়, সাজাবার পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি আছে। শিক্ষার সঙ্গে শিল্পরুচির অপরূপ সমন্বয়। আছে খবরের কাগজ—বোর্ডে ক্লিপ দিয়ে আঁটা। নতুন চীন ডাকহাঁক করে সকলকে শোনাতে চায়—কী মাণিক্য সে পেয়েছে, আরও কা কী সে পেতে চায়। এই সামান্ত-স্টেশন থেকেই তার শুরু।

আর এক বিস্ময়—স্টেশন জায়গা, এত মানুষের আনাগোনা, কিন্তু ধুলো-ময়লা নেই কোনখানে। ছোট্ট মেয়েটা কমলালেবু খেল—আরে আরে, খোসা নিয়ে গুটগুট করে যায় কোথা ওদিকে? আবর্জনা ফেলবার জায়গা আছে—উপরে ঢাকনি, ঢাকনির সঙ্গে কাঠের লম্বা হাতল। হাতল ধরে ঢাকন খুলে লেবুর খোসা তার মধ্যে ফেলে আবার ঢাকা দিল। থুতু ফেলছে, তাও এই সব জায়গায়। কেমন অসোয়াস্তি লাগে। নিতান্তই রেললাইন পাশে, তাই ধরে নিচ্ছি স্টেশন। নইলে বাস-ঘর—কিংবা ঠাকুর ঘর বললেই বা ঠেকায় কে? ভয় হয়, কেউ আবার জুতো খুলতে না বলে বসে।

এদিকে—

ভদ্রলোক ইংরেজী জানেন না—হাত নেড়ে হাস্যমুখে পাশের হলঘর দেখা-

ছেন, ঢুকে পড়তে ইশারা করছেন।

নিচু নিচু টেবিলে কেক স্যাণ্ডউইচ রকমারি ফল লেমন-স্কোয়াশ ইত্যাদি চা নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে জনে-জনের কাছে। ঢোকাবার কারণ বোঝা যাচ্ছে; মুখের বাক্য নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু বাক্যবিদ্‌ও একজন এসে পড়লেন।

দাঁড়িয়ে আছেন আপনি?

এতক্ষণ বসে বসে এলাম। আবার এই ঘরের ভিতর ঠায় বসিয়ে রাখবেন, দেখতে শুনতে দেবেন না?

দেখবেন বই কি! দোষত্রুটিও দেখিয়ে দেবেন, এই আমরা চাই। কিন্তু কষ্ট করে এলেন, এখন বিশ্রাম নিন।

বললাম, সকালে হংকং থেকে আচ্ছা একদফা সেরে ট্রেনে উঠেছি। তুলার বাক্সে যেমন করে আঙুর আনে, সারা পথ তেমনি করে তো নিয়ে এলেন। বলছেন যখন, কষ্ট কিছু করেছি নিশ্চয়। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি নে। দয়া করে যদি একটু ধরিয়ে দেন কী কষ্ট করেছি, তদনুপাতে বসে বসে হাঁপাতে থাকি, আর সরবৎ গিলি...

এক বর্ষীয়সী স্টেশনে আসছেন—পিঠের সঙ্গে বাচ্চা বাঁধা, আর এক বাচ্চাকে হাতে ধরে হাঁটিয়ে আনছেন। পিছনে এক তরুণী—ছোট বোনই হবে আগের জনের। হাতে ঘড়ি, চোখে চশমা—ছিমছাম আধুনিকা, কিন্তু কাণ্ড দেখুন—কাঁধে এক বাঁক, বাঁকের দুই প্রান্তে গন্ধমাদন তুল্য দুই বোঝা। দিন দুপুরে অন্তত পক্ষে শ দুই-তিন চক্ষুর সামনে প্রকাশ্য স্টেশনের উপর আধুনিকা বাঁকে ঝুলিয়ে বোঝা নিয়ে আসছে—ভ্যানিটিব্যাগ বইতেই ঘাম বেরিয়ে যায় 'পল্লবিনী-লতেব' ললনা দর্শনে অভ্যস্ত আমাদের দৃষ্টিতে পলক পড়ে না।

না, দেখেছিলাম একবার গোবরডাঙা স্টেশনে। পায়ে মল ও আলতা মাথায় দেড়গজি ঘোমটা, এক বউ ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করে নিয়ে চলছে। আগে আগে যাচ্ছে স্বামীপ্রবর—হাতে ছড়ি, মুখে বিড়ি, ফাঁপানো টেড়ি মাথায়। ছড়ি তুলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল বউ পিছিয়ে পড়েছে বলে। গাড়ীর কামরায় বসে সেই একবার দেখেছিলাম। কিন্তু এখানে ছড়িধারী মার্তণ্ড-মূর্তি দেখছি না কাউকে কাছে-পিঠে। আর বোঝা বয়ে মেয়েটা একটু যে কাতর হয়েছে, তার কোন চিহ্ন নেই। বরঞ্চ 'রণং দেহি' দৃষ্টি। দাও না আর গোটা দুই বোঝা এর উপর, ডরাই নাকি—চোখে মুখে এমনি ভাব প্রকট। দুম করে বোঝা নামাল, রাখল সে দুটো সাজিয়ে। হাতঘড়ি এক নজর দেখে টিকিট করতে চলল।

স্বাস্থ্যান্বিত উজ্জ্বল মেয়েগুলোর এমনি প্রতাপ নতুন-চীনের পথে-ঘাটে সর্বত্র।

ওয়াং-সিও-মেই-কে তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম···থাকগে এখন। একথা পরে হবে। ছোট স্টেশন ছিল। এখন প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে, সম্প্রসারিত হচ্ছে নানান দিকে। অনেক লোক খাটছে, দিনকে-কে-দিন ভোল বদলে যাচ্ছে। আমাদের জিনিসপত্র এনে ফেলেছে। এইবার একটু কাজ—কোন্ জিনিসটা কার, বলে দেওয়া। ওদের নিজ ভাষায় নাম লিখে নিয়ে যথাব্যবস্থা করবে। ক্যান্টনের হোটেলে গিয়ে দেখতে পাবেন, ঘরের তাকে আপনার বস্ত্র-বোঁচকা সাজানো রয়েছে।

দাদা, রাখবেন তো আমায়?

কার্তিক এসে অনুনয় করছে। অবাক হয়ে বলি. মারছে কে আপনাকে? আর মারে যদি, আমিই কোন্ শক্তি ধরি রুখবার?

কার্তিক বলে. আপনি মালিক—সর্বশক্তিমান। সমস্ত আপনার হাতে—হাতের ঐ কলমের ডগায়। এত টুকছেন, আমার কথাও টুকে নেবেন। বইয়ে যেন বাদ না পড়ি।

হুড়মুড় করে ট্রেন এসে পড়ল। ট্রেন এলো কামরা-ভর্তি কলহাস্য আর প্রাণ-চাঞ্চল্য নিয়ে। ট্রেন এসে আমাদের কাছে যেন উপুড় করে দিল নতুন-চীনের বিচিত্র উল্লাস। গাড়ি থামতে না থামতে ছড়িয়ে পড়ল প্লাটফরমে, আমাদের বসবার ঘরে, আমাদের সকলের মনে মনে।

কলেজের ছাত্র-ছাত্রী—টাটকা গ্র্যাজুয়েট আছে কয়েকটি। অতিথিদের দেখা-শুনা ও দোভাষির কাজ করবে। ভার পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে, এমনি ভাব। পরে আরো কত ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে—তাদের এ-কাজে আনা হয় নি, যেহেতু তারা বিদেশি ভাষা-বিভাগের (foreign language department) নয়। বেচারিরা সেজন্য মরমে মরে আছে।

সাঁইত্রিশটা দেশের প্রায় পৌনে চার শ' অতিথি—এমনি হাজার তিনেক ছাত্র-ছাত্রী তাদের আপ্যায়নের জন্যে এসেছে। পড়াশুনা মুলতুবি রেখে ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। নানা জায়গায় ছড়িয়ে রাখা হয়েছে তাদের, যেখানে যেখানে অতিথিদের পা পড়বে। সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি অবশ্য পিকিনে, কাজের দক্ষতাও তাদের সর্বাধিক। দিন নেই রাত নেই, শীত নেই বর্ষা নেই, সময় নেই অসময় নেই—ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে আছে। পান থেকে কারো চুন না খসে, এমনি সতর্কতা

ঐ ট্রেনই আমাদের বয়ে নিয়ে যাবে ক্যান্টনে। দাঁড়িয়ে আছে। উঠুন, উঠে পড়ুন এবার দয়া করে। ছেলে আর মেয়েগুলো ঘিরে নিয়ে আমাদের গাড়িতে তুলল। ওরাও চলল সঙ্গে। শুধুমাত্র বিদেশীয় হওয়ার গুণে এত-

খালি খাতির যেলে, আগে কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি ?

গাড়ি ছাড়ল। পিছে তাকালাম একবার। ব্রিটিশ-এলাকা একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। দুই রাজ্যের মাঝখানে ছোট্ট একটু খাল—অথচ আকাশ ও পাতালের ব্যবধান। যেন নিশ্বাস লাগল গায়ে, নিশ্বাসের মতন হাওয়া। হাওয়া আসে ওপারের লাউ-হু স্টেশনের দিক থেকে। ঝুর-ঝুর করে পাতা ঝরে প্লাটফরমের গাছটার। রৌদ্রদীপ্ত আকাশের নিচে মনে হল রূপগরবিনী হংকং ঈর্ষান্বিত চোখে তাকাচ্ছে নতুন-চীনের দিকে। মূলভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরামেই ছিল মোটের উপর। একটিমাত্র ব্রিটিশ-মনিবের মন জুগিয়ে এসেছে—চীনের মতো বারোভূতের হাতে ভোগান্তি হয়নি। আজকে শতকে বৎসর পরে টনটন করে উঠেছে বুঝি পুরোনো নাড়ি-ছেঁড়া বেদনা।

(৪)

ট্রেনে দুটো ক্লাস—নরম আর শক্ত। নরম ক্লাসের বেঞ্চিতে গদি-আঁটা, ভাড়া কিছু বেশি। শক্ত ক্লাসে শুধু কাঠ। তফাত এই মাত্র, আর কিছু নয়। যাত্রীরা চা পায় বিনামূল্যে। খাও বা না খাও সামনে চা রয়েছে; ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ঢেলে নিয়ে চা-পাতায় আবার গরম জল দিয়ে যাচ্ছে। নরম বা শক্ত ক্লাস বলে কোন বাছ-বিছার নেই। টানা-পথ গিয়েছে আমাদের খোপগুলোর পাশ দিয়ে—ইঞ্জিন থেকে শেষ অবধি এই পথে গতায়াত চলে। লাউড-স্পীকার প্রতি কামরায়—মাঝে মাঝে গান হচ্ছে যাত্রীদের খুশি রাখবার জন্য। কাজের কথাও হচ্ছে—অমুক স্টেশন আসছে এবার, এক মিনিট থামবে, যারা নামবে তৈরি হও এখন থেকে। কিংবা অমুক পাহাড় দেখ ঐ ডান দিকে। অমুক নদীর পুল। লড়ায়ের সময় বিশ জন মুক্তিসৈন্য আশ্রয় নিয়েছিল এই পুলের নিচে—কী কষ্ট তাদের, কী কষ্ট!

ট্রেন যে-অঞ্চল অতিক্রম করছে, সেটা চিনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে এমনি করে ভূগোল আর ইতিহাস পুঁথির পাতায় মাত্র নয়—জীবন্ত হয়ে উঠছে চোখের সামনে। আমরা চীনা ভাষা বুঝি না, বোকার মতো হাঁ করে থাকি—ওরাই সদয় হয়ে যা-কিছু মানে বলে দেয়। কিন্তু কত আর বলবে! নানা জনের নানা প্রশ্নে টগবগ করে মুখে খই ফুটছে। চতুর্মুখের চারটে করে মুখ হলেও তো থই পেতো না।

সত্যি, এ কী অমোঘ সঙ্কল্প! শতকরা আশিজন ছিল অশিক্ষিত—তাদের একটি প্রাণীকে আর অজ্ঞ থাকতে দেবে না। সেন-চুন স্টেশনে পা দিয়ে দেখেছিলাম.গাড়ির মধ্যেও ঠিক সেই ব্যাপার। ইস্কুল কলেজ য়্যুনিভার্সিটি তো আছেই। পথযাত্রী, এখন একটু ফাঁক পেয়েছ, শিখে নাও যেটুকু পারো।

পরে দেখেছি, এ-রীতি চীনের সর্বত্র। ভোরবেলা—হ্যাংচাউয়ে হ্রদের কিনারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সারি সারি নৌকো বাঁধা। নৌকো চালায় মেয়েরাই বেশির ভাগ। চড়নদার বপায় আসবে। হাতে কাজ নেই—কী করবে, গলুয়ের সঙ্গে আঁটা কাঠের বাক্স থেকে বই বের করে নিয়ে পড়তে লাগল। রাত বারোটায় বাসে চড়ে পিকিনের পথে শেষ দিনের শান্তিসম্মেলনে যাচ্ছি- রাস্তার ধারে আলো জেলে ঐ বাঘা শীতের মধ্যে বয়স্কেরা লেখাপড়া করছে। দিনমানে সময় পায় না, লেখাপড়া শিখতেই তো হবে—রাত বারোটায় এসে জমেছে। গিয়েছি এক গ্রামে। বেলা দুপুর। ভয়াবহ চিৎকার আসছে এক বাড়ির উঠোন থেকে। কী ব্যাপার? একদল সৈন্য বিশ্রামের জন্য আছে, সেখানেই হাঁকডাক করে তারা পাঠ অভ্যাস করছে। নিরক্ষর ছিল। অল্প ক'দিনের মধ্যে শিখে নিতে হবে। তাই উৎসাহ ও বিক্রমের অবধি নেই। যাক গে, পরের কথা—এ সব পরে হবে। ঝকমক করছে গাড়ির কামরা- গুলো, বেঞ্চির উপরে পাটভাঙা চাদর পাতা। দুপুরের ভুরি-ভোজনের ব্যবস্থা চলতি ট্রেনে—আমিষ নিরামিষ যেমন খুশি! খেয়েদেয়ে ঝিমুনি আসছে। কিন্তু, না—অপরাধ মনে করি এ জায়গায় ঘুমানো। জীবনের এত বছর অতীত হয়েছে, অর্ধেক তার তো ঘুমিয়েই কাটালাম। আজকে জাগ্রত থাকো দুই চক্ষু। ট্রেন ছুটছে মাটি কাঁপিয়ে। গ্রাম ঘরবাড়ি মাঠঘাট নদী- নালায় শ্যামশ্রী নতুন-চীনের হাস্যাননই দেখতে পাচ্ছি চতুর্দিকে। বন্ধুজনেরা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, অনেক—অনেক রক্তস্রোতে ভেসে আজকের এ দিনে এরা পৌঁছেছে। সকলের মুখে নজর করি, এক-একটা স্টেশনের প্ল্যাট- ফরমে তাকাই এদিক-ওদিক। রক্তের দাগ লেগে থাকে যদি কোথাও!

দক্ষিণ-চীনের এই অঞ্চল বাংলাদেশ বলে বারংবার ভুল হয়ে যায়—ঠিক পূর্ব- বাংলা। বাঁশঝাড় গ্রামের ধারে। কলাগাছ, পেঁপেগাছ, কলাইক্ষেত। জলা জায়গায় কত পদ্মবন! নিঃসীম ধানক্ষেত। পাটক্ষেতও অনেক। আমাদের পাটের জিনিসের পুরানো খদ্দের চীন। মতলব ভাল নয় তবে তো —দেদার পাট চাষ করছে। নানা একজিবিশনে গিয়ে দেখেছি, কোথায় কত পাটকল হয়েছে তার হিসাব। পাটের জিনিসের উৎপাদন অতি-দ্রুত বাড়ছে। তৈরি জিনিসের নমুনাও দেখিয়েছে। ঢাকা-ময়মনসিংহের মতো উৎকৃষ্ট নয় যদিচ, তবুও দিব্যি কাজ চলবে। পাকিস্তানি বন্ধুদের সঙ্গে একত্র গিয়েছিলাম এক একজিবিশনে। উভয় তরফ থেকে টেপাটিপি করি— হায় রে, এ বাজারটা হাতছাড়া হয়ে গেল! আগে জানতাম, পাট বাংলার একচেটিয়া। সে গর্ব নির্মমভাবে ভেঙে দিচ্ছে নানান জায়গা থেকে।

দীর্ঘ-দেহ এবং দীর্ঘ-দাড়ি মকবুল হোসেন—মাথায় কালো টুপি। বম্বের নাম-করা চিত্রকর। তিনি স্কেচ করে চলেছেন পাতার পর পাতা। ছেলে-মেয়েরা ঘিরে ধরেছে। স্বচ্ছ হাসি সর্বদা তাঁর মুখের উপর—সেই হাসি হাসতে হাসতে এগিয়ে দিলেন স্কেচগুলো। ওরা দেখছে, মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাতাকি করছে পরস্পরের দিকে। হাতে হাতে ঘুরছে ছবি।

হঠাৎ দেখি, হোসেন সাহেবকে ছেড়ে আমার দিকে ধাওয়া করছে। কৌশলটা তাঁরই—আমি এক লম্বা-চওড়া লেখক ইত্যাদি বলে থাকবেন। হাতে কলম, সিঁদের মুখে চোর ধরবার গতিক। ছেলে-মেয়ের দঙ্গল হটিয়ে দিয়ে হোসেন আবার কাজে মনোযোগ করেছেন। দু চোখে যা দেখেন, মহামূল্য মণিরত্নের মতো খাতায় তুলে নিতে চান।

কিন্তু আমার ছবি নয়, কলমের লেখা। তা-ও বাংলা অক্ষরে। এই দেখে বুঝবে কোন জন ?

একটি মেয়ে তবু নাছোড়বান্দা।

কী লিখেছ পড়ো না একটুখানি !

তোমাদের কথা—

আমাদের নিয়ে আবার লেখা যায় নাকি ?

ভাবীকালের মহাচীন তোমরা। তোমাদের জন্যেই চরিদিকের সকল আয়োজন। অবহেলার বস্তু তোমরা কিসে ?

ঘাড় নেড়ে আবদারের সুরে বলল, বাজে কথা রাখো। নবেল আর গল্প লেখো, আমরা শুনেছি। কাদের নিয়ে তোমার গল্প বলো তাই।

ফুটন্ত ফুলের মতো মুখখানা দুই করতলে ন্যস্ত করে উৎসুক চোখে চেয়ে আছে। জবাব দিতেই হয়।

বাংলা দেশের মানুষ নিয়ে। তাদের হাসি-অশ্রু, ঘর-গৃহস্থালি, রাগ অনুরাগের গল্প। আর আছে আমাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের কথা। কংগ্রেস আর দেশের মানুষ ইংরেজের সঙ্গে কতকাল ধরে অসম যুদ্ধ চালাল—শুনেছ কংগ্রেসের নাম ?

কংগ্রেসের কথা অতি সামান্য জানে। বেশি শুনেছে নেহরুর নাম। আর সবচেয়ে বেশি জানে টেগোর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে। বিদেশী ভাষার ছাত্র-ছাত্রী বলেই সম্ভবত।

বলছিলাম, আমাদের ছেলেমেয়েরা—তোমাদেরই মতো এমনি বয়স—হাসি-মুখে ফাঁসিকাঠে চড়েছে, গুলির মুখে প্রাণ দিয়েছে। ব্যক্তিজীবনের সুখদুঃখ কপালের ঘামের মতো তারা মুছে ফেলেছিল দেশের মুক্তির জন্য। তাদের

চোখ ছলছলিয়ে উঠল, স্পষ্ট দেখলাম। হাজার হাজার মাইল দূরে ভিন্ন দেশের মেয়ে—সেখানকার চাঁদ সূয্যিও বুঝি আলাদা। আর সেই চলন্ত ট্রেনের মধ্যে ঐটুকু সময়ে আমাদের সর্বত্যাগীদের কী-ই বলতে পেরেছি! তবু কাঁদল। ধরা গলায় বলে, বলো আরও তাদের কথা। ভাল করে শুনি।
খাতা এগিয়ে দিই। তোমার নামটা লেখো এখানে।
চীনা অক্ষরে লিখল। পাশে ইংরেজি বানানে লিখল আবার। ওং-ঔন (Wong Oyun)। কয়েক ঘন্টার সঙ্গিনী সমব্যথিনী মেয়েটার হাতের লেখা ঝিকমিক করছে আমার ছোট্ট খাতাখানায়।
পরে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করি, কেঁদেছিলে কেন?
ওং-ঔন মুখ ফিরিয়ে নিল। অত স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ, তবু নজর তুলে কথার জবাব দিতে পারে না।
তোমার দেশেরও কত ছেলে মেয়ে গেছে অমনি!
মেয়েটা বলে, অনেক—অনেক—আকাশের তারার মতো অগণ্য। কিন্তু তাদের জন্য কাঁদব কেন? তারা যা চেয়েছিল, সে তো পাওয়া যাচ্ছে—
স্বচ্ছন্দ শান্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলল। স্তব্ধ হয়ে রইলাম। ফসল ভরা মাঠের মধ্য দিয়ে গাড়ি ছুটছে। দিগ্ব্যাপ্ত সবুজ শীর্ষে আজকের জনমনের আনন্দোচ্ছ্বাস ঢেউ দিয়ে যাচ্ছে যেন। ওদের মানস-স্বপ্ন মঞ্জরিত হল এত দিনে?
হবে আমাদেরও। এ আমি একান্তভাবে জানি। বললাম সে কথা। ইংরেজ তামাম জাতটাকে মজ্জাশূন্য করে রেখে গেছে। উঠে দাঁড়াতে কিছু সময় লাগবে। পড়ে থাকব না আর। দুঃখ নিশার অন্তে স্বাধীন বিমুক্ত দুই পুরানো প্রতিবেশী আবার আজ নতুন করে পরিচয় স্থাপন করতে এসেছি।
লড়াই চলছে চীনের সীমান্তে—কোরিয়ার—ইয়েলু নদী পার হয়ে গিয়ে। তাই বা কেন—ইয়েলুর এ পারেও পড়েছে সাংঘাতিক বোমা। সে থাক গে, দেশে ফিরে গিয়ে অনেক সকালবেলা চায়ের বাটি ও খবরের কাগজ নিয়ে আলোচনা চালানো যেতে পারবে। আর এক বিষম লড়াই হচ্ছে সমস্ত চীন জুড়ে, এমন গ্রাম নেই যেখানে লড়াই না আছে। ঘরোয়া যুদ্ধ—বিস্তারিত ব্যাপারটা অনেক বিদেশির চোখ এড়িয়ে যায়, কিন্তু ফলাফল অতি প্রত্যক্ষ। রেলপথের দু পাশে ঐ দেখতে দেখতে যাচ্ছি।
আচ্ছা, জ্ঞান হবার পর থেকেই যে চীনে দুর্ভিক্ষের কথা শুনে আসছি, দুর্ভিক্ষের চাঁদা দিয়েছি কতবার—হঠাৎ সে দেশ আড়তদারি ফেঁদে বসল কিসে? চাল বিক্রি করছে। পিকিনে ভারতীয় দূতাবাসে দেখা করতে গেলাম সে সময়টা তাঁরা ভারি ব্যস্ত। বললেন, কিছু চাল খরিদের তালে আছি এদের।

কাছ থেকে। পিকিন ছাড়বার মুখে আবার যখন গিয়েছি, চাল গস্ত করা হয়ে গেছে। বহুবিস্তীর্ণ দেশের সংখ্যাতীত মুখে ভাত জুগিয়ে আরও বিক্রি করে, এত চাল চীন পায় কোথায়?

ঐ যা বললাম—লড়াইয়ের ফল। লড়ায়ের মানুষ সাফ হয়ে যায়, খাদ্যের আর প্রয়োজন থাকে না। এ লড়াইয়ে কিন্তু তা নয়। মানুষ বিষম জীবন্ত হয়ে উঠেছে, ভীষণ খাচ্ছে। এত খেয়েও ফুরোয় না, তাই বাজারে দিচ্ছে। সেই সচ্ছলতা আমরা দেখে এসেছি।

দেখুন—দেখুন না তাকিয়ে—

আঙুল দিয়ে দেখায় ওরা। ফসলের ক্ষেত রেলের পাটি ছোঁব ছোঁক করছে। এক ছিটে জায়গা বাদ দিতে চায় না।

বললাম, দুই পাটির ফাঁকে ওখানেও তো কিছু আর্জানো যেত। গোলআলু কি ব্যাঙের ছাতা? ওটুকু বাদ দিলে কেন? তা কী হয়েছে—রেলগাড়ি গড়গড় করে উপর দিয়ে চলে যেত! এ কিন্তু জমির অন্যায় অপচয়।

ঠাট্টা করে বললাম, কিন্তু গতিক এমনই বটে! পাগল হয়ে চাষে নেমেছে। খানাখন্দ ভরাট করছে। পাহাড়ের উপরে কেটে চৌরস করে সেখানেও চাষ। যে ফসল যেখানে ফলানো যায়।

চীনদেশের অফুরন্ত জমি, কিন্তু নিজের বলতে এক ছটাক জমি ছিল না অধিকাংশ লোকের। জমির মালিক জমিদার কিংবা ধনী চাষী—ঈশ্বর যেন তাদের ইজারা দিয়ে দিয়েছেন। চড়া খাজনায় জমি বন্দোবস্ত নিতে হত ওদের কাছ থেকে, কিংবা মজুরি খাটত অন্যের ভুঁইয়ে। ঋণ করত মহাজনের কাছে—সে ঋণ যথানিয়মে লাফিয়ে লাফিয়ে পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠত। মাটির সন্তানের দুর্ভোগে কুপিতা ভূমিলক্ষ্মী বিগড়ে গেলেন, রুগ্ন অশক্ত শিরদাঁড়া-ভাঙা চাষীর জমিতে ফসল ফলে না। দেশ জুড়ে নিরন্নের হাহাকার। সরকারি প্রচার-যন্ত্র হাঁকড়াচ্ছে—জনবৃদ্ধি ঘটছে, অত খাদ্য আসবে কোত্থেকে? ধান-গম ছেড়ে ঘাসপাতা খাও বেশি করে। বিদেশের তুষ-ভুষি আনা হচ্ছে জাহাজ বোঝাই করে। উনিশ শ'পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের এই চীনের সঙ্গে আমাদেরও কয়েক বছর আগেকার অবস্থা দেখুন দিকি মিলিয়ে।

জমিদারের সঙ্গে চাষাভুষোর রোমহর্ষক নানা শর্ত—এ ব্যাপারে চীন আমাদের অনেক দূর ছাড়িয়ে ছিল। খাজনার উপরে এটা-ওটা দেওয়া, বেগার খাটা—ওসব তো ছিলই। আমাদের এখানে আছে, ওদেরও ছিল। আর যা ছিল আমাদের লোক শুনে কানে আঙুল দেবে। নতুন লাউ ফললে কি প্রথম গাই বিয়োলে মনিবের ভোগে দিতে হয়। নিজের স্ত্রী-কন্যার সম্পর্কেও অনেক

ক্ষেত্রে ছিল অমনি বিধি।

কিন্তু এসব নিতান্ত অতীতের কথা। তিনটে বছরেই যেন অনেক পুরানো ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের মানুষ শিউরে ওঠে বিভীষিকার সে সব দিন মনে করতে গিয়ে। মুক্তির অবাধ আলো, নব জীবনের আনন্দস্বাদ! আর কী লড়াই, কী লড়াই! গ্রামে ঢুকছ—পথের মোড়ে ও নানা প্রকাশ্য জায়গায় দেখতে পাবে লড়াইয়ের বীরদের ছবি। কৃষক বীর, শ্রমিক-বীর। ক্ষেতে দেড়া-ফসল ফলিয়েছে—চারদিকে সেই বীরের জয়জয়কার। খবরের কাগজে ছবি উঠছে, নাম বেরুচ্ছে। সরকার থেকে পুরস্কার দিচ্ছে, আরামের প্রাসাদে পাঠাচ্ছে কিছুদিনের জন্য। রাজা-মহারাজা এবং বড় বড় ধনীরা ঐ সব প্রাসাদ বানিয়েছিলেন—ফুর্তির তুফান বইত অহোরাত্রি। নির্ধন গ্রাম্য চাষী, সর্ব অঙ্গে এখনো সেদিনের দারিদ্র-লাঞ্ছনা—প্যালেসে গিয়ে তারা গদিতে শুচ্ছে, কৌচে বসে তাস-দাবা খেলছে। শুধু বিলাস-সম্ভোগই নয়—কত ইজ্জত! চাষীরা তাই প্রাণপাত খাটে। আর, মা লক্ষ্মী চুপিসাড়ে হিমালয় পার হয়ে গিয়ে ঐ নিরীশ্বর দেশে আঁচল বিছিয়ে বসেছেন। আমাদের ভাগে বুঝি মা-ভবানী?

সন্ধ্যা হল। আকাশে মেঘের ঘন ঘটা। ক্যান্টনের আর দেরি নেই। পূর্ববর্তী শহরগুলির স্টেশনে গাড়ি থামল। জায়গাটার নাম—না, পড়বার উপায় নেই—এখন শুধুমাত্র চীনা অক্ষরে। ইংরেজি পরিচায়িকা বন্ধ চীনভূমিতে প্রবেশের পর থেকেই। স্টেশনের পাশে এক-সাইজে-কাটা টুকরো কাঠ স্তূপীকৃত। দেশলাইয়ের কারখানা আছে তার জন্য। এরা যত দেশলাই জ্বালায়, আর যত সিগারেট পোড়ায়, সমস্ত স্বদেশে তৈরী। গাড়ি ধীরে ধীরে চলল ক্যান্টন অভিমুখে।

ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নামল। গান কানে আসছে বৃষ্টি-বাদলার অবিরল আওয়াজ ছাপিয়ে। বহুকণ্ঠে সমবেত গান। সুর থেকে আন্দাজ পাচ্ছি, এ গান শুনেছি সঙ্গীদের মুখে। ট্রেনে তাদের গান করতে বলা হল, তারাও পাল্টা ভারতীয় গান শুনতে চাইল। উভয় তরফের গান হয়েছিল কয়েকটা। তার মধ্যে এই গানও শুনেছি। গানের মানে বুঝিয়ে দিয়েছিল—আমার খাতায় লিখেও দিয়েছে ইংরেজি বানানে। 'পৃথিবীর মানুষ এক হও, এক হও। সকল মানুষের একটিমাত্র হৃদয়—'

থামল গাড়ি। সংবর্ধনার অপরূপ ব্যবস্থা। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে—বছর বারো-চোদ্দ বয়স—সারবন্দি প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে। পরিচ্ছন্ন বেশ, গলায় লাল রুমাল বাঁধা—সাদা কামিজ কালো হাফ প্যান্ট। হাস্যবিম্বিত মুখ,

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা। ইয়ং-পায়োনিয়র এরা এক-একজন আমরা কামরা থেকে নামছি, ওদের এক একটি এগিয়ে এসে প্রায় ব্রতচারী কায়দায় হাত তুলে অভিনন্দন জানাচ্ছে। ফুলের মালা নয়, তোড়া দেওয়ার রীতি। তোড়া হাতে দিয়ে তারপর ডান হাত জড়িয়ে ধরল। এগিয়ে চলেছি। আমার পিছনে যিনি নামলেন, তিনিও ঠিক এমনি। তাঁর পিছনে যিনি, তিনিও।

ছবিটা কল্পনা করুন। সন্ধ্যার আঁধার ঘনতর হয়েছে মেঘছায়ায়। বৃষ্টি পড়ছে। চারিদিক বিমন্দ্রিত শত শত কণ্ঠের ঐক্য-সঙ্গীতে। হাত ধরে নিয়ে চলেছে, প্রবীণ কর্তাব্যক্তিরা কেউ নয়—এই শিশুরা, ভাবী দিনের চীন। মিছিল করে চলেছি। উপহার-পাওয়া ফুলের তোরা বুকের উপর, ডান হাতখানা কোমল মুঠির মধ্যে নিয়ে চীনভূমিতে পথ দেখিয়ে চলেছে—সে-ও পরমশুচি ফুল একটি। বিশিষ্টেরাও এসেছেন অবশ্য স্টেশনে—আপাতত তাঁরা অবান্তর। ছেলেমেয়েদের দক্ষিণে ঐ দূরে দূরে চলেছেন তাঁরা, দরকারমতো দুটো-একটা কথার জোগান দিচ্ছেন।

আরও এগিয়ে আসতে হাততালি উঠল। হাততালি দিয়ে ক্যান্টনের মানুষ আবাহন করছে। গান চলছে। আলো দিয়ে সাজিয়েছে সারা স্টেশন আর রাস্তার অনেক দূর অবধি। সৈন্যদল সারবন্দি দূরে দাঁড়িয়ে গান করছে। সৈন্যর শুধু বন্দুক মারে না, গানও গায় তা হলে! গান গেয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে স্টেশনে জমায়েত হয়েছে। গান গাইছে ছাত্র-ছাত্রী, ফ্যাক্টরির কর্মী, ক্যান্টনের অগণ্য নাগরিকদল। গম্ভীর স্বস্তি-মন্ত্র। 'পৃথিবীর মানুষ এক হও সকলে, মানুষের দুঃখ বিদূরিত হোক, কল্যাণ আসুক সর্বত্র…'

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভুলে গেলাম, বিদেশে এসেছি কয়েক হাজার মাইল দূরবর্তী বাংলাদেশ থেকে। এ-ও আমার আপন ভূমি, চারিপাশের এই সব মানুষ আমার আপনার। মহাচীনকে ভালবেসে ফেললাম সেই মুহূর্তে, আমাদের চিরকালের সম্পর্ক নতুন করে চেতনায় এলো। মনের সমস্ত আকুতি দিয়ে কামনা করলাম, কোন অমঙ্গল কখনো যেন স্পর্শ না করে এই শিশুদের! বোমা না পড়ে এদের মাথায়, রক্ত না ঝরে মাটির উপর। পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হোক—সূর্যের আলোর মতো এদের সোনার হাসি ছড়াক দিগ্‌দিগন্তে।

আমার হাত ধরে যাচ্ছে মেয়েটি—দোভাষিকে দিয়ে তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম। ওয়াই মিঁয়া। ডাকলাম নাম ধরে। ওয়াই-মিঁয়া, তুমি ওয়াই-মিঁয়া? সরল নিষ্পাপ মুখ তুলে সে মধুর হাসি হাসল।

স্টেশনেই জলযোগের ব্যবস্থা। তা-বড় তা-বড় যাঁরা এসেছেন, এতক্ষণে তাঁদের পরিচয় পেলাম। শহরের মেয়র, ডেপুটি মেয়র, শান্তি-কমিটির

প্রেসিডেন্ট, বড় বড় ব্যবসাদার ইত্যাদি। বেশভূষায় কিন্তু ঠাহর করবার উপায় নেই—মামুলি গলাবন্ধ-কোট ও প্যান্ট।

অপেক্ষমান মোটর স্টেশনের বাইরে। ছোট্ট সঙ্গিনীর হাতে হাত দিয়ে এসেছি, এইবার বিচ্ছিন্ন হব। হাত ঝাঁকাচ্ছে, বারম্বার ঝাঁকাচ্ছে—কচি তুল-তুলে হাতটুকুতে যত জোর আছে, সমস্ত দিয়ে শেকহ্যাণ্ড করছে। ছাড়বে না—ছাড়তে কিছুতে চায় না। তারপর মোটরে উঠে বসলাম। জীবনে আর কোনদিন চোখে দেখব না ওয়াই-মিঁয়াকে। নামটা রয়েছে খাতায়।

গাড়ী হোটেলে নিয়ে চলল। পার্ল নদীর উত্তর তীরে আই চুং হোটেল। ১৯৩৭ অব্দে তৈরি, পনের তলা প্রকাণ্ড বাড়ী। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল এবার-প্রবল ধারাবর্ষণের মধ্যে ভিজতে ভিজতে অবিচল জনতা তখনো গাইছে। গান ক্রমশ দূরবর্তী হয়ে একসময়ে মিলিয়ে গেল। হোটেলের ঘরে গম্ভীর রাত্রি অবধি মনে তার অনুরণন শুনেছি। এক হও, একপ্রাণ হও সমস্ত মানুষ…

(৫)

আশ্চর্য মেয়ে পেরিন। ক্ষীণ দেহ কিন্তু অসীম কর্মোদ্যম। প্রস্তুতি কমিটির ডেপুটি সেক্রেটারি-জেনারেল রমেশচন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে পেরিন রমেশচন্দ্র হয়েছেন। সে ভদ্রলোক তো আগেভাগে পিকিনে গিয়ে সম্মেলনের কাজে মেতে আছেন। পেরিন চলেছেন আমাদের সঙ্গে। কিংবা বলতে পারি আমাদেরই নিয়ে চলেছেন সঙ্গে করে। যাত্রা-পথে অজান্তে কোন সময় সকলের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

হোটেলে এসেই পেরিন বললেন, ঘরে গিয়ে দেখুন, মালপত্র ঠিক মতো পৌঁছেছে কিনা। সকালবেলা প্লেন—ওগুলা এক্ষুনি আবার ওজন হবে।

পিকিন প্রায় দেড় হাজার মাইল ক্যান্টন থেকে। ঠিক ছিল না, ট্রেনে যাওয়া হবে কি প্লেনে। স্টেশনেও ওখানকার কর্তারা সঠিক বলতে পারেন নি। এখন খবর হল, প্লেন পৌঁছে গেছে অতিথি নিয়ে যাবার জন্য। কালকের কয়েকজন পড়ে আছেন ত্রিশঙ্কুর অবস্থায়, তাঁরাও যাবেন। কিন্তু এত মানুষমাল একটা প্লেন একসঙ্গে বইতে পারবে না আজকে কেউ কেউ তাই থেকে যাবেন তাঁদের নিয়ে যাবে পরশু। কপাল ভালো, আমাকে আজকের দলে ফেলেছে।। কিন্তু কপাল মন্দ যে প্লেনের ব্যবস্থা হল। ট্রেনে গেলে কত দেশ দেখতে দেখতে কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় করে তিন চার দিন ধরে খুশমেজাজে যাওয়া চলত। এ-পথে সাধারণের জন্য বিমান চলাচলের ব্যবস্থা নেই। হয়ে ওঠেনি—প্লেনের ঘাটতি আছে মনে হয়। এই দিক দিয়ে ভারতীয় আমরা জিতে আছি। জিত আর কত! শীতে চামড়া চৌচির হলেও ওদের এক আঙুল

ক্রিম জোটে না—আর আমাদের মেয়েগুলো, অহরহ দেখতে পাচ্ছেন, কটকটে কালো মুখে পক্ক আপেলের আভা ধরাচ্ছে।

বাজে কথা থাক। সারাদিন ধকল গেছে, স্নান করে ঠাণ্ডা হই আগে। আমি আর পট্টনায়ক—ভুজনের কোণের ঘরে জায়গা। বাথরুমে তাকের উপর আন-কোরা নতুন টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, চুলে মাখাবার ভেসিলিন এবং ভেবেছিলাম গন্ধতেল—তা নয়, অডিকলোনের শিশি। সমস্ত দু-দফা করে। দরজার কাছে খাসের সুরম্য চটি দু-জোড়া, পায়ে দিয়ে ঘর-বারান্দায় ঘুরঘুর করে বেড়ান—এই আর কি! মাত্র একটা রাতের মামলা—সকালেই কাঁহা-কাঁহা মুলুক চলে যাচ্ছি। তারই জন্য এত! ভেবেছে কি বলুন তো? একেবারে ন্যাড়া হাত-পা নিয়ে ওদের মুলুকে এসেছি? দুই ব্যক্তি আমরা—অতএব দু-সেট করে প্রতিটি জিনিস। কিন্তু টুথপেস্টটাও কি এক টিউব থেকে নেওয়া চলত না? অডিকলোন দু-শিশিরই বা প্রয়োজন কিসে?

আতিথ্যের এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র ক্যান্টনে নয়, চীনের সর্বত্র। যে হোটেলে গিয়েছি, সেখানেই। পিকিন ছাড়া তিন চার দিনের বেশি থাকতে হয় নি কোথাও। ও-সব জিনিস স্পর্শ করি নি, নিজেদের সঙ্গে ছিল—সামান্য ক্ষণের জন্য নষ্ট করে আসব কেন ওদের জিনিস?

বুদ্ধিমান করিৎকর্মা ব্যক্তিও ছিলেন অবশ্য। একদা একজনের ব্যাগ থেকে চিঠির কাগজ বের করতে গিয়ে চীনা-অক্ষর মুদ্রিত টুথব্রাশ বেরিয়ে পড়ল। হোটেলের মাল ভ্রমবশত তাঁর ব্যাগে ঢুকে পড়েছে। সে ভদ্রলোক কিন্তু ভারতীয় নন, দিব্যি করে বলছি। নিজেদের গালমন্দ করি—কিন্তু আমাদের লজ্জা দিতে পারেন এমন বহুতর ধুরন্ধর আছেন ভুবনে।

স্নানের মধ্যেই শুনতে পাচ্ছি. হাঙ্গামাগুলো তাড়াতাড়ি চুকিয়ে নেবার জোর তাগিদ। অতিথিদের সম্মাননায় ভোজের আয়োজন—সময় হয়ে গেছে, ভোজের আসরে যেতে হবে এখনই।

আবার শুনছি, পট্টনায়কের কাছে কে-একজন প্রশ্ন করেছেন আমার নাম ধরে। ক্যান্টন শহরে অপরিচিত কণ্ঠে আমার নাম—তাই তো, কেও-কেটা ব্যক্তি আমি তো তবে!

খালি গা, ভিজে কাপড়চোপড়—সেই অবস্থায় বেরিয়ে এলাম। কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি—খাস বাংলা জবানে বললেন, আপনিই? পরিচয় করতে এলাম—আমি ক্ষিতাশ বোস। গান গাই। কাল থেকে আটক হয়ে আছি হোটেলে। আপনাদের সঙ্গে এক প্লেনে যাবো।

পরের দিন থেকে ক্ষিতীশ চীন-ভ্রমণে আমার নিত্যসঙ্গী। এক ঘরে থেকেছি।

পিকিন, সাংহাই, হ্যাংচাউ—প্রায় সর্বত্র। ছাড়াছাড়ি দমদম এরোড্রোমে ফিরে এসে।

ধুতি পরে গায়ে ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবি ঢুকিয়ে কাঁধের উপর শাল চাপিয়ে ভোজ-সভার মধ্যে জাঁকিয়ে বসা গেল। ভদ্রতা বজায় রেখে আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে সকলে আজব পোশাক দেখছে। পাশের চেয়ারে ক্যাণ্টন শান্তি-কমিটির সেক্রেটারী। নিজের কাপড়-চোপড়ের দিকে একবার নজর বুলিয়ে সগর্বে বললাম, আমাদের জাতীয় পোশাক।

কিন্তু ভারতীয় মানুষ আরো তো দেখছি। তাঁদের এ সজ্জা নয়—দৃষ্টির হল সইতে পারেন না বলে কড়া কোট-পাতলুনে তাঁরা অঙ্গ ঢেকে বেড়ান। লেখক মানুষ আমি—লোক না পোক—মানুষ গ্রাহ্য করি নে। তা হলে কি আজব গল্প ছাপার অক্ষরে ছাড়তে পারতাম?

খাঁটি চীনা পদ্ধতির ভোজ, খৃষ্টপূর্ব আমল থেকে ধারা চলে আসছে। সাজানো উপকরণ দেখেই উদর আঁতকে ওঠে। পঁচিশ-ত্রিশ পদ তো হবেই—ভাজা-ভুজিগুলো আবার হিসাবে ধরা হয় না। বিশ্বসংসারে হেন বস্তু নেই, ভোজের টেবিলে যা একবার দেখা না দেবে। নিরামিষের মধ্যে প্রধান হল ব্যাঙের ছাতা ও বাঁশের কোড়। আছে সুবৃহৎ পাত্রে চার-পাঁচ-সেরা এক-একটা অখণ্ড ভেটকি বা ঐ জাতীয় মাছ। দৃষ্টিপাতেই রোমাঞ্চ হয়। জন চারেকে মিলে চক্ষের পলকে ঐ বিশাল বস্তু শেষ করে ফেলছে। এহ বাহ্য, আসলে পৌঁছান নি কিন্তু এখনো। বন্ধুরা আমাকে হরবখত প্রশ্ন করেন, চীনাদের মূল-খাদ্য কি—চাল না গম? উঁহু, কোনটাই নয়—আসল হল মাংস। ভাত-রুটি ওগুলো ভোজন-শেষে মুখশুদ্ধির উপকরণ।

ভূচর খেচর জলচর—জীবব্রহ্মের সর্ব স্বরূপে এদের সমান আসক্তি। ব্যাং-আরশুলা সাপ-শুয়োর থেকে ইস্তক মা-ভগবতী। এক হাতে দুটি মাত্র শলাকার সাহায্য কঠিন তরল যাবতীয় বস্তু অবিরত মুখের গহ্বরে চালান করছে। এ-ও এক তাজ্জব দৃশ্য! খাওয়া দেখতে দেখতে ম্যাজিক দেখার স্ফূর্তি পাওয়া যায়। আমাদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে রপ্ত হয়ে উঠলেন দিন কয়েকের মধ্যে। ভারতীয় প্রতিভা যে কত উচ্চগ্রামের, তার একটি পরিচয়।

অসমর্থের জন্য অনুকল্প ব্যবস্থাও আছে—কাঁটা-চামচে। দু-পাঁচ দিন শলাকা-চালনার পাঠ নিয়েছি অনেকেই আমরা। মুখে নির্বিকার হাসি—যেন ভারি একটা রসিকতা হচ্ছে। আমাদের সেই কার্তিক—মনে আছে তো? ফড়িঙে পোকা ধরার মতো দুই কাঠিতে মুরগির ঠ্যাং সাপটে ফেলেছে মিনিট কয়েক ধস্তাধস্তির পর। চতুর্দিকে একবার তাকিয়ে নিল—অর্থাৎ দেখুন একবার

সর্বজনে চক্ষু মেলে। ভুলেও মুখের কাছাকাছি—হাঁ করেছে—হা ঈশ্বর! মাংসের টুকরো ছিটকে গিয়ে পড়বি তো পড়, তার সুবিখ্যাত আঠারো ডলারে ট্রাউজারের উপর।

সে যাই হোক, ধরা-বাঁধা কিছু নেই—কেউ মাথায় দিব্যি দিচ্ছে না, ঐ প্রণালীতে খেতেই হবে। উপকরণ সম্পর্কেও তাই। পচা গজালমাছ কি হাঙরের কাঁটার ঝোল যদি বাদ দাও, জেলে-ফাঁসে যেতে হবে না। মারাত্মক বিপদ হল, ভোজনপর্ব সমাধা হতে নিদেনপক্ষে ঘণ্টা তিনেকের ধাক্কা। আরম্ভ হয় ভদ্রতাসঙ্গত মৃদু ভাবে, রাশ ক্রমশ আলগা হয়ে আসে। চীন-ভারত মৈত্রীর নামে এক পেগ শেষ হল—ভরে দিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তিলেকের তরে গেলাস, খালি থাকতে দেওয়া যেন অপরাধ। ওরা ভরে ভরে দিচ্ছে, আপনি অবিশ্রাম শেষ করে যান। বিশ্বশান্তির নামে খান এক পাত্র, খান অতিথিদের সম্মাননায় উদ্যোক্তারাই বা বাদ যাবেন কেন, তাঁদের সমৃদ্ধি কামনা করে অতিথিদের থেকে প্রস্তাব করুন টোস্ট। চলেছে তো চলেছে—অন্তহীন প্রবাহ। এ হেন ভোজের অনুষ্ঠান হামেশাই ঘটে না, এই বাঁচোয়া। কোন নতুন জায়গায় গিয়ে পৌঁছলে অথবা বিশেষ কোন ব্যাপার ঘটলে। ভাতের সঙ্গে আমরা ডাল খাই, ভোজের সঙ্গে সুরাও তেমনি ওদের কাছে। খাচ্ছে সেটা কিছু নয়, কেউ খাচ্ছে না—সেটাই পরমাশ্চর্য ব্যাপার। তেমন নাকি নেশাও হয় না ঐ বস্তুতে। স্বীকার করছি আমি কাপুরুষ ব্যক্তি—যাচাই করে দেখবার সাহস হয় নি। এর জন্য ঝঞ্ঝাট কম পোহাতে হয়েছে! মদের বদলে গেলাসে অরেঞ্জ স্কোয়াশ ঢেলে স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্য পান করতাম। আমাদের দলপতি ডক্টর কিচলুও। রক্ষা এই, এই প্রকার কমবখ্‌ত নিতান্ত গোনাগুনতি। সামান্য কয়েকটি মানুষে রসভঙ্গের কারণ ঘটত না।

রান্না বহু বিচিত্র রকমের। অর্ধেক তৈরি করে অতিথিদের ভোজে বসিয়ে দেয়—তার পর এক একটা তরকারি শেষ করে গরমা গরম নিয়ে আসে। অত্যুষ্ণ এক বস্তু বড় পাত্রে করে এনে রাখল; পিছনে আর একজন আসে কড়াই ভরতি ফুটন্ত ঝোল নিয়ে। ঝোল ঢেলে দিল পাত্রের উপর। ছাঁত করে ঐ টেবিলের উপরই ফুটে উঠল একটুখানি। আমাদের ব্যঞ্জন সম্বরা দেওয়া আর কি? চামচে কেটে এবারে নিজ হাতে নিয়ে নিন যতটা প্রয়োজন।

বড় বড় ভোজ, চার পাঁচশ' মানুষ এক সঙ্গে খাচ্ছে, সেখানেও এই রীতি। কত লোক খাটছে না জানি, কি পদ্ধতিতে রান্নাবান্না করছে—ইচ্ছে করত রান্নাঘরে উঁকি দিতে। কিন্তু বিদেশের মহামান্য অতিথি—লজ্জায় বাধো

পরে একদিনের কথা। এক ভোজে খুব দেমাক করছিলাম, যে যা-ই করুক —আমি বেছেগুছে সাত্বিক খাওয়া খেয়ে এসেছি বরাবর। মেষ কিংবা মুরগি—তার ওদিকে যাই নি।

অধ্যাপক হয়া (যতদূর মনে পড়ে, পিকিন য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক এই ভদ্রলোক) খুব হাসতে লাগলেন।

কোন চিজ কখন রসনা বেয়ে উদরে ঢুকছে, সব কি টের পেয়েছ ভায়া ? এই ধরো, ভাজা-আরশুলার গুঁড়ো অতি উপাদেয় মশলা; ঐ গুঁড়ো ব্যঞ্জনে দু-চার টিপ ছড়িয়ে দিলে সেই স্বাদ ইহজন্মে জিভ থেকে মোছে না। এমন বস্তু থেকে মান্য অতিথিদের বঞ্চিত করেছি, এই কি হতে পারে কখনো ?

বলেন কী

সৌভাগ্য আছে নাকি ?

সত্যি কিংবা রসিকতা ঠিক ধরতে পারলাম না। আমতা-আমতা করে জবাব দিই, তা নয়। অত্যন্ত যদি ভাল লেগে যায়, দেশে ফিরে কোথায় পাবো বলুন আরশুলাচূর্ণ, কেউটের কাটলেট, অথবা হাঙরের সুপ ? ঐ ভয়ে এগুতে ভরসা পাই নি।

ওরা কিন্তু লজ্জিত নয় কিছুমাত্র। বাহাদুরি দেখায়, আজেবাজে আরও দশটা হাস্যকর খাদ্যের মিছামিছি নাম করে।

বলে, সব খাই আমরা। বিষটিষ না হয়, আর চিবানো গেলেই হল। কোন কিছু অকারণে নষ্ট হতে দেওয়া সামাজিক পাপ। তা সে মানুষ পশু পাখি কীটপতঙ্গ যা-ই হোক না কেন। সকলেরই মূল্য আছে।

তাই। চোর-ডাকাত, খুনি গুণ্ডা—ওরা বলে, তৈরি করে নিতে পারলে সকলেই অতি প্রয়োজনীয় সমাজের পক্ষে। জন্মপাপী কেউ নেই। গায়ে কালি লাগার মতো—চেষ্টা করে ধুয়ে-মুছে সাফসাফাই হওয়া যায়। তাই মৃত্যুদণ্ড দিয়েও মেরে ফেলে না সঙ্গে সঙ্গে। থাকো জেলের মধ্যে এক বছর দু-বছর। ভাল ভাল লোক যাচ্ছে তাদের কাছে, শিক্ষা দিচ্ছে, হিতকথা আলোচনা করছে। রিপোর্ট নিচ্ছে দণ্ডিতের মনোভাব সম্পর্কে। শোধরাচ্ছে যদি বোঝা যায় আরও সময় দেবে—প্রাণদণ্ড মকুব হয়ে দীর্ঘ কারাবাস। তারও মেয়াদ কমবে নৈতিক উন্নতির অনুপাত ক্রমে। আহা, জীবন নিলে সবই তো চুকেবুকে গেল—সমাজের কাজে লাগতে পারে বেঁচেবর্তে থাকলে। দেখাই যাক না চেষ্টা করে।

এমনি সকল ক্ষেত্রে। কুয়োমিনটাঙের সঙ্গে মারাত্মক লড়াই করে তবে দেশের দখল পেয়েছে। কোন ইতর কাজে পিছপাও হয়নি কুয়োমিনটাঙ

অধিকার বজায় রাখবার জন্য। বিদেশিরা যা করেছে, স্বদেশীয় শত্রুদের অপরাধ তার চেয়ে বেশিই। রেল রাস্তা উপড়েছে, পুল ভেঙেছে, কয়লার খনিতে কাদামাটি পুরে নষ্ট করে গেছে চলে যাবার সময়। কিছু কিছু তার নিদর্শনও আমাদের দেখাল। এত যারা ক্ষতি করেছে, সে দলের বহুতর পাণ্ডা আজ বড় বড় সরকারী চাকুরে—অনেক জরুরি বিভাগের অধিনায়ক। নতুন চীন গড়ে তোলবার কাজে তাদের উদ্যম ও আন্তরিকতা কারো চেয়ে কম নয়। একদা ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে যাদের উৎকট শত্রু বলে ভেবেছিল, আজকে অভেদাত্মা তাদের সঙ্গে। তিন বছরের * মহাচীন তাই বিশ্বজনের ডাক লাগিয়ে দিয়েছে। সবাই এসো, আন্তরিকতার সঙ্গে দেশ গড়তে লেগে যাও—সকলের কাছে সে আহ্বান পাঠিয়েছে।

প্রথম এই চীনের সামাজিক ভোজে বসেছি। বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এ-পাশে বিশিষ্ট কেউ, ও-পাশে দোভাষি, মাঝখানে আমরা এক-এক জন। অবিরত সওয়াল-জবাব চলছে। ফৌজদারি আদালত হার মেনে যায়। থাকব সামান্য কয়েকটা দিন—মহাচীনের যতদূর জেনে যেতে পারি তার মধ্যে। সাঁইত্রিশটা দেশের পৌনে চার শ' মানুষ মাসাধিক কাল জেরা করে বেড়িয়েছি। খাওয়ার টেবিলেও বিরাম নেই, খেতে খেতেই খাতা বের করে টুকছি। দেশস্থ বুদ্ধিমানেরা তবু খেদোক্তি করেন, কিছু জানতে দেয় নি রে—অভিনয় করে বোকা বুঝিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে খাওয়া শেষ করে রাতদুপুরে ঘরে এলাম। সকাল বেলা চলে যাচ্ছি। আর নয়, শুয়ে পড়ো। ঘুমিয়ে পড়ো তাড়াতাড়ি। নতুন-চীনের প্রথম রাত্রি। সারাদিন আনন্দ-ভাসিত যত মুখ দেখছি, অন্ধকারে সকলে যেন ঝিলিক হানছে। আরও আছে। বইয়ে পড়েছি আর শুনেছি যাদের কাহিনী। নামহীন যে শত-সহস্রের শবস্তূপ সিঁড়ি হয়েছে আজকের এ দিনে পৌঁছবার…

পুরনো কথা কিঞ্চিৎ অবধান করুন।

সাত-সমুদ্র পারে ইউরোপের বন্দরে ফিরিঙ্গিরা বহর সাজাচ্ছে। রাজা-রানীর কাছে দরখাস্ত করে, হুকুম দাও—ব্যাপার-বাণিজ্য করে আসি। তা পরের দেশে চরে খেয়ে বেড়াবে, বেশ তো, ভালই তো—এতে আর আপত্তির কি? ছাড়পত্র মিলল। রে-রে করে ছড়িয়ে পড়ে বণিকেরা নানান দেশে। বিশেষ করে এশিয়ার নির্বিরোধ সমৃদ্ধ সুপ্রাচীন দেশগুলোর উপর।

রেশম আর পোর্সিলেনের লোভে এসে পড়ল চীনে। চারুচিত্র-আঁকা যে

* আমরা ১৯৫২ অব্দে চীনে যাই।

কাগজ এঁটে ইউরোপ দেয়ালের বাহার করত, তা-ও এখানকার। চীন তার বদলে কিনত ঘড়ি, টুকিটাকি শৌখিন জিনিস। কিন্তু ঘড়ি আর কত কেনা যায় বলুন? প্রাচীন সভ্যতা ও শিল্পের দেশ চীন—বিদেশি ব্যাপারির কাছ থেকে কিনবার মতন জিনিস কী আছে?

অতএব রুপো খরচ করতে হবে চীন থেকে যদি কিছু কিনতে চাও। রুপোর ভাণ্ডার চলে যাচ্ছে চীনে, রুপো দিয়ে দিয়ে য়ুরোপ গরিব হয়ে যাচ্ছে। এ কেমনধারা ব্যবসা? খোঁজো কোন বস্তু, যা বদলাবদলি চলে। পুঁজি ভাঙতে হয় না যাতে।

ব্রিটিশরা অবশেষে পেয়ে গেল তেমনি বস্তু—আফিঙ। আফিঙের বোঝাতে বিবোক পড়ে পড়ে চান—চীনের মালে ভরা সাজিয়ে ব্যাপারি-জাহাজ ততক্ষণ দেশ-দেশান্তর পাড়ি দেবে। হাওয়া ঘুরে গেল। আগে অজস্র রুপো চীনে আসছিল, এখন তাবৎ জিনিসপত্র দিয়েও আফিঙের দাম শোধ হয় না। স্রোতের জলের মতো রুপো চীন থেকে চলে যাচ্ছে বাইরে।

তখন টনক নড়ল। নেশায় পড়ে গোল্লায় যায় এত বড় একটা জাত! দুই কোটি আফিঙখোর দেশের মধ্যে—দু-পাঁচ শ' নয়। আফিঙের আমদানি নিষিদ্ধ হল। কিন্তু ও বললে কে শোনে? ইংরেজ ইতিমধ্যে ভারতের আফিঙ একচেটিয়া করে বসেছে। তোমার না থাক, গরজ যে আমাদের। জবরদস্ত করে কেনাবো। আইনে না হোক, বে-আইনে চলবে আফিঙের আমদানি।

আরও এক ব্যাপার। ভারতবর্ষ মুঠোয় পুরে টাকার কুমির হয়ে পড়েছে ইংরেজ। কলকারখানায় বিলাত ভরে গেছে; পাহাড় জমেছে তৈরি জিনিস-পত্রে। খদ্দের চাই—পৃথিবী চুঁড়ছে খদ্দেরের চেষ্টায়। এত বড় চীনদেশ—আয়তনে গোটা য়ুরোপের চেয়ে বড়। ঢুঁ মারল সেখানে চীন, তোমার খদ্দের হতে হবে।

চীনের করুণ জবাব। সবই মোটামুটি আছে আমাদের—আমরা কিনব না তাই বললে কী হয়—ছি! অত বড় দেশ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, মাল নিয়ে আমরা তবে যাই কোথায়?

মিশনের পর মিশন আসছে। কখনো নরম সুর, কখনো গরম। শেষ মিশনের কর্তা লর্ড নেপিয়ারের প্রায় অর্ধচন্দ্র-প্রাপ্তি ক্যান্টন থেকে। ও দিকে আফিঙ আর আফিঙ—চোরাই আফিঙের ঠেলায় দেশ উৎসন্নে যাবার জোগাড়।

১৮৩৯। বিশ হাজার আফিঙের বাক্স চুরমার করে দেওয়া হল এইখানে—ঐতিহাসিক এই ক্যান্টন বন্দরে। চোরাকারবারিরা ব্রিটিশ ও আমেরিকার মানুষ—স্বদেশীয় সরকারের কাছে তারা হায় হায় করে পড়ল। কী অন্যায়,

কী অন্যায় !

বেশ, ভাল কথায় শুনছ না—কামানের মুখেই তবে রফা নিষ্পত্তি! ব্রিটিশ যুদ্ধঘোষণা করল, আমেরিকা সহায়। যুদ্ধান্তে নানকিনের সন্ধি। হংকং নিয়ে নিল ব্রিটিশ। অবাধ-ব্যবসায়ের পত্তন হল ক্যান্টন সাংহাই ইত্যাদি বন্দরে। যুদ্ধের যাবতীয় খরচ চীনকে দিতে হবে। এই হল আফিঙ যুদ্ধ। চীনের দরজা খুলে দেওয়া হল দেশ বিদেশের লুঠেরার সামনে!

মাঞ্চু-রাজারা দেশের মালিক। লড়াইয়ে হেরে তাদের ইজ্জত গিয়েছে। লোকের তেমন আস্থা বা আতঙ্ক নেই রাজার সম্পর্কে! সর্বনাশ, সাধারণ মানুষ শেষ-টায় ক্ষমতা পেয়ে যাবে নাকি? রাজরাজড়ারা সময়-বিশেষ অল্প অল্প বীরত্ব দেখালেও আসলে তাঁরা লোক ভালো, শেষ পর্যন্ত সামলে যান। তখন বিদে-শিরাই আবার নিজ স্বার্থে মাঞ্চু রাজার পিঠ চাপড়ায়। তোমায় পিছনে আছি আমরা, আর আমাদের কামান বন্দুক! এমন ধাতানি জুড়ে দাও যেন একটা মানুষ কোন দিকে মাথা তুলতে না পারে।

তবু চাষীদের মাঝ থেকে বিদ্রোহ উঠল। তাইপিং বিদ্রোহ। নেতাকে সকলে বলে 'স্বর্গের রাজপুত্র'। জোয়ান অব আর্কের মতো চাষীর ছেলে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পেয়েছেন। 'শান্তির রাজত্ব' বানাবেন তিনি। সাদামাঠা অতি-সরল তাঁর বক্তব্য—সকলে খাবে পরবে, জমি ও টাকাকড়ি সকলের হবে, সব মানুষ সমান। আজকের মাও সে-তুঙের কথা এরই রকমফের কি না, দেখুন ভেবে।

রাজশক্তি বিপন্ন—রাজার সঙ্গে যত দহরম মহরম থাক, এমন মওকা বিদেশিরা ছেড়ে দেবে কেন? এটা দাও, ওটা দাও—রাজার কাছ থেকে নানা সুবিধা আদায় করে নিচ্ছে। এরই মধ্যে একবার পিকিন শহরটা লুঠপাট করে কিঞ্চিৎ নগদ মুনাফাও হল। তারপর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সকলে দাঁড়াল তাইপিং গবর্ন-মেন্টের বিরুদ্ধে। খৃীস্টভক্ত মহাধার্মিক মিশনারীরা আগে থেকেই তাইপিঙের আতিথ্যে আছেন। খুব খাচ্ছেন দাচ্ছেন, তোয়াজে আছেন। তাঁরা গোপনে খবরাখবর জোগান। তাইপিং দল যত অতিথিবৎসল হোক, চাষা-ভুষো তো বটে! তারা রাজ্যপাট চালাবে, এটা কেমনে সহ্য হয়? দেশময় রক্তবন্যা। কৃষক-নেতা সেই স্বর্গের রাজপুত্র আত্মহত্যা করে বাঁচলেন তো তাঁর শিশুপুত্রকে কেটে রাগের শোধ নিল। পরিবারসুদ্ধ খতম—বংশে বাতি দিতে কেউ রইল না।

উনিশ শতকের শেষ গণ-অভ্যুত্থান—বক্সার-বিদ্রোহ। সাহিত্যিক দাদামশায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই বিদ্রোহ-দমন ব্যাপারে ইংরেজ-সরকার চীনে

পাঠিয়েছিল। রাজা হলেন বিদেশিদের যো-হুকুম তাঁবেদার, ভাল ভাল বন্দর বিদেশিরা নিয়ে নিয়েছে, রাজকরের বেশির ভাগ বিদেশির ট্যাঁকে যাচ্ছে লড়াইয়ের খরচের বাবদ। বন্যার জলে জমিজিরেত ঘরবাড়ি ভাসছে, ট্যাক্সের দায়ে মাথা বিক্রি। মানুষের দুঃখের অবধি নেই।

প্রতিকার চাই। প্রতিরোধ করতেই হবে। গুপ্ত-সমিতি চারিদিকে। শাসন-নীতির সামান্যতম বিরুদ্ধতা প্রকাশ্যে করবার জো ছিল না। বিশেষত চাষীর তরফ থেকে। এরা চাইল রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ তো বটেই—বিদেশিরও নির্বাসন। পশ্চিমি বণিক আর মাঞ্চু-রাজা সবাই ওরা এক জাতের।

রাজার তরফ থেকে তখন বিষম এক চাল চালল। চীনের আসল দুষমন হল বিদেশিরা—আমরা এই মাঞ্চু-রাজারা নই। বিদেশি আপদগুলোই যত দুঃখ-কষ্টের কারণ, ওদের তাড়াবার জন্যে রাজশক্তি সকল রকম সাহায্য করবে। এক হয়ে লড়বে রাজা ও প্রজা।

রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে আক্রোশ, সেটাও এমনিভাবে চালান করে দেওয়া হল বিদেশির অভিমুখে। মোট আটটা বিদেশি শক্তি—সকলে একত্র হল। হেরে গেল চীন। দেশ-শাসনের পুরোপুরি দায়িত্ব তারা নিল না। নলচে আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়ার মতো রাজাকে খাড়া রাখতে হবে সামনে। বুড়ি রাণীকে বাতিল করে তার দু-বছর বয়সের হামাগুড়ি-দেওয়া ছেলেকে রাজতক্তে বসাল। হেনরি পিউ-ই তার নাম—শেষ মাঞ্চু-সম্রাট।

রাজতন্ত্র খতম হল আরও পরে—১৯১২ অব্দে, সান-ইয়াৎ-সেন যখন সর্বমান্য দেশনেতা।

(৬)

রাত আছে তখনো। কড়া নাড়ছে। ঘুম ভেঙে চমকে উঠি।

কে?

দরজা খুললাম। সেদিন ঘুমোন নি। জাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন ঘরে ঘরে। উঠে সকলে তৈরি হও। রওনা হতে হবে।

আর যেই দরজা খোলা পেয়েছে, একজন সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল চা এবং ফলমূল ইত্যাদি নিয়ে। সেবা করুন কিঞ্চিৎ। পেট খালি থাকলে ধকল সামলাবেন কী করে?

পট্টনায়ককে ডেকে দিলাম।

খেয়ে যাও ভাই। শেষরাত্রে সাজিয়ে এনেছে—ফেলে গেলে ওরা দুঃখ করবে। দু ঢোক চা গিলে তাড়াতাড়ি আমি সুটকেশ খুলে বসলাম। ছোট সুটকেশের অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বড়টায় ভরে হালকা করে নেবো। কাল

বেশ ভোগান্তি হয়েছে আলস্যের দরুন।

কাজ সেরে বাথরুমে যাচ্ছি স্নানাদি সমাপনের জন্য। হবার জো আছে? পুনশ্চ তলব, চলে আসুন—

কোথায় গো?

ব্রেকফাস্ট তৈরি—কিছু খেয়ে যান।

আর এই যে—এটা কি হল? এখন অবধি সাপটে ওঠা যায় নি—বিছানার খাওয়া—এই আবার ধর্তব্যের মধ্যে নাকি? অনেক দূরের পথ। মনোরম ভাবে ঠেসে খেয়ে নিন, নইলে কিন্তু কষ্ট হবে।

অতএব ব্রেকফাস্টে গিয়ে বসলাম। সে পর্ব সমাধা করে লাউঞ্জে এসেছি—

বসবেন না আর। দরজায় গাড়ি, একেবারে গাড়িতে উঠে জুত করে বসুন।

ঘরে যাবো যে একবার। ছোট-স্যুটকেশ হাতে নিয়ে নেবো।

সে কি আর আছে? এরোড্রোমে পৌঁছে গেল এতক্ষণ।

চাই যে আমার সেটা। পথের দরকারি জিনিস তার ভিতর।

লিফটে উঠে পড়লাম। একপাশে আলাদা রাখা ছিল, স্বচক্ষে দেখে আসি। না, কিছুই নেই। সমস্ত নিয়ে গেছে। ঘর খাঁ খাঁ করছে।

নন্দীকে ধরলাম। এ বড় মুশকিল! লোকগুলো যেন মানুষ নয়, ঘড়ির কাঁটা। ওদের সঙ্গে তাল রাখি কেমন করে?

নন্দী অভয় দিলেন, পিকিন গিয়ে পেয়ে যাবেন। ভাবনা নেই।

আমার খাতাপত্তর যে ওর মধ্যে। এতখানি পথ হাই তুলে কাটিয়ে শেষটা হাতির মুণ্ড হয়তো গণেশের ধড়ে চাপাবো ভ্রমণ-কথা লিখবার সময়।

আচ্ছা—এরোড্রোমে চলুন। দেবো বের করে আপনার স্যুটকেশ।

নিশ্চিন্ত হলাম। নন্দী হলেন দলের একজন সেক্রেটারি—দস্তুর-মতো ক্ষমতা ধরেন, আমাদের মতো হেলাফেলার মানুষ নন। ওঁদেরই তাঁবে আছি—উঠতে বললে উঠি, শুতে বললে শুই। চুপি-চুপি নিবেদন করি, একুনে কত জন সেক্রেটারি—সেটা জিজ্ঞাসা করলে বিপদ। চেষ্টা করেছি, কিন্তু গুণে কূল পাই নি। এক-এক জন উদয় হয়ে হুকুম ঝাড়ছেন। কে বটেন ঐ মহাশয়? সেক্রেটারি। পিকিনে পৌঁছে হপ্তাখানেক কেটে গেল সেক্রেটারিবর্গের মুখ চিনতে। পাঞ্জাব-বঙ্গ-গুর্জর-মহারাষ্ট্র সকল দেশেরই আছেন। পুরুষ আছেন মেয়ে আছেন। তবে এটা বলা যায়, সেক্রেটারির সংখ্যা প্রতিনিধির চেয়ে কম। বেশি হলেও দোষ ছিল না। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি হতে পারে তো এতে আর আপত্তি কিসের?

এরোড্রোম শহর থেকে খানিকটা দূরে পাহাড়তলি জায়গায়। ঘাসবন হয়ে

গ্যাংওয়ের উপর। আকাশ-চারণ খুব যে চালু এমত মনে হয় না। গাড়ি থেকে নামিয়ে ওরা সমাদরে টেবিলের সামনে বসাল। সেই এক ব্যাপার। ফলের থালা, চা কফি, স্যাণ্ডুইচ, নানাবিধ শীতল পানীয়।
এবং সকরুণ মিনতি। সেবা করুন। দূরের পথ পিকিন—কখন পৌঁছচ্ছেন। ঠিক নেই—
ছাড়বে কখন বলো তো?
তাও বলা যাচ্ছে না। কী করবেন বসে বসে—খেতে থাকুন।
নন্দী প্রতিশ্রুতি ভোলেন নি। একে বলছেন, ওর কাছে দরবার করছেন— শেষটা হতাশ হয়ে এসে বললেন, জিনিসপত্তোর প্লেনে উঠে গেছে! পিকিনের আগে উপায় নেই।
সর্বনাশ! আমি কি করি তাহলে?
লেখার প্যাড থেকে তিনি খান তিনেক পাতা ছিঁড়ে দিলেন। এতেই যা-হোক করে চালিয়ে নিন আপাতত।
চীনাবন্ধু একজন ছিলেন পাশে। হেসে উঠে তিনি বলেন, কী মুখ বেজার করছেন। খান।
হায় ভগবান, পাকস্থলীর সঙ্গে একটা অতিরিক্ত থলি দিতে যদি! উটের যেমন আছে। তাহলে নিদেন পক্ষে বছরের খাদ্য আকণ্ঠ বোঝাই করে দেশে ফিরতাম। কত আঙুর আপেল পচিয়ে এসেছি, ভাবতে গিয়ে এখন রসনা লালাস্নিত হয়ে ওঠে।
আর কী বলব—আমাকে নিয়েই কি যত গোলমাল!
তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছি হোটেল থেকে। ভাবলাম সময় তো অঢেল— নতুন ককঝকে বাথরুম, চান-টানগুলো সেরে নেওয়া যাক এই ফাঁকে।
বেশিক্ষণ যায় নি। এরই মধ্যে কেমন মনে হল, বসবার ঘরটা নিঃশব্দ হয়ে গেছে, মানুষজনের সাড়া নেই। বেরিয়ে এসে—যা ভেবেছি তাই—এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। কা কস্য পরিবেদনা! প্লেন ছাড়া অবশ্য চাট্টিখানি কথা নয়, আগে অনেক রকম পাঁয়তারা ভাঁজতে হয়। আরও এগিয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে এরোড্রোমের একজনের সঙ্গে দেখা।
সবাই উঠে গেছে, আপনি পড়ে আছেন যে!
সগর্জনে প্রপেলার ঘুরছে। আমাকে ফেলে প্লেন চলল তবে তো সত্যিই। দৌড়চ্ছি। আমার আগে সেই লোকও দৌড়চ্ছেন। চিৎকার করছেন, রোখো—রোখো। কেউ শুনছে, তেমন লক্ষণ নেই। প্লেনের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে তিনি প্রচুর হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

তারপর আমার দিকে ফিরে হাতের ইঙ্গিতে দৌড়াতে নিষেধ করলেন। অর্থাৎ ওরা দেখতে পেয়েছে, আর ভয় নেই। জোর কমতে কমতে প্রপেলার বন্ধ হয়ে গেল। প্লেনের দরজা বন্ধ, সিঁড়ি সরিয়ে নিয়েছে, মিনিট খানেকের মধ্যেই খুলতে শুরু করল। আবার সিঁড়ি লাগিয়ে দেওয়া হল। দস্তুরমতো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তখন আমার। একটা সিটে ধপাস করে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলাম। তারপর সামলে নিয়ে অভিমান ভরে পাশের ব্যক্তিকে বললাম, বেশ কিন্তু আপনারা! একটা লোক তেপান্তরে পড়ে রইল, কারো তা হুঁশ হল না? পথের উপর মারা পড়লে পায়ের ধাক্কায় মড়া ঠেলে এগিয়ে চলে যাবেন, সেই রকম দেখছি।

আকাশলোকে উড়তে উড়তে নন্দীর দেওয়া চিঠির কাগজে যা লিখেছিলাম, কতকটা তার অবিকল তুলে দিচ্ছি। একটা কথারও এদিক-ওদিক করিনি—

২৩ সেপ্টেম্বর '৫২, বেলা ১০টা। দূরের পাল্লা, ট্রেনে যেতে দিন তিনেক লাগে। তাই উড়ে চলেছি। পার্ল নদী পার হয়ে ছুটেছি উত্তরমুখো। মহাচীন, সুপ্রাচীন কাল থেকে আমার ভারতবর্ষের কত মহাজন, দিন, মাস, বৎসর ধরে তোমার ভূমির উপর পথ অতিবাহন করেছেন। আমরা নূতন কালের যাত্রী—তোমার দিগন্তপ্রসার আকাশের উপরে উড়ে চলেছি।

উপরে, কত উপরে! নিচে কিছু দেখা যায় না। কলঙ্কলেশহীন শাদা মেঘপুঞ্জ—সেই শ্বেত সমুদ্রে ভেসে ভেসে চলেছি। আমার বাম দিকে সূর্য ম্লান রৌদ্রের কর-বিস্তার করছে—আর এদিকে-ওদিকে যতদূর তাকাই অনন্ত অপার মেঘসমুদ্র। ঈষৎ তরঙ্গ উঠেছে সেই সমুদ্রে; আবার মনে হচ্ছে, দুধ-সাগর—দুধ ঢেলে দিয়েছে সমস্ত অন্তরীক্ষে; দুধেরই ফেনা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। ভাসমান হিমশিলার মতো ঐ কয়েকটি মেঘস্তূপ। দুধসাগর ফুঁড়ে ক্ষীরের পাহাড় উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে নাকি? আকাশপথে কত ঘুরেছি, কিন্তু এমনটা দেখি নি কখনো। উত্তর-মেরুর অভিমুখে চলেছি—তুষার-লুপ্ত মেরুলোকের কথা কেতাবে পড়া যায়, এ যেন সেই বস্তু।

তন্দ্রা মতো এসেছিল। অপরাধ নেই, কাল রাতে ভোজ খেয়ে সাড়ে-এগারোটায় শয্যা নিয়েছি। রাত থাকতে উঠে গোছগাছ করতে হয়েছে। ওরই মধ্যে চা এবং ফল ইত্যাদি এনে দিয়েছে কামরায়। আবার ব্রেকফাস্ট সাড়ে-ছটায়। এরোড্রোমেও ব্যবস্থা ছিল, একাধিকবার গলাধঃকরণ করতে হয়েছে। প্লেনের মেয়েটি এখানেও নিবেদন করছে, কিঞ্চিৎ চলবে কিনা? পরের দেশে এসে পর-খাদ্য পেয়ে ক্ষিধে অসম্ভব রকম বেড়েছে দেখছি অনেক জনের। আমি ঐ মহাশয়দের পদবাচ্যের যোগ্য নই। খেয়েই যাচ্ছেন তাঁরা—প্রাণপণ প্রয়াসে

থাচ্ছেন। সাধ্য কী পাল্লা চালাতে পারি! আপোসে হার মেনে বসে আছি। মেয়েটা বারংবার বলছে। কফি খেয়ে মান রক্ষা করলাম। চিত্র-বিচিত্র গেলাসে কফি এনে দিনে দিল। কাগজের গেলাস—খাওয়ার পর ফেলে দিতে হয়, কিন্তু এমন মনোরম ছবি ঐ স্বল্পস্থায়ী জিনিসে যে গেলাসটা সযত্নে মোড়ক করে বাক্সে তুলতে ইচ্ছে করে।

চারিদিক এখন রোদে বিভাসিত। স্বচ্ছ সুন্দর আকাশ। আবার চোখ বুজেছি। হঠাৎ এক অপরূপ অনুভূতি—চোখ মেলে দেখি, মেয়েটা এক পাতলা কম্বল আবার পায়ের উপর দিয়ে চারপাশ পরম যত্নে মুড়ে দিচ্ছে। আর ইতিমধ্যেই কোন সময় চেয়ারের ঠেশান নামিয়ে আরামে ঘুমের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অনেক দিন আগে, মা যখন ছিলেন—ঘুমন্ত ছেলে এমনি যত্ন পেত। আজকে এই ভিন্ন দেশে তুমি কোন মমতাময়ী আমাদের এমন স্নেহ দিচ্ছ! শুধু সামাজিক কর্তব্য—তার বেশী নয়? ভাবতে মন চাচ্ছে না।

পাইলটের ঘর থেকে স্লিপ এলো—কুনাং প্রদেশ, চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙের দেশের উপর দিয়ে যাচ্ছি। বিচিত্র নিসর্গ দৃশ্য। প্লেন যাচ্ছিল দশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে—নেমে নিচুতে এল। নিঃসীম সবুজ পাহাড়—আঁকাবাঁকা নদী-রেখা—সবুজের মধ্যে সাদা ঝিকিমিকি। সুদীর্ঘ অজগরগুলো ঘুমুচ্ছে যেন পাহাড়ের কোলে রোদ পোহাতে পোহাতে। ধোঁয়ার মত এক ঝলক মেঘ এসে দৃশ্যটা ঢেকে দিল একবার। মেঘ সরে গেল—খণ্ড খণ্ড মেঘ পেঁজা-তুলোর মতো বিচ্ছিন্ন ভেসে বেড়াচ্ছে আমাদের অনেক নিচে। সামনে আবার দুস্তর মেঘসমুদ্র। হয়তো তারই মধ্যে গিয়ে পড়বে এখনই…

স্লিপ এলো, ১১-১৭ মিনিটে হ্যাঙ্কাউ পৌঁছচ্ছি। আবহাওয়া সুন্দর। এরো-ড্রোমটা উ-চ্যাং নামক জায়গায়; সেটা হ্যাঙ্কাউ-এর আড়পার।

সওদাগর ছোকরাটি প্লেনে উঠেই চোখ বুজেছেন, এবং অনন্তনিদ্রা দিচ্ছেন। তাঁর কোনদিকে লক্ষ্য নেই। ট্রেনেও দেখেছি একই ব্যাপার—গাড়িতে ওঠা মাত্র ঘুমিয়ে পড়েন। আর খাওয়ার আহ্বান এলে চোখ মেলে অগৌণে খেতে শুরু করে দেন। সাতে-পাঁচে কোন তালে নেই। এক বন্ধু বলছিলেন, আপনারা নানান বড় বড় কথা বলেন—তার মধ্যে উনি থই পান না। অতএব, ঘুমিয়ে থাকাই নিরাপদ। ঘুম না এলে চোখ বুজে নিঃসাড়ে থাকেন।

ক্ষিতীশ ধরে পড়ল, বাংলা গান সে গাইবে—তার ইংরেজি অনুবাদ করে দিতে হবে। নইলে বুঝবে কে? অঙ্কে পরে কা কথা—আমাদের অবাঙালিরাও তো হাঁ করে চেয়ে থাকবেন। আরে দূর, এখন এই প্লেনের মধ্যে হয় নাকি? শিখিয়ে দিয়ে বসি আগে জুত করে। কিন্তু নাছোড়বান্দা ক্ষিতীশ।

সরস্বতী মুখাগ্রে এলেন সহসা। গানের এক-এক পদ শুনছি, আর গড় গড় করে ইংরেজি বলে যাচ্ছি। আড়াই মিনিটে খতম। তার মানে, নিরঙ্কুশ অবস্থা—বাংলা আর ইংরেজি পাশাপাশি মিলিয়ে কে দেখতে যাচ্ছে বলুন? মিছে ধরা পড়বার ভয় নেই—অনুবাদটা শ্রুতিসুখকর এবং মূলের সঙ্গে তার ভাসা ভাসা মিল থাকলেই হল।···

চীনের বৃহত্তম নদী ইয়াংসি। তারই তীরে হ্যাঙ্কাউ। প্লেন যেখানটা নামল, সে এক মাঠ—উলুঘাসে ভরা। এরোড্রোম কে বলবে তাকে? মাঠের মধ্যে খানিকটা জায়গা সাফসাফাই করে নিয়েছে। ভাঙাচোরা গ্যাংওয়ে—কোন প্রভিকে অতি সাবধানে ওঠানামা করতে হয়। বিশ্বযুদ্ধের সময় দায়ে পড়ে তাড়াহুড়োর মধ্যে তৈরি। তারপর শুনতে পেলাম, কুয়োমিনটাং চলে যাবার সময় নষ্ট করে দিয়েছিল। এমন একটা নয়—অনেক জিনিসই। সমস্ত আবার নতুন করে গড়তে হচ্ছে। শান্তি সম্মেলনের ব্যাপারে ক্যান্টন পিকিন বিশেষ প্লেনের যাতায়াত চলছে, বিমানঘাঁটির কর্মতৎপরতা তাই বেড়েছে এই ক'দিন।

অনেকগুলো মোটরগাড়ি। প্লেন নামবার সময় লক্ষ্য করেছি। ভূতলে পা দিতেই যথারীতি ফুলের তোড়া নিয়ে অভ্যর্থনা। প্রচুর হাততালি।

একজন বা দু'জন এক-এক মোটরে। শহরে নিয়ে যাবে নাকি? নদীর দু-পারেই শহর, প্লেন থেকে দেখেছি। কিন্তু দূর অনেকটা যে এখান থেকে। তা নিয়ে যাও যেখানে তোমাদের খুশি। শুধু মাঝপথে আবার গিলতে বসিও না দোহাই।

সিকি মাইলও হবে না—মোটরগুলো মাঠের সীমানায় গিয়ে থামল। নূতন বাড়ি তুলছে, আরও তুলছে। এয়ার অফিস ও লোকজনের বসবার জায়গা। স্বচ্ছন্দে এটুকু হেঁটে আসতে পারতাম, কিন্তু অতিথির পা মাটির উপরে উঠবে পড়বে,, এ কেমন কথা! আর যা আশঙ্কা করেছিলাম—ঘরের মধ্যে নিয়ে বসাল, সামনে টেবিল, টেবিলের উপর খাদ্যসম্ভার।

করজোড়ে নিবেদন করলাম, নিতান্ত অক্ষম, নিরুপায়—মাপ করতে হবে। তাই হয় নাকি? শান্তির সৈনিক আপনারা—নারাজ হলে চলবে কেন? সময় নেই যে একটা দিন আটকে রেখে দেখিয়ে শুনিয়ে দিই, মন খুলে দুটো কথা বলি। এর উপরে একটু কিছু মুখে না দিয়ে যদি চলে যান, আমাদের ভারি দুঃখ হবে।

অন্তরের বাঁধুলি বকুনি নয়, প্রতিটি কথা আন্তরিকতায় স্নিগ্ধ। নির্গত হচ্ছে মুখ থেকে নয়, অন্তর থেকে। এমন নিবিড় আতিথ্য একান্তরূপে আমা-

ন্নের প্রাচোর। পথে প্রান্তরে অচেনা আত্মীয়েরা বাৎসল্য বিছিয়ে আহ্বান করেন।

সময় বেশি নেই, প্লেন ছাড়বে আবার এখনই। ক্ষিতীশ গান ধরল। সুদূর-বিস্তৃত ইয়াংসির শীতল হাওয়ায় সুরতরঙ্গ খেলে বেড়াচ্ছে। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। শেষ হল গান। ইংরাজিতে আমি গানের মর্ম বললাম। দোভাষি ছেলেটি চীনা ভাষায় বুঝিয়ে দিল সকলকে। করতালি-ধ্বনি। নিরলস ক্ষিতীশ। গানে তার আপত্তি নেই। শেষ হয়ে গেলে ওদের একজন হাত ধরে টানে।

আর নয়, এবারে রওনা—

মোটরগাড়ি নিয়ে গেল প্লেনের পাশটিতে। আকাশে উঠলাম আবার। এক পাক ঘুরে ইয়াংসি মহানদীর উপর। বিপুল বহুব্যাপ্ত জলরাশি। সমস্ত সুস্পষ্ট দেখছি। বাঁধ দিয়ে নদীর বন্যারোধ করা হয়েছে। দিগ্ব্যাপ্ত চর। চরের এখানে ওখানে ক্ষেত, সরু নদী মাঝে মাঝে চর কেটে বেরিয়ে গেছে। শস্যশ্যামায়িত রূপ দেখে দুচোখ প্রসন্ন হয়। ঘরবাড়িতে ভরা এক একটা জায়গা—গ্রাম ওগুলো। কতগুলো গ্রাম ঐ নদীচরে, কে গুনে বলবে? দালানকোঠার ছাত নজরে পড়ছে। অতএব সমৃদ্ধিমান জনপদ। সুদীর্ঘ রাজপথ গেছে গ্রামগুলি সংযুক্ত করে। টুকরো কাগজে বর্ণনা লিখে রাখলাম— কোন একদিন এই লেখা পড়তে পড়তে চরভূমির পরিপূর্ণ ছবি মনে ভাসবে। ইয়াংসি আর দেখা যায় না, পাহাড়ের আড়ালে পড়ে গেছে। চলেছি, চলেছি......কতদূর আর পিকিনের! লাঞ্চের সময়টা এবারে আর কোন ওজর গ্রাহ্য হল না। মুরগির ঠ্যাং, আর কিসের মাংস, ডিম, কাঁকড়ার একটা উপাদেয় তরকারি, নানা রকম ফল। খাওয়া শেষ করে কাচের জানলায় অলস দৃষ্টি বিস্তারিত করে বসলাম...

বেলা পড়ে এসেছে। ঘণ্টা বাজল, চীনা লেখা ফুটে উঠেছে সামনের দেয়ালে। অর্থাৎ পেটি বাঁধো, পিকিন নিকটবর্তী, প্লেন নামবে। বড় নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছে। গেরুয়া বালুবেলা, ঘোলা জল। শহর দেখা যাচ্ছে। রেললাইন, নদীর উপরে পুল, জল-স্রোত দুর্বার বেগে চলেছে...

(৭)

পিকিনে নামলাম, তখন সন্ধ্যা আসন্ন। ফুলের তোরা সহ তেমনি শিশুরা। বিশিষ্টরা অনতিদূরে। ভারত-দূতাবাস থেকে এসেছেন শ্রীযুক্ত পরাঞ্জপে। মারাঠি যুবা—সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও কর্মিষ্ঠ। চীনকে ভালবাসেন মনে প্রাণে, তার সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি পরম প্রীতিপর। পিকিনে

বছর পাঁচেক আছেন, দূতাবাসের চাকরি সম্প্রতি পেয়েছেন। আমাদের এক তরুণ বন্ধু সতীরঞ্জন সেন শান্তিনিকেতন থেকে চীন গিয়েছিলেন—এঁরা দুজনে সতীর্থ। সতীরঞ্জন আমার সম্পর্কে খান কয়েক চিঠি দিয়েছিলেন, পরাঞ্জপের না মণ্ড ছিল। কিন্তু বিমানঘাঁটির ব্যস্ততার মধ্যে পরিচয় এখন সম্ভব হল না।

ভারতীয় দলের অনেকে আগে গিয়ে পৌঁচেছেন—তাঁরাও এই বিমানঘাঁটি অবধি এগেছেন। পরিচয়ের দু-চারটে কথার পরে সেই ব্যাপার—খেতে বসে যাও এবার—

শ্রীমতী আচার্য এগিয়ে এসে আপত্তি জানান। আর সবাই থাক, ক্ষিতীশের খেলে চলবে না। দলের মধ্যে সবে-ধন এ একটি গায়ক। ক'দিন আগে এসে ও'রা মহা বিপদে পড়েছেন। চীনা মেয়েগুলো অস্থির করে মারছে। গান শোনাও তোমরা—ভারতের গান। গানের পর গান তারাই গাইচে, ভারতীয়র মুখ ভোঁতা করে আছেন। কিন্তু কেন? গান গায় না, হেন মানুষ নেই। ম্যালেরিয়া জ্বর, প্রেমোদয় কিম্বা ভূতের ভয় হলে গেয়ে থাকেন না আপনারা গান? তারই দু-একখানা ছাড়লেই হত। বামোকা হার স্বীকার করার মানে হয় না।

আমরা তো খাওয়ার টেবিলে জাঁকিয়ে বসেছি, আর ওদিকটায় নাচ-গান। বাংলা গান ও চীনা গানে মেশামেশি, ভারত ও চীনের ছেলেমেয়ে হাত-ধরাধরি করে নাচছে। ওরা চীনা ধরেছে, এরা তখন হুঁ-হাঁ করে গলা মেলাচ্ছে সেই সঙ্গে; আবার বাংলা গানের সময় ওদের সেই ব্যাপার। তাই দেখলাম—ভাষায় পার্থক্য কিছুই নয়, ভূমির ব্যবধানও মিলনের বাধা হয় না। মন একমুখী হলে নিমেষে মিল হয়ে যায়।

চেয়ে চেয়ে দেখি, অজ পাড়াগাঁর চেহারা—শহরের নিশানা নেই কোন দিকে। তরিতরকারির ক্ষেত, ধানবন। কৃষকদের বাড়ি—মাঝে মাঝে টালি-ছাওয়া পাকাবাড়িও দেখা যাচ্ছে।

এমনি চলতে চলতে আমাদের বাস রেল-রাস্তা পার হয়ে বিশাল পাঁচিলের দরজায় এসে দাঁড়াল। বড্ড ভিড়। ভিড় কাটিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকলাম ভিতরে। আসল পিকিন পাঁচিলের চৌহদ্দির মধ্যে; পাঁচিলের বাইরেটা শহরতলি বলা যায়। খুব বড় দরজা পাঁচিলে—বড় দরজার দু-পাশে দুটো ছোট দরজা। উপরে চৌকি—নগর-প্রহরার ব্যবস্থা সেখানে।

কী পাঁচিল রে বাবা! যেমন উঁচু, তেমনি চওড়া। কোন যুগে লয় পাবে না। মহারাবেরা বানিয়েছে। হবে না কেন, সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে একটা

হল মহাপ্রাচীর—সে তো এদেরই কীর্তি। স্থাপত্য শিল্পে মহা ওস্তাদ। কোন শিল্পেই বা নয়? আর দু-এক দিনের মধ্যেই টের পেলাম, সেকালের ক্ষমতাদের নতুন-চীনে আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। বড় বড় ইমারত, রেল-লাইন, নদীর বাঁধ, পুল-রাস্তা যেন মন্ত্রবলে অবিশ্বাস্য রূপ কম সময়ে গড়ে তুলেছে। যেমন একটা দেখলাম—শান্তি হোটেল। আটতলা বাড়ি, আধুনিক সকল রকম আরামের ব্যবস্থা বিশাল অট্টালিকায়। নবীনতম অলঙ্করণ ও রূপসজ্জা। মতলবটা উঠেছিল শান্তি সম্মেলনের ব্যবস্থা উপলক্ষে। বাইরে থেকে বিস্তর অতিথি আসছেন, একমাত্র পিকিন হোটেলে সকলেরই ঠাঁই হবে না। অতএব বানাও নতুন হোটেল-বাড়ি। তিন মাস সময় দেওয়া হল। কিসে লাগবে অত সময়—পঁচাত্তর দিনের মধ্যে সমস্ত শেষ।

মন্ত্রটা কি, জানতে চেয়েছি। বহু জনের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। বিশাল দেশের অগণ্য নরনারীর মধ্যে নতুন প্রাণের উন্মাদনা। দেশটা যে তাদেরই সমস্ত সত্তা দিয়ে বুঝেছে—এত দিন খেটে এসেছে—খাটনির যা মজুরি, তার বেশি প্রত্যাশা ছিল না। আজকের প্রাপ্তি অনেক বেশ—শুধুমাত্র নিজের জন্য নয়, খাটছে নিজের দেশের জন্য। কাজ করে টাকা পাচ্ছে আর পাচ্ছে দেশ-সেবার আনন্দ। পরিশ্রম তাই দ্বিগুণ করেও কাতর হয় না।

যাক সে কথা! পাঁচিল পার হয়ে তো পিকিনে ঢুকলাম। পিকিন-মানুষের কথা পড়েছি—পাঁচ লক্ষ বছরের পুরানো কঙ্কাল। সেই কঙ্কালের সঙ্গে পাওয়া গেল পাথরের অস্ত্রশস্ত্র এবং অগ্নি-ব্যবহারের নিদর্শন। পিকিনের কিছু দূরে চৌকৌতিয়েন নামক জায়গায়। মানবিক সভ্যতা এবং চীনজাতি যে কত পুরানো—তার ধারণাতীত পরিচয় মিলল।

আদি শহর খ্রীস্ট-জন্মের সাড়ে এগারো শ' বছর আগে তৈরি। তার পরে হাত-ফেরতা হয়েছে কত বার, কত রূপান্তরিত হয়েছে! নামও পালটেছে। রাজধানী এধারে-ওধারে সরেছে নানা শতাব্দীর রাষ্ট্র বিপর্যয়ের সঙ্গে। মিলে-মিশে সমস্ত এখন এক হয়েছে, পিকিন তাই এত বড়।

পাঁচিল ঘিরে তবু ঠেকানো যায় নি আততায়ীদের। এই সেদিনের ব্যাপার, ১৯০০ অব্দ। ইংরেজ, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স, রুশ, জার্মান, ইটালি, অস্ট্রিয়া—আট জাত মিলে শহর লুঠ করল। জাপানিরা লড়াই চালাল এই জায়গায় ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ অবধি। আরও কত দুর্যোগ এমনি। অধিবাসীরাও রুখে দাঁড়িয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে। রক্ত দিয়েছে। বেদনা ও গৌরবের অপরূপ স্মৃতি-রঞ্জিত মহাপ্রাচীন নগর এই পিকিন।

টানা দেওয়াল রাস্তার একদিকে। চলেছে তো চলেইছে।

কি ওটা? কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলাম।

নিষিদ্ধ শহর (Forbidden City)। ওর মধ্যে অগণ্য প্রাসাদ, প্রমোদ উদ্যান, কৃত্রিম পাহাড়, লেক—পৃথিবীর যাবতীয় নিসর্গ-বৈচিত্র্য সযত্নে বিরচিত হয়েছে। রাজারা থাকতেন আর থাকত তাঁদের অগুন্তি পত্নী ও উপপত্নী। রাজার প্রসাদধন্য ভাগ্যবতীরা প্রথম তারুণ্যে আমোদ-উৎসবের মধ্যে একদিন এই রহস্যপ্রাচীরের অন্তরালবর্তী হত, বাইরে আসা ঘটত না জীবনে আর কোন দিন। মরার পরেও নয়—ওরই মধ্যে গোরস্থান। আমাদের বনেদি বধূর একটুখানি তবু সুবিধা, মড়া পোড়াবার বাবদে নদীকূলে নিয়ে আসে—খোলা হাওয়া গায়ে লাগে সেই সময়। চীনা রাজবধূদের মরেও ছাড়ান নেই। বিশ্বের যাবতীয় শোভা-সৌন্দর্যের নমুনা তাই নিষিদ্ধ-শহরের ভিতরে। সুন্দরী ধরিত্রী দেখার সুখ করে নাও জায়গাটুকুর মধ্যে বিচরণ করে।

জনসাধারণ ঢুকতে পেতো নিষিদ্ধ-শহরের বাইরের দিকে সামান্য দূর অবধি। পিকিন শহরের ভিতর দেওয়াল-ঘেরা আর এক শহর।

আজকে দিন পালটেছে। অবাধ গতি সেখানে সকলের। মিউজিয়াম, লাইব্রেরী, সান-ইয়াত-সেন পার্ক, শ্রমিকের আরাম প্রাসাদ—অসংখ্য রকমের প্রতিষ্ঠান। নতুন-চীনের কলহাস্যে মুখরিত সেকালের নিষিদ্ধ-শহর!

বিচিত্র বৃহৎ ফটক। মাও-সে-তুঙের প্রকাণ্ড ছবি সেখানে। স্বর্গীয় শান্তির দ্বার (Gate of Heavenly Peace); চীনা নাম—তিয়েন-আন-মেন। পিকিনের কেন্দ্রভূমি দেয়াল ফুঁড়ে পাঁচটা ফটক পাশাপাশি। ফটকের উপর তলায় হল, সুপ্রশস্ত অলিন্দ। সামনে পরিখা, পরিখার বড় কবিত্বভরা নাম—সোনালি জলের নদী। মার্বেল পাথরের পাঁচটা সেতু দরজার সামনা-সামনি। লোহার খুঁটির উপর পাঁচতারার নিশান—মাও সে-তুঙ ঐ নিশান টাঙিয়েছিলেন ১লা অক্টোবর, ১৯৪৯। আরও এক নতুন স্তম্ভ তৈরি হচ্ছে মুক্তি-সংগ্রামে যারা মারা গেল তাদের স্মৃতিতে।

সামনে পার্ক। এটাও ছিল নিষিদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে। রাজার দেহরক্ষীরা থাকত। এখন বিমুক্ত। বহু রক্তাক্ত ইতিহাস আছে এই জায়গার।

তিয়েন-আন-মেনে নতুন করে রঙ ধরাচ্ছে, ১লা অক্টোবর সমারোহ হবে তার জন্য। ঐ বিশাল অলিন্দের উপর দাঁড়াবেন নতুন-চীনের নায়কবৃন্দ—দাঁড়িয়ে জনগণের উল্লাস দেখবেন, অভিবাদন গ্রহণ করবেন।

আর অদূরে সাত তলা আকাশচুম্বী অট্টালিকা—ঐ হল পিকিন-হোটেল। আমাদের জায়গা ওখানে।

ডক্টর কিচলু কোথায়—আমাদের দলপতি ?
হোটেলে পা দিয়েই খোঁজ করছি। বাতের ব্যথায় তিনি শয্যাশায়ী—ঘরে আছেন।
সুইচ টিপতে আলো জলে ঘর বিভাসিত হল।
দূর থেকে দেখেছি তাঁকে কয়েক বার। আর আশৈশব জেনে এসেছি, অনেক উঁচুর মানুষ। পাঞ্জাব-কংগ্রেস বলতে সেকালে ছিল দুটি মানুষ—সত্যপাল আর কিচলু। তাঁদের গ্রেপ্তার করল (৯ই এপ্রিল, ১৯১৯) ; অমৃতসরে হরতাল—একটা বিড়ির দোকান অবধি খোলা নেই। বটে, ইংরেজের কামানে মরচে ধরে নি—মজা বোঝ তবে। ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের কুয়া ভরতি মড়ার গাদায়, রক্তের ধারায় তৃণভূমি রাঙা। তারপর আহিমাচল-কুমারিকা থেকে উঠল গান্ধিজীর নেতৃত্বে।
আইন-ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কিচলু ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। যাবজ্জীবন কারাগার। কিন্তু আটকে রাখা গেল না অত কাল একটানা ; জনদাবিতে ছেড়ে দিতে হল। তা একবারে না হল তো ছয় বারে। দশ বছর জেলে কাটালেন মোটমাট। তারপর এলো পাকিস্তানের আন্দোলন। দেশবিভাগ তিনি স্বীকার করলেন না, তাই খুন করতে গেল। অমৃতসর থেকে তখন দিল্লিতে আস্তানা। সেখানে হাঙ্গামা তো কাশ্মীরে। প্রাণভয়ে মত বদলান নি, অর্থ ও নেতৃত্ব প্রলুব্ধ করে নি কখনো। সেই কিচলু। মানুষের দিকে অত্যন্ত অবিশ্রান্ত লাঞ্ছনা। এতবার জেল, এত নির্যাতন আত্মীয়, বন্ধু, সহকর্মি—প্রায় সকলে পরিত্যাগ করল, নিন্দা-লাঞ্ছনার অন্ত নেই—নির্বিকার ডক্টর কিচলু। যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব থেকে একটিমাত্র পথ ধরে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হয়ে এলেন—কংগ্রেসের পথ।
ভারতের শান্তি-আন্দোলনে সকলের পুরোভাগে তিনি। নিঃসংশয়ে জেনে রেখেছেন, রাজনীতি-পঙ্কের উপর এই স্ফুট-কমল। সকল মানুষ শান্তি ও সম্প্রীতিতে থাকবে, প্রভু বুদ্ধ থেকে মহাত্মা গান্ধি—একই জীবন-সাধনা সকলের।
বয়স ও শরীরের গ্লানি অবহেলা করে কিচলু চলে এসেছেন এতদূর এই পিকিনে। শয্যার উপর উঠে বসে সোল্লাসে বললেন, এসো, এসো—
এসো বাচ্চা—বলে আহ্বান করলেন। এমন ভাল লাগে কথার মাঝে 'মাই চাইল্ড' আদরের সম্ভাষণ। তারুণ্য কবে পার হয়ে এসেছি, মা-বাপ ওপারে, এখন ডাক ডাকবার মানুষ কই ? আজ সন্ধ্যায় সুদূর পিকিন শহরে কিচলুর

কণ্ঠে যেন অতীত গুরুজনেরা কথা বলে উঠলেন।

দোরিনকে বললেন, লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি পথের উপরে—আর একজনের এদিকে যে ঘুম ছিল না।

কটাক্ষ হল রমেশচন্দ্রের দিকে। নবোঢ়া দুটি ছেলেমেয়ে বিচ্ছেদের পর মিলিত হয়েছে—ভাবখানা এমনি। বৃহৎ কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্নেহমধুর এমনি রহস্যালাপ চলে।

ঘুম নেই রমেশচন্দ্রের, কথাটা কিন্তু মিথ্যা নয়। সাঁইত্রিশটা দেশের প্রতিনিধি আসছেন আসন্ন সম্মেলনে—ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব। সেই দায়িত্ব কাঁধে চেপে রয়েছে, দু-চোখ এক হয়ে ঘুমোবার ভরসা পাবে কি করে?

আমার হাত জড়িয়ে ধরে কিচলু বলতে লাগলেন, তুমি বাঙালি—বাংলার মানুষ পেলে আমার বড় আনন্দ হয়। ভারতকে পথ দেখিয়েছে বাংলাদেশ। সকলের মুখে একবার নজর বুলিয়ে বললেন, বাংলাই আমার রাজনীতির অনুপ্রেরণা দিয়েছে। বাংলার কাছে ঋণের অন্ত নেই।

তাজ্জব লাগল। ঋণ অনেকেরই অনেক রকম থাকে, বেমালুম চেপে যাওয়াই তো রীতি। মলিন মুখে এক ব্যক্তি 'তা বটে! তা বটে!' গোছের হাসি হাসছেন। ভদ্রলোকের মনোবেদনা বুঝতে পারছি—কিন্তু মুখ চেপে ধরে দলের দলপতিকে থামানো যায়ই বা কি করে?

প্রসঙ্গ পালটাল অবশেষে।

কিচলু বললেন, ভারতীয়দের সম্পর্কে সকলের বড্ড আশা। সব চেয়ে বড় দল আমাদের, সম্মেলনেও তেমনি কিছু বিশেষ স্থান নিতে হবে।

গোলমেলে কথা এসে পড়েছে—খাওয়া-দাওয়া, দেখাশুনো এবং আমোদস্ফূর্তি মাত্র নয়, পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দায়িত্বের কাজও করতে হবে অনেক-কিছু।

সে যাক, পরের কথা পরে হবে। নমস্কার সেরে এইবার কেটে পড়া উচিত। খাওয়ার ঘরে যাই চলো, সময় হয়ে গেছে। কোন্ দিকে?

কি রকম খাবে, সেইটে ঠিক করো—

কি চাও? নৈকষ্য বিলাতি খানায় রুচি থাকে তো সাততলার উপর। চক্ষু বুজে লিফটে উঠে পড়ো, সেখানে নিয়ে তুলবে। বিরাট ভোজনশালা, টেবিলগুলো সরিয়ে দিয়ে অক্লেশে ফুটবল খেলার গড়ের-মাঠ বানানো যায়। এমন ঘরেও না কুলোয় তো পাশে আর একটি আছে। পানশালা ওদিকে—মাল টানো ও বিলিয়ার্ড খেলো। যতক্ষণ দমে কুলোয় খাও এবং খেলে যাও—দাম দেবার হাঙ্গামা নেই। অথবা প্রশস্ত ফাঁকা ছাদের উপর দাঁড়িয়ে স্মরণা-

তীত কাল থেকে গড়ে-ওঠা সুপ্রাচীন নগর নিরীক্ষণ করো। রঙিন টালিতে ছাওয়া চৈনিক পদ্ধতির সংখ্যাতীত ঘরবাড়ি, মন্দিরের উঁচু চূড়া, পেই হাই পার্কে তিব্বতী লামার সমাধির উপর আকাশভেদী চৈত্য, আর হালফিলের ঐ একটি বৃহৎ ব্যাপার—পীস হোটেল। রাত্রিবেলা ছাদ থেকে ভারি বাহার পিকিন শহরের—আকাশের তারার মালা যেন চারিদিকে ছিটকে পড়েছে, মাটির উপরে ঝিকমিক করে তারা জ্বলছে।

চীনা মতে যদি খেতে যাও, নেমে পড়ো সর্বনিম্নতলে—সুপ্রশস্ত ড্রইংরুম অতিক্রম করে। কোন্ বেলা কোথায় ইচ্ছা করবে, পূর্বাহ্নে কাউকে বলতে হবে না—কিছুই তোমার করণীয় নেই। যথা ইচ্ছা ঢুকে টেবিলে বসে পড়ো, হুকুম করো যত এবং যে-রকম খুশি। খাওয়ার পরে একটা বিল নিয়ে আসবে—কিসের কত দাম কিছু তুমি জানো না। জানার প্রয়োজনও নেই। এক লক্ষ দেড় লক্ষ যা হোক একটা অঙ্কপাত করে এনেছে—নিচে সই মেরে খালাস। নিজে না পারো, যে কেউ পেন্সিল নিয়ে একটু হিজিবিজি করে দিক।

এমন দরাজ ব্যবস্থা আমার দেশে কেন চালু হয় না-রে! মহাশ্রদ্ধেয় মহাদেবদার গল্প শুনেছি—খবরের-কাগজে কাজ করতেন, সেই সুবাদে ডাইং ক্লিনিংও মাংনা কাপড় কাচতেন। নয়তো—রোস বেটা, লিখব তোর নামে এক কলম। কিন্তু হোটেলে যদৃচ্ছা খেয়ে একটি মাত্র নাম-সইর ওয়াস্তা—এ ব্যাপার সম্ভব সত্যযুগে। আর ঐ দেখে এলাম নতুন-চীনে।

কিন্তু কথাটা উঠল যা নিয়ে—এক বেলায় এক টেবিলে বসে এক লক্ষ দেড় লক্ষ ইয়ুয়ান উদরস্থ করছি। এর উপর শোনা গেল, সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে নগদ হাতখরচাও গুঁজে দিয়ে গেছে—প্রতি জনের দশ লক্ষ হিসাবে। কোন সুলগ্নে যাত্রা গো—চীনের মাটিতে পা দিতে না দিতেই (লক্ষপতি বলে গালি দেবেন না) অনেক লক্ষের অধিকারী। আমাদের দেশে হয়েছে যেন চড়ুইপাখির খড়কুটো-সংগ্রহ—দু-টাকা সাত আনা রোজগার, সাত সিকে খরচ; সারা জীবনে একত্র করলাম দু-শ' সাতান্ন টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই। আর ওখানে দশ-বিশ হাজারের নিচে কথাই নেই। সওয়া মাসে যা খরচ করে এসেছি, ইনকামট্যাক্স-কর্তাদের মাথাঘুরে যাবে সেই টাকার অঙ্ক শুনলে।

হয়তো বাজারে যাচ্ছি কয়েক জনে মিলে খেয়ালাফিক সওদা করতে।

এই যাঃ, মনিব্যাগ ফেলে এসেছি। টাকা বেশি আছে তোমার কাছে?

কোথায়! দু-আড়াই লাখ হবে বড় জোর—তাতে কি হবে? আড়াই লাখের বাজার ভদ্রলোকে আবার কি করবে! ক্ষুণ্ণ মনে ফিরতে হল অর্ধপথ থেকে। দাম লিখে জিনিসের গায়ে সেঁটে রাখবার নিয়ম ও-দেশে—তার উপরে কানা-

কড়ির ধরদস্তুর চলে না। ওয়ান-টু ইত্যাকার আন্তর্জাতিক সংখ্যায় লেখা দাম—দেশি বিদেশি কারো বুঝতে আটকায় না। আমিও এটা ওটা কিনে এনেছিলাম বন্ধুবান্ধবদের জন্য। দামের কাগজ আঁটাই ছিল জিনিসের গায়ে, ছিঁড়ে ফেলতে যেন ভুলে গিয়েছি। বন্ধুরা চমকে ওঠেন—কি কাণ্ড, দশ হাজার এটার দাম? এত খরচ করে নিয়ে এলে?

প্রেম-গদগদ-কণ্ঠে বলি, তা কি হবে—তুমি তো পর নও! চীনের একটা স্মরণ-চিহ্ন—জীবনে হয়তো আর যাবো না—টাকার মায়া করলে চলবে কেন!

চুপি-চুপি বলছি, দশ হাজারের ঐ মহার্ঘ বস্তুর আমাদের হিসাবে দাম দাঁড়িয়েছে দু-টাকা এক আনার মতো। আটচল্লিশ শ চীনা ইয়ুয়ানে এক টাকা। কিন্তু চেপে যান—খবরদার, যেন চাউর হয়ে না পড়ে আমার বন্ধু-জনের মধ্যে। পশার ভেস্তে যাবে।

চীন থেকে ফেরার মুখে সাংহাই ক্যান্টনে দু-হাতে বাজার করছি। নিজে করছি, ওখানকার তরুণ বন্ধুরাও করে দিচ্ছেন। চীনা ইয়ুয়ান শেষ করে ফেলতে হবে। শেষ অবধি হাজার ছয়ে ঠেকে গেল ওরা বলে, এতে আর কী-ই বা পাওয়া যাবে—রেখে দিন। হাজার দুয়েক ওর থেকে ঔদার্য বশে দিয়ে দিলাম ক্ষিতীশকে। হাজার চারেক আছে এখনো। অর্ধেক কিংবা সিকি পরিমাণ টাকায় নিয়ে নিন না কেন (ভারতের টাকা অবশ্য)! কত সস্তায় যাচ্ছে—কিনবেন? আর কিনেছেন! বোকার মতো আগেই ফাঁস করে দিয়ে বসে আছি।

আমাদের তো এই। আগের খবর কিঞ্চিৎ শুনুন। সতীরঞ্জন সেনের কথা বলেছি—তাঁরা অনেক বেশি ভাগ্যবান। ১৯৪৭ অব্দে ভারত-গবর্নমেন্ট পাঠিয়েছিলেন তাঁদের। দশ জন ছাত্র পৌঁছলেন তো সাংহাইয়ে। হাতখরচা ইত্যাদির জন্য প্রত্যেকে দশটা করে টাকা দিলেন চীনা ইয়ুয়ানে ভাঙিয়ে আনবার জন্য। লোক গেছে তো গেছেই—অনেকক্ষণ পরে রিক্সায় করে ফিরে এল বিশাল এক বস্তা নিয়ে। বস্তাবন্দি নোট। কাঁধে বয়ে আনতে পারে নি, রিক্সা করে আনতে হল। বস্তা খুলে সর্বাগ্রে রিক্সা-ভাড়া তো চুকিয়ে দিলেন কোটি-খানেক। তার পরে ঐ নোটের গাদা গণে মিলিয়ে নেওয়া। সে কী বিপদ! দশ জনে ভাগে ভাগে গনছেন—কোটি কোটির ব্যাপার—প্রতি বারে আলাদা এক-এক রকম হয়। ঘন্টা কয়েক ধস্তাধস্তি করে তাঁরা হাল ছেড়ে দিলেন। ব্যাঙ্ক থেকে যা লিখে দিয়েছে, তাই ধরে নেওয়া গেল। আমাদের অতটা ভাগ্য হয় নি। কোটি কোটি নয়, তবে কোটির কাছাকাছি নাড়াচাড়া করে এসেছি বটে

গালগল্প বলে ঠেকছে। কিন্তু সতীরঞ্জনের মুখে স্বকর্ণে শুনে তবে লিখছি। আন্দাজ করুন অবস্থার ভয়াবহতা। সাধারণের ক্রয়শক্তি একেবারে লোপ পেয়েছে—কিনতে পারে, আঙুলে-গণা-যায় এমন কয়েকটি ভাগ্যবান। আর খরচ চালাবার জন্য সরকারি ছাপাখানায় দেদার নোট ছেপে যাচ্ছে। গতিক এমনি. ছেলেপিলে হাতের লেখার কাগজ পায় না নোট ছাপানের কাগজের এমনি টান পড়েছে। নতুন-চীন খতিয়ে দেখেছে, কুয়োমিনটাং যুদ্ধপূর্ব আমলের চেয়ে ১,৭৬৮,০০০,০০০,০০০ গুণ বেশি নোট চালু করে গেছে। তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাবার মুখেও তারা বগল বাজাচ্ছিল, বিজীর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ক'দিন চলবে গণতন্ত্রী সরকার? যাও সে-তুড়কেও পাতাতাড়ি গুটোতে হবে।

সতীরঞ্জনেরই আর একটি গল্প। ওঁরা পিকিনে তখন। কুয়োমিনটাঙের টলমল অবস্থা—মুক্তি-সৈন্য আসছে ঝড়ের বেগে। পাওয়ার-হাউসে বিশৃঙ্খলা—বিদ্যুৎ-সরবরাহ যে কোন মুহূর্তে বন্ধ হবে। সতীরঞ্জন গিয়েছেন দুর্দিনের জন্য এক টিন কেরোসিন কিনে রাখবেন বলে। এক দোকানে দর নিলেন। যাচাই করতে আর এক দোকানে গিয়ে দেখলেন, সেখানকার দর অনেক বেশি। প্রথম দোকানে এলেন আবার। এবার এরা যে-দর হাঁকল সেটা দ্বিতীয় দোকানকে ছাড়িয়ে গেল।

দোকানি বলল, কিনতে হয় তো এক্ষুনি নিয়ে যান। সাড়ে-দশটায় এখন এই দর। দশ মিনিট পরে শুনবেন আর এক রকম।

এমনি কাণ্ড। চীনা মুদ্রার উপর লোকের এক তিল আস্থা নেই। হেন ইনফ্লেশন পৃথিবীর কোন রাজ্যে কখনো ঘটে নি। এক গৃহস্থের কথা শুনলাম। ভদ্রলোক মিতব্যয়ী। কায়ক্লেশে খরচাপত্র চালিয়ে যৎসামান্য সঞ্চয় করে এসেছেন বছর বছর। বুড়ো হয়ে পড়েছেন, জীবনের বাকি কয়টা দিন পুঁজি ভেঙে ভেঙে খাবেন। কুয়োমিনটাঙের শেষ সময় তখন। মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন তিনি। হিসেব করে দেখা গেল, সারা জীবনের সঞ্চয় একটা মুরগির আণ্ডা কিনতেই খতম হয়ে যায়। আজকে বিলকুল সামলে নিয়েছে। সামলাতে পেরেছে, তাই চীন বেঁচে গেল। আর এত বড় অসাধ্য-সাধন যারা করতে পারে, তামাম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জোট পাকিয়েও তাদের মারতে পারবে না।

ইনফ্লেশন দমনের পদ্ধতি শুনুন তবে কিছু কিছু। সে আমলে যা হয়েছিল, আর এঁরা যা করেছেন। অবস্থা এমন, মাইনে হাতে পাওয়া মাত্রই লোকে জিনিস কিনে ফেলবে। দরকারে লাগবে কিনা, সে বিবেচনা করতে গেলে হবে না। চাল মিলল না তো কিনে ফেলুন বিশ গ্রোস ইস্ক্রুপ, নয় তো কাপড়-কাচা সাবান দু-পেটি। মোটের উপর টাকা হাতে রাখবেন না—তাহলে সর্বনাশ—

হু-হু করে নেমে যাচ্ছে টাকার ক্রয়মূল্য। কাল হয়তো দেখবেন, সাবান এক পেটি মাত্র পাওয়া যাচ্ছে ঐ টাকায়।

অথবা কিনে রাখুন সোনা-রুপো। রুপোর মুদ্রা বাজারে নেই, মানুষে সিন্দুকে পুরছে। কালে ভদ্রে দুটো-পাঁচটা বেরুলো তো তার পিলে-চমকানো দর। বাজারে যা সগৌরবে চলেছে সে হল আমেরিকান ডলার। নামে চীন দেশ এবং স্বাধীনও বটে, কিন্তু টাকার বাজারে আধিপত্য আমেরিকার। এক্স-চেঞ্জের একটা সরকারি হার নির্দিষ্ট আছে—কিন্তু সে হল ঐ পাঠ্য বইয়ে থাকে 'সদা সত্য কথা কহিবে' তারই মতন এক নীতিকথা। কেউ মানে না, জানেও না বড় বেশি লোক। আমেরিকান ডলারও কাগজ বটে—কিন্তু তার অশেষ ইজ্জত, রীতিমতো দরদস্তুর করে কিনতে হয় সে বস্তু। শহরে গ্রামে সর্বত্র তাই সংখ্যাতীত মজুতদার। সাধারণের দুঃখকষ্ট সীমাহীন হয়ে পড়ল। ব্যাঙ্ক অথবা জাতীয় ধনাগারে লক্ষ্মী নয়—তাঁর পেঁচার বসতি। পেঁচার স্তূপীকৃত ঝরা পাখনা—ছাপা নোটের হিমালয় পর্বত।

তেড়ে ফুড়ে কুয়েমিনটাং আইন করল, সোনারুপো আটকে রাখা বেআইনি—ভিন দেশের মুদ্রাও চলবে না। ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দাও। এ-আইন অমান্য করা দেশদ্রোহিতা—চরম দণ্ড হবে অপরাধীর।

কা কস্য পরিবেদনা! বাজার এত গরম—কে যাচ্ছে ঐ সরকারি বাঁধা-দামে জমা দিতে? ফাঁসিতে লটকানো হল দু-একটাকে। কিছুতে কিছু হয় না। শুধু আইন করে দায় খালাস হয় না, আইন লোকে মানতে পারে এমন অবস্থায় সৃষ্টি করতে হয়। সোনা-রুপো এবং আমেরিকান ডলার ভাঙিয়ে ধরুন বিশ কোটি ইয়ুয়ান নিয়ে এলাম। সেই বিশ কোটি আগামীকাল তো বিশ লক্ষের দামে নেমে যাবে। তখন?

নতুন চীনের পদ্ধতি শুনুন এবার। সোনা রুপো এবং আমেরিকান ডলার সরকারি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দাও। ব্যাঙ্কের দর দেওয়া হল কালোবাজারের চেয়ে কিছু বেশিই। একটা জিনিস তবু বাকি থেকে যায়। আজকে আমার নামে যে পরিমাণ চীনা ইয়ুয়ান জমা পড়ল, কাল যদি তার দাম কমে যায়? অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম চড়ে, কম জিনিস পাওয়া যায় ঐ মুদ্রায়? সে ব্যবস্থাও হল। জমা দেবার সময় টাকার অঙ্কের পাশে ঐ তারিখের চাল-কাপড়-তেলের দামও লেখা রইল। ব্যাঙ্ক থেকে যেদিন টাকা তুলবে, জিনিসের দর যদি ডবল হয়ে থাকে, তোমার জমা টাকাও ডবল হয়ে গেছে, এই রকম গণ্য হবে। তার উপরে নিয়মমাফিক সুদ তো আছেই।

মাসের পর মাস চলল এই নিয়মে। কালোবাজার অচল। লোকের আস্থা

ফিরে এলো জাতীয় অর্থনীতির উপর। নতুন-চীন ইনফ্লেশন পুরোপুরি সামলে নিয়েছে। দরের এখন উঠানামা নেই। কনট্রোলের আবশ্যক নেই কোনখানে। সেদিনের পরম দুর্গতির একটুখানি স্মরণ চিহ্ন রয়েছে—নোটের উপর ছাপা মোটা অঙ্ক। বাস, আর কিছু নয়।

সতীরঞ্জন প্রভৃতির কাছে শোনা কাহিনী। সুনিশ্চিত ধ্বংস থেকে জাতি বেঁচে গেল এমনই নানা কৌশল ও বিচক্ষণতায়। শাপে বর হল। সোনা-রুপো আটক পড়ে গিয়ে এবং বিদেশি মুদ্রা চালু হয়ে একদা চীনের সর্বনাশ ঘটেছিল—এখন সমস্ত গবর্নমেন্টের হাতে এসে গেছে। বাইরের বাজারে নতুন চীনের তাই ইজ্জত হয়েছে। দেশ-পরিগঠনের জন্যে বিদেশি যন্ত্রপাতি ও মালপত্র কিনবার আর দারিদ্র্য নেই।

কিন্তু কি কথায় কতদূর এসে পড়লাম! দু-লাখ পাঁচ-লাখ অহরহ পকেটে নিয়ে ঘুরেছি—আর এখন? কাজ নেই, গুমর ফাঁক হয়ে যাবে।

(৯)

পিকিনের সেই প্রথম সন্ধ্যা। শ্যাম রাখি না কূল রাখি—অর্থাৎ সাত তলার উপর বিলাতি মতে অথবা একতলায় চীনা পদ্ধতিতে সেবা গ্রহণ করব, সে সমস্যা আজকের দিনটায় নয়। নতুন এসেছি, অতএব নিয়ম মাফিক ভোজ খেতে হল। ভোজ-পর্ব সমাধা করে বেরিয়ে পড়লাম ক'জনে।

হোটেলের প্রাঙ্গণে কত যে মোটর, তার সীমাসংখ্যা নেই। মোটরের সংখ্যা কমই এখানে। একজন রসিকতা করে বললেন, যে ক'টা আছে সব বুঝি অতিথি-পরিচর্যায় এনে মজুত করেছে।

জন চার-পাঁচ হাঁ হাঁ করে এসে পড়ল।

যাবেন কোথাও?

উঁহু, এই সামনের দিকে একটুখানি পায়চারি করছি।

এদিক-ওদিক চাইতে ফাঁক বুঝে একসময় রাস্তায় নেমে পড়লাম। হাঁটতে চাই। কিন্তু টের পেলে রক্ষা নেই, মোটরের ব্যূহ ঘিরে ফেলবে।

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বেশ ঠাণ্ডা। খান তিন-চার বাড়ির পরে অপেরা হাউস। উঁকিঝুঁকি দিচ্ছি সেখানে। কর্মচারি একজন দরজা আটকে কী বলল।

জানি রে বাপু টিকিট না হলে ঢোকা যায়না। ঢুকে বসবার মন মেজাজ এখন নেই। রাতের পিকিন দেখে বেড়াব।

এক ভদ্রলোক, দেখি তাড়া করেছেন আমাদের। নতুন জায়গা, গতিক বুঝি নে—কোন রকম দোষ-ঘাট হল নাকি? ইংরেজি বলেন তিনি খুঁড়িয়ে

খুঁড়িয়ে চলার মতো। আমাদেরই সমগোত্রীয়, শুনে অতএব উল্লাস বোধ করি।
টিকিট চেয়েছিল আপনাদের কাছে। ঐটে নিয়ম কি না। তা আসুন আপ-নারা—টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।
আজকে দেখব না।
সকরুণ মিনতি করে তিনি বলেন, বিলক্ষণ। আমাদের ঘোরগোড়া অবধি এলেন—সে কি হয় কখনো ?
মাপ করুন, আর হবেনা এমনটি। কেও-কেটা ব্যক্তি এখন, বুঝতে পেরেছি। চলাফেরা অতঃপর মাপজোপ করে হবে।
অনেক কষ্টে হাত ছাড়ানো গেল। দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু দরজা খোলা। ১লা অক্টোবর জাতীয় উৎসব—তিন বছর আগে মাও-সে-তুং ঐ দিন মুক্তির পতাকা তুলেছিলেন, নিপীড়িত চীন সকল কালিমা মুছে পাঁচ-তারার আলোয় মাথা তুলে দাঁড়াল। সেই আয়োজনের ধূম লেগেছে। মানুষ-জন মহাব্যস্ত। আমাদের অবোধ্য চীনা অক্ষরে কত কি লিখছে কাপড়ের উপর, পিচবোর্ড কেটে তার উপর রং করে হাজার হাজার শান্তির কপোত বানাচ্ছে। নানা রঙের কাগজ কেটে স্তূপীকৃত করছে, ফুল হবে নানান রকমের। উৎসব-দিনের অনেক বাকি, কিন্তু মানুষ মেতে উঠেছে এখন থেকেই
এক ঘরে তিন জন আমরা···আমি, ক্ষিতীশ আর মীরাটের এক জাঁদরেল উকিল ব্রজরাজ কিশোর। উকিলবাবুটি ফর্সা, লম্বা, মাথায় টাক···চোস্ত ইংরে-জী বলেন। দু-জনের ঘরে কিছু অতিরিক্ত আসবাব ঢুকিয়ে তিনের জায়গা হয়েছে। কি করবে, নতুন তৈরি শান্তি হোটেলও ভরাট হয়ে গেছে—এত অতিথির জায়গা কোথা ? জানলার কাছে নিরিবিলি দিকটা আমি দখল করে নিলাম। জানলা হলেও ওদিকের ঘরে আটকা—আলো বড়-একটা আসে না। হোটেলের সব চেয়ে খারাপ ঘর—সেইটেই আমাদের কপালে পড়ে গেল!
তা হোক ঘাবড়াবার কি আছে, ঘরে থাকি আর কতটুকু ? ওখানে চলো, এটা দেখ, ঐ কনফারেন্সে যাও···লেগেই আছে একটা-না-একটা। আমি এসেছি নতুন চীন দেখতে এই কম সময়ের মধ্যে দেখে-শুনে যথাসম্ভব আলাপ-পরিচয় করে যাবো। হাত-পা মেলে জিরোতে এবং খেতে যারা এসেছেন, উৎকৃষ্ট ঘরে বহাল-তবিয়তে শুয়ে শুয়ে তাঁরা আরাম করুন গে।
ঘরের সুখটা শুনুন এবারে। শয্যার পাশে ফোন। শুয়ে-শুয়ে তামাম পিকিন শহরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। শিয়রে সুইচ—শীতের দেশে পাখার চল

নেই—এন্তার আলো জ্বালুন আর আলো নেভান। আর আছে বোতাম সুইচের পাশে। বোতামে আঙুল ছোঁয়ানো মাত্র দরজায় টোকা পড়বে, মৃদু কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন, আসতে পারি?

তারপরে যা খুশি লোকটাকে ফরমাশ করুন—আকাশের চাঁদ, বাঘের দুধ এই জাতীয় কয়েকটা বস্তু বাদ দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে এনে হাজির করবে। সূচ-সুতা-বোতাম আঠা-খাম-কাগজ ইস্তক স্ক্যুইচ-কাফ-আইসক্রীম···রাত দুপুরে মুরগির কাটলেট অবধি। সোফা ও নিচু-টেবিল ঘরের কেন্দ্রদেশে। সেই টেবিলে অহরহ দেখবেন ফলের গাদা, নানা জাতীয় কেক. চকোলেট, সিগারেট ইত্যাদি। অব্যবহারে বাসি হয়ে গেলে তা বদল করে আবার টাটকা এনে দিচ্ছে। এক রকম আঙুর—রক্তাভ রং, সুমিষ্ট ও চমৎকার গন্ধ, টকের লেশমাত্র নেই। উত্তর-চীনের কোন কোন অংশে ফলে। ঐ আঙুর এক চালান এসেছিল হোটেলে। তার পরে আর কোন আঙুর মুখে রোচে না। ঐ লাল আঙুর যদি আনতে পারো বাপু, তা হলে গোটা কয়েক দাঁতে কাটতে পারি।

শোনা মাত্র শশব্যস্তে বেরিয়ে যায়। সে কালের বর্ষীয়সীরা গুরুঠাকুর সম্পর্কে এমনি তটস্থ হতেন জানি—গুরু চটলে পরকালের দরজায় তালা পড়বে। এখানেও প্রায় তাই। অতিথি আমরা, শান্তি-সৈনিক—সর্বোপরি ভারতীয়। ব্রহ্মস্পর্শ ঘটেছে। খুঁজে খুঁজে অতএব থোলো দুই লাল আঙুর জোগাড় করে আনল। কাতর হয়ে বলে, মিলছে না এখন। কালকে দিনমানে··· কত যেন অপরাধ করে বসেছে, লজ্জার সীমা-পরিসীমা নেই—মুখ-চোখের ভাব এমনিধারা। অতএব ক্ষমা করে ফেলে ঐ দু-থোলো অর্থাৎ আধসের-খানেক আঙুরে মুখশুদ্ধি করে নেওয়া যাক, কি বলেন? রাগ করে থাকাটা কিছু নয়।

হোটেলের এই কর্মীদের সম্পর্কে কিছুতে বলতে গেলে, সত্যি, শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। চাকর বলতে সরম লাগে—নতুন-চীন পরিগঠনে তারাও মহা-কর্মী। নানা দেশবাসী ও নানা মেজাজের অতগুলো অতিথির কী সেবাই না করেছে! হাসি ছাড়া মুখ দেখি নি কখনো। যেন ওরা আঁধার মুখ করতে জানে না!

সকালবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে করিডর অতিক্রম করে লিফটে যাচ্ছি। হাসিমুখের অভিবাদন আসছে এদিক-ওদিক থেকে। লিফটম্যান প্রসন্ন হাস্যে বলে, গুড-মর্নিং। দূর-আকাশে সূর্য হাসছে, এর মুখেও সেই ঝিকিমিকি

ঐ যে বললাম— বিশ্রাম ছিল না একটুও। সারা দিনমান এবং রাত দুপুর অবধি এটা-ওটা লেগেই আছে। ঠাসা প্রোগ্রাম তুরকি-নাচন নাচিয়ে ছাড়ছে। বঙ্গদেশের কিঞ্চিৎ আয়েশি মানুষ আমরা, হতভাগারা বুঝবে না তা কিছুতে। চল্লিশ দিনে চল্লিশ মাসের দেখা দেখিয়ে দিয়েছে। ছিমছাম থাকা বরদাস্ত করতে পারি নে—কেমন যেন পালিশ-করা কাঠের পুতুলের মতো মনে হয় নিজেকে। জামা-কাপড় বই কাগজ বিছানা-পত্র মহানন্দে হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করব, নইলে জীবন-ধারণের সুখ কী? ঘর ছেড়ে যখন বাইরে চলে যাই, মনে হবে, গজ-কচ্ছপের লড়াই হয়ে গেছে এইখানে একটু আগে। মনিব্যাগ এবং বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ হাজারের নোটও ছড়িয়ে রয়েছে অনেক দিন। ফিরে এসে অবাক হয়ে যেতাম। যেন পাল্লা চলেছে—আমরা কত ছড়াতে পারি আর ওরা কত গোছাতে পারে! কত যে ফুলের তোড়া পেতাম—একটা ছাগল থাকলে খেয়ে খেয়ে মুটিয়ে স্বচ্ছন্দে মোষ হতে পারত। অবহেলার সেই সব ফুলের তোড়া, ওরা করত কী—কোত্থেকে ফুলদানি জোগাড় করে টেবিলের উপর পরম যত্নে সাজিয়ে রেখে দিত। বিছানায় সদ্য-পাটভাঙা চাদর, বাথরুমে নতুন সাবান, নতুন একদফা তোয়ালে। কতক্ষণ ছিলাম না—সযত্ন পরিমার্জনায় ঘরের যেন নতুন রূপ খুলে দিয়েছে।

বিদেশি মানুষগুলো কয়েকটা দিন ছিল তোমাদের আশ্রয়ে। আর কোন দিন দেখা হবে না জীবনে। এমন করে আপন করে নিলে—দূরে বসে আজ নিশিরাত্রে এই কাহিনী লিখতে লিখতে মন স্নেহসিক্ত হয়ে উঠছে…

যেদিন পিকিন-হোটেল ছেড়ে চলে যাব, সকলে উসখুস করছি—কী দেওয়া যায় ওদের? কয়েক লক্ষ ইয়ুয়ান কিংবা ভারত থেকে নিয়ে-যাওয়া কোন জিনিস? উঁহু—কিছুই নয়. ওতে নাকি নীতিহীনতা দেখা দিতে পারে, প্রাপ্তির লোভে সেবার হয়তো মানুষ বিশেষে কম-বেশি হবে ভবিষ্যতে। আর ওরাও প্রত্যাশা করে না। দিয়ে দেখুন, স্পর্শ করবে না উপহারের জিনিস—কথায় বোঝাতে পারে না তো, এক অদ্ভুত ধরনের হাসি হাসবে।

অথচ—পিছিয়ে যান দিকি কয়েকটা বছর। ঐ চীনেরই রণক্ষেত্রে সৈন্য আহত হয়ে আর্তনাদ করছে, বিনা বখশিশে কেউ তাকে ছোঁবে না। ছুটছে—যে-লোকের কাছে মোটা রকম প্রত্যাশা আছে। এ আমার মনগড়া কথা নয়—শতেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, ছাপা বইয়েও এবংবিধ বিস্তর কাহিনী। আর পশ্চিম ইউরোপীয় অঞ্চলে একটু দৃষ্টিপাত করুন—এবং তাদের তল্পিবাহক আমাদের দেশি হোটেলগুলোর দিকেও। এক টাকা খাওয়ার চার্জ ধরল তো টিপস্ লাগবে অন্যূন অষ্টগণ্ডা।

না—নতুন-চীনে এসমস্ত একেবারে নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু ভালবাসা, হাতে-হাতে স্নেহস্পর্শ, আলিঙ্গন? তাদের এক-একজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে আমরা ঋণ-স্বীকার করে এসেছি।

(১০)

প্রাতরাশের পর চিঠিপত্র লেখা শেষ করতে দশটা। আমাদের জন্য আলাদা পোস্টাপিস বসেছে নিচের তলায় ড্রয়িং-রুমের এক পাশে। গাদা গাদা কাগজ-খাম ঘরের টেবিলে। তাতে না কুলায়, পোস্টাপিসে এসে হাত পাতলে যত খুশি পেয়ে যাবেন। দেদার লিখে যান—যদৃচ্ছা লিখে দিয়ে দিন পোস্টাপিস-ওয়ালাদের কাছে, মালপত্র পাঠাতে পারেন দু-সেরি পাঁচ-সেরি প্যাকেট বেঁধে বেঁধে। হিজিবিজি-লেখা একটা স্লিপ ওঁরা এগিয়ে দেবেন, খানাঘরের মতন এখানেও স্লিপের উপর সই মেরে ছুটি। তারও করা যায়—খরচ পড়ে শুনলাম কথা প্রতি টাকা পাঁচেক (ভারতীয় টাকা, ওঁদের ইয়ুয়ান নয়)। তা সে যা-ই লাগুক, সে টাকাও গৌরী সেনের—অতএব আমাদের কি ভাবনা? কেব্‌ল (cable) করছেনও অনেক, খবরাখবর পাঠাচ্ছেন। প্রেমপত্রাদি ছাড়ছেন না বোধহয়। ছাড়লেও ও-তরফ থেকে আপত্তি হবে না, চক্ষু বুজে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু অতিথিদের আক্কেল-বিবেচনা আছে তো!

দশটা বেজে গেল। বেরুনো হবে এবার। বাস অপেক্ষমান। দোভাষি ছেলেমেয়েরা ভাগ করে নিয়েছে, কারা সামলাবে কোন্ দলকে। নতুন বয়স—অফুরন্ত তাদের অধ্যবসায়, সময় মতো ঠিক নিয়ে বের করবে। সময় মেপে প্রতিটি কাজ—প্রোগ্রামের একটু এদিক-ওদিক হতে দেবে না। সাগর-পাহাড় পার-হয়ে-আসা অবোধ মানুষগুলোর গার্জেন হয়ে স্ফূর্তি অবধি নেই। এটা দেখায়, ওটা বোঝায়—নিজেরা যা বোঝে না, তা-ও বোঝাতে ছাড়ে না।

এ কোথায়—তোমাদের কেমন ধারা য়ুনিভার্সিটি গো?

সঙ্কীর্ণ লোহার গেট পার হয়ে বাস ভিতরের প্রাঙ্গণে ঢুকল—যেন জেলের মধ্যে পুরেছে। ব্যাপার তাই বটে। চিয়াং-কাই-শেকের আমলে কমাণ্ডার-ইন চীফ থাকত এখানে আর তার প্রধান দলবল। তাই এতে উঁচু পাঁচিল—এমন উদ্ধত লৌহদ্বার। বড় এক পুকুর—বরফ-পড়া রাতে কত কম্যুনিস্টকে ঐ পুকুরে চুবিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করেছে।

হেসে হেসে দেখাচ্ছে আমায় সুইং-ইঞা-মিঁ। নতুন গ্র্যাজুয়েট হয়েছে মেয়েটা—গোলালো মুখ, চোখে নিকেলের চশমা, মিষ্টি হাসে কথায় কথায়। আজকে নবীন কালের ছেলেমেয়ের হাস্যোল্লাসে পুরানো কলঙ্ক ধুয়ে মুছে গেছে। এ যেন আর এক জায়গা, এরা সব আর এক মানুষ।

পিপল্‌স্‌ য়্যুনিভার্সিটি। শুধু কেতাবি বিদ্যা নয়, দেশ গড়ে তোলার শিক্ষা দেওয়া হয় এখানে। ফ্যাক্টরিতে কাজ করছ, কৃতিত্ব কোন এক বিষয়ে—এসে থেকে যাও এখানে মাস তিনেক। খুব ভাল করে শিখে যাও তোমার সেই জিনিসটা। বছরে এমনি এসে এসে পাকাপোক্ত কর্মী হয়ে যায়। মাইনে-পত্তোর দেয় ফ্যাক্টরি।

আনকোরা প্রতিষ্ঠান—১৯৫০ অব্দে তৈরি। কলকাতায় পুরাতন ইলিসিয়াম রো'র বাড়িটায় গান্ধি-আশ্রম প্রতিষ্ঠা হলে যা হত—সেই ব্যাপার আর কি! ইস্কুল, নার্সারি ইস্কুল, কলেজ য়্যুনিভার্সিটিতে সারা দেশ ছেয়ে দিচ্ছে এরা এই নতুন আমলে। এক পিকিন শহরেই গোটা চারেক য়ুনিভার্সিটির খবর পেলাম লম্বা টেবিলের এদিকে-ওদিকে সকলে বসেছি। য়ুনিভার্সিটির কর্তারা আছেন। আছেন কয়েক জন শ্রমিক-বীর—ফ্যাক্টরির কাজে দেশের ধনোৎপাদনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলার, ভাইস-চ্যান্সেলার প্রভৃতির সমতুল্য আসন ঐ বীরবর্গের। চা ইত্যাদি যথারীতি সম্মুখ ভাগে। পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এক-একজন উঠে দাঁড়াই, সেক্রেটারি নাম ধাম ও ক্রিয়াকর্ম শুনিয়ে দেন। আর হাততালি।

একটি ভারতীয় মেয়ে—চক্রেশ জৈন। আমাদের দলের সে নয়, পিকিনে থাকে। বাপ জগদীশ জৈন পিকিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দির অধ্যাপক। ভারত থেকে অধ্যাপক মশায়কে নিয়ে গেছে। মেয়ে বাপের সঙ্গে। সে-ও হিন্দি পড়ায়, আর বাপের খবরদারি করে। দূর বিদেশে অধ্যাপক জৈনের মা হয়ে বসেছে।

জৈনকে চিনলেন তো? সে-আমলে কাগজে পড়েছিলেন, বেশ খানিকটা হৈ-চৈ হয়েছিল ব্যাপারটা নিয়ে। গান্ধিজীকে হত্যার ষড়যন্ত্র দৈবক্রমে ইনি কিছু জানতে পারেন। পুলিশকে জানিয়েও ছিলেন সে কথা। পুলিশ তেমন আমলের মধ্যে আনে নি, এত বড় সর্বনাশ ঘটে গেল তাই। এই নিয়ে অধ্যাপক জৈন বই লিখেছিলেন 'আই কুড নট সেভ বাপুজী'—বাপুকে বাঁচাতে পারলাম না।

এতগুলো দেশের মানুষ পেয়ে বর্তে গেছে চক্রেশ। চোখে-মুখে কথা বলে মেয়েটা—কথার তুবড়ি ফোটাচ্ছে। মাস-ছয়েক ধরে জমে-ওঠা সমস্ত কথা এক সঙ্গে বলে ফেলতে চায়। ইংরেজি বলছে সুপ্রচুর, চীনা বলে, হিন্দি বলছে। আর ছটফটে এমন—একটা মিনিট স্থির হয়ে বসা তার কুষ্ঠিতে লেখে না।

নিয়মমাফিক বক্তৃতা দিয়ে শুরু। চ্যান্সেলার সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক—লিখিত-বক্তৃতায় ঢালাও ধন্যবাদ দিলেন সকলকে। বললেন, নতুন য়ুনিভার্সিটি-স্থাপ-

নার যাবতীয় ইতিহাস ও কাজকর্মের কথা। তার পরে ভাইস-চ্যান্সেলার। প্রশ্নের পর প্রশ্ন আমাদের তরফ থেকে। কত ছাত্র, কতগুলো ক্লাস, শিক্ষণীয় বিষয় কী কী? তাবৎ ব্যবস্থা বুঝে নিতে চাই ঐ এক চেয়ারে বসে বসে। এবারে নিয়ে চললেন একজিবিশন-ঘরে। নতুন-চীনের কর্মোৎসাহের পরিচয় ঘরে ঘরে সাজানো। একটা ঘরে চীন-বিপ্লবের জলন্ত ও সুবিস্তৃত ইতিহাস। দরজা দিয়ে ঢুকে পায়ে পায়ে এগোচ্ছি। এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়। কত ছবি, কাহিনী কত রকমের কাগজপত্র! মুক্তি-ফৌজ ঝোড়ো রাতে নিঃসীম নদী পার হয়ে যাচ্ছে—তার ভয়াবহ ছবি। যে শহীদেরা প্রাণ দিল তাদের কতজনের ছবি, টুকিটাকি তাদের ব্যবহারের জিনিসপত্র। এ সমস্ত অভিভূত করে আমাকে, আমাদের সর্বত্যাগী ছেলেমেয়েদের কথা পাশাপাশি মনে পড়ে যায়।

ভারতীয় দলের পরামর্শ-সভা বিকালবেলা। এ সভা লেগেই আছে—পথের কষ্টে কাল বড় ক্লান্ত ছিলাম, আমাদের ক'জনকে রেহাই দিয়েছিল তাই। হোটেলের প্রশস্ত একটা ঘরে একসঙ্গে মিলেছি।

শান্তি-সম্মেলন পঁচিশে অর্থাৎ আগামী কাল থেকে বসবার কথা। ক'দিন চলবার পরে ১লা অক্টোবর বন্ধ থাকত ওদের জাতীয় উৎসবের দরুন। উৎসব অন্তে আবার চলত।

বানচাল হচ্ছে এই ব্যবস্থা। কত দেশের কত মানুষ একত্র জমবে—বহু জনে এখনো পথে পড়ে, এসে পৌঁছতে পারে নি। আসছে তারা অনেক কষ্ট করে। কাছাকাছি এই জাপানের কথা ধরুন। ছাড়পত্র অনেকেরই ভাগ্যে হয় নি, কয়েক জনে শুধু পেয়েছে। মানুষগুলোও নাছোড়বান্দা—সমুদ্রটুকুর ও-পারে অপরূপ আনন্দ-সমাবেশ—ছাড়পত্র দিলে না, তা বলে কি পড়ে থাকবে দ্বীপের চৌহদ্দির মধ্যে? সমুদ্র সাঁতরে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়— কি কৌশলে বন্দুক-বেয়নেটের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে এ-তটে এসে পৌঁছবে, খোদায় মালুম। গবর্নমেন্ট খুব নাকি তড়পাচ্ছে—দেশে ফিরতে হবে না? দেখে নেবে আবার যখন ওদের খপ্পরের মধ্যে পাবে।

আরও আসছে—বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নানা অঞ্চল থেকে। আগে তো ভাবা যায় নি, শান্তি-সম্মেলনের মতো এমন নিরীহ অনুষ্ঠান সম্পর্কেও কর্তাদের এতখানি দ্বিধা-সন্দেহ। পথ তবু কিছুতে রুখতে পারল না—আসছে তারা, এসে পড়ল বলে। নদী-সমুদ্র পাহাড়-জঙ্গল পার হয়ে পায়ে হেঁটে আসছে—তারিখ মতো তাই এসে পৌঁছতে পারছে না। ছাড়পত্রধারী ভাগ্যবানদের মারফতে খবর পাঠিয়েছে-যাচ্ছি গো, সবুর করো কয়েকটা

দিন ভাই। এত কষ্টে হাজির হয়ে শেষটা না দেখতে হয় শলা-পরামর্শ অন্তে যে যার কোটে ফিরে গেছে।
তাই তারিখ পেছুল জাতীয় উৎসব চুকে যাক, সম্মেলন তার পরের দিন থেকে চলবে। অবিচ্ছেদ্য আট-দশ দিন ধরে চলতে পারবে, মাঝে কোন বিরতির দরকার হবে না। ২রা অক্টোবর তারিখটা ভারতীয় পঞ্জিকার নির্ঘণ্ট মতে—পরম শুভও বটে—গান্ধিজীর জন্মদিন। অধুনাতন পৃথিবীতে শান্তির সাধনায় প্রাণপাত করছেন অমন আর কে? এই ভাল হল—গান্ধিজী ধরায় এলেন, সেই পুণ্য দিনে শান্তি সম্মেলনের আরম্ভ।
আবার এক মতলব হচ্ছে—
কার্তিক কানে কানে খবরটা দিল। এত দেশের এত মানুষ জুটেছে—বলুন দিকি, আমাদেরই কি মাথা মোটা সকলের চেয়ে? তারা তো রা কাড়ে না, নোটের বাণ্ডিলে পকেট মোটা করে দিব্যি গোঁফে তা দিয়ে বেড়াচ্ছে।
সাব্যস্ত হয়েছে, দশ লক্ষ করে ঐ যে সকলকে হাতখরচা দিয়েছে, ভারতীয় দল ও-টাকা নেবে না। অন্তর্যামীর মতো মনের কথা বুঝে নিয়ে অবিরত জিনিস-পত্রের যোগান দিচ্ছ, হাতখরচ করব—তার ফাঁক রেখেছ কোথা?
শুনে ও-পক্ষ তো হাঁ-হাঁ করে ওঠেন।
আমাদের চিরকালের প্রথা—অতিথি এলে খাওয়া-দাওয়া শুধু নয়, সম্মান-দক্ষিণা দিতে হয়। হাজার বছর ধরে হয়ে আসছে। ভারতেও আছে নিশ্চয় এমনি-কিছু। থাকতেই হবে। প্রাচ্য আতিথ্যের রীতি এই।
কুয়োমিনটাং আমলে ছিল না—ছেড়ে দিন মহাশয়, সে কথা। সকল পাট উঠে গিয়েছিল সে দুর্দিনে। যখন দিন পেয়েছি রীতিপর্ব একে একে সমস্ত বহাল হবে। নতুন-চীনে দেশ বিদেশের মানুষ প্রথম এই একসঙ্গে পায়ের ধুলো দিলেন, কিছুই তো করা হল না—অতি-সামান্য এতটুকুও যদি গ্রহণ না করেন, আমরা মর্মে মরে যাবো।
এর উপর তর্ক চলে না। নেওয়া হল টাকা, বাঁটোয়ারা হল। চুপিচুপি ঠিক রইল, হজম করা হবে না—ফেরত দিতে হবে কয়েকটা দিন পরে কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে।
হল তাই। সকলে অবশ্য পুরোপুরি দিতে পারেন নি, খরচ হয়ে গিয়েছিল কিছু কিছু। সমস্ত একত্র করে দান করা হল শিশুমঙ্গল সমিতিতে। কেমন! তোমাদের নিয়েছি যখন, আমাদের এ-দানও নিতে হবে। নইলে মর্মাহত হব জানি আমরাও।
হাতখরচের টাকা ফেরত দেওয়া হল এমনি ভাবে। সাঁইত্রিশটা দেশের মধ্যে

ভারতীয়েরাই দিল শুধু। ঐ যেমন কার্তিক বলল—অন্য সবাই উচ্চবাচ্য না করে পকেটস্থ করলেন।

(১১)

পরের দিন, অর্থাৎ পঁচিশে। সম্মেলন যখন হচ্ছে না, দেখাশুনো করে বেড়াও। ঘরে পড়ে থাকবে কেন—চীনকে দেখে বুঝে নাও, প্রাচীন সম্পর্কটা ঝালিয়ে নাও পরস্পরের মধ্যে। এটাও কাজ সকলের—

আমি বলি, সকলের বড় কাজ।

গ্রীষ্মপ্রাসাদে (Summer Palace) যাচ্ছি। বরাবর-ওখানে রাজরাজড়ারা গিয়েছেন সান-ইয়াৎ-সেনের অভ্যুদয়ের আগে পর্যন্ত। তাঁরা যেতেন ঘোড়ায় পালকিতে—আমরা বাসে। চারখানা ঝকঝকে নতুন বাসে মিছিল করে চলেছি। চানটান সেরে নিয়েছি, মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া ওখানে। আটশ বছর ধরে যে ঘরে কেবল রাজা-রাণীরা খেয়ে এসেছেন, সেইখানে আজ আমাদের পাত পড়বে। বুঝুন! সারা দিনমান কাটবে ওখানে—সারাদিন ঘুরেও নাকি নমো-নমো করে দেখা হবে, এমনি বৃহৎ জায়গা।

শহরের বাইরে জায়গাটা—দূর কম নয়। বাসে ঘন্টাখানেক লাগল। সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে উঠলেন, দেখছেন—একটা পাখি নেই কোনদিকে।

সত্যিই তো! এত পথ এলাম, এত গাছগাছালি—পাখি উড়তে দেখি নি, কোথাও। আমার বাংলা দেশের মতো পাখির ডাক ভেসে আসে না অলক্ষ্য থেকে।

সুবোধ বন্দ্যো—ব্যক্তিটিকে মালুম হচ্ছে তো? বিধান-সভার সভ্য—খবরের কাগজে হামেশাই যার নাম পাচ্ছেন। চোখ ও মন খোলা—প্রতিটি জিনিস জেনে বুঝে নিতে অসীম চেষ্টাপর তিনি।

বেলা সওয়া দশটা! বাস থেকে প্রাসাদদ্বারে নামলাম। ব্রোঞ্জের বিশাল সিংহ পাহারা দিচ্ছে। অদূরে 'দীর্ঘায়ু ও দয়ার হল'। ঘরবাড়ি, পথ-পাহাড়, অলিন্দ, দরজা, দ্বীপ—সকল বস্তুরই এক-একটা-বিচিত্র নাম। কয়েকটা ধাপ উঠে ভিতরে পৌঁছতে হবে। রাজবাড়ি কি না—সিঁড়ি থেকেই অভিনবতা শুরু। ধাপ দু-পাশে—মাঝখানটা ঢালু হয়ে উঠেছে। বিশাল ড্রাগন খোদাই-করা সেখানে।

দু-পাশের সিঁড়ি দিয়ে সকলে উঠছেন? আমরা কয়েক জন মাঝের ঢালু পথে ড্রাগন-দেহের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে। নতুন কায়দায় উঠে যাওয়ার বাহাদুরি আর কি!

চক্রেশ এসেছে দলের সঙ্গে। বলল, আরে সর্বনাশ—মুণ্ড কাটা যাবে যে! স্তম্ভিত হলাম। আর যাই হোক, স্কন্ধকাটা হয়ে দেশে ফিরব কোন্ লজ্জায়? মুণ্ড নেই দেখে বন্ধুসজ্জন বলবেন কি?

খিল-খিল করে তরঙ্গিত হাসি হাসতে লাগল চক্রেশ।

বলে, হাসছি বটে আজ। হাসি বেরিয়ে যেত সেই আমলের কেউ দেখতে পেলে। মাঝখানের ঐ জায়গা দিয়ে যাবে শুধু রাজশিবিকা। শিবিকায় রাজা থাকবেন—অপর কেউ নয়। অপরে পা ছোঁয়ালে তক্ষুনি গর্দান। রাজার পথে চলবে, এত বড় আস্পর্ধা!

রাজে লোকের পথ হল দু-পাশের ঐ ধাপগুলো। বাজে মানে কি আপনি-আমি? রানী, রাজপুত্র, মন্ত্রী, সেনাপতি—ওরাই সব। ভারি দরের মানুষ ছাড়া এখানে ঢুকবার জো ছিল না। কুয়োমিনটাং আমলেও—এই সেদিন অবধি। এখন খোলা দরজা। যে-কেউ এসে দেখ, শোন, ঘুরে বেড়াও।

মহারানীর অফিসঘর। প্রাঙ্গণ ও অলিন্দে নানা জীব-জানোয়ার ব্রোঞ্জ ও নানা ধাতুতে গড়া। ড্রাগন, ময়ূর, সূ-নি নামক অবাস্তক পৌরাণিক জীব। বড় বড় পাত্র অগ্নি-ভয়ে জল রাখবার জন্য। ঘরের মাঝখানে সিংহাসন। দু-পাশে দুই হাঁসের মাথায় বাতিদান, ধূপদান। দশম শতাব্দীর তৈরি সিল্কের বিচিত্র কারুকর্ম। শান্ত সমাহিত প্রভু বুদ্ধের মূর্তি একটি প্রান্ত জুড়ে…

এই গ্রীষ্মপ্রাসাদ বাইরে থেকে সামান্য, প্রায় সাধারণ—বোঝা যায় না, এত বস্তু আছে ভিতরে! পাথর-কাটা পথ অতিক্রম করে এসে হঠাৎ দেখি সুবিশাল লেক। জল সমুদ্রের মতো গাঢ় নীল—চোখ জুড়িয়ে যায়। তিন ভাগই জল এখানে, একভাগ মাত্র ডাঙা। লেক ঐ তো হল—তা ছাড়া পদ্ম-ভরা কত পুকুর! খালও আছে—ঝেড-প্রস্রবণের জল নিয়ে আসা হয়েছে পাহাড়ের গোড়া থেকে খাল খুঁড়ে। উঁহু, খাল কেন হবে—নদী। নামটা শুনবেন? সোনালি জলের নদী।

যত এগোই, বিস্ময়ের পর বিস্ময় উন্মোচিত হতে থাকে। এত বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য ধারণায় আসে না। দূর-পাহাড়ের উপর ঘর-বাড়ি দেখা যায়-ওগুলোও গ্রীষ্মপ্রাসাদ এলাকার মধ্যে। নেই যে কোনটা? পাহাড়, দ্বীপ সেতু, মণ্ডপ, জয়স্তম্ভ কক্ষ, অলিন্দ, পার্ক, ছাতে-ঢাকা রাস্তা—এবং পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় বিশাল বুদ্ধ-মন্দির। না জানি কোন কবির নামকরণ। গোটা জায়গাটারই এক সময়ে নাম হয়েছিল—'স্বচ্ছ ঢেউয়ের পার্ক'; এক ফটকের নাম 'রঙিন মেঘের দরজা'; লেকের মধ্যে রয়েছে 'পরীদেশের দ্বীপ'; পাহাড়ের উপরে 'ভালোবাসার শিখর'। একটা ঘর 'সুবাসের বাস'—লতায় পাতায়

অপরূপ সাজানো ; নাকে শুঁকতে হয় না—চোখের দৃষ্টিতেই বুঝি সুবাসের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। লেকের কিনারায় পদ্মবনের পাশে 'বাসন্তী-মণ্ডপ' হাতছানি দিয়ে ডাকে বসন্তরাত্রে অলস বিশ্রামের জন্য।
পৃথিবীখ্যাত অপরূপ এই প্রমোদনগরী। আট'শ বছরে কত রাজা কত রাজবংশের বিলয় ঘটেছে, নগরী রচনা অব্যাহত থেকেছে তবু। আগুনে পুড়িয়েছে ইংরেজ আর ফরাসি, ভেঙে চুরমার করেছে আটটা দুশমন জাত একত্র হয়ে—আবার নতুন ইমারত গড়ে উঠেছে ভগ্নস্তূপের উপর। সর্বশেষ রাণী বিচিত্র ষড়যন্ত্র জাল বুনতেন এই প্রাসাদে বসে। কত পাপ অন্যায়, কূট কৌশল, বন্দাস্ত্র, বিষপান! এক-আধ দিন নয়—সাতচল্লিশ বছর নানান কৌশলে তিনি রাজত্ব করে গেলেন।
পদ্ম আর বাঁশবন দেখে ক্যান্টনের পথের কথা মনে পড়ে যায়। ব্যাপারও তাই। সেকালের এক দুঃসাহসী রাজা (চে-লুং) ইয়াংসি পার হয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণ-চীনে। সেখানকার নিসর্গ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দক্ষিণের গাছপালা আমদানি করে এই উদ্যান সাজিয়েছেন। নানা জাতীয় বামনগাছ—পাঁচ-সাত শ' বছরের বাড়বৃদ্ধি কুল্যে হাতখানেক। জাপান ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও হেন বস্তু দেখা যায় না। এই গাছ-লালনের কৌশল এরাই শুধু জানে।
লেকের আগে অন্য নাম ছিল, এখন কুয়েনমিন লেক। ছোট ছিল, কেটে বড় করেছে। সেই মাটি পাহাড়ের গায়ে পড়ে পাহাড়েরও আয়তন বেড়েছে! জলের মাঝখানে 'পরীদেশের দ্বীপ'—ঘরবাড়ি ও গাছগাছালি মেশামিশি হয়ে আছে বিচিত্র রূপে। মার্বেল পাথরের তৈরি সতের-খিলানের সেতু-হুড়োহুড়ি করে সেতুর উপর দিয়ে ছুটলাম সকলে দ্বীপের দিকে। চার সিংহ সেতুমুখ পাহারা দিচ্ছে—ভয় নেই, ভয় নেই! পাথরের সিংহ।
লেকের উপর পাহাড়ের গায়ে মার্বেলের নৌকো। দুশ' বছর আগে তৈরি —তখন ছিল শুধুই নৌকো—বাড়িয়ে ও ঘষামাজা করে দোতলা জাহাজের রূপ দিয়েছে ১৮৯২ অব্দে। অযত্নে অবহেলায় পড়ে ছিল, নতুন আমলে পরিপাটি হয়েছে আবার।
পাহাড়ে উঠছি এবার—বুদ্ধমন্দিরে। উঠতে উঠতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। পথ সংকীর্ণ। খানিকটা জায়গায় সিঁড়ির মতো—ফাঁকা-ফাঁকা টেরা বাঁকা সিঁড়ি। মন্দিরের পথ বলেই বোধহয় এমনি—অনায়াসপ্রাপ্তিতে পুণ্য নেই। আরে, হাত ধরতে আসে যে মেয়েগুলো! এক-এক ফোঁটা কলেজের মেয়ে পাহাড়ের এই দুরারোহ পথ—ভারি আস্পর্ধা বাপু তোমাদের! রাগ করে জোর পায়ে ওদের আগে গিয়ে উঠি। এই তো সেদিন অবধি পায়ে ছোট লোহার জুতো পরিয়ে

রাখত, এতটুকু পা নিয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয় যাতে। মেয়েমানুষ খোঁড়া হয়ে বেশ নাচের ঠমকে চলবে, সেই তো শোভা। সানইয়াৎ-সেন প্রাচীন বনেদি রীতি রহিত করে চিরকালের বামনদের মনে চাঁদ ছোঁয়ার স্বপ্ন জাগিয়ে দিলেন। তাই দেখুন, দুর্গম গিরিপথে দাপাদাপি করছে সাহসিকা-দল। আর কিনা হাত ধরে আমাদের গিরিশীর্ষে নিয়ে তুলবে বলে!

উপরে মন্দিরের নিম্নদেশে আর-এক মন্দির। নয় তলা ছিল—ইংরেজ ও ফরাসী ভেঙে দেয়। এখন চার তলা মাত্র। কপিলাবস্তুর রাজপুত্র সন্ন্যাসী বহু সহস্র ক্রোশ দূরে অটল মহিমায় দাঁড়িয়ে আছেন—দুই প্রধান শিষ্য দু-পাশে। মণিমাণিক্য হীরা-জহরতে সাজানো ছিল বিগ্রহ, ঠিক সামনে ঐখানটায় ছিল অতি-বৃহৎ আয়না—দেখুন, চেয়ে দেখুন, নিদর্শন রয়েছে তার।—তিক্তকণ্ঠে দোভাষী মেয়েটা বলে, সেই লুঠেরারা ভেঙে ফেলেছে আয়না, মণিমাণিক্য ডাকাতি করে নিয়ে গেছে। সারা দেশ জুড়ে বার বার এমনি অত্যাচারের ঢেউ বয়ে গেছে। বলতে পারেন, কেন এমন হয়?

বেলা গড়িয়ে আসে। দেখার শেষ নাই। পা টলমল করছে তবু বসতে মন চায় না। দু-চোখ ভরে দেখে নিই আর যেটুকু সময় আছে। চিরজন্মের এই দেখা…

রাজার জন্মদিনে উৎসব হত এই ঘরটায়। ঐ চেয়ার আর ঐ টেবিল কাঠের তৈরী, আয়তনও এমন-কিছু বড় নয়। নিয়ে যাও দিকি সরিয়ে। হেঁ-হেঁ, দশ-বিশের কর্ম নয়—সাত শ' মানুষ লাগাতে হবে, তবে নড়বে।

লুঠপাট হয়ে গিয়েও যা এখনো আছে, স্বদেশি বিদেশি সকলের চোখ ঠিকরে যায়। হাতির দাঁতের তৈরি একটা মাছ দেখুন কত বড়। দেখুন, প্রাচীন শিল্পী ফ্যান-আন-ইয়া'র অপরূপ চিত্রমালা। আর ওদিকে মাটির কাজ, গালার কাজ, চন্দনকাঠের কাজ। কারু-শোভিত আসবাপত্র, অলঙ্কার, ছাত থেকে ঝুলানো রকমারি বাতিদান…কত আর লিখব! লিখতে গেলে দেখা হয় না, পিছিয়ে পড়ি। এই সব কক্ষ-অলিন্দ মণ্ডপ-চত্বরের গোলকধাঁধার মধ্যে রাজরানী রাজমাতা রাজকন্যারা কোথায় যেন বেড়াতে বেরিয়েছেন—এক্ষুনি আসবেন ফিরে—তেমনি ভাবে চারিদিক পরিপাটি করে সাজানো। তাঁদের অনুপস্থিতিতে তাড়াতাড়ি চোখের দেখা দেখে নিচ্ছি আমরা।

শেষ রানীর পোশাক বদলানোর ঘর। কত পোশাক রে বাপু—দেওয়ালে কত রকমের আয়না! চন্দনকাঠের অতিকায় পেঁটরা; মাছ রাখত, ফল রাখত, চন্দন পোড়াত—সেই সব নানা ধরনের পাত্র। সাতচল্লিশ বছরের রাজত্বে স্ফূর্তির চূড়ান্ত করে গেছে বটে! সব দেশের রাজরাজড়ার ঐ এক রীতি।

আট-আটটা রান্নাবাড়ি রানী সাহেবার—গণে দেখলাম। মহারানী যখন, তার কমে কুলাবে কেন? অমন দেড়-শ দু-শ রাঁধুনি ছিল—তারাও সামাল দিয়ে উঠতে পারত না। মারাঠি মেয়ে সরলা গুপ্তা হেসে বললেন, পোড়া কপাল আমাদের, একটা রাঁধুনি জোটে না—হাত পুড়িয়ে খেতে হয়।

রানী হতে হবে, তবে তো দু'শ রাঁধুনির রান্না খাবেন। কেরানী, চাকরানী—এই তো সকলে। শুধু মাত্র রানী কে আছেন, বলুন।

অপেরা ঘর—তেতলা-মঞ্চ। নাটকের পরী স্বর্গ অর্থাৎ উপরতলা থেকে এবং দৈত্যদানো পাতাল অর্থাৎ নিচের তলা থেকে আবির্ভূত হত মাঝের মঞ্চে। রাজ-পরিবার অভিনয় দেখতেন ঐ ঘরের ভিতর কাঠের ঝিলিমিলির অন্তরাল থেকে। এখন মিউজিয়াম—পুরানো শিল্পবস্তু সাজানো রয়েছে। একধারে বিশ্রামকক্ষ সারি সারি। আর বাজনা বাজে না, নাটক হয় না—গহনার শিঞ্জন নেই প্রেক্ষাকক্ষে। সিঁড়ির ধারে ছোট ঐ গাছটিতে অজস্র লাল ডালিম ফলে নির্জন গৃহাঙ্গণ আলো করে রয়েছে।

না গো, নির্জন হবে কেন, সাড়াশব্দ পাই যে ভিতরে! বিছানা, কাপড়-চোপড়, থালাবাটি—উঁকি দিয়ে দেখি, মানুষও রয়েছে শুয়ে বসে। একজন দুজন নয়—বিশ্রাম ঘরগুলো সমস্ত ভর্তি। আমাদের দেখে বেরিয়ে এলো। হাততালি দিচ্ছে। সমবেতকণ্ঠে গলা মিলিয়ে বলছে—চীন-ভারত এক হও, হোপিন ওয়ানশোয়ে—শান্তি দীর্ঘজীবী হোক।

এরাই রাজা একালের। সর্বাঙ্গে দুঃখ-সংগ্রামের অগণিত ক্ষতচিহ্ন—মুখের প্রসন্ন হাসির সঙ্গে দেহের চেহারা একেবারে বেমানান। শ্রমিক-বীর এরা। কৃতিত্বের পুরস্কার—রাজকীয় প্রমোদ-নগরীতে দশটা দিন স্ফূর্তি করে যাবে। অতুল সম্মান—যখন কাজে ফিরবে সম্ভ্রমদৃষ্টিতে তাকাবে সকলে। আট শতাব্দী ধরে গড়ে-তোলা গ্রীষ্মপ্রাসাদের সেই অপরাহ্ণে নবীন কালের রাজা মহারাজারা গভীর উল্লাসে হাত ঝাঁকিয়ে বিদেশি আগন্তুকদের সংবর্ধনা জানাল…

কিন্তু আর নয়। দূতাবাসে যেতে হবে এখন। লেকের জলে নৌকো চড়া হল না…উপায় কি, দূতাবাসে হাজিরা দিতে হবে আজকের মধ্যেই।

ছুটল বাস। বেশ লাগে, এই সুদূর শহরে একটি বাড়ির মাথায় বিশাল ত্রিবর্ণ ভারতীয় পতাকা উড়ছে। কক্ষে কক্ষে গান্ধির ছবি। নাম সই করতে হল ওঁদের খাতায়, তারপর গল্পগুজব চলল। শরবত খাওয়ালেন ওঁরা। পরাঞ্জপে কোথায় কাজে বেরিয়েছেন, দেখা হল না তাঁর সঙ্গে।

দোতলায় লিফটের সামনাসামনি একটা ঘরে ভারতীয় দলের অফিস। দরজার পাশে নোটিশবোর্ড। হরেক রকম নোটিশ বেরুচ্ছে দিনের মধ্যে অমন বিশ বার। উঠা-নামার মুখে বোর্ডে অতি-নিশ্চয় উঁকি দিয়ে জেনে যাবেন—কী আপনার করণীয় অতঃপর। সেক্রেটারি বিস্তর—লেখাজোখারও সেজন্যে অবধি নেই। বহু সন্ন্যাসীর কর্মতৎপরতায় দরকারি জিনিসটাই অবশ্য বাদ পড়ে থাকে কখনো কখনো।

সোভিয়েট-ডেলিগেটরা নিমন্ত্রণ করেছেন ব্যাঙ্কুয়েট-হলে। সন্ধ্যার সময় খাওয়া—ফিরে এসে নোটিশ-বোর্ড থেকে অবগত হওয়া গেল। আর কুমুদিনী মেহতা মুখে বললেন, জনকয়েক সাহিত্যিকের মধ্যে মোলাকাতের চেষ্টা করা যাচ্ছে। হয়তো বা এখনই। ঘরে থাকবেন, বেরিয়ে পড়বেন না।

চোরে চোরে মাসতুত ভাই—অমন আপন-জন বিদেশ-বিভূঁয়ে আর কে? চোখ ঠেরে কুশলাদি শুধাবো, খবর কি ভায়ারা? লেখনী-পেষণের কারবার চলে কেমন ওদিকে? খাতির পাও, সভায় ডাকে, বই-টই কিনে পড়ে তো সবাই—না মুফতে বাগাবার চেষ্টা?

চারতলার ঘরখানায় কবি-সাহিত্যিক গিজগিজ করছে অর্থাৎ ডাক-সাইটে কতকগুলো মিথ্যুক আর অকর্মা জুটেছে এক জায়গায়। কথার সঙ্গে কথা জুড়ে খাজে কাজে বসে বসে তারা দিন কাটায়। শাস্ত্রের বচন-একশ' বার মিথ্যে কথা বলবে, কিন্তু মা লিখ, মা লিখ। আর এই দুর্বৃত্তেরা (আমি, আর আমার মতন যারা গল্প-উপন্যাস লেখে) মিথ্যে কথা হরদম লিখে দেশ-বিদেশে বুক ফুলিয়ে প্রচার করে।

জন ত্রিশেক হবো আমরা গণতিতে। ধুরন্ধর রাজনীতিকের স্থান নেই। অথবা তাঁরা আসবেনই না এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারে। আলোচনা বিশেষ ভাবে সোভিয়েত সাহিত্যিকদের সঙ্গে। তার মধ্যে আছেন তুর্কি-কবি নাজিম হিকমতও। ভদ্রলোকের কবিতার গুঁতোয় তুর্কি-সরকার তেড়েফুড়ে শুধু মাত্র কবিতা নয়—কবিকেও বের করে দিয়েছেন দেশ থেকে। অগতির গতি রাশিয়ার আশ্রয়ে তিনি আছেন। মস্কোয় বসতি।

কী সব তাগড়া জোয়ান! কলমবাজিতে উদরপূর্তি করে এমনধারা চেহারা বাগিয়েছে—আমাদের কালোবাজারিরাও যে হার মেনে যায়। নাজিম হিকমতের অনেক কবিতা বাংলা পড়েছি—ভারি ঔৎসুক্য কবিকে দেখবার। এত বড় কবি—অতএব কিঞ্চিৎ ললনা-মোহন আহা-মরি গোছের ভাব থাকা উচিত। সে-সব একেবারে কিছু নয়, মুসড়ে গেলাম—ইয়া দশাসই জোয়ান,

টকটকে ফর্সা রং। একটা পা খোঁড়া, লাঠি নিয়ে চলতে হয় সর্বদা।

ছোট ছোট দল হয়ে গেল তুরসুন, কোজেভনিকভ, হিকমত—এমনি এক-একজনকে নিয়ে। আমরা দলের নেতা খোদ অ্যানিসিমভকে নিয়ে পড়লাম। মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার! সাহিত্যিক ও সাহিত্যের অধ্যাপক, তার উপর সোভিয়েট-লিটারেচার সম্পাদনা করেন। দেহ গৌরবেও হিমালয় পর্বতের বড় বেশি কম যান না। (সকলের হিংসা করে মরছি, এ অধমও অবশ্য হেলাফেলার বস্তু নন আয়তনের দিক দিয়ে।)

ব্যবস্থাপনা কুমুদিনী মেহতার—তিনি পরস্পরের পরিচয় করিয়ে দিলেন। দীর্ঘকাল বিলাতে ছিলেন, জলের মত ইংরেজি বলেন। রাশিয়া গিয়েছিলেন, রুশ ভাষাতেও দিব্যি দখল। আসল দোভাষি হলেন পোপোভ—ইংরেজিনবিশ কাগজে সম্পাদক ইনিও। কথাবার্তার মধ্যে কুমুদিনী ফোড়ন দিচ্ছেন মাঝে মাঝে, দুর্বোধ্য এক-একটা জিনিস সহজ করে বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

গোড়ায় আমি একাই শুরু করেছিলাম। একটা সোফার একপাশে আমি মাঝে অ্যানিসিমভ, ওপাশে পোপোভ। ইণ্ডিয়ার উপন্যাসকার শুনে গভীর আন্তরিকতায় হাত জড়িয়ে ধরলেন আমার। আহা, টেগোরের দেশের লেখক তুমি, টেগোরের উত্তরাধিকারী।

মনে মনে প্রণতি জানাই গুরুদেবের উদ্দেশে। দেশে দেশে কত সম্মান ছড়িয়ে গেছ তুমি আমাদের জন্যে। আজ কতকাল পরে পিকিন হোটেলের চারতলার ঘরে মানুষগুলো ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে রইল—তোমার রেখে-আসা ইজ্জত সগৌরবে মাথায় তুলে নিলাম। তাই তো বলি, বাইরে না এলে দৃষ্টি খোলে না, বোঝা যায় না নিজেদের যথার্থ মূল্য। সঙ্কীর্ণ দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে বেড়াই, কূপের ভেকের মতো ভ্রান্ত অহমিকায় স্ফীতোদর হই। তোমার বিশ্বজনীনতা একদা সমালোচকের উপহাসের বস্তু হয়েছিল—বিশ্ব যে ক্রমে ঘরের মধ্যে এসে যাচ্ছে, উঁচু হয়ে দেয়ালের বাইরে নজর তুলে দেখে নিক তারা একটি বার। বাইরে এসে উপলব্ধি হয় টেগোর-নেহরু-নেতাজির মহিমা ইতিমধ্যে আরও অনেকেই ঝুঁকেছেন এই দিকে। সোফায় জুত হয় না—তখন নিচের কার্পেটে গোল হয়ে বসি।

অ্যানিসিমভ বললেন, আমাদের সম্বন্ধে ধারণা কি তোমাদের দেশে? বিশেষ করে তোমাদের সাহিত্যিক মহলে? অনেক রকম ভুল ধারণা জন্মাবার চেষ্টা হয়—কি বলো? আচ্ছা, এই কিছুদিন আগে এক দল গিয়েছিলেন আমাদের দেশে। কেউ কিছু লিখলেন, খবর রাখো?

নজর বন্ধ রেখে চলি, অনেকেই অবশ্য আমরা। কতক অভ্যাসের বশে, কতক

বা স্বার্থের খাতিরে। কিন্তু ওখানে তা ফাঁস করতে যাই কেন? বললাম, (আর তা মিথ্যাও বড় নয়) তোমাদের সম্পর্কে বড় আগ্রহ ভারতের মানুষের। রবীন্দ্রনাথ সেই যে 'রাশিয়ার চিঠি' লিখলেন, আগ্রহ সেই থেকে সর্বব্যাপ্ত হয়েছে। বলেছ ঠিকই—নরকের কীট বলে ঢাক বাজাবার ব্যবস্থাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু সমস্ত বিতর্ক ছেড়ে দিয়ে তোমরা যে মানব-সমাজ নিয়ে অতি-আশ্চর্য এক্সপেরিমেন্ট করছ এবং বিস্ময়কর সাফল্যও পেয়েছ—শত চেষ্টাতেও এ সত্য লুকানো যাবে না। চিরাচরিত ভাবনার মূল ধরে নাড়া দিয়েছ—তোমরা। শুধু মাত্র থিয়োরি নয়—হাতে-কলমে তা রূপায়িত করে দেখিয়েছ। আরো দেখাবে।

রাশিয়া থেকে ফিরে হালে যা লেখা হয়েছে, তার মধ্যে সত্যেনদা'র বইটার কথা মনে ছিল। দরাজ ভাষায় তার পরিচয় দিলাম। অ্যানিসিমভ বললেন, কে লিখেছে বললে— মজুমদার?

মজুমদার, মজুমদার বার কয়েক বলে লেখককে মনে আনবার চেষ্টা করছেন। বললাম, রাশিয়ার আর চীনের কথা লোকে বড় শুনতে চায়। ছেলেপুলের রূপকথায় যেমন কৌতূহল, তেমনি যেন কতকটা। সত্যেনবাবুর বইটা যে মাসিকপত্রে বেরিয়েছিল, তার সম্পাদক আমাকেও অনুরোধ করেছেন। ফিরে গিয়ে চীনের কথা ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।

অ্যানিসিমভ উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, লিখবে তুমি? মানুষে মানুষে সত্য পরিচয় হোক, সব চেয়ে বড় কাম্য এটা। বিশ্বশান্তি আসবে। আর, রাজনীতিক নয়—সাহিত্যিকেরই এ কাজ প্রধানত।

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলি, আমিও ঠিক এমনি ভাবছি। মানুষই আসল। চীনের কথা যা লিখব তাতে থাকবে না সংখ্যাতত্ত্ব বা রাজনীতিক বিশ্লেষণ। ও সব বুঝিও নে। মানুষেরা থাকবে আমার কাহিনী জুড়ে। সামান্য আর মহৎ যত মানুষ দেখতে পাচ্ছি। তাদের এই সুবিপুল উল্লাস আর কঠিনতম সাধনা। জমে উঠেছে আমাদেরই সব দলের চেয়ে বেশি। উমাশঙ্কর যোশি আর অধ্যাপক শুকলা এলেন এই দিকে। এলেন কেরালার লেখক জোসেফ মুণ্ডেশেরি। আর যারা ছিলেন, মনে করতে পারছি নে।

সোভিয়েট সাহিত্য পড়ো তোমরা? কোন্ কোন্ লেখক তোমাদের প্রিয়, জানতে ইচ্ছে হয়।

শুধু ঘাড় নেড়ে এবার নিস্তার নেই। তা আমরাও পিছপাও কিসে? গড়-গড় করে কতকগুলো নাম বলা গেল। এ কালের শুধু নয়, সেকালেরও। আর উমাশঙ্করের, সত্যি, প্রচুর পড়াশোনা। কোন একটা ভাল বইয়ের পাতা ধরে

যদি একজামিন করতে বসি, তা-ও বোধকরি তিনি হার মানবেন না।
টলস্টয়ের সম্বন্ধে বললাম, কৈশোর থেকে তাঁর লেখায় অনুপ্রেরণা পেয়ে আসছি। মহাত্মা গান্ধী আমাদের হৃদয়ের মানুষ— টলস্টয়ের আসনও দূরবর্তী নয়?
অ্যানিসিমভ উল্লসিত হলেন।
দেখ, আগামী বছর টলস্টয়ের একশ' পঁচিশ জন্মবার্ষিকী। জাঁকিয়ে উৎসব করতে চাই এই উপলক্ষে। আর বুঝতে পারছ—এ হল আসলে সাহিত্যিকদেরই অনুষ্ঠান, তাঁরা জমায়েত হবেন সব চেয়ে বেশি। ভারত থেকে অনেক সাহিত্যিককে আমরা চাই, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তাঁরা জীবন্ত পরিচয় স্থাপন করবেন। এ ব্যাপারে, আশা করি, পুরোপুরি সহযোগিতা পাবো তোমাদের—
নিশ্চয়, নিশ্চয়—
ওরে পাগলা ভাত খাবি না—হাত ধোব কোথায়? আমাদের বল সেই বৃত্তান্ত। কিন্তু চেপেচুপে মনোভাব প্রকাশ করতে হয়—হ্যাংলামি বেরিয়ে না পড়ে।
তার পর এক মোক্ষম প্রশ্ন উমাশঙ্করের। যে সন্দেহ অনেক মানুষের মনে। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নেই নাকি সোভিয়েট-রাষ্ট্রে? চিন্তার প্রকাশ যথেচ্ছ করা চলে না। সাহিত্য ফরমাশ মতন তৈরি হয়, চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ততায় গড়ে ওঠে না। দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপনি—আপনার মুখ থেকে ব্যাপারটা প্রাঞ্জল ভাবে জানতে চাই।
হ্যাঁ, এমনি রটনা হয় বটে। ভাল হল আপনাদের প্রশ্নটা পেয়ে।
ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন আমাদের দিকে চেয়ে। মুখে মৃদু হাসি। বললেন, সত্য আমাদের দিকে। কিছু লুকোবার নেই কারো কাছে। পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা থাকা সম্ভব শুধুমাত্র সেইখানে, যেখানে যথার্থ গণতন্ত্র বর্তমান। সে আমাদের দেশেই।
দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, সোভিয়েটের পঁয়ত্রিশ-বর্ষব্যাপী অস্তিত্বের মূলনীতি হল, যা-কিছু ভাল সমস্ত সর্বসাধারণের সম্পত্তি। লোক আর লেখকের মধ্যে সম্পর্ক অতি নিবিড়। লোকের চিন্তা-চেষ্টাই সাহিত্যের বাণী। সাহিত্য নিতান্তই জনমনের প্রতিধ্বনি। মায়ের যেমন সন্তান সম্পর্কে প্রত্যাশা—জনগণও ঠিক তেমনি আশা করে; লেখক কর্তব্যপর হবেন—লেখার ইষ্টানিষ্ট অনুধাবন করবেন।
অ্যানিসিমভের মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা। এক গণ্ডা কলম উদ্যত হয়ে

আছে, চলেছে একটি মাত্র—পোপোভের কলমটা। তিনি নোট নিচ্ছেন। বক্তা থামলে ঐ নোট দেখে তিনি ইংরেজিতে বুঝিয়ে দেবেন। তখন ছুটবে আমাদের কলমের পাল্লা। একটি কথা বাদ না পড়ে, এতটুকু হেরফের না হয়। একটি কথা অ্যানিসিমভ বারবার উচ্চারণ করছেন—'নারোড'। ঝগড়া বাড়াতে হলে আমরা 'নারদ', 'নারদ'—বলে কলহ-দেবতার আবাহন কার—সেই নামটা অবিকল। হাসি পায়, মজা লাগে। পোপোভের অনুবাদের সময় টের পাওয়া গেল, রুশীয় 'নারোড' হলেন জনগণ। ওটা কিন্তু আমাদের দেশের হলেই ঠিক হত। এত ঝগড়াঝাটি ও লাঠালাঠি পরস্পরের মধ্যে—তাঁরা যে নির্ভেজাল 'নারদ', অত্র সন্দেহ নাস্তি।

অ্যানিসিমভ বলেছিলেন, জীবন বৈচিত্র্যময়। সাহিত্য জীবন-সত্য রূপায়িত হয়, অতএব আলো-অন্ধকার নিশ্চয় থাকবে। লেখকের কর্তব্য হল সত্যের উদ্ঘাটন ও ব্যাখ্যা। এ বিষয়ে সোভিয়েট-লেখকদের চেয়ে বেত্তি বিমুক্ত কে? জোর দিয়ে বললেন, সর্বাধিক মুক্ত আমাদের লেখকেরা। সোভিয়েট-কাঠামোর ফল এটা। কেউ যখন মিথ্যা রটায়, সোভিয়েট-লেখকের স্বাধীনতা নেই—আমরা হাসি। এসে বরঞ্চ নিজের চোখে দেখ, দেখে নিঃসংশয় হও। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। প্রশ্নটা জনগণের দাবির সঙ্গে বিজড়িত। গণতান্ত্রিক সমাজে সব চেয়ে বড় শক্তি গণদাবি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মহিমময় লেখক (রবীন্দ্রনাথের নাম একাধিকবার উচ্চারণ করলেন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে। নাম করছেন আমার দিকে তাকিয়ে। আলাপনের গোড়ার দিকে বুক চিতিয়ে বলেছিলাম—বাংলার লেখক আমি, বাংলা ভাষায় লিখি—যে ভাষায় টেগোর লিখেছেন। অর্থাৎ বঙ্গ-সাহিত্য বলতে আপাতত দু-জনকে ওরা জেনে রাখলেন—টেগোর এবং এই অধম) নিশ্চয় অবাধ সুযোগ পাবেন খুশিমতো লিখবার। কারণ তিনি জনগণের কাছাকাছি—লোকের শুভাশুভ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি প্রখর ও আবিলতাশূন্য। কিন্তু ব্যক্তিস্বর্বস্ব নৈরাশ্যবাদী লেখক—যিনি মানুষ চেনেন না, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ নেই যাঁর—তাঁর খেয়ালখুশি বাধা পাবে নিশ্চয়। রবীন্দ্রনাথের বই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ি—ভারতের আত্মার সন্ধান পাই সেখানে, ভারতের চিরকালের মানুষদের দেখি। তা বলে টি এস এলিয়টের সম্পর্কে এ কথা খাটবে না। রবীন্দ্রনাথ একেবারে পৃথক মনোভঙ্গি নিয়ে লিখলেও সে রচনা আমাদের আদরণীয়।

আর নয়, গা তুলুন এবার। ঘোর হয়ে এলো। ভোজের আসর এখনই। এঁরা খাওয়াবেন আজ আমাদের। খাওয়া এবং বক্তৃতা আছে, কিন্তু সব চেয়ে

বড়ো জিনিস হাসি-রহস্য, গা এলিয়ে বসে আজেবাজে গল্পগুজব । কে বলবে, বিশ্বের এ-পাড়ায় আমাদের ঘর—আর ওরা হল ও-পাড়ার ? সব বিভেদ ভুলে গিয়েছি । একটা ঘরের মধ্যে এখন আমরা এক পরিবারের লোক ।

না, খাওয়ার ফিরিস্তি আর নয় । বুঝতে পারছি, পাঠকবর্গের প্রতি নিষ্ঠুরতা হচ্ছে । ঠাকুর রামকৃষ্ণ উপমা দিতেন. পাঁজিতে দশ আড়া জল লেখে, পাঁজি নিংড়ে এক ফোঁটাও মেলে না । পিকিন-ডাকের (স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতলে ঐ বস্তুর নাকি জুড়ি নেই) আধখানা ঠ্যাং-ও খাওয়াতে পারব না, কেন মিছে রসনা লালায়িত করা ?

একদিন এক বিষম কাণ্ড হয়েছিল, তবে শুনুন ।

খাওয়ার টেবিলে গল্পগুজবের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে আমাদের একজন বললেন, জল—

গেলাসভর্তি জল (ফোটানো জল অবশ্য) দেখে চমক ভাঙল, অ্যাঁ ?

জলই তো চাইলেন—

ভুল করে চেয়ে বসেছি । জল বদলে লেমনেড বা অরেঞ্জস্কোয়াশ দাও ভাই—চল্লিশ দিন চলেছে এই রকম । আদরের অতিথি—জল খাবো কেন—হ্যাঁ ? আর যাই হোক, আমাদের দেশেঘরে ও-বস্তুর অভাব নেই । প্রচুর আছে ।

ঘুরে ফিরে আবার ঐ খাওয়ার কথা । থাক গে, মোটামুটি একটা বিধি জেনে রাখুন শুধু । সকালে খাওয়া, দুপুরে খাওয়া, রাত্রে খাওয়া । আলোচনায় বসলে খাওয়া, ট্রেনের মধ্যে প্লেনের মধ্যে খাওয়া, যেখানে যাচ্ছি এবং যা-কিছু করছি সর্বত্রই সুবিধামতো খাওয়ার প্রয়োজন । খাওয়ার প্রসঙ্গ পারতপক্ষে আমি আর তুলবো না—কমা-সেমিকোলন-দাঁড়ির মতো আপনারা জায়গা বুঝে ঐ ব্যাপার মনে মনে বসিয়ে নেবেন ।

রাত্রে ঘরে ঢুকবার সময় নোটিশ-বোর্ড দেখে লাফিয়ে উঠলাম, সকালবেলা স্পেশ্যাল-ট্রেন যোগে বেরুনো হবে মহাপ্রাচীন দেখতে ।

(১৩)

মন উড়ল কত দিন-মাস-বছর পিছিয়ে, কত দেশদেশান্তর পার হয়ে । কোথায় এই পিকিন শহর, কোথায় বা সে-কালের নিতান্ত সাধারণ জনবিরল একটি গ্রাম—ডোঙাঘাটা ! মধ্য-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালায় ঘিরে বসেছি প্রহ্লাদ মাস্টারমশাইকে । জগতের সপ্ত আশ্চর্যের গল্প বলছেন । শিশু-দলের চোখে মুখে আনন্দ-কৌতুক । কোন দেশে বিশালাকায় রাক্ষুসে ঘণ্টা বাজছে ঢং-ঢং করে । সুনীল সমুদ্রে ঘেরা সাইপ্রাস দ্বীপে পিত্তল মূর্তি দুই গিড়ি চূড়ে দুই পা রেখে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে আছে—নৌকো-জাহাজ চলাচল করে নিচ দিয়ে ।

ঝাবিলনে আকাশব্যাপ্ত সুবিশাল উদ্যান। আর ঐ মহাপ্রাচীর—"দ্বাদশটি অশ্বারোহী প্রাচীরের উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে ঘোড়া ছুটাইতে পারে—" খটাখট খটাখট ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে—গিরি-নদী-কালান্তর অতিক্রম করে ছুটছে—গ্রামশিশুর দৃষ্টির উপর ঝিলিক দিয়ে যায় তারা, কানে বাজে অশ্বখুরের ধ্বনি! সেই মহাপ্রাচীর চোখে দেখতে যাচ্ছি। মিলিয়ে দেখব, আমার শিশু-কল্পনার সঙ্গে কতখানি মেলে আসল বস্তু। তাই তো ভাবি, স্বপ্নেও মনে করতে পারি নি—এমনি কত কি পেলাম এই জীবনে! সত্য বলে ভাবতে ভরসা পাই নে, আমার জীবনে প্রাপ্তির এমন দুকূলব্যাপী প্রবাহ। ভাল করে চোখ কচলে স্পষ্ট চিত্তে দেখতে ভয়-ভয় করে, স্বপ্ন হয়ে মুছে যাবে বুঝি এ সমস্ত!

সকাল পৌনে ন'টায় পিকিন স্টেশনে। বাইরের ভিতরে অপরূপ সাজিয়েছে শান্তির কপোত, পতাকা, ফুল। আর টাঙিয়ে দিয়েছে—লাল সিল্কের কাপড়ে তৈরী একরকম উৎসব-মালা—নাম জেনে এসেছি সা-তেং (Sa-teng)। লাউডস্পীকারে গান হচ্ছে। ছেলেমেয়ের দল, সৈন্য ও মাতব্বরেরা বিদায় দিতে এসেছেন। হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, হাততালি দিচ্ছেন এক-তালে। সারা স্টেশন গমগম করছে।

শহর ঘিরে যে দৃঢ় অত্যুচ্চ পাঁচিল আছে, স্টেশন তার বাইরে—একেবারে পাঁচিলের লাগোয়া। প্লাটফরমের পশ্চিম দিক হচ্ছে পাঁচিল। পাঁচিল থেকে কতকটা দূর অবধি বাগান, রংবেরঙের ফুল ফুটে আছে সেখানে।

স্পেশাল ট্রেন কিনা—নতুন রং-দেওয়া ঝকঝকে গাড়ি, চেয়ার টেবিলে ধবধবে চাদর পাতা। প্রতি কামরার দরজার কাছে মাতব্বরদের এক-একজন দাঁড়িয়ে। শেকহ্যাণ্ড করে সমাদরে গাড়িতে তুলে দিচ্ছেন।

আলোয় চীনা অক্ষর ফুটে আছে ল্যাভেটরির সামনে। তার মানে, খালি আছে—এখন ব্যবহার করতে পারো। মানুষ ঢুকলে আলোর লেখা আর থাকবে না।

পাঁচিলের ধারে ট্রেন চলেছে। কঠিন বিশাল পাঁচিল—গিয়েছে কতদূর! এ বস্তুও কম আশ্চর্য নয়। লাইনের ওদিক গড়খাই—তার ওপাশে ঘরবাড়ি। রাজহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে গড়খাইর জলে। একটা বিড়াল বসে আছে চুপচাপ। গোরু-ছাগলের পাল। ছেলেমেয়ে কোলে গ্রাম-বৃদ্ধেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আমাদের। দুটো স্টেশন ছাড়িয়ে এলাম, একটানা পাঁচিল তবু চলছে আমাদের বাঁদিকে।

চেয়ারে হাতলের পাশে বোতাম টিপলে আংটির মতো জিনিস বেরিয়ে আসে। ঐখানে কাঁচের গেলাস বসিয়ে চা দিয়ে গেল। দুধ-চিনিবিহীন সোনার বর্ণ

চা—খুব সুগন্ধ, ফুলের রেণু মেশায় ওরা চায়ের সঙ্গে।.
আর একরকম আছে—সবুজ চা। জলে পাতা ফেললেই সবুজ রং হয়ে যায়। এই জাতীয় চায়ের—বিশেষ করে হ্যাংচাউ অঞ্চলে যা উৎপন্ন হয়—ভারি নামডাক।
চীনারা হল বনেদি চা-খোর। সময়-অসময় নেই, জায়গার বাছবিচার নেই—সর্বক্ষেত্রে চা। 'চা' কথাটাও খাঁটি চীনা। আমরা দুধ-চিনি মিশিয়ে খাই শুনে ওরা হেসে খুন। ওতে স্বাদ-গন্ধ থাকে কিছু? শুধু দুধ-চিনি খেলেই তো পারো তার মধ্যে চায়ের কয়েকটা পাতা না ফেলে। ওদের ঐ চা-ভেজানো জলে গোড়ায় তেমন মউজ হত না আমাদের। পরে মজা পেয়ে গেলাম। অবোধ অতিথিজন বলে করুণাপরবশ হয়ে যদি দুধ-চিনি দিতে আসত, আমরাই তখন না-না করে উঠতাম।
দেখ, দেখ—কত পাতিহাঁস একটা পুকুরে! যেন একরাশ শ্বেতকুসুম ফুটে আছে। পাখি নেই—কাল যে বলাবলি হচ্ছিল? কিচমিচ করে আমাদের জানান দিয়ে একঝাঁক উড়তে উড়তে সুদূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল।
লাউড-স্পীকারে বারংবার মার্জনা চাইছে। সামনের স্টেশনে গাড়ি পাঁচমিনিট থেমে থাকবে ইঞ্জিন বদলানোর জন্য। পাহাড় অঞ্চলের শুরু—গাড়ির গতি কমবে এবার থেকে।
বিনামূল্যে যদিচ—টিকিট দিয়েছিল আমাদের প্রত্যেককে, সেই টিকিট চেক করতে এলো। গটমট করে কাজ করে বেড়াচ্ছে—বাপরে বাপ, পোষাক-পরা যত সব জাঁদরেল কর্মচারী। কাছে এলে সন্দেহ হয়, ঠাহর করে দেখি। কে বট হে তুমি? অত লাবণ্য চাপা দেওয়া আছে রেলের টুপি ও কোটপ্যান্টে। হাসলেই তখন ধরা পড়ে যায়। নতুন-চীনের কর্মচঞ্চল মেয়েরা। রুপালি দাঁতে ঝিকমিকে সরল হাসি—অমন হাসতে ওরাই শুধু জানে। ড্রাইভার ছাড়া এ গাড়ির প্রতিটি কর্মচারী মেয়ে। মেয়ে-ড্রাইভারের গাড়িতেও চড়েছি এর পরে। এই বিপুল শক্তি ও মাধুর্য অন্ধকারে গুহায়িত হয়ে ছিল—এবারে ছাড়া পেয়েছে। তিন বছরের নতুন-চীনের এমনতরো শক্তিমত্তা।
পাঁচ মিনিট তো অঢেল সময়—ট্রেন থামতে না থামতে হুড়মুড় করে নেমে পড়ল সকলে। আমার দরজার সামনে দেখি, হাত বাড়িয়ে আছে কটা-চুল ঘোলা-চোখ লালমুখো এক সাহেব। আকারে বর্ণে পুরোপুরি সেই বস্তু— দেশে ঘরে এই সেদিন অবধি যাদের এক শ হাত এড়িয়ে চলতাম। হাত জড়িয়ে ধরল সাহেবটা, কি-একটা নাম বলল, বাড়ি নিউজিল্যাণ্ডে। সাগর থেকে নতুন-ওঠা ভূমি—তাই নিউ সি-ল্যাণ্ড বা নিউজিল্যাণ্ড। এই ভৌগোলিক ব্যাখ্যা

দিয়ে বললাম, নবীনতম আর প্রাচীনতম সুদূরবর্তী দুটি ভূমিও বুঝি আজ ভালবাসায় বাঁধা পড়ল আমাদের নব সৌহার্দ্যের মধ্যে।

শুধু কি ঐ একজন? সবাই ঘুরছে ভাব করবার জন্য, যাকে পারছে পাকড়াও করছে। সে এক অভিনব ব্যাপার। সাদা আর কালো, এশিয়া আর ইয়োরোপ আমেরিকা সেই স্টেশনের প্লাটফরমে প্রাণ খুলে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে।

নতুন রেল বসাচ্ছে। মহা ব্যস্ততা সেদিকটায়। সময় নেই—দুর্যোগে অনেক পিছিয়ে রয়েছি, তাড়াতাড়ি সমস্ত শুধরে নিতে হবে—এমনি একটা ভাব সর্বত্র। যন্ত্রশক্তির তেমন তোড়জোড় নেই তো লাগাও মানুষ। শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে মানুষ হাতে কাজ করছে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলায়। একটুকু হৈ-চৈ নেই। কি করে হতে পারে, এ-ও এক দেখে নেওয়ার জিনিস। রেলপথের ধারে টেলিগ্রাফ-লাইন—লম্বা লম্বা কাঠের গুঁড়ি পুঁতে পোস্ট বানিয়েছে। সিকি পয়সা ওরা অকারণ ব্যয় করবে না, অপব্যয়ের দিন এখন নয়—যা আছে তাতেই কাজ চালিয়ে নেবে।

স্টেশনের এই গ্রামটা বেশ বড়। খোলার বাড়ি বেশির ভাগ। আর দেখছি —খড় নয়, খোলাও নয়, বাঁশের বাখারির ছাউনি। ঘরবাড়ির ধাঁচ একেবারে আলাদা, যেমন ছবিতে দেখে থাকেন। আমাদের দেশের সঙ্গে মেলে না। পাহাড় দেখা যায়, বিস্তর পাহাড়। দূরের পাহাড় কাছাকাছি আসছে। পাহাড় একেবারে ঘিরে ফেলেছে আমাদের।

ঐ—ঐ যে মহাপ্রাচীর!

গাড়ি ভরতি চলেছি আমরা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের প্রায় সমস্ত দেশ ও জগতের মানুষ। মুহূর্তে সকলে শিশু হয়ে গেলাম। কৌতূহল-ঝলকিত চোখের দৃষ্টি। জানালার ধারে ভিড়, জানালার মুখ বাড়িয়েছি।

একেবারে কাছে এসে গেছি। এমন বস্তু ধারণায় আনা যায় না। অতিকায় এক অজগর সাপ এঁকে বেঁকে ত্রিভুবন জুড়ে বয়েছে যেন। উত্তুঙ্গ শিখর-দেশে উঠেছে, নিচে নামতে নামতে চোখের আড়াল হয়ে গেছে আবার। ট্রেন কখনো প্রাচীরের পাশ দিয়ে, কখনো বা অতিক্রম করে চলেছে। চলতে চলতে টানেল, কত প্রস্রবণ, কত বাঁকাচোরা গিরিপথ পার হয়ে স্টেশনে নামলাম স্টেশনের নাম চিং-লুঙ-চাও।

প্লাটফরমে উল্টো দিকে পাহাড়ের ছায়ায় পূর্ণাবয়ব এক বিশাল মূর্তি। ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তিনি, নাম—সেঙ-টিন-ইউ। এই দুর্গম অঞ্চলে তাঁরই কৃতিত্বে রেলগাড়ি এসেছে, রেলওয়ে সম্পর্কে বিস্তর উন্নতি-বিধান করছেন

তিনি। মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে অদূরবর্তী মহাপ্রাচীরের দিকে একবার নজর করে দেখে নিলাম। বিস্ময় লাগে। ভাবতে পেরেছি, কোন একদিন প্রাচীরের পদতলে এসে দাঁড়াব চূড়ায় উঠবার আয়োজনে?

জন দশেকে এক একটি দল, সঙ্গে দোভাষি এক চীনা বন্ধু। চলে বেড়ানোরই ব্যাপার—চড়াই ভাঙতে ভাঙতে খুশ মেজাজে কথাবার্তা চলে না, সেজন্য আজকে দোভাষি বেশি নেই। তবু মেয়েরা আছে দলের মধ্যে। পাহাড়ে ওঠা-নামা চাট্টিখানি কথা নয়—ভয় দেখিয়ে তাদের নিরস্ত করবার চেষ্টা হয়েছিল। তা শুনছে তারা! ছেলেরা পারে তো মেয়েরাই বা কম কিসে!

বীরত্ব দেখাবার প্রয়াসে তারাই আগে আগে পথ দেখিয়ে ছুটেছে। আর ছুটেছেন আমাদের দলের রোহিণী ভাটে। মারাঠি মেয়ে, নাচেন অতি চমৎকার। পিকিনে জমিয়েছিলেন ভারতীয় নাচ দেখিয়ে। লঘু শরীর—নাচতে নাচতেই যেন পাহাড়ে উঠছেন। অথবা পাখির পাখার মতো বাতাসে আঁচল ফুলিয়ে উড়তে উড়তে যাচ্ছেন। কঠিন পাথরে পা ছোঁয় না ছোঁয়, ঝুপসি-ঝুপসি জঙ্গল গাছে ঠেকে না ঠেকে—আলগোছে কেমন যেন আকাশে উঠে যাচ্ছেন।

চলেছেন গান্ধি টুপি মাথায় রবিশঙ্কর মহারাজ। খালি পায়ে এসেছিলেন প্রচণ্ড এই শীতরাজ্যে। পশমের মোজা ও জুতোর আবরণেও আমাদের পা কনকন করে—মহারাজ একজোড়া স্যাণ্ডেল ধারণ করেছেন শেষ পর্যন্ত। পলিত কেশগুম্ফ সত্তর বছরের যুবাব্যক্তিটি—পিছনে তাকাবার অভ্যাস নেই, ধীর পায়ে চলেছেন। হেসে ছাড়া কথা বলেন না, গুজরাটি এবং সামান্য হিন্দি মাত্র বলতে পারেন। সামনে-পিছনে সর্বক্ষণের দুই অনুচর—অধ্যাপক শুকলা ও উমাশঙ্কর যোশি। আমাদের কথা শুনে নিয়ে এঁরা মহারাজকে বুঝিয়ে দেন, কথা বুঝে স্মিতহাস্যে মহারাজ আনন্দ জ্ঞাপন করেন।

চলেছেন সর্দার পৃথ্বী সিং। গান্ধিজী সর্দার বলে আহ্বান করেছিলেন; আর নামের সঙ্গে আজাদ জুড়ে জন্মভূমি পাঞ্জাব তাঁর বীর্যবত্তার পরিচয় দিত। গান্ধিজীর উপাধিটা নিয়েছেন তিনি, কিন্তু আজাদ নাম বাতিল। দীর্ঘ দেহ—বয়স হয়েছে, তা তিনি মানেন না। মানেন কী-ই বা! অমিত-শক্তি ইংরেজের প্রতাপ মেনেছেন কোন দিন? মেনেছেন সিপাহিশাস্ত্রী-ঘেরা কারাগারের কঠিন শাসন? ডিটেকটিভ উপন্যাসকে হার মানিয়ে দেয় এই মানুষটির জীবন। আন্দামানে চির-নির্বাসনে ছিলেন বারীন্দ্র, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পুরানো বিপ্লবীদের সঙ্গে বিশেষ জানাশোনা। একদিন অকস্মাৎ উধাও আন্দামান থেকে। বৃটিশ-সরকারের হুলিয়া ছুটল দেশ-দেশান্তরে—পুলিশের মুঠো থেকে

পৃথ্বি সিং পিছলে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছেন। স্থিতি হল রাশিয়ায় গিয়ে। অনেক দিন পরে ফিরলেন আবার দেশে—ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন, পুলিসে পাত্তা পায় না। গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন আত্মসমর্পণ করতে। তার পরে—ঠিক মনে পড়ছে না—আটকে রেখেছিল বোধকরি কিছু দিন। বেরিয়ে এসে গান্ধিজীর সঙ্গে তাঁর আশ্রমে রইলেন। কিন্তু চলে গেলেন বছর কয়েক পরে—আশ্রমচর্যা মনের সঙ্গে নিতে পারলেন না। গান্ধিজীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রইল তবু।

এমনি সব বিপ্লবী বীরদের নিয়ে আমি উপন্যাস লিখেছি, তাঁদের প্রতি বড় অনুরাগ আমার। এ সব খবর আমিই বলি, কিংবা আর-কেউ বলে থাকবেন। কেমন একটু বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাঁর সঙ্গে। খাওয়ার সময়টা প্রায়ই এক টেবিলে বসতাম গল্পগুজবের জন্য। শান্তি-সম্মেলনের মধ্যেই একদিন খাতা এগিয়ে দিলেন, নাম ঠিকানা লিখে দাও। খাতা ফেরত পেয়ে হাতে গুঁজে দিলেন আবার। কিছু লিখে দাও ঐ নামের সঙ্গে। লিখলাম—মহাবিপ্লবীকে প্রণাম।

পৃথ্বি সিংকে দেখতে পাচ্ছি অদূরে। শালগাছের মতো সরল সমুন্নত। খাড়া হয়ে চলেছেন। একটা জিনিস শেখেন নি জীবনে—মাথা নিচু করা। তা ঐ পাহাড়ে উঠছেন, সে অবস্থায়ও নয়।

এমনি চলেছি ট্রেনের জঠর থেকে বেরিয়ে-আসা আগন্তুক-দল। পথ সংক্ষেপ করতে পাকদণ্ডীর পথ ধরেছি। দুর্গম পথ—বসে পড়ে জিরোচ্ছি ক্ষণে ক্ষণে। চারিদিকে নজর করি। আঁকাবেঁকা পথ বেয়ে পথ বেয়ে বিসর্পিল গতিতে উঠেছে ঐ দলের পর দল। কতক আমাদের আগে চলে গেছে। কতক বা উঠে আসছে নিচে থেকে। পুরুষ আছে, মেয়ে আছে—একটা বাচ্চাও দেখতে পাচ্ছি সাত-আট বছরের। নানা জাতের মানুষ—পৃথিবীর কোন দেশের যে নেই, ঠিক করা শক্ত। পোশাক তাই বিচিত্র রকমের। ঝোপঝাপ ও শিলাখণ্ডের আড়ালে এই একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল, বেরিয়ে আসছে আবার পরক্ষণে। অনেক কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে অবশেষে প্রাচীরের উপর ওঠা গেল। সপ্ত আশ্চর্যের সেরা বস্তুটি এই পায়ের তলায়। চলো এগিয়ে চলো—উঁচুর দিকে ক্রমশঃ। প্রাচীর ঐ পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় গিয়ে উঠেছে। তারপরে ঢালু হয়ে নেমে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেছে। প্রহ্লাদ গুরুমশাই বলতেন, দ্বাদশটি অশ্বারোহী—আমার মনে হল, বাড়তি আরও দু-পাঁচটি সহ ঘোড়দৌড় হতে পারে এখান দিয়ে। ছাতের আলসের মতো বেশ-খানিকটা উঁচু পাঁচিলে ঘেরা দু-দিকে—উত্তম ব্যবস্থা, নিচে পড়বার আশঙ্কা নেই। পাথরের উপর

পাথর গেঁথে করেছে এই কাণ্ড ; উপরের দিকে সেই পাথর কেটে ইটের মতো পাতলা করে বসিয়েছে—মানুষের চলাচলে কষ্ট যাতে না হয় ! এমনি টানা চলেছে—কত দূর আন্দাজ করুন দিকি ? পনের শ' মাইল। কখনো পর্বতশীর্ষ, কখনো বা নিম্নতম অধিত্যকার অন্ধি-সন্ধি অতিক্রম করে। এ মহাপ্রাচীর তৈরী শুরু হয় খৃষ্টের তিনশ' বছর আগে, সম্রাট অশোকের সমকালে। পঞ্চাশ বছর লাগে শেষ করতে। সে কী আজকের কথা ! কী করে সে আমলে অত উঁচুতে তুলল এত পাথর ! আর কী তাজ্জব দেখুন—পাঁচিল গেঁথে দেশের সীমানা ঘিরে ফেলে দিল মোঙ্গলদের রুখবার জন্য। আমরা গোরু-ছাগল ঠেকাবার জন্য বাগানের বেড়া দিই—সেই গোছের ব্যাপার আর কি !

আলিগড়ের অধ্যাপক ডক্টর আলিম—চাপদাড়ি, সুন্দর সুগৌর চেহারা। আলসেয় ঠেশান দিয়ে দাঁড়িয়ে পুরানো ইতিহাস বলছিলেন তিনি। এত উদ্যম আর অধ্যবসায়ের মহাপ্রাচীর কি কাজে এল শেষ পর্যন্ত ? মোঙ্গলদের ঠেকানো যায় নি, কুবলাই খাঁ এসে মহাচীনে দখল গড়লেন। আর এখনকার যুগে পাঁচিল তুলে শত্রু আটকাবো, হেন প্রস্তাব ভাবতে যাওয়াই হাস্যকর। মানুষের পাখনা হয়েছে, আকাশে উড়ে উড়ে লড়াই। মেঘের চোরাগোপ্তা পথে যাতায়াত। মহাপ্রাচীর কত নীচে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে—এখনকার দিনে সে কিছু ধর্তব্যের বস্তু নাকি ? এত মানুষ মিলে এত কাণ্ড করেছিল; কিছুই মুনাফা হল না কোন কালে। শুধু সপ্ত আশ্চর্যের একতম হয়ে রইল—স্থাপত্যের চূড়ান্ত নিদর্শন। দেশবিদেশের মানুষ এসে দেখে যায়, প্রত্নতাত্ত্বিকের গর্বের জিনিস। প্রাচীরের উপরে কতকগুলো ঘাঁটি তৈরি হয়েছিল, দেখলাম, গত লড়াইয়ের সময়—আকাশমুখী কামান বসানো হয়েছিল। দুশমনি প্লেন ঘায়েল করা হত। এখন সীমাহীন প্রশান্তি চারিদিকে—শুধু প্রাচীরের উপর ভাঙাচোরা পাথরের গাঁথনিতে ভয়ঙ্কর দিনের সামান্য দাগ লেগে আছে। দেশে থাকতে শুনেছিলাম, জড়বাদী নতুন চীন মহাপ্রাচীর ভেঙে তছনছ করেছে ; পাথর খুলে খুলে দশ রকম কাজে লাগাচ্ছে। আরে সর্বনাশ, বাটালি মেরে একটি টুকরো-পাথর খসাতে যান দেখি ! দশ রকম কৈফিয়তের তালে পড়বেন। পুরানো জিনিস নিয়ে এত দেমাক তামাম দুনিয়ায় আর কোন জাতের নেই। বাঘিনী শাবক আগলে থাকে—প্রায় সেই অবস্থা। ধর্মকর্মের বড় ধার ধারে না, তা সত্ত্বেও দেখে আসুন গিয়ে—এই নতুন আমলের হাজারো রকম কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে যে-মেরামতি বৌদ্ধমন্দিরগুলো ভারা বেঁধে রাজমিস্ত্রি লাগিয়ে ঠিকঠাক করছে, অস্পষ্ট প্রাচীন দেয়ালচিত্রে নতুন করে রং ধরাচ্ছে। দেড়হাজার মাইল জোড়া-পাঁচিল, একটুখানি বস্তু নয়। তার উপর বয়সেও

কত বুড়ো হল বিবেচনা করে দেখুন—প্রায় বাইশ শ' বছর। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে কত শতবার, জনপদের উত্থান-পতন ঘটেছে। অতএব দশ-বিশ জায়গায় আপনি ভেঙে পড়তে পারে, সেটা কিছু নয়। ইচ্ছে করে ভাঙা হয়েছে গোটা কয়েক জায়গায় নতুন রেল-লাইন বসাবার প্রয়োজনে। মহাপ্রাচীর এখন আর চীনের সীমান্ত নয়। প্রাচীর পার হয়ে অনেক দূর অবধি চীনদেশ। নব জীবনের বার্তা ছুটেছে দেশের সর্ব অঞ্চলে—প্রাচীর ভেঙে রেললাইন বসিয়ে তারই পথ হয়েছে···

দলে দলে উপরে উঠে যাচ্ছে—আমরা দু'জনে বসে পড়েছি এক ধাপের উপর। আমি আর বর্ধমানের সন্তোষ খাঁ। সান্ত্বনাও আছে অবশ্য—আমাদের নিচে ঐ কত জন বসে হাঁপাচ্ছে। অনেক দূর উঠেছি—যত উপরেই যাই, একই ব্যাপার—কি হবে মিছামিছি দেহযন্ত্রটা খাটিয়ে? দিব্যি বসে বসে দিগ্‌ব্যাপ্ত মহাচীনের শোভা দেখা যাচ্ছে। ঘর-বাড়ি উঁকি দিচ্ছে গাছপালার ভিতর থেকে। রেল-লাইন এক সুদীর্ঘ সরীসৃপের মতো পাহাড়-জঙ্গলের ভিতর এঁকে বেঁকে শুয়ে রয়েছে। শীতল গিরিবায়ু সর্ব শরীর জুড়িয়ে দিয়ে গেল···

উচ্ছল কলহাস্য এক টুকরো। এক তরুণী লাফাতে লাফাতে উঠে এলো। ভারি সুন্দরী। অলকগুচ্ছ কপালের উপর এসে পড়েছে। এক রাশ বনফুল তুলে এনেছে পথের ধার থেকে। কী কৌতুকে পেয়ে বসেছে—ঝুঁকে পড়ে ফুলের থোলো ঘোরাল সে আমাদের দু-জনের মুখের সামনে। আরতির সময় যেমন পঞ্চ-প্রদীপ ঘোরায়। কোন্ দেশের মানুষ, কি বৃত্তান্ত, কিছু জানি নে—এর আগে চোখেই দেখি নি মেয়েটাকে। বার কয়েক ফুল নেড়ে ডান দিক ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে ধুপধাপ ছুটে বেরুল। সঙ্কোচের বালাই নেই—এ কেমন ধারা উল্লাসিনী গো। ছুটতে ছুটতে নাচতে নাচতে চলে গেল। প্রাচীরের চূড়ায় চূড়ায় সঞ্চারিণী অপরূপ এক বিদ্যুল্লতা।

পরে আরও দেখেছি তাকে। কনফারেন্সের মধ্যে দেখতাম শান্ত অচপল মূর্তি। একমনে বক্তৃতা শুনছে, কদাচিৎ নোট নিচ্ছে কপোত আঁকা সবুজ পকেট বই খুলে। সাংস্কৃতিক কমিশনেও দেখেছি—রাত তিনটে বেজে গেছে, সদস্যেরা উসখুস করছেন আসর ভেঙে ঘরে যাবার জন্য। কিন্তু বিতর্ক শেষ হবার আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটা দুটি আঙুলে আঙুরের থোলো থেকে ফল ছিঁড়ে আলগোছে গালে ফেলছে, আর পাশের লোকটির সঙ্গে চাপা গলায় কি আলোচনা করছে। লোকটি তার স্বামী—খবরের কাগজ চালান এবং কিছু কিছু সাহিত্য চর্চা করেন। পরে এক সাহিত্যিক কনফারেন্সে খুব ভাবসাব হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে। স্বামী-স্ত্রী জোড়ে এসেছেন। পিকিন

ছাড়ার আগের দিন ক্ষিতীশ আর আমি বাজার ঢুঁড়ছি—এ দম্পতির সঙ্গে দৈবাৎ দেখা। ভদ্রলোক নিয়মমাফিক স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেয়েটা নিঃসংশয়ে ভুলে গেছে মহাপ্রাচীরের উপর আর একদিনের ক্ষণচাপল্য। পিকিন থেকে ওঁরা দেশে-ঘরে ফিরছেন না, জোড় বেঁধে এখন ইয়োরোপে চললেন। এদেশ-সেদেশ ঘুরে ঢুঁ মারবেন অবশেষে ভিয়েনা-কনফারেন্সে।

দেখাশুনোর পাট চুকল, আর নয়—নিচে নেমে সবাই এবার স্টেশনে গিয়ে জুটব। আপন মনে ফিরে চলেছি আমি। প্রখর রোদ, বেশ কষ্ট হচ্ছে। পথ সংক্ষেপ হবে বলে জঙ্গল-ভরা সুঁড়িপথে এসে পড়েছি। একলা। এদিক-ওদিক তাকাই। উপরে ও নিচের দিকে সঙ্গীদের দেখা যাচ্ছে। কোন-একটা দলে গিয়ে জোটা কঠিন নয়। কিন্তু প্রয়োজনই বা কি? পথের আন্দাজ হয়ে গেছে—স্টেশনে ঠিক গিয়ে পৌঁছব; হয়তো বা ঘুরপথ হবে একটু-আধটু। সে এমন কিছু নয়।

কিন্তু তৃষ্ণা পেয়ে গেল যে! তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়। এক ঢোক শীতল জল—পথ চলা নইলে অসম্ভব হয়ে উঠছে।

আঃ, মিলে গেছে! বাঁক ঘুরেই দেখি কলস্বনা ঝরনা। কপোত-চক্ষুর মতো নির্মল জল বনান্তরাল হতে বেরিয়ে উপল-বিছানো খাতে লাফিয়ে পড়ছে, তার পরে ধার বেগে বয়ে চলেছে সংকীর্ণ ধারায়।

কোন অলক্ষ্য-দেবতা অবস্থা বুঝে মিলিয়ে দিলেন। নেমে যাচ্ছি ঝরনার দিকে। দৌড়ানো বলা যেতে পারে। আঁকা-বাঁকা পথ অতিক্রম করে ইপ্সিত জলের ধারে এসে পড়েছি, অঞ্জলি ভরে জলও তুলেছি—

চিৎকার এলো, কে যেন হুমকি দিয়ে উঠল কোথা থেকে। চমক লাগে। হাত কেঁপে অঞ্জলির ফাঁকে জল পড়ে যায়। না, মনের ভুল নয়—ছুটে আসে একটি লোক—চেঁচাচ্ছে, কথা বুঝতে পারি না, তাই প্রবল বেগে হাত-মুখ নেড়ে মানা করছে। সাধারণ গ্রাম্য মানুষ—দোভাষি কিংবা আমাদের চেনা-জানা কোন প্রাণী নয়।

অবাক হয়ে আছি। কেন এমন করে? বিদেশ-বিভুঁই জায়গা। রীতি-প্রকৃতি কিছু বুঝি না এদের। লোকটা একেবারে গায়ের কাছে এসে ইশারা করছে তাকে অনুসরণ করতে। কী মতলব কে জানে! হতভম্ব হয়ে পিছু পিছু চলি।

রেল-লাইন অবধি নিয়ে এলো সঙ্গে করে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল স্টেশনটা। সহসা হাত বাড়াল বন্ধুত্বের ভাবে, শেকহ্যাণ্ড করে ফিরল বনপথ বেয়ে। ভারি রহস্য তো! হাঁ করে চেয়ে আছি যতক্ষণ না সে নজরের

আড়ালে গেল।

স্টেশনে সকলে কলরব করে ওঠেন, একা কোন দিকে কেটে পড়েছিলেন?

ট্রেন ছাড়বার সময় হল।

তৃষ্ণা যেটাই তো সকলের আগে। সাদামাঠা জল চাইলাম, দিল এনে বোতলের মিনারল ওয়াটার। মন্দ কি! ঢক-ঢক পুরো গ্লাশ গলার ঢেলে সুস্থ হয়ে বৃত্তান্ত নিবেদন করলাম।

পাগল বোধ হয় লোকটা।

দোভাষি বলে, কী সর্বনাশ! ঝরণার জল খেতে গিয়েছিলেন—জলে হয়তো বিষ।

মুখে এক ধরনের হাসি, ঘৃণা উপছে পড়ছে সেই হাসিতে। বলে, এক ফোঁটা তেষ্টার জল—তা-ও নির্ভয়ে মুখে দেওয়া যায় না শয়তানির ঠেলায়।

জল না ফুটিয়ে খায় না এ-তল্লাটে! স্বাস্থ্য-ব্যাপারে কড়া নজর—এটা কিন্তু ঠিক সেইজন্যে নয়। মার্কিন সৈন্য কোরিয়ায় জীবাণু-বোমা ফেলে গেছে। কিছু কিছু এ দিকেও না পড়েছে এমন নয়। এখানে-ওখানে যে-কয়েকটার সন্ধান পাওয়া গেছে, তার বাইরেরও থাকতে পারে। পদে পদে তাই এত সতর্কতা। বিদেশী মানুষ—আমি তো অত-শত জানিনে—চাষী লোক চাষ ফেলে সামাল করতে এসেছিল তাই।

স্পেশাল গাড়ি চলল আবার পিকিনমুখো। খাবার পরিবেশন করে গেল টেবিলে টেবিলে—পরিবেশকদের হাতে দস্তানা, নাকে-মুখে কাপড়ের ঢাকনি। (মোটর-ড্রাইভারদের এমনি দেখছি। ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফিরছে ধুলোর ভয়ে তাদের নাক, মুখ ঢাকা) অপারেশনের সময় ডাক্তার-নার্সদের—যেমন দেখে থাকি। কামরা ঝাঁট দিয়ে যাচ্ছে কিছু সময় অন্তর। একবার লাউড-স্পীকারে বলল, কাচের জানলাগুলো খুলে দাও—বাইরের বাতাস চলাচল করুক! কর্মচারী মেয়েগুলো জানলা খুলতে লাগল, আমরা সাহায্য করি। আবার এসে তারের কবাট ফেলে দেয়, মাছি আর ধুলো যাতে না ঢোকে। জীবাণু-যুদ্ধের ব্যাপার বাদ দিয়েও তামাম জাত অতিমাত্রায় স্বাস্থ্য-সজাগ হয়ে উঠেছে। প্রায় ছুঁৎমার্গীয় অবস্থা।

আমাদের বন্ধু প্রশ্ন করলেন, ছিং-লুঙ-হাও স্টেশন কত মাইল পিকিন থেকে?

জানি নে তো—

তবে সমস্ত দিন ধরে কী লিখলেন মশাই? ট্রেনে আর স্টেশনে লিখলেন, পাঁচিলের উপর বসে লিখলেন—এই সামান্য কথাটা খোঁজ নিলেন না কারো কাছ থেকে?

ভুল হয়ে গেছে দেখছি। তা-নাই বা থাকল আমার লেখায় হিসাবপত্রের ফিরিস্তি!

শৈলেন পাল ওদিকে ধমকাচ্ছেন। এ কি হল! সিগারেটে পুড়িয়ে ফেললেন চেয়ারের চাদর।

লজ্জার কথা সত্যি। সামান্য সিগারেটটাও কায়দামাফিক ধরিয়ে টানতে পারি নে। তার উপরে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি এত দেশের এতগুলো মানুষের দিবসব্যাপী সান্নিধ্যে। বহু তীর্থনদীর বিচিত্র সঙ্গমে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে আছি, অত-শত হুঁশ থাকে না।

মতামত চাইতে এল রেলগাড়ির পরিচালনা সম্পর্কে। আরো কি রকম উন্নতি হতে পারে, সেই পরামর্শ যদি দিতে পারি। লিখতে দিচ্ছে একটা করে ছবি-আঁকা মনোরম কাগজে। না লিখে পকেটে পুরতে লোভ হয়। কিন্তু এত-গুলো চোখ!

লিখলাম, তোমাদের সঙ্গে আজকের এই মধুর ভ্রমণ চিরকাল আমার মনে থাকবে।

(১৪)

পরের দিন। ডেলিগেট-সভা চুকল তো সাংস্কৃতিক সভা। মানুষ এত বকতেও পারে! সেই আটটার মুখে জলযোগ সেরে এসে বসেছি, তারপর থেকে এই চলেছে। এত ধকল সইবে তো কলম-পেশার নির্বাক কাজ নিয়েছি কেন? অন্তত একটা হাফ-নেতা হওয়া কি যেতো না! সে পথ মাড়াই নি—এবম্বিধ মিটিং করা এবং তৎপরে খবর-ছাপানোর জন্য কাগজওয়ালাদের তোয়াজ করতে হবে, এই ভয়ে। তবে বিদ্যে এবং রুচিজ্ঞান কিছু বেশি হয়ে গেছে নেতা হওয়ার পক্ষে, এমন কথাও, আপনারা অবশ্য বলতে পারেন।

(থাকে। মনে মনে এতক্ষণ ধরে এক ভীষণ সঙ্কল্প ভেঁজে নিয়েছি। রাস্তায় হাঁটব, যত্রতত্র বেড়াব। জীবনে ঘেন্না ধরে যায় ঐ এক এক ফোঁটা ছেলে-মেয়েগুলোর জ্বালায়। ক্ষুদে অভিভাবক হয়ে বুড়ো বুড়ো নাবালক-দের খবরদারি করে বেড়াবে! নিতান্ত অবোধ যেন আমরা এক-একটি, কিছু বুঝি না সংসারের—কোথায় কখন গোলমাল ঘটিয়ে বসি, সেই ভয়েই সদা তটস্থ। আয়েসের সুধা-তরঙ্গে হাবুডুবু খাচ্ছি—দাও না বাপু গোলমালের চোরা বালিতে একটুখানি পা ঠেকাতে। হোক না একটু পথের গণ্ডগোল—এ রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে বেড়াই. ঠকেই আসি না হাজার কয়েক ইয়ুয়ান সওদা করতে গিয়ে। রবীন্দ্রনাথ আওড়াচ্ছি মনে মনে—'পুণ্যে পাপে সুখে দুঃখে

পতনে উত্থানে, মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে'—তা বিশ-বাইশের গরবিনী ঐ মা-জননীরা বুঝবে সেকথা!

মরিয়া আজকে, পালাবোই। তোমাদের বিনা মাতব্বরিতে বহাল তবিয়তে বেড়াতে পারি, প্রমাণ করে ছাড়ব। ক্ষিতীশ দু'দিন ধরে একটা টাইমের কথা বলছে, নিজেরাই টাই কিনে চোখের উপর মেলে ধরব, কেমন—পারি না যে?

গলা খাঁকারি দিয়ে বেরিয়ে এলাম। থুতু ফেলতে বাইরে যাচ্ছি এই আর কি। ক্ষিতীশের দিকে চোখ টিপে এসেছি। অনতিপরে সে-ও এলো।

নিচের তলায় মিটিং, এই বড় সুবিধা। অধিক আগল পেরোতে হবে না। বড়-দরজা পার হতে পারলেই লন, এবং তার পরেই রাস্তা। লনেও বিপদ থাকতে পারে। কিন্তু এই দেড় প্রহর বেলায় সকলেই প্রায় মিটিঙের তালে ব্যস্ত—সুড়ুৎ করে লনটুকু পিছলে যাওয়া যাবে না, তবে আর বড় বিদ্যার কী শিখলাম এতদিনে!

আঃ, করো কি ক্ষিতীশ! তাকিও না কোনদিকে—ঝুপ্ করে বসে পড়ো সোফার উপর।

দোভাষি ছাত্র একটি আসছে। না, আমাদের দিকে নয়; আমাদের সন্দেহ করেনি। এমনি শঙ্কিত মন—সিঁদুরে মেঘ দেখলে অগ্নিকাণ্ড বলে ভাবি। সিঁড়ি বেয়ে ছোকরা তরতর করে উপরে উঠে গেল। চলে যাক একেবারে দৃষ্টির আড়ালে। আমরা বাপু নিতান্তই ক্লান্ত হয়ে বসে আছি। দুষ্ট-বুদ্ধি কিছুই নেই, জিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আবার মিটিং-ঘরে।

গেছে চলে তো? এখন এগারোটা। একটায় লাঞ্চ—পাকা দু'ঘণ্টা। কাছে-পিঠেই একটা বাজার লক্ষ্য করা গেছে—মরিশন স্ট্রীটের উপর। বাজার ঢুঁড়বো, চলো—

কী আনন্দ! পায়ে হেঁটে বেড়ানো পিকনের রাস্তায়—মোটরের গর্তে বসে নয়। পিকিনের পথের ধুলো লাগছে পায়ে। পায়ে নয়, জুতোর তলায়। আর ধুলোই বা কোথা—ধুলো কি থাকতে দিয়েছে কোনখানে? যাই বলুন, এ-ও এক রকমের ব্যাধি। ধুলো-ময়লা মশা-মাছি নিয়ে শুচিবাই। আমার সেজ-খুড়িমার মতো—সর্বত্র গোবর লেপে তিনি নির্ভাবনা হতেন।

চলেছি। লোকে তাকাচ্ছে আমার দিকে। উৎসাহী কেউ কেউ পিছু নিচ্ছে। একবার দাঁড়িয়েছি পথের পাশে দোকানের জানালায়। পিছন ফিরে দেখি, ভিড় জমে গেছে। ও-ফুটপাতের লোকও রাস্তা পার হয়ে আসছে। তখন মালুম হল। কৃষ্ণমূর্তি—তার উপর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি-আলোয়ান

আজব চিজ পথে বেরিয়েছে, নিতান্ত অন্ধজন ছাড়া আসবেই তো ছুটে। নিখরচায় চিড়িয়াখানার মজা! বিপদ কত দিক দিয়ে কত রকম ভেবেছি, একচক্ষু হরিণের মতো ভেবে দেখিনি তো!

একবার ওদের দিকে তাকাই, একবার বা নিজের দিকে। ফরসা মানুষদের মধ্যে দেহবর্ণ আরও যেন ঘন দেখাচ্ছে। চারু-দার কথা মনে পড়ে। ফড়খেলা হচ্ছিল যশোরের এক মেলায়। চারু-দা ইস্কাপনের উপর এক আনা ধরলেন। হল না, গুটি অন্যঘরে। আনিটা বাজেয়াপ্ত করে ফড়ওয়ালা বলে, ফরসা—! তার মানে ঐ ঘর ফাঁকা—গুটি পড়েনি। চারু-দা তৎক্ষণাৎ আর এক আনা বের করে সেই ঘরে রাখলেন। বলেন, আর একবার বলো ভাই ফরসা। পাওনা হলেও চাই নে। আমার দিকে চেয়ে 'ফরসা' আজ অবধি কেউ বলেনি।

দ্রুতপথে হাঁটছি। ভিড় পিছনে ফেলে এগিয়ে উঠব। হাঁটা আর বলি কেন, দৌড়োনো। ক্ষিতীশের কোট-পাৎলুন—গঙ্গাজলের ছিটার মতো ঐ পোশাক-মাহাত্ম্যে তার কালো রঙের পাপ খণ্ডন হয়ে যায়। গায়ে চাপিয়েছে কি সাহেব। দূর থেকে সে হাঁক পাড়ছে, দাঁড়ান—

দাঁড়িয়ে মরি আর কি ভিড়ের ঠেলায়! মানুষ-চলাচল বন্ধ হবার জোগাড় —ট্রাফিক-পুলিশ শেষটা থানায় নিয়ে তুলুক! মহাকালের মতো চলতেই হবে আমায়, থামা চলবে না। সাহেব হয়ে পথে বেরিয়েছ, ভাগ্যবান তোমরা —হেলতে দুলতে ইতি-উতি দেখে শুনে গজেন্দ্র গমনে এসো।

নতুন বিপদ। একদল সৈন্য ওদিককার পথ ধরে মরিশন স্ট্রীটে পড়ছে। পথে আটকে গেছে, ওদের লাইন শেষ না হওয়া অবধি এগোবার উপায় নেই। গতিশীল। ভিড়টাও থমকে দাঁড়িয়েছে আমার সঙ্গে। সৈন্যেরা কুচকাওয়াজ করে খুব সম্ভব আসন্ন উৎসবের মহাড়ায় চলেছে। কিন্তু তাদের চেয়ে বেশি দ্রষ্টব্য এখন আমি—আমারই উপর সমস্তগুলো চোখ। উপায়?

চতুর্দিকে দেখে নিলাম এক নজর। সৈন্যরা যাচ্ছে তো যাচ্ছেই—পথ খালি হবার আশু সম্ভাবনা দেখি নে। বড় দোকান একটা। অকূলে ভাসমান—তৃণ কী মহীরুহ বাছবিচারের সময় নেই! যা থাকে কপালে—কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। আপাতত নিরাপদ তো বটেই!

আইয়ে বাবুজি—

কী আশ্চর্য! জাত-ভাইয়ের গলা—হিন্দী জবান বলছে। কী আনন্দ যে হল! ইচ্ছে করে, আধবুড়ো মানুষটাকে কাঁধে তুলে নাচাই।

বলে, খেরুমল আমার নাম। ঘর সিন্ধুদেশে। জমি-জিরেত ঘরবাড়ি সমস্ত এখন পাকিস্তানে। আপনারা আসছেন, কাগজে দেখতে পাচ্ছি। তা মশাই,

আমরা পুঁটিমাছ—অত বড় মচ্ছবে মাথা সেঁধুতে ভয় পাই। জানি, এসেছেন যখন—পায়ের ধুলো একদিন পড়বেই। চিনে চিনে ঠিক এসেছেন।
এসেছি কিন্তু না চিনেই—
বেরুমল মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন।
দেখুন তাই। চিনবার কোন উপায় রাখতে দিল কি? দেশের মানুষের মুখ দেখতে পাইনে। কালেভদ্রে কেউ যদি এসে পড়ে—সেই জন্যে ধরাপাড়া করলাম, বাপু হে, তোমাদের চীনে হিজিবিজি কে বুঝবে, সাইনবোর্ডখানা ইংরেজিতে লিখিয়ে দি—'ইণ্ডিয়ান সিল্ক শপ'। তা বিদেশি হরফ চীনা-মানুষের চোখে পড়লে এদের মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। সদর জায়গায় চীনা ছাড়া আর কোন লেখা থাকতে দেবে না। এমন গোঁড়া বামনাই দেখেছেন মশাই, ভুভারতে?
বটে তো! পথে ঘাটে এ ক'দিন যত লেখা দেখেছি সমস্ত চীনা। গোটা চার-পাঁচ ক্ষেত্রে কেবল চীনার সঙ্গে একত্র রাশিয়ান দেখছি। চারটে কি পাঁচটা পোস্টার—তার অধিক হবে না। নিজের ভাষা ছাড়া আর-কিছু লোকের নজরে আসবে না—এ কি গোঁড়ামি। আমরা কত দরাজ, বিবেচনা করুন তা হলে। এই কলকাতা শহরে, কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বমুখ হয়ে পদচারণা করুন, বিশ্বভুবনের যাবতীয় বর্ণমালা মিছিল করে দেখা দেবে। মানি, পুরানো জাত তোমরা, অতি—পুরানো সংস্কৃতি—ঐশ্বর্যবান তোমাদের সাহিত্য। তা আমরাও কম হলাম কিসে? অত ঠেকার আমাদের নয়।
পরে আরও এক নমুনা দেখেছিলাম পিকিন ছাড়বার মুখোমুখি সময়টা। শান্তি-সম্মেলন চুকে যাবার পর যতদিন ছিলাম, শুধুমাত্র মেলামেশা—ভাবের লেন-দেন। আমাদের সাহিত্যিকদের কয়েকজনকে নিয়ে একটুখানি বৈঠক হচ্ছিল। সামান্য ব্যাপার—জন আষ্টেক সাকুল্যে, তন্মধ্যে দু-জন ওঁদের। ওঁরা বলছেন চীনা ভাষায়, দোভাষি ইংরেজি করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। একটা জিনিস ঠিক বোঝাতে পারছে না দোভাষি, লাগসই কথার জন্য হাতড়াচ্ছে। বক্তা টুক করে জুগিয়ে দিলেন কথাটা। তবে তো মানিক! জানো তোমরা ইংরেজি, ভাল রকমই জানো—এ ধকল দিচ্ছ কেন? মারফতি কথা না বলে মুখোমুখি চালাও তবে ইংরেজি।
সে হবার জো নেই। চীনা সাহিত্যিক চীনাভূমির উপর দাঁড়িয়ে ভিন্ন ভাষায় কথা বলবে—কেন, ওঁদের ভাষা-সাহিত্য কম জোরের হল কিসে? মুখের বুলি কারো খাতিরে ভিন্ন দেশের চেহারা নেবে না—গরজ থাকে তোমার বুঝে নাও তর্জমা করিয়ে। আমাদের মাওলানা আজাদের ঠিক এই রীতি। উর্দু

ছাড়া অ-কুলিন কোন ভাষা জিভের ডগায় ঠাঁই দেন না।

আর, আমার কথা বলা যায়—মানুষটা আমিই-বা কম কিসে? ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এই যে লোকের দৃষ্টিশূলের খোঁচা খাচ্ছি, পোশাকের এমন-অমন হলে তো হাঙ্গামা ছিল না। হবার যো নেই—আত্মম্ভরিতা। বাঙালি মানুষ বাইরের দেশে এসেছি তো বাঙালি হয়েই ঘুরব। গরজে ভোল বদলাতে হলে সাহেবরা আমাদের দেশে, অন্ততপক্ষে সামাজিক ব্যাপারে, ধুতি পরবে না কেন?

বেরুমল বলছিলেন, শেষ অবধি কথা হল ভারতের পতাকা আঁকা থাকবে আমাদের দোকানের সাইনবোর্ডের উপরে। আমতা আমতা করে ওঁরা রাজি হলেন—ভারত-দূতাবাস থেকে যদি কিছু না বলে। তারা কি বলবে! দূতাবাসগুলোই আমার খদ্দের—নানান দেশের ওঁরা আছেন বলেই কায়ক্লেশে টিকে আছি। তাই চক্রধারী পতাকা রয়েছে দোকানের সাইনবোর্ডে, আর এক শাড়িপরা মেয়ে আঁকিয়ে রেখেছি দরজার পাশে। কিছুতে কিছু হয় না, কে দেখে এত খুঁটিনাটি নজর করে? এই আপনাকে দিয়েই বুঝুন না।

ক্ষিতীশ ঢুকছে আমার পরেই। এখানেও টাই মজুত বহুত রকমের। কর্মচারীরা চীনা—তাদের একজন দেখাচ্ছিল। বেরুমল তিন লাফে সেখানে গিয়ে পড়লেন। গোটা চারেক বাক্স বাতিল করে টাই বের করলেন একটার ভেতর থেকে। মেলে ধরে বললেন, দেখুন তাকিয়ে—আসল আমেরিকান চিজ পঁচিশ হাজার। কাঁইকুঁই করবেন না, দিল খুলে গলায় বেঁধে নিন। দেশের মানুষ—দুটো পয়সা কম নেবো তো বেশি নয়।

ক্ষিতীশ দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলে, কিন্তু অন্য জায়গায় আলাদা দর দেখে এলাম। ঠিক এই রকম জিনিসই তো!

বেরুমল হেসে ওঠেন।

আরে মশাই, চাঁদ বাঁকা আর তেঁতুলও বাঁকা। তামাম পিকিন ঢুঁড়ে হেন বস্তু আর একটি মিলবে না। পাবেন কোথা? বাইরের আমদানি বন্ধ—অতি দরকারি জিনিস ছাড়া আনতে দেবে না। নিজেরা যা বানাচ্ছে, তাতেই চালিয়ে-চুলিয়ে নাও। দর বাঁধা—আমদানি কম বলে যে দুটো পয়সা চড়িয়ে দেবেন, সে জো নেই। বিদেশী মালে তবু শতকরা তিরিশ অবধি মুনাফা দেয়, ওদের ঘরের জিনিসের উপরে খুব বেশী হল তো বারো। খরচ-টরচা কষে সরকারি লোক দর ঠিক করে দিয়ে যায়; সেই দর সেঁটে রাখো মালের গায়ে। খদ্দের সেজে ওরাই আবার ঢুকে পড়ে মাঝে মাঝে, সাঁটা দরের হেরফের হল কিনা তদারক করে যায়। বলেন কেন, নিকুচি করেছে পোড়া দেশের ব্যাপার-

বাণিজ্যের !

বেরুমলের এক কনিষ্ঠ আছেন, তিনি এসে জমেছেন ! ফোড়ন দিচ্ছেন মাঝে মাঝে।

ঐ যে তিরিশ পার্সেন্ট—সে-ও কেবল কানে শুনতে। স্টেট বারো পার্সেন্ট ট্যাক্স টেনে নেয় ওর থেকে, কত থাকল তবে হিসেব করুন। চলে ?

সহসা গলা নামিয়ে বলেন, বাইরের মাল বলে আমাদের সঙ্গে হিসেবের খুব কড়াকড়ি করতে পারে না—এই যা। আপন লোকের কাছে ঢাকাচাকি কি—সামান্য হলেও আছে কিছু। কিন্তু নতুন মাল আসতে দেবে না—তা হলে ব্যবসা আর ক'দিন ?

বেরুমল বেজার মুখে বললেন, পুরানো জিনিস ক'টা কেটে গেলে—ব্যস, হাত পা ধুয়ে ঘরমুখো জাহাজে ভাসব। ঘরই বা কোথায়, বেড়াবো আপনাদের দিল্লী কলকাতার পথে পথে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। রকমারি সিল্কে ঘরের ছাত অবধি ভরতি। এই পর্বত-প্রমাণ সংগ্রহ কয়েকটা জিনিস বলে উল্লেখ করে বেরুমল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ভাবনা কিসের ? আপনাদের এই মালের কাটান দিতেই তো কলি কাবার—

কনিষ্ঠ বললেন, এ আর কি দেখছেন। একেবারে নস্যি মশায় আগের তুলনায়। পাশের ঐ দোকান, ওটাও আমাদের ছিল—এই দোকানের লাগোয়া। ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। এ বাড়ি নিজস্ব আমাদের। মেয়েছেলেরা উপরে থাকে, নিচে দোকানপাট।

বেরুমল বলেন, পঞ্চাশ বছরের দোকান—এক-আধ দিনের নয়। আমি নিজেই পিকিনে রয়েছি তিরিশ বছর। হাজার হাজার চীনা, বিবেচনা করে দেখুন, আমার দেশে ভাত করে খাচ্ছে। আর এই এত বড় শহরে গোটা পাঁচ ছয় ভারতীয় দোকানের সমস্ত গেছে—শেষ আমিও যাই-যাই করছি। তখনই মশায় আঁচ করেছিলাম, চিয়াঙের দল খেদিয়ে এরা যখন এসে পড়ল। ভায়াকে বললাম, একেবারে ছেড়েছুড়ে যাওয়া ঠিক হবে না—কাঠামোটা ঠিক রেখে ওদের ভাব-সাব বুঝতে লাগো। স্বদেশের হাল দেখে আসিগে আমি। ইটখোলা করলাম আপনাদের কলকাতার কাছে সোনারপুরে। ব্যবসা জমে যায় তো সবশুদ্ধ দেশে গিয়ে পড়ব ঝাড়ু মেরে এই ছ্যাঁচড়া কারবারের মুখে। তা গেরো খারাপ মশায় ! চোতমাসে এমন বৃষ্টি—খানা খুঁড়ে ইট বানিয়েছিলাম, কাঁচা ইট গুলে গিয়ে সে খানা সঙ্গে সঙ্গে ভরাট। ইটখোলা তোবা করে আবার জাহাজে চড়লাম। পুনর্মূষিক হয়ে পড়ে আছি।

দেশের মানুষ পেয়ে মনের ব্যথা খুলে বলছেন। আমাদের সমবেদনা হওয়া

উচিত, আর হচ্ছেও তা। তবু এক জায়গায় বসে কাঁহাতক এক কাঁদুনি শোনা যায়? চুপিসাড়ে বেরিয়ে এসেছি,—অনেক কৌশলের একটুখানি ছুটি। তা বেশ তো—জানাজানি হয়ে গেল, আসা যাবে আবার। আছি এখনো বেশ কিছুদিন—কতবার আসব। গরজও আছে। দু'পাঁচটা এখানকার হালকা জিনিস নিতে চাই দেশের বন্ধুবান্ধবের জন্য—কেনাকাটার ব্যবস্থা করে দিতে হবে কিন্তু।

নিশ্চয়, একশ' বার। আত্মীয়জন ভাববেন আমাদের। যা যখন দরকার পড়ে। দোকান বন্ধ থাকে তো ঐ পাশের দরজায় বোতাম টিপবেন। উপরে থাকি সকলে। একদিন খেতে হবে কিন্তু আমাদের বাড়ি; সবাইকে পায়ের ধুলো দিতে হবে। এত জনকে একসঙ্গে পাওয়া ভাগ্যে হয় না তো কখনো!

দু-ভাই ফুটপাথে নেমে এসে যে-দরজায় বোতাম টিপতে হবে, দেখিয়ে দিলেন। ঠিক বুঝতে পারিনে, কেন নিতান্তই চলে যেতে হবে এঁদের। বিদেশী সিল্ক ও অন্য বিলাস-দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করেছে, আজকের দিনে তিলমাত্র অপচয়ের উপায় নেই সেইজন্য। তা অন্য সকলের মতো চীনা কাপড়ের কারবার ধরলেই তো হয়! মনটা ভারাক্রান্ত হল—বাঁধা দোকান ছেড়ে দিয়ে সেই তো হাজার লক্ষ উদ্বাস্তুর দলে ভিড়বেন। এমনধারা ব্যবসা জমিয়ে নিয়ে বসবেন, সে অনেক কথার কথা। কিছু গুহ্য ব্যাপার আছে হয়তো, পয়লা দিনে ফাঁস করেন নি। শুনে নিতে হবে। সরকারি তরফের মানুষ আমাদের ঘিরে থাকেন—তাঁদের উল্টো-ভাবনা যাঁরা ভাবেন, তাঁদের কথাও শুনতে হবে বই কি! আবার ভিড় জমছে। তা হোক, মতলব ঠাউরে ফেলেছি এবার। পালাবো না—মানুষ ওরা, বাঘ-ভালুক নয়। আর এই ফাঁক রেখে চলার দরুনই মানুষ শেষটা বাঘ-ভালুকে দাঁড়ায়।

এসো ভাই সব, এসো এগিয়ে—

থমকে দাঁড়িয়েছে, তখন নিজেই চলে যাই ওদের মধ্যে। কাঁধে হাত চাপিয়ে দিলাম একজনার। অবাক হয়ে গেছে। আর এতদিনে সর্বসাকুল্যে একটি চীনা কথা রপ্ত করেছি—সেটা ছেড়ে দিলাম এই মওকায়। ইন্দু—অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় আমি। কী মোক্ষম কথা রে বাপু, মড়া বাঁচিয়ে তোলার মন্ত্র! সকলের মুখে সঙ্গে সঙ্গে অমায়িক হাসি। ভারতীয় আমরা—বুদ্ধের দেশের মানুষ। অন্য দেশের মানুষ ওদের ভাষায় 'হু' অর্থাৎ বর্বর; কিন্তু ভারতের মানুষ হল 'থিয়েন-চু' অর্থাৎ স্বর্গের বাসিন্দা। আজকের নয়—এ কথা পুরানো কাল থেকে চলে আসছে। ইংরেজ টুঁটি চেপে আছে—তারও মধ্যে চীনের সেই বড় বিপদের দিনে, আমাদের মেডিকেল মিশন তাবৎ দেশের

ভিতর সেবা করে বেড়িয়েছে। অর্ধাসনে থেকেও দুর্ভিক্ষের চাঁদা দিয়েছি। তামাম দুনিয়া একঘরে করলেও আমরা এবং আঙুলে-গণা-যায় এমনি কয়েকটা দেশ ইউনো-য় লড়ে বেড়াচ্ছি নতুন-চীনের হয়ে। শক্তির দাপটে ভয় পাই নে, ঐশ্বর্যের হাতছানিতে লোভাতুর হই নি—চিরকারের কুটুম্বের পাশে সহজ আসনটি নিয়ে বসেছি। তা কুটুম্বিতা ওরা মেনে নিল ঐ একটিমাত্র কথায়; পথ-চলতি নগণ্য মানুষ হলেও সবাই ভাসা ভাসা রকমে জানে, ভারত ভাল লোক—নতুন-চীনের পরম বন্ধু।

দুটি প্রাণী—আমি আর ক্ষিতীশ—একা-একা যাচ্ছিলাম পিকিনের

দেখ, কতজনে এখন আমরা। গা ঘেঁষে চলেছে, আমার আলোয়ানের প্রান্ত তুলে ধরে কাশ্মীরি কারুকর্ম দেখছে। বাজারের ভিতর ঢুকব এবার—হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তারা। গভীর আবেগে হাত নেড়ে দিয়ে নতুন বন্ধুরা বিদায় নিল।

কোরিয়ার লড়াই কতদিন ধরে শুনছি। কতটুকু দাগ পড়েছে মনে! কাছা-কাছি এসে পড়ে এখনই কিঞ্চিৎ মালুম হচ্ছে। সেই যে মহাপ্রাচীরের নিচে ঝরণার জল খেতে দিল না—হায় রে, তেষ্টার জলটুকুও হতভাগাদের নির্বিচারে মুখে দেবার জো নেই!

কোরিয়া থেকে সদ্য-ফিরে আসা একজনে আজকে বলা দিচ্ছেন। মণিকা ফেলটন—ব্রিটিশ মহিলা। এর আগে আরও একবার গিয়েছিলেন দল বেঁধে। রণবিধ্বস্ত কোরিয়া দু-দুবার নিজের চোখে দেখে এসেছেন। পনেরো মাস আগে সেই প্রথম বারেই দেখেছেন ধ্বংসের ভয়াবহতা। শহরে একটা ইমারত আস্ত নেই। খাড়া রয়েছে হয়তো একটা থাম, কী একটুখানি দেয়াল। এক এক টুকরো নমুনা রয়ে গেছে, আগে কী ছিল তার কিছু কিছু আন্দাজ করা চলে। ঐ যেমন দেখে থাকবেন, মাটি কাটার সময় এক একটা ঢিবি রেখে দেয়, মাটির পরিমাণ হিসাব হবে বলে। ঐ সব নমুনা ইচ্ছা করেই রেখেছে কিনা কে জানে! যে, সর্বজনে দেখুক তাকিয়ে তাকিয়ে! এবং নিঃসংশয়ে বুঝে নিক—মারবার, পোড়াবার গুঁড়োগুঁড়ো করে ভাঙার ওস্তাদ কী প্রকার সুসভ্য মানুষের। অতএব দুর্বল জাতিবৃন্দ, 'যাহা পায় তাহা খায়, যাহা শোনে তাহা করে' এবম্বিধ প্রথম ভাগে সুবোধ গোপাল হও। ঘাড় তুলতে গিয়েছ কী মারা পড়েছ।

তবু শুনুন তাজ্জব ব্যাপার। ফেলটন বলতে লাগলেন, ধূমকেতুর মতো আকাশে উঠে দুশমন প্লেন যখন-তখন আগুন বৃষ্টি করে যাচ্ছে, মানুষে আর ভয় পায়

না। গা সহা হয়ে গেছে। মরার বাড়া গাল নেই—সেই মজহব চালাচ্ছে তো দিবারাত্রি। আর কী করবে হে বাপু এর উপর?

গোটা পয়ং-ইয়ং শহর চুঁড়ে চারটে দেয়াল এবং তদুপরি ছাত-হেন গৃহ একটি পাবে না। তবু দেখা যাবে, ধ্বংসস্তূপের এখানে-ওখানে ঘরসংসার পেতেছে মানুষজন। মানুষ মানে মেয়েলোক, শিশু ও বুড়োরা। সমর্থ পুরুষ সবাই লড়াইয়ের কাজে! এরই মধ্যে ত্রিপল খাটিয়ে একটু ইস্কুল মতো হয়েছে, বাচ্চারা পড়ে সেখানে। পড়ে আর মনের সুখে লুকোচুরি খেলে বেড়ায় ভাঙা বাড়ির ইটকাঠের মধ্যে।

লোকে আকাশমুখো তাকায়—দেবতার করুণা চেয়ে নেয়—রোষ আর ঘৃণার দৃষ্টিতে। যে আকাশ থেকে যখন-তখন বোমা পড়ে হাস্যোচ্ছল জনপদে আগুন ধরায়, নির্বিচারে মানুষ মারে। এ সমস্ত অবশ্য জানা কথা, চোখে না দেখেও আন্দাজ করা চলে। যে খবর সকলে জানে না, সে হচ্ছে সর্বধ্বংসী আগুনের মধ্যে দুরন্ত জীবনোল্লাস। মার্কিন আধিপত্যের খানিকটা স্বাদ একবার পেয়েছিল কিনা লড়াইয়ের গোড়ার দিকটায়! এখন তারা মরিয়া।

ব্রিটিশ ও আমেরিকান কয়েকটি বন্দী গল্প করেছে মনিকা ফেলটনের কাছে। তাদের ধরে ফেলল যখন চীনারা। একে চীনা তায় কম্যুনিস্ট—মেরে ফেলবে তো নির্ঘাত। আর মরার আগে খবর বের করার জন্য যা-সব ঘটবে, আন্দাজ করতে সর্বদেহ হিম হয়ে যাচ্ছে।

এলো সেইক্ষণ। হেড-কোয়ার্টারে এনে বন্দীদের সারবন্দি দাঁড় করিয়েছে। হুকুম হল, হাত বাড়াও—

এক গুলিতে সাবাড় করবার পদ্ধতি এই। কিন্তু পেটের কথা পেটের মধ্যে রেখেই মরতে দেবে—এত দূর ভদ্র, জানা ছিল না তো! বন্দুকই বা কই সামনে? সিপাহী-সান্ত্রী কোথায়? কয়েকটি মাত্র অফিসার।

হাত বাড়াতেই অফিসারের হাত চেপে ধরেছেন জনে-জনের। শেকহ্যাণ্ড করেছেন।

কিছু বলতে হবে না ভাই, সমস্ত জানি। কোরিয়ার যুদ্ধের জন্য দায়ী তোমরা নও। নিজেরাই কি কম ভুগেছো? যাকগে, বিশ্রাম আপাতত।

পেটের কথা ক্রমশ তারা নিজেরাই ফাঁস করেছে। একেবারে কিছুই জানত না—ঘরবাড়ি ছেড়ে সাত সমুদ্র-পারের লড়াইয়ে ঝাঁপ দিয়েছে পৃথিবীর অশান্তি রোধ করবার জন্য। সেই রকম বুঝিয়েছিল তাদের। তারা নৃশংস নয়—মা-বাপ, ভাইবোন, প্রীতিমতী প্রণয়িনী সমস্ত ছিল একদা, ছিল য়ুনিভার্সিটির পড়াশুনো আর অফিসের চাকরি! আর ছিল রুচিবান আদর্শনিষ্ঠ শান্ত জীবন।

রণদৈত্যের মুঠোর মধ্যে পড়ে সেই তাদের হেন জঘন্য কর্ম নেই যা করতে হয় না। তার উপরে ঔদ্ধত্য ছিল মনে মনে—এসব মানুষের সমাজের জন্য, মানুষের জন্য, সমাজ-শত্রুদের শায়েস্তা করবার জন্য। আজকে আর্তনাদ করছে অন্তরের মানুষ। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। আমি নই—কিছু জানি নে আমি। আমার হাত দু'খানা দিয়ে বোমা ফেলেছে ওরা...

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে মণিকা ফেল্‌টনের তাবৎ কথা শোনা হল। ছবি যেন চোখের উপর দেখছি। এবার চলুন আর এক জায়গায়—অন্য এক ঘরে। নাকামুরা কী বলে, শুনে আসি।

হ্যাঁ, গতিক সেই রকম। পৃথিবী অতি ছোট—হাতের মুঠোর আমলকী বিশেষ। কোরিয়া বলুন, জাপান বলুন, এবাড়ি-ওবাড়ি ছাড়া কিছু নয়। সবাই প্রতিবেশী আমরা। পীস-হোটেল আর পিকিন-হোটেল—দুটো মাত্র জায়গায় মধ্যে সকলকার আস্তানা। দিনের মধ্যে অমন দশবার দেখাশুনো হচ্ছে। ভাষা না জানি তো বয়ে গেল। তাতে বুঝি পরিচয় আটকায়? ঐ তো আজ সকালেই যে কাণ্ড হলো মরিশন স্ট্রিটের উপর বাজারে যাবার সময়। কোরিয়ার কথা শুনলাম, এবার জাপান কী বলে—শুনিগে চলুন। জাপান গর্বনমেন্ট নয়—জাপানের মানুষ।

নাকামুরা ফূর্তিবাজ অভিনেতা মানুষ—চলনে-বলনে তার আমেজ পাওয়া যায়। হবে না কেন? রং মেখে সাজগোজ করে বাপের পিছন ধরে পাঁচ বছুরে শিশু একদিন স্টেজে উঠলাম, আজকে বাহান্ন বছুরে বুড়ো নেচে-কুঁদে সেই রকম লোক মাতাচ্ছি। জাত ব্যবসা মশায়, বাপ-দাদাও জীবনভর এই করে গেছেন। খাসা ছিলাম কাবুকি দলে, সেটা হল পেশাদারি অপেরা—টাকা কামাও, আমোদ-স্ফুর্তি করো, নাক ডেকে ঘুমোও—কোন রকম ঝামেলা নেই। সেই মানুষ আজ তামাম দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানীদের সামনে দাঁড়িয়ে আঁতের কথা বলতে উঠেছি। হেন দুর্ভোগ স্বপ্নে ভেবেছি কোনো দিন?

লড়াই বাঁধল। লড়াইয়ের বাবদে যত গণ্ডগোল। কর্তারা বললেন, বাজে নাচনা-গাওনা নয়—মতলব নিয়ে লেগে পড়ো। নতুন পালা লেখানো হচ্ছে—লড়াই জিতলে ইন্দ্রধাম ধরায় নেমে আসবে, এমনি সব বিষয় নিয়ে। এমন মোক্ষম গাওনা শুরু করো, মানুষ যাতে দলে দলে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই সই। ঢাক কাঁধে ঝুলিয়ে দিল তো বাজিয়ে চললাম এক নাগাড়ে চার-পাঁচ বচ্ছর। কী ঝড় বয়ে গেল দেশের উপর দিয়ে, কত সর্বনাশ যে হয়ে গেল! কাগজে ক'টা কথাই বা লেখে! একটি কথাই বিশ্ববাসী সকলে জেনে রইলেন, জাপানের মতো হাড়বজ্জাত লড়াইবাজ জাত দুনিয়াদারিতে

দ্বিতীয় নেই।

রামা-শ্যামা মানুষগুলোর কথা কানে যায় না যে আপনাদের! আর মন খুলে কথাও কী বলবার জো আছে? সাদা পোশাকে পুলিশ কোথায় ওৎ পেতে আছে, কঁ্যাক করে টুঁটি চেপে ধরবে। তা মশায়রা আমাদের দুর্ভাগা দেশের হয়ে একটা খবর নিবেদন করি—মার-কাট-করনেওয়ালা গোঁয়ার-গোবিন্দ জাত সত্যি সত্যি আমরা নই। কপালের ফের, তা ছাড়া আর কী বলতে পারি? ঘুরে ফিরে আমাদের দিয়ে প্রলয়-নাচন নাচাচ্ছে, কিন্তু বিশ্বাস করুন—নেচে নেচে চেরিগাছে মুকুল ফোটাবো, সেইটেই আমাদের বিশেষ পছন্দ।

তা হতে দিচ্ছে কে? দু-দুটো অ্যাটম-বোমায় ঘায়েল হয়ে আছি, তবু রেহাই দেবে না। ষড়যন্ত্র হচ্ছে, আবার ওখানে পয়লা নম্বরের ঘাঁটি করে নতুন এক লড়াই যদি বাধানো যায়। আমরাও ঠিক করেছি মশায়, ন্যাড়া আর বেল-তলায় যাবে না। ঠিক করছে অবশ্য রামা-শ্যামা-যোদো-মোধোর দল—যাদের কথা খবরের কাগজে ওঠে না। কিন্তু শোনাবোই এবার আমাদের কথা। জেন শিনজা (গণনাট্য দল) গড়েছি, নাটক করি। নাটক দেখতে লোক ভেঙে পড়ে। তা হলে দেখুন, ওরাই গুরু এক হিসাবে, ওদের কথা মেনে নিয়েছি—বাজে নাচনা-গাওনা নয়, মতলব হাসিল করতে হবে।

বাধা শতেক রকমের। হুড়মুড় করে একদিন হাজারখানেক পুলিশ এসে সমস্ত তছনছ করে দিয়ে গেল। তখন মতলব হল, দু-চারটে পালা সিনেমা-ছবিতে পাকাপোক্ত করে তুলে রাখা মন্দ নয়। ছবি তোলা চাট্টিখানি কথা নয়—ম্যাও ধরবে কে? দেশের মানুষদের জানান দিয়ে দাও। তা মশায়, বলব কি, এক পয়সা করে লাখ টাকা উঠে গেল। চাঁদা তুলে সিনেমার ছবি—শুনেছেন এমনধারা? একবার হামলা দিল আমাদের উপর—অভিনয় করতে দেবে না। জনতার গোলামনফর আমি—স্টেজে উঠে করজোড়ে শুধাই, কী আদেশ তোমাদের?

শতকণ্ঠে গর্জন উঠল, চালাও। আমরা আছি—কে ধরতে আসে দেখি! পুলিশ প্যাট-প্যাট করে চেয়ে রইল, স্ফূর্তিতে পালা গেয়ে যাচ্ছি। গতিক বুঝে পিটটান দিল তারা অবশেষে।

হাসছে নাকামুরা নিজে, হাসাচ্ছে আমাদের। হাসতে হাসতে শিল্পীর লাঞ্ছনা ব্যক্ত করছে। আর এদিকে হাসতে গিয়ে জল ফুটে ওঠে শ্রোতাদের চোখে।

সুইং-ইঞ্রা-মিঁ—সেই হাসিখুশি মেয়েটা—নজর খাটো বলে চশমা ধরেছে. কিন্তু পান থেকে চুন খসলেও দেখি নজরে পড়ে।

সকালের মিটিঙে ছিলেন না—

আমতা-আমতা করে বলি, ছিলাম বই কি! নিশ্চয় ছিলাম। হাজিরার লিস্টি আছে তো—দেখ গিয়ে তার মধ্যে।

শেষ অবধি ছিলেন না।

অত মানুষের মধ্যে সেটাও ঠাহর করেছে। কিছু আশ্চর্য নয়। আমাদের আটটি দশটি পড়েছে এক-একজনের ভাগে। ছায়া হয়ে সাথেসঙ্গে ঘোরে, যেমনত করে বেড়ায়। ভাগের মানুষ সরে পড়েছে, টনক তো নড়বেই।

ধরা পড়েছি যখন, বুক ফুলিয়ে জাঁক করাই ভালো। বললাম, ছ-ছটো মিটিঙের অত ভালো ভালো কথা সামলাতে পারলাম না। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল, তাই বেরিয়েছিলাম।

বললেন না কেন ? সঙ্গে যেতাম।

ওঃ, ভারি সব লাটসাহেব এসেছি কি না—যেথায় যাবো, মিছিল করে চলতে হবে!

সুইং বলে, সে কথা হচ্ছে না। ধরুন, দরকার পড়ল কাউকে কিছু বলবার। কিংবা চলতে চলতে হয়তো ভুল রাস্তায় গিয়ে পড়লেন।

তোমাদের তর্জমা ছাড়াও বলতে পারি কথা। বলবার ভাল কায়দা আজকে শিখে নিয়েছি।

বাজার থেকে অনেক জিনিস এনেছি রঙিন বেতের ব্যাগ বোঝাই করে। সগর্বে মেলে ধরলাম।

দেখ, দেখ। হাতির দাঁতের উপর কাজ-করা সিগারেট-হোল্ডার. কুল্যে দশ হাজারে। দশ দোকান ঘুরে ঘুরে কেনা—এক ইয়ুয়ান কমে নিয়ে এসো দেখি কোন-একটা জিনিস। বিনা কথায় হয়েছে এসব ?

ভ্রূভঙ্গি করে সুইং বলে, সওদায় এখানে কথা লাগে না—বোবারাও করে থাকে। কেউ ঠকাবে না, দরাদরি নেই।

শুনলেন ? আমরা বোবা—ঠেশ দিয়ে তাই বলা হল কি না! ওদের ঐ হিজিবিজির ধাঁধায় না ঢুকতে পারলে ধরে নেবে নিতান্ত অবোলা জীব। কী করে বোঝাবো বলুন নির্বুদ্ধি মেয়েটাকে—মুখে বকবক না করেও চোখের চাউনিতে তামাম কথা বলা যায়। তাই তো বলেছিলাম মরিশন স্ট্রীটের উপর। সেই ভাষায় কথা বলেছি দোকানিদের সঙ্গে। তুমি ছিলে না মাতব্বর ঠাকরুন, ভাগিস ছিলে না সঙ্গে! ঠিক করেছি, এমনি ফাঁক কাটাব যখন তখন—সায়েক হয়ে গেছি, ডরাই নে আর কোন মানুষ। চীনের মানুষগুলো তো নয়ই।

তার ঐ যে বলল, ঠকায় না ব্যক্তি—সবাই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। হেন তাজ্জব

বিশ্বাস করতে বলেন কলিকালে ? আর আমি 'হাঁ' বলে রায় দিলেও বিশ্বাস করবেন কি আপনারা বুদ্ধিমান পাঠকদল ? জাতে চীনা—কলকাতার চীনা-বাজার চুঁড়ে বিস্তর চিনে রেখেছেন ওদের। জুতো কিনতে যান ওদিকে। জুতোর দাম বিশ টাকা হেঁকে বসল তো তার সিকি পাঁচ লুপেয়া থেকেই শুরু করবেন, না কি ? ইংরেজি বলবেন, বাংলা বলবেন, সাহেব-সাহেব করবেন—একবার বা আঁটকুড়ির ব্যাটা বলে নিলেন ওর ফাঁকে। নাঃ, কিনবো না এখানে—রাগ করে রাস্তায় নেমে পড়লেন। পিছন থেকে তখন ডাকল, আধ লুপেয়ায় নিয়ে যাও জুতো, লোকসান করে দিচ্ছি।

দেশের দোকানে এসে বললে সেই তারা নাকি দরাদরি একেবারে বরদাস্ত করবে না। পাতিকাক স্থান-মাহাত্ম্যে ময়ূর হয়ে পেখম ধরেছে! আচ্ছা, হাতে-নাতে দেখিয়ে দেবো কাল-পরশুর মধ্যে। সুইঙের দেমাক চূর্ণ হবে।

আজ সন্ধ্যায় ভিয়েতনামের দলকে ডিনারে ডেকেছি আমরা ভারতীয়েরা। এই তো আসল—মানুষজনের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়। কনফারেন্স ধুম-ধাড়াক্কা ব্যাপার, সর্বচক্ষুর দৃষ্টি সেই দিকে, রিপোর্টাররা লুকিয়ে আছে বক্তৃতাদির কণাটুকু বাদ না যায়। ইতিমধ্যে বিশ্বের নানান জাতের মানুষ মুখ-শোঁকা-শুঁকি করে নিঃসংশয়ে বুঝে নিচ্ছি ভাইব্রাদার আমরা—ডাণ্ডাবাজি নিতান্তই অহেতুক। খোলা মনে পাশাপাশি বসেই মীমাংসা হতে পারে।

নিচের বাঙ্কুয়েট-হলে খাওয়া-দাওয়া। আচ্ছা মজার নিমন্ত্রণ—নিমন্ত্রকদের এক তিল ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হল না। ওদের ঘরবাড়ি, ওদের লোকজন, জিনিসপত্র সমস্ত ওদের। একটিবার মুখের হুকুম ঝেড়ে খালাস। শুধু নামের বেলা আছি—খাওয়াচ্ছি নাকি আমারই।

খবরের-কাগজে পড়েন, অতএব ভিয়েতনাম নামটায় চোখ পড়ে থাকবে। কী একটা গোলমেলে ব্যাপার চলেছে যেন অনেক দিন ধরে ? আজ্ঞে হাঁ, নির্ব্যূঢ় স্বত্বে স্বত্ববান ও পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখলিকার সুসভ্য ফরাসি জাতি—দুর্জন ভিয়েতনামিরা গোলমাল বাধাচ্ছে উক্ত মহাশয়দের সঙ্গে। এত অতি হাস্যকর নিয়মবিরুদ্ধ কথা বলছে ভিয়েতনাম নাকি ভিয়েতনামবাসীদেরই। রাগ হয় না আমার ডান দিকে বসেছে গো-গিয়া-খাম। দুটো হাত নুলো। বক্তৃতায় হাততালি দিচ্ছে নুলো করাগ্র দুটোয় শুকনো কাঠি বাজানোর মতো। আলাপ-পরিচয়ের পর পরস্পর শেকহ্যাণ্ড করছি, সে নুলো হাত ঠেকাচ্ছে আমাদের হাতে। এ দশা ছিল না তার। জাপানি হামলার সময় ফরাসিরা তো রাতারাতি জাহাজ ভাসিয়া দরিয়া পাড়ি দিল। গেরিলা-লড়াই করেছে তখন এরা। নিরস্ত্র ও নিঃসহায়—তা হাতবোমা বানিয়েই নাস্তানাবুদ করতে লাগল জাপানিদের।

একটা হাত গেল, তবু ছাড়েনি। দুটো হাতই খতম তারপরে। মুখ পুড়ে মাংস দলা-দলা হয়ে আছে। খানিকটা নিশ্চিন্ত সেই থেকে। ছেলেটাকে বার বার চেয়ে দেখছি। বীভৎস ভয়ঙ্কর মুখ, কিন্তু সাদা দাঁতের হাসির লহর খেলছে। অ্যাটম-বোমার গুঁতোয় শিরদাঁড়া-ভাঙা জাপান পালাল তো খিড়কির পথে গুড়গুড় করে ঠাকঠমক সহ পুনশ্চ ফরাসিরা ঢুকে পড়লেন। এই যে এসে গেছি! কিন্তু কোথায় ছিলেন বীর পুঙ্গবেরা বড ডামাডোলের সময়টা? সেই যখন জাপানিরা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে তাবৎ চাল বাইরে, সরাল, আর অনাহারে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মরল কীটপতঙ্গের মতো? লাইনবন্দি গোরুর-গাড়ি লাস-সরাতে লাগল রাজধানী হ্যানয়ের রাস্তা থেকে—তখন মহাশয়দের টিকি দেখা যায় নি। তার পরে শ্মশানভূমির নৈঃশব্দ্যে প্রেতদলের মতো করোটি-কঙ্কাল নিয়ে ডাংগুলি খেলার উদ্দেশ্যে আবার অভ্যুদয়?

গুয়েন-কুয়োক-ট্রি পঁচানব্বই টা লড়াইয়ের বীর। জাপানিদের সঙ্গে লড়েছে, এখনও লড়ছে। বলে, তোমরা ভারতীয়েরা বাপু, যা হোক করে কাঁধের ভূত নামিয়েছে—কবে যে সোয়াস্তির শ্বাস ফেলব আমরা!

মঞ্জুশ্রী দেবী রবীন্দ্র-সঙ্গীত ধরলেন। পৃথিবী এমন সুন্দর, মানুষ এমন ভালো! বাংলা বোঝেন ক'জনই বা! কিন্তু প্রীতি-প্রসন্নতার আলো মুখে মুখে। সর্বব্যাপ্ত আনন্দ। এতক্ষণের আলোচনার যাবতীয় সমস্যা ও আক্ষেপ সুরতরঙ্গে ভেসে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গান এই প্রথম শুনল ওরা, সর্বপ্রথম এই রণিত হল পিকিন-হোটেলের কক্ষে। গানের শেষে ভিয়েতনামের একটি মেয়ে জড়িয়ে ধরল মঞ্জুশ্রী দেবীকে। আবিষ্ট হয়ে আলিঙ্গন করছে, ছেড়ে দিতে চায় না। অপলক চোখে দেখছি আমরা। নিখিল পৃথিবীর পাহাড়-সমুদ্র যেন নিঃশেষে বিলীন হয়ে পথ ছেড়ে দিয়েছে, এক হয়ে গেছে দূরবাসী আপন মানুষেরা।

১৫

তার পরের দিন—২৮শে সেপ্টেম্বর। ব্রেকফাস্টে চলেছি কয়েকজন সাত-তলার খানাঘরে। লিফটের বোতাম টিপে অপেক্ষায় আছি।

হন্তদন্ত হয়ে এক ভদ্রলোক এলেন। আমার নাম ধরে বলছেন। অমুক বলে কেউ আছেন আপনাদের মধ্যে।

অতএব ছেড়ে দিলাম সেবারের লিফট।

পিকিন-য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক আমি—আলাপ করতে এসেছি।

চলুন তবে ঘরে গিয়ে বসিগে।

খেতে চলেছেন—খেয়েই আসুন। না হয় আমিও যাচ্ছি সেখানে, খাওয়ার

টেবিলে আলাপ হবে। উঠে যান—আসছি আমি একটু পরে।

আধময়লা লম্বা মানুষটি। চৈনিক চেহারা এমন যে হতেই পারে না, এমন নয়। তার পরে জানাশোনা হল—চক্রেশের বাপ জগদীশ জৈন। হিন্দী পড়ান। মেয়ের সঙ্গে তো বিস্তর পরিচয় হয়েছে, বাপকে দেখলাম এবার। বম্বের এক কলেজের অধ্যাপক—চাকরিটা ছাড়েন নি। ছুটি নিয়ে এসেছেন। সমস্ত পরিবার বম্বে রয়েছে, এখানে শুধু বাপ আর মেয়ে।

এ মানুষকে হেলা করা চলে না। মাস ছয়েক আছেন, কত কি নতুন কথা পাওয়া যাবে এঁর কাছে!

চীনা ভাষাটা শিখেছেন তো ভাল করে?

অধ্যাপক শিউরে উঠলেন: ওরো বাবা! সে কি দু-দশ মাসের কর্ম?

দু'মাসের না হোক, দশ মাসেও হবে না?

না। সজোরে তিনি ঘাড় নাড়লেন।

অক্ষরই হাজার কয়েক। ভুল করলাম—অক্ষর নয়, লিপি। কিংবা ছবিই বলুন না। এক একটা ছবি দিয়ে প্রকাশ।

এত প্রগতি নানান দিকে—লিপির ঐ জগদ্দল বোঝায় অসুবিধা হয় না? সহজ কিছু বোঝা নিলে তো পারে। রোমক অক্ষর নিয়ে নিচ্ছে অনেক দেশে। কাজকর্ম চালানো কত সহজ হয় তাহলে!

এই আলোচনা পরে করেছিলেন অপর এক বিদগ্ধ জনের সঙ্গে। তিনি ঐ দেশীয়। খুব খানিকটা হেসে নিলেন। বললেন, অতি প্রাচীন পরিপক্ক জাত যে আমরা। আয়তনে সারা ইয়োরোপের চেয়ে বড়। ইজ্জতেও। কেউ আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে না। চার হাজার বছরের খবর পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ২৮০০ বছরের পাকা ইতিহাস রয়েছে। হেন ঐতিহ্য দেখান দিকি আর কারো! অন্য সকলের যা চলে, আমাদের তা চলবে না। জান কবুল—পুরানো ঐতিহ্যের অাঁশটুকুও আমরা ছাড়তে পারব না।

আবার বললেন, ভাষা নিয়ে অসুবিধা আছে মানি। কিন্তু কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, ভাষা-ত্যাগের প্রস্তাব তুলবে? তবে গবেষণা চলেছে—সহজে ভাষা শেখবার একটা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিও বেরিয়েছে। মাস তিনেকে মোটামুটি কাজ চালানোর মতো শেখা যায়।

খবরের মত খবর। পুলকিত হবার ব্যাপার নিঃসন্দেহে।

ছড়িয়ে দিন না পদ্ধতিটা। বিচিত্র আপনাদের প্রাচীন সাহিত্য ভাণ্ডার। যারা স্বাদ পেয়েছে, তারাই মজেছে। ভাল হয়েছে সংক্ষিপ্ত পথে এগিয়ে মূঢ় জনে এবারে যদি একটু উঁকিঝুঁকি দিতে পারে!

তিনি বললেন, বাইরের লোকে এখন খুব বেশী সুবিধে করতে পারবে না। পদ্ধতিটা ধ্বনির উপর নির্ভরশীল। আমাদের বাগ্‌ভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় থাকলে তবে হবে।

হিজিবিজি লিপির প্রবর্তনা কেমনে হল, শুনবেন নাকি একটু? সত্যি মিথ্যে জানি নে—কষ্টিপাথরে ঠুকে যদি বলেন খাদ আছে, গণেশের দিব্যি করতে পারব না। যেমন শুনেছি, তেমনি লিখে দিলাম। আপনারাও গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করুন, শুনতে পাবেন এই কাহিনী।

তখনো লিখন-শিল্পের আবিষ্কার হয়নি। লোকে দৈবজ্ঞের কাছে যায় ভবিষ্যৎ জানতে, রোগপীড়া সারাতে, গ্রহশান্তি করতে। সমস্ত শুনে নিয়ে দৈবজ্ঞ কচ্ছপের খোলা, মানুষের করোটি বা ঐ জাতীয় কিছু ফেলে দিলেন আগুনে। তারপর আগুন নিবিয়ে বস্তুগুলো বের করে আনা হল। উত্তাপে ফেটে ফেটে আঁকাবাঁকা রেখা রেখা ফুটেছে খোলার উপর। দৈবজ্ঞ ভবিষ্যৎ পড়ে গেলেন ঐ সমস্ত রেখায় চোখ বুলিয়ে। এই হল লিপিবিদ্যার আদি। রেখার মানে দৈবজ্ঞ বোঝে তো আপনি আমি চেষ্টা করলে বুঝব না কেন? অতএব সকলে লিখতে লাগল ঐ ধরনে, মানেও করতে লাগল। লিপির ধরন তাই অমন আঁকাবাঁকা।

অক্ষর নয়—ছবি। এক একটা আস্ত কথার ছবি করে দিয়েছেন একটা-দুটো টুকরো-রেখায় ছবির সংকেত। নিরিখ করে দেখুন, মালুম হবে কতক কতক। রসবোধের নমুনা দেখে অবাক হতে হয়। মানুষ—দেখুন, এক জোড়া পা। স্ত্রী দেড় লাইনে মেয়েলোকের মতো বানিয়ে তার হাতে ঝাঁটার ইঙ্গিত। মামলা—দুটো কুকুর। কয়েদি—বাক্সের ভিতরে গুড়ি মেরে আছে মানুষ। পূজা—মানুষ হাঁটু গেড়ে আছে। পূর্বদিক—গাছের আড়ালে সূর্য। পশ্চিম—পাখীরা বাসায় ফিরছে। এমনি অজস্র।

অধ্যাপক জৈনের পর পরাঞ্জপে। এসে অবধি তাঁর খোঁজ করছি, এত দিনে চোখে দেখলাম। ঝড়ের বেগে ইংরেজী বলেন। আর অমন তাজ্জব চীনা শিখেছেন—খাস চীনা মুলুকের মানুষও লজ্জা পেয়ে যায়। বড় ব্যস্ত—বসে দুটো কথা বলার ফুরসৎ নেই। এঘরে-ও-ঘরে ছুটোছুটি করে দেশের ভাইদের সঙ্গে আলাপ করছেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে যাট জনের সঙ্গে মোলাকাত সেরে ড্রইংরুমে এলেন। ভারতীয় দূতাবাস চাল কিনবার তালে আছে চীনের কাছ থেকে—তার জন্য নানা স্তরে নানাবিধ আলোচনা। আরো নানা ব্যাপার। একটুও সময় নেই। কাল আসব আবার। নয় তো পরশু। আজকে মার্জনা করুন।

সাইকেলে চেপে পরাঞ্জপে সাঁ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

চলুন যাই একজিবিশনে। নতুন-চীন কি করছে, তার কিছু নমুনা দেখে আসা যাক নিজ চোখে। এতকাল চীন যাদের তাল্প বয়ে এসেছে, জোট বেঁধে তারা তো এক ঘরে করে দিল। রোসো, দেখে নিচ্ছি—এখন করছি কমু্যনিস্ট বেটাদের হুঁকো—নাপিত বন্ধ করে। কিন্তু শাপে-বর হয়ে গেল। বাঁচতেই হবে, দাঁড়াতেই হবে নিজের পায়ে। যা দেশে-ঘরে আছে, তাই নিয়ে খুশি থাকো দেশের মানুষ। আর গড়ে তোল নতুন নতুন কারখানা, কোমর বেঁধে সর্ব-শক্তিতে লেগে যাও।
দশ বছরের বেশি ঘরোয়া লড়াই—অস্থি-মজ্জা কিছু কি আর ছিল? জিনিস পত্রের দাম লক্ষগুণ বললে বিনয় করে বলা হয়। ভারী-শিল্প কমে গিয়েছিল শতকরা সতের ভাগ, ছোট শিল্প তিরিশ ভাগ। ফসল কমেছিল কি। সব আবার ঠিক হয়ে গেছে। তাই বা কেন—উৎপন্ন এমন বেড়েছে, কস্মিনকালে যা কেউ দেখেনি। আরও বাড়ছে দিনকে দিন। যেটা ওরা আশা করে, আশা ছাপিয়ে অনেক আরো এগিয়ে যাচ্ছে বছর বছর। কয়লা আর লোহাপাথর চালান দিত আগে, এখন নিজেরাই ইস্পাত বানাচ্ছে। দেশের শিরাউপশিরার মতো সর্বপ্রান্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে রেল-লাইন। জমি-সংস্কার করে ফেলেছে—লাঙল যাদের তাদেরই জমি। নিজের হাতে লাঙলের মুঠো ধরতে হবে তার মানে নেই অবশ্য; লোকজন দিয়েও করাতে পারো। কিন্তু ফরাসে পা ছড়িয়ে খাজনা আদায় চলবে না। দেশ-জোড়া এত বড় কাজ কটা বছরের মধ্যে যেন মন্ত্রের জোরে করছে। অথচ অস্বস্তি কত রয়েছে, ভেবে দেখুন। ঘরশত্রু বিভীষণেরা অদূরে ফরমোশায় ওত পেতে বসে আছে—তাদের পিঠের আড়ালে ভুবনের শক্তিধর মহাশয়গণ। আর শিল্পাঞ্চল অর্থাৎ দেশের প্রাণকেন্দ্রের অতি-নিকটে কোরিয়ায় তো মার-মার কাট-কাট ব্যাপার—অহরহ সেদিককার ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। তার মধ্যেও এত সমস্ত—এমন হাসি আর নিবাধ আনন্দ।
ঘুরে ঘুরে দেখছি। হেন বস্তু নেই, যেদিকে এদের নজর পড়ে নি। ছবি-আঁকা মধুগন্ধী চন্দনের পাখা থেকে ভীমকায় বয়লার। আহা, সবরকমে নাজেহাল হয়েছে এতকাল ধরে—কেউ তো ছেড়ে কথা কয় নি। বারোয়ারি ময়দা—যে পেয়েছে সে-ই ঠেসে গেছে। আজকে দিকে দিকে নবজীবনের ব্যাপ্তি। একজিবিশন ঘুরে ঘুরে ওদের নবীন স্বাস্থ্য ও নিশ্বাসপ্রশ্বাস অনুভব করছি। ভাল হোক এদের—শান্তি ও সমৃদ্ধি উথলে উঠুক। এই আনন্দোচ্ছল স্বাস্থ্যোজ্জ্বাসিত ছেলেমেয়েদের মুখ মলিন না হয় যেন আর কখনো! আর

আমি জানি, এমনি হাসি হাসবে আমাদের সন্ততিরাও। সার্বিক চেষ্টা চাই তার জন্য। দোষ আছে আমাদের মানি, গালিগালাজ করি—আত্ম-সমালোচনা বলে তা ধরে নেবেন। আমাদের কর্মচেষ্টা নিষ্কলঙ্ক ও ব্যাপকতর হোক। আনন্দের প্লাবন দেখে এলাম চীনে—সে আনন্দ হিমালয় ছাপিয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে পড়ুক এখানে। প্রীতি ও সৌহার্দ্যে এপার-ওপার এক হয়ে থাক সেই প্রাচীন দিনের মতো।

কিনতে লোভ হয় নানান জিনিস। বিশেষ করে সিল্কের উপরে তোলা ছবি ও ব্যাগ। ভারি চমকদার। চক্রেশ ও তার বাপ আছেন দলে—আমাদের সঙ্গে ঘুরছেন। হাঁ-হাঁ করে উঠল মেয়েটা। এখানে নয়, আমি কিনে দেবো! যারা তৈরি করে, জানি তাদের। অর্ডার দিয়ে দেবো—আরো ভাল জিনিস হবে, অনেক ভালো—

ডায়েরির খাতা খুলে স্তব্ধ হয়ে গেছি। বিজয়া দশমী। ছাপা আছে তাই, নইলে টের পাবার কথা নয়। শানাই বাজছে যেন কোথায় অনেক দূরে। বাজছে করুণ হয়ে আমার কিশোরকালের একটি বিমুগ্ধ দিনান্ত। এয়োস্ত্রীরা জমেছেন চণ্ডীমণ্ডপে, প্রতিমার কপালে সিঁদুর দিচ্ছেন—তারপর প্রসাদী সিঁদুর মাখাচ্ছেন এ-ওর কপালে। অতি-কুৎসিত মেয়েটাকেও কত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে এই দশমীর দিন। উঠানে নামাল প্রতিমা। গর্জন-তেল মাখিয়ে দিয়েছে—অপরাহ্ন-আলোর ঝিকমিক করছে। মাগো, আবার এসো—

বাড়ির গিন্নি হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। ঠাকুর-প্রতিমা নয়, এ যেন মেয়ে। মা-খুড়ি এবং মাসিরা মিলে শ্বশুরবাড়ি পাঠাচ্ছেন এই গ্রামকন্যাকে। পাশাপাশি আর-এক ছবি। ঘাটে নৌকো। ছাতিমতলায় সকলে দাঁড়িয়ে। চোখে অঝোর-ধারা বয়ে যাচ্ছে। মাগো—কাঁদিস নে মা, নিয়ে আসব তোকে সামনের অঘ্রানে—

লগি ঠেলছে মাঝি। নৌকো এগোয় কই? কলমিফুলে ভরে গেছে নদী-জল। কলমিলতারা শত বাহু মেলে আটকে আছে। এগুতে দেবে না···

তেমনি সানাই বাজে আজও যেন কোথাও। আমার সারা চৈতন্য আচ্ছন্ন করে বাজছে। হঠাৎ কে কথা বলে উঠল। চমক লাগে। ইয়ং এসে বলছে—বয়সে ছোকরা, কিন্তু দোভাষি-দলের কর্তাব্যক্তি।

পাকিস্তানের দল আসছেন। ভাবলাম, আপনিও গেছেন বুঝি এরোড্রোমে। জানি নে তো—

আপনাদের অনেকেই গেছেন। একলা চুপচাপ ঘরের মধ্যে—শরীর খারাপ নাকি?

ভাবছি নানান কথা। লিখছি।

ছবি দেখতে যাবেন? আটটায়। ভালো ছবি। হুয়ে-নদী আটক হচ্ছে। সেই সর্বনাশা নদীর বন্দীদশা দেখবেন চোখে।

না ভাই, কোথাও নয় আজকে। চিঠি লিখব।

কত চিঠি লিখলাম গভীর রাত্রি অবধি। পর্বত-সমুদ্রের ওপার থেকে প্রণাম, প্রীতি আর আলিঙ্গন সুহৃৎ-আত্মীয়দের। দক্ষিণ-দিগন্তে পাখনা মেলে মন উড়ে চলল ভারতের দিকে।

(১৬)

সকালবেলা নীচে নেমেছি। ড্রইংরুম হল দিনরাতের আড্ডাখানা। যত্ৰ-বিটপীবৎ। এই হোটেলের কোন খোপে কে সেঁদিয়ে আছেন, জানা সহজ নয়। ড্রইংরুমে হঠাৎ দেখা মিলে যায়। বেরোবার মুখে পরস্পরের সঙ্গে খানিকটা মোলাকাত সেরে যাই আরামপ্রদ আসনে বসে। ফিরে এসেও বসি খানিকক্ষণ। অথবা ঘুরে বেড়াই ঘরের এদিক-ওদিক—বই ও ছবির দোকানে, পোস্টাপিসে, ব্যাঙ্কে। তক্কে তকে বেড়াচ্ছি—কাল যাঁরা পাকিস্তান থেকে এলেন, তাঁদের পাকড়াতে হবে। অন্তত একজন-দু-জন—কে কে এলেন, খবর নিতে চাই। ভিন্ন দেশ বলে আলাদা দল করে এসেছেন—তবু এতগুলো দেশের মধ্যে রক্ত-সম্পর্কীয় অমন আর কে? বিশেষ করে যারা পূর্ব-পাকিস্তানের। আমার সাত-পুরুষের ভিটেবাড়ি, জন্ম থেকে সমস্ত কিশোর কাল কাটিয়েছি যেখানে। সে গাঁয়ের খানাখন্দ, জঙ্গুলে গাছগুলো অবধি মুখস্থ। ঢাকা শহরের মধ্যেই বা কত বন্ধু আমার! সে আজ বিদেশ হয়ে গেছে। ভারতের দলে আছি আমরা কয়েকজন বাঙালি—আর ও-দলেও নিশ্চয় বাঙালি এসেছেন। ভাইবেরাদার একত্র হয়ে মনের খুশিতে খাস বাংলায় হল্লোড় করে বুঝব।

আচকান-পরা এক ব্যক্তি—হুঁ, চেহারা ও বর্ণে স্বজাত বলে সন্দেহ করি। তবু সাবধানে এগুনো ভালো। ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করি, এই প্রথম বোধহয় দেখলাম মশায়কে?

ইলিয়াস খোন্দাকার আমার নাম—

বাস, বাস—আবার কি! দু-হাতে জাপটে ধরি। বিনামূল্যের খাদ্য খেয়ে—বলতে নেই—গায়ে কিছু তাগাত লেগেছে। সদ্য-আগন্তুক আমাদের স্ফূর্তির ধকল সামলায় কি করে? অবাক হয়ে গেছে। স্বদেশি ভাষায় তখন সাহস দিই: ঢাকার থন আইছেন—সেই ডা কন ভাইডি! জোব্বা দেখে ভড়কে যাচ্ছিলাম—বুঝি বা কোন্ কুবলাই খাঁ তক্তাউস থেকে নেমে এলেন।

জবাব এলো—আর, ঐ পয়লা জবানেই আমি তাঁর দাদা।
আপনি চীনে এসেছেন, ঢাকা থেকেই শুনেছি দাদা।
এবং একথা-সেকথার পর—
দাদা. গরম মোজা কিনতে হবে যে একজোড়া—
হবে. হবে— সেজন্য ভাবনা কি।
এই কদিন আমরা পুরোপুরি লায়েক। ছোটভাইয়ের চোখ-কান ফুটিয়ে দেওয়া সম্পর্কে দাদার বিশেষ কর্তব্য আছে নিশ্চয়ই। ঠাণ্ডা হতে বলি। পিকিন একবারে নখদর্পণে—এমনি একটা ভাব। বললাম, সমস্ত পাওয়া যাবে ভায়া. ব বস্থা করে দেবো, ভাবতে হবে না।
অনতিপরেই বেরুলাম ইলিয়াসকে নিয়ে। ছেলেমেয়েগুলো বা অপর কেউ জানতে না পারে। বাহাদুরির জুত হবে না তাহলে।
হাজির করেছি বাজারের ভিতর। সারা পথ তালিম দিয়ে এনেছি। হোটেলে খাবার ব্যবস্থা কখন কি রকম, ব্রেকফাস্টে কোন কোন পদ অতি-উত্তম, দেশে চিঠি দেবার প্রক্রিয়া কি, কাপড় ধোপার-বাড়ি দিতে হলে কি করতে হবে…। কনিষ্ঠের জ্ঞানচক্ষু-উন্মীলনে চেষ্টার কসুর নেই।
জিনিস দেখুন. পছন্দ করুন, এ-দোকানে ও-দোকানে দেখে বেড়ান—কিন্তু এক-দামে না ক কেনা-বেচা। ঐ যে দর সাঁটা রয়েছে, মাথা খুঁড়ে মরলেও ওর থেকে পাই-ইয়ুয়ান কমবে না।
ইলিয়াস অবাক। চীনে দোকানে একদর—বলেন কি!
তাই বলে গো দেমাক করছিল। দেখা যাক একটু ভাল করে বাজিয়ে।
আরও কজনের সঙ্গে দেখা। তাঁরাও আমাদের মতো বাজার চুঁড়ছেন। অবসর পেলে বাজারে ঘুরে বেড়ানো নেশার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ঘুরলাম অনেকক্ষণ ধরে। লাখ পাঁচেকের জিনিস পছন্দ করেছি সকলে মিলে। দোকানিকে বলল, এত মাল গণ্ড করছি, দশটা হাজার কমিয়ে দাও এর থেকে বাপু। ভদ্রলোকের মান রাখা তো উচিত। উচিত কিনা বলো?
হাত-মুখ নেড়ে প্রাণপণ করছি তো বোঝাবার। কতদূর কি বুঝল কে জানে? হাসছে মিটমিটি। হিসাব করবার একরকম যন্ত্র আছে—তারে-বাঁধা কতক-গুলো গুটি, ফ্রেমে বসানো। সেই গুটির এটা এদিকে ওটা ওদিকে দ্রুত বেগে ঘুরিয়ে কি দিয়ে কি করল—সেই দিকে চেয়ে একটুকরো বাজে কাগজে ফসফস করে লিখে যাচ্ছে। আর আমরাও এদিক পাঁচ আর নয়ে চোদ্দ, চোদ্দ আর সাত একুশ, একুশের এক নামে হাতে দুই রয়—এমনি করে অনেক কষ্টে যখন লাখ লাখের যোগ শেষ করলাম, দেখি নির্ভুল ওদের হিসাব। কিন্তু কি

পাষণ্ড দেখুন—এক ইয়ুয়ান, যার দাম এক পয়সার পঁচাত্তর ভাগ, তা-ও বাদ দেয় নি ভদ্রলোকেদের খাতির করে। ঠোঁটের উপর ঐ একটু হাসি মাখিয়েই শোধ দিল।

রাগ করে বলি, তবে বাপু চললাম। সওদা হবে না তোমার এখানে।

তখনো হাসি। কথা না বোঝায় সুখ আছে, দেখতে পাচ্ছি। যেমনধারা দেখেছি, কালা হওয়ার দরুন সেকালের এক যশস্বী সম্পাদকের সুখ। নামটাই বলে দিচ্ছি, জলধর সেন—আমাদের জলধর-দা। লেখা ছাপানোয় তাগাদার জবাব দিতে হত না তাঁকে।

দোকানদার ইতিমধ্যে আপন মনে ক্যাশ-মেমো কাটতে বসেছে। মা গছিয়ে ছাড়ল না দেখা যাচ্ছে।

দশ হাজার না হোক, নিদেন পক্ষে পাঁচ। ছাড়তেই হবে কিছু। আজকে আমরা পণ করে এসেছি।

যোগ দিয়ে ঠিক সেই আগের অঙ্কে এসেছে। তার পরে—ও হরি, বাদ দিয়ে দিল পাঁচ নয়, দশ নয়—হাজার পঁচিশের মতো। ক্যাশ-মেমো সগর্বে পকেটে পুরি। দেখাব সুইং-ইঞা-মিঁকে। বড় যে জাঁক হচ্ছিল, খাতির উপরোধ নেই—বোবা মানুষেও সওদা করতে পারে! কী হল এই পঁচিশ হাজার বাদ দিয়ে দেওয়া?

ক্ষিতীশ আচ্ছা জমিয়ে নিয়েছে, দেখি, ওদিকে। বাজনার দোকানে ঢুকে পরখ করছিল একটা যন্ত্র। মিষ্টি হাত। লোক জমে গেল দোকানের জানলায়। তখন গান ধরল কিঞ্চিৎ। আর যাবে কোথায়? এ বাজ কিনে এনে পরিয়ে দেয়, ও এসে শেকহ্যাণ্ড করে। তারপর বাজার থেকে বেরুল তো ভক্তদল ফিরছে পিছু পিছু। সমারোহ ব্যাপার!

জাতীয় উৎসব এসে পড়েছে। যে দিকে তাকাই, সাজসজ্জার ধুম। নতুন চেহারা খুলছে অতি-পুরানো পিকিন শহরের। এখন থেকে এই—আর সেই পরম দিনে মানুষজন কি করবে আন্দাজ করতে পারিনে।

বড় বাহার বেরুমলের দোকানের। সাজানো তবু শেষ হয় নি, নিশান টাঙাচ্ছে তার টেনে এনে আলোর মালা ঝুলিয়ে দিচ্ছে দরজা ও কাচের শো-কেসের চতুর্দিকে ঘিরে। মালিক দু-ভাই ফুটপাথের উপর, নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছেন। আমাদের দেখে হৈ চৈ করে উঠলেন, আসুন—আসতে আজ্ঞা হয়—

নাছোড়বান্দা। ভিতরে নিয়ে তুললেন। এমনই হয় দূর বিদেশে দেশোয়ালি পেলে। সেই যে বলে থাকে—কোথায় নিয়ে রাখি, ভুঁয়ে রাখলে পিঁপড়ের

খাবে, মাথায় তুললে উকুনে খাবে—এ যেন সেই বৃত্তান্ত।

চা খেয়ে যেতে হবে আজকে। খুব ভাল ভাল বস্তু খাচ্ছেন জানি—কিন্তু নিজের দেশের মতো চা করে খাওয়াবো। সে জিনিস ওরা দিতে পারবে না। বেরুমল চীনা কর্মচারী একজনকে পাঠিয়ে দিলেন উপরে। মাকে বলে এসো নিজ হাতে ভাল করে চা বানাতে কলকাতার বাবুদের জন্য।

বিস্তর জিনিস কিনেছি আজকে। তর্কাতর্কির ঠেলায় এই দেখুন, সস্তা করে দিয়েছি।

ক্যাশ-মেমো বের করে ধরলাম। বেরুমল নিশ্বাস ফেলে বললেন, ছিল মশায় সে সমস্ত দিন। একটা বছর আগে এলেও কিছু কিছু নমুনা পেতেন। এখন ফক্কিকার। মাল কেনো, দাম ফেল—ব্যস, বিদেয় হয়ে যাও। একেবারে শুকনো লেনদেন—দুটো কথা-কথান্তরেরও ফাঁক রাখেনি।

এটা কি হয়েছে তবে? হাজার পঁচিশ ডিস্কাউন্ট আদায় করে ছেড়েছি, চেয়ে দেখুন।

বেরুমল বললেন, সবাই দিচ্ছে। দোকানিদের ইউনিয়ন ঠিক করেছে, উৎসবের এক হপ্তা পাঁচ পার্সেন্ট বাদ দেবে দামের উপর। তর্কাতর্কি করে থাকেন তো কথার বাজে খরচ করছেন মশায়। বোবা মানুষ গেলেও ডিস্কাউন্ট পাবে।

ফুটফুটে একটি মেয়ে এলো। বছর আষ্টেক বয়স। নাম মায়া। এরও দিদি আছে—দু'বছরের বড়। বেরুমল বললেন, নমস্কার করো বাবুদের।

মিষ্টি রিনরিনে গলায় মায়া বলে, নমস্তে—

তারপর চা ইত্যাদির সঙ্গে বড়টিও এসে দাঁড়াল।

কি পড়ো তুমি?

ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, হিন্দি আর চীনাও।

কি সর্বনাশ! শেল শূল গদা মূষল—শিশুপাল-বধের চতুরঙ্গ আয়োজন একেবারে।

বেরুমল বললেন, ফ্রেঞ্চ-ইস্কুল বলে ফরাসিটা পড়তেই হবে। তাহলে কোনটা বাদ দেওয়া যায় বলুন। দূতাবাসগুলোর যত ছেলেমেয়ে ঐখানে পড়ে। ইস্কুলটা স্রেফ বিদেশীদের নিয়ে। বড় মুশকিল হয় এখানে আমাদের ছেলেপুলেদের পড়াশুনোর ব্যাপারে।

আবার গল্প জমে ওঠে। সেই দাঁতের ব্যথা। ব্যাপার-বাণিজ্যের সুখ একেবারে নেই মশায়। এই মরিশন স্ট্রিটে আগে সাহেব-মেমের ভিড়ে রাস্তা চলা যেত না—এখন চৌকাঠে দাঁড়িয়ে গুণুন, গণ্ডা দুই-তিনের বেশি পাবেন না সমস্ত দিনে। শখের মাল কারা কিনবে তবে বলুন? মা-ষষ্ঠির দয়ায় এরাও

অনেক। তা এরা কিনবে শৌখিন আমেরিকান সিল্ক? হয়েছে আর কি!
নীলরঙের গলাবন্ধ কোট আর পাজামা। মেয়ে-পুরুষ সকলের এক পোশাক। দামে অতি সস্তা—টাকা কুড়ির মত সাকুল্যে। সুতি জিনিস—খুব টেকসই, তুলোর প্যাড-দেওয়া শীত ঠেকানোর জন্য। সরকারি কো-অপারেটিভ দোকানে পাওয়া যায়। দূর গ্রামাঞ্চল অবধি গবর্নমেন্ট সরবরাহ করে। দুটো-তেই বছর কাবার। সান-ইয়াৎ-সেনও চেষ্টা করেছিলেন এই জিনিস চালু করতে—তিনি তত জুত করতে পারেন নি। এদের আমলে, দেখুন, বিলকুল সব নীল হয়ে গেছে। তা হলে বুঝুন. আমাদের খদ্দের কোথা? দূতাবাস-গুলো আছে, আর কদাচিৎ ছিটকে-আসা কেউ কেউ। আর এখন তো এ-সবের আমদানি বন্ধ। ভাল লাগে না—আগেকার এই মজুত মাল খতম হয়ে গেলে এতকালের পাট চুকিয়ে দুর্গা বলে ভেসে পড়ি।
মাস আষ্টেক আগে—সে কী কাণ্ড—ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। পাশের দোতলা দেখছেন—এক দোকানদার ঐ ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরল ওদের হাতে পড়বার ভয়ে। ঘোড়া-ভেড়া সব সমান, মশায়, এ পোড়া দেশে—আপন লোক বলে খাতির-উপরোধ নেই। চোরা কারবারের দায়ে চোরটাকে গুলি করে মারল—তিনটে তার মধ্যে কম্যুনিস্ট, কর্তাদের ভাইব্রাদার। মেরে ফেলল তা-ও বরং ভাল—প্রাণে বাঁচিয়ে রেখে যে দাগাটা দেয়! এক রকম আছে—প্রশ্ন করে যাওয়া। মানুষটাকে শুতে দেবে না, ঘুমুতে দেবে না—একের পর এক এসে অবিরাম প্রশ্ন। কমাদাঁড়ি নেই প্রশ্নের—দিনের পর দিন পালাক্রমে চলছে। কতক্ষণ সামলানো যায়? প্রশ্নের সাঁড়াশির টানে পেটের কথা হিড়হিড় করে বেরিয়ে আসে। এই দেখছেন কোন দিকে কিছু নেই—খদ্দের সেজে এরই মধ্যে কতবার দর-দাম নিয়ে গেছে, ঠিক কি! কার ভরসায় কি করবেন, তবে বলুন। জানে-মানে সরে পড়াই উচিত।
বেকমলের দোকান থেকে বেরিয়ে ভাবতে ভাবতে আসছি। ঐ যে খেই ধরিয়ে দিলেন—তারপর খবরাখবর নিয়ে তাজ্জব হয়ে যাই। যা হয়ে থাকে। ক্ষমতা-হাতে পেয়ে মানুষের ঠিক থাকা মুশকিল। আদর্শ ধুয়ে মুছে যায়। এক বিপ্লবী দাদাকে জানি—সারা যৌবনকালে ফাঁসির দড়ি পিছনে কোন গতিকে প্রাণ নিয়ে ছিলেন, বুড়ো বয়সে স্বাধীনতার আমলে সেই তিনি পারমিট-বাগানোর ঘুঘু। এদেশে যা হয়েছে, ওদেশে হয়ে উঠেছিল প্রায় তাই। মাথা ঘুরে গেল জন কতকের।
আর অমনি ছেড়ে দিল মোক্ষম অস্ত্র—সান-ফান অর্থাৎ তিন মানার আন্দোলন। দুর্নীতি নয়, অপচয় নয়, এবং বনেদিআনা নয়। চোরা-কারবার কুলো

বাজিয়ে দেশ-ছাড়া করাতে হবে ; যা নইলে নয় সেইটুকু মাত্র নেবে, জিনিসের এক কণিকা নষ্ট না হয়। আর চিরকাল ধরে এ যে বাদশাহি মেজাজ দেখিয়ে আসছে একটা দল—কাজ করবে না, অন্যের শ্রমের উপর বসে বসে খাবে, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব আঁকড়ে থাকবে কলা-কৌশলে—সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে তাদের অনাচার।

শাসন-শক্তি ওখানে আলাদা-কিছু নয়—কোন বিশেষ অঞ্চল থেকে পুলিশ-প্রহরায় অপতিত হয় না জনসাধারণের উপর। ঐ বস্তু ছড়িয়ে আছে সর্ব-সাধারণের মধ্যে। তোমাদের গাঁয়ের কাজ, তোমাদের পাড়ার ব্যাপার তোমরাই দেখ—কার বাপু দায় পড়েছে বাইরে থেকে চৌকিদারি করবার? না পেরে ওঠ, পিছনে পড়ে থাকবে তোমরা। পারবে সইতে হেন অপমানের দায়? এত দুঃখ-দহনের পরেও এমন দুর্গ্রহ! কী লজ্জা, কী লজ্জা! টেনে বের করো দুরাচারদের জনসমাজে; মুখে চুন-কালি দাও। সমাজের শত্রু—নতুন চীনের অগ্রগমনে পথের কাঁটা।

এই হল জনসাধারণের আন্দোলন। তখন ব্যাপারি-মহল বলে, আমরাই বা কম হলাম কিসে? ওরা হুমকি দিয়ে কালোবাজার সামলাবে—কেন নিজেরা সাবাড় করতে পারব না আমাদের ভিতরকার কালো-ভেড়াগুলোকে? ব্যাপা-রিদের নিজস্ব আন্দোলন উ-ফান অর্থাৎ পাঁচ মানা। ওদের তিন, এদের হল পাঁচ—আরও দুটো বেশি। ঘুষ দেবো না, সরকারকে ঠকাবো না, সরকারি মাল চুরি-চামারি করবো না, সরকারি গোপন তথ্য ফাঁস করবো না, ট্যাক্স ফাঁকি দেবো না।

কে কি অপকাজ করেছ খুলে বলো সরল মনে। একটা তারিখ ঠিক করে দেওয়া হল—অমুক দিনের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দোষ-ঘাট স্বীকার করো। তা যারা করল—দেশের সামনে হা-হুতাশ করে বলল, এমনটি আর কস্মিনকালে হবে না—বকেঝকে ছেড়ে দেওয়া হল তাদের।

ওদিকে হাঁকডাতে লাগল খবরের-কাগজ, রেডিও, মিছিল, মিটিং স্লোগান। উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম যে দিকে চরণ ফেলবেন—হৈ হুল্লোড় পড়ে গেছে। এই তো ব্যাপার যে মালপত্র চেপে রেখে দুটো-পাঁচটা টাকা বেশি নিয়েছে! তা মানুষ খুন করলেও কোনো দেশে এতদূর হয় না।

এই এক মজা ওখানে—উপর ওয়ালারা এক-দোকা কিছু করে না, নিজেদের কাঁধে ভার রাখে না, সকলকে নিয়ে দল জোটায়। কেন বাপু, একলা আমাদের কি? চোরা-কারবারের দরুন দুর্ভোগ সর্বসাধারণের নয়? সকলে নির্বিকার আর সরকারি কয়েকটা মানুষ টুঁ মেরে বেড়াবে—এমন হবে কেন তাহলে?

আর পড়শিরা বিগড়ে রয়েছে—হেন লক্ষ্মীছাড়া স্থানে আর যাই হোক, কালোবাজার কক্ষনো চলতে পারে না।

মামলা দায়ের হল হাজার ছয়েকের মতো। গণ-আদালতের ব্যাপার বেশির ভাগ—কম-বেশি জরিমানা দিয়ে আসামিরা ছাড়ান পেল। কিন্তু প্রাণে মারা ওর চেয়ে বোধহয় মন্দ ছিল না। কী ধিক্কার! এই কাণ্ডের পরে আবার কী মাথা তুলে বেড়াতে পারবে? সমাজদ্রোহী রূপে চিরদিনের মতো দাগি হয়ে রইল।

দু-হাজারের মধ্যে প্রাণদণ্ড চার জনের। চোরা-কারবারের দায়ে গুলি করে মারা হবে। বুঝুন। আর তার মধ্যে কম্যুনিস্ট তিন জন। হয়তো ভেবেছিল আমি শ্রীপ্রভঞ্জন শর্মা, অমুক কর্তার সঙ্গে দহরম-মহরম, মাকড় মারলে ধোকড় হবে রাজত্ব চালাচ্ছে যখন আমাদের দল। কিন্তু হুকুম শুনে চক্ষু কপালে উঠে যায়।

কী সর্বনাশ, খুনে-ডাকাত নাকি আমরা?

হ্যাঁ। একজন দু'জন নয়—হাজারে হাজারে খুন হয়েছে। ডাকাতি এক-আধ জায়গায় নয়, লক্ষ লক্ষ বাড়িতে।

চুলচেরা হিসাব—অপকর্মের ফলে কত মানুষ খেতে পায় নি, কত খাদ্য পাতালপুরীর অন্ধকারে জমিয়ে রেখেছিল। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সে হিসাব জানিয়ে দেওয়া হল দেশের সর্বত্র সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে।

কম্যুনিস্ট পার্টির মাতব্বর গোছের মানুষও আছে আসামীদের মধ্যে। এ সমস্ত চাউর হয়ে গেলে দোষ তোমাদের পার্টির উপরেও পড়বে যে! শত্রুর অভাব নেই, তারা হাসাহাসি করবে—চোখ টিপে বলবে, মাছ খেয়েছে বাপু আরো কত জন, ধরা পড়েছে হাঁদারাম এই কয়েকটি মাছরাঙা। বুদ্ধিমানেরা হেন অবস্থায় চেপে যান, ধমক-ধামক দিয়ে সামলে নেন। কিন্তু ওরা গোঁয়ার-গোবিন্দ। বলে, ছিল এককালে পার্টির মানুষ—এখন পতিত। আর পার্টির চেয়ে অনেক বড় হল মহাচীন।

একজন আকুল হয়ে কেঁদে পড়ে।

পথের কুকুরের মতো তাড়া খেয়ে বেড়িয়েছি কুয়োমিনটাং আমলে, মুক্তি-সৈন্যদের মধ্যে থেকে লড়েছি, ঘর-গৃহস্থালীর দিকে চোখ তুলে তাকাই নি কোনদিন। বিবেচনা করো, আমার গৌরবময় অতীত—

মৃত্যুও গৌরবময় হোক এবার। মহাপাপের মহা প্রায়শ্চিত্ত।

পিকিন শহরে দুটো লোক প্রাণ দিল এমনি। বাহান্নর ফেব্রুয়ারিতে। এমন কিছু বেশি দিন নয়। সারা দেশের মধ্যে বাকি আর দু-জন। পঞ্চাশ কোটি

মানুষের চারটি—বাস, এতেই একেবারে ঠাণ্ডা। কালোবাজারে লাল-বাতি। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা—ও-পথের ধূলো আর মাড়াবে?
কি অদ্ভুত পরিবেশ—দেশময় প্রায়-যুধিষ্ঠির হয়ে উঠেছে। মানুষ বটে তো! ইচ্ছে কি করে না দুটো পয়সা এদিক-ওদিক করে বেশি রোজগারের। কিন্তু জোট বাঁধে কার সঙ্গে? এমন হয়েছে, অমন চিন্তা মনের মধ্যে আনতেও ভয় করে। তা ছাড়া খাওয়া-পরা যখন মোটামুটি চলে যাচ্ছে, কিসের প্রয়োজন ঐ হাঙ্গামা-হুজ্জতের মধ্যে যাবার?

(১৭)

সেণ্ট্রাল কলেজ অব আর্টসে যাচ্ছেন জন-কয়েক। সে দলে আমার নাম নেই। অফিস-ঘরে চলে গেলাম।
লিস্ট কে করেছেন?
সেক্রেটারি বহুজন। যাকে বলি, তিনিই ঘাড় নাড়েন। শেষে টের পাওয়া গেল বন্দোবস্ত কুমুদিনী মেহতার। তিনি খেতে গেছেন। খানাঘরে অতএব হানা দিলাম।
আমায় বাদ দিলেন কেন?
একটা বাসে ক'জন ধরবে। লেখক মানুষ, লেখাপড়া নিয়ে থাকেন—ছবিও বোঝেন নাকি?
পরখ করুন। যে-ছবি সকলের গোরু বলে মনে হবে, ঠিক বলে দেবো পার্বত্য-ঝরনা; ক্রোটো-তালগাছ যাকে বলেন, সেটা হবে বেণী-বিসর্পিণী আধুনিকা। ছবি দেখে দেখে ঘুণ হয়ে আছি।
হেসে হেসে বলছিলাম। তার পরে ঝাঁঝ এ.স গেল কথায়।
শিল্পীর দেশ মহাচীন—'হুনুয়ে চীন'। তাদের নতুন কালের শিল্প-সাধনা চোখে দেখতে দেবেন না—সে হবে না. যাবোই আমি।
আজকে ঘুরে আসুক তো এরা। না হয় আর একদিন—
খাওয়া শেষ হয়েছিল। কুমুদিনী উঠে গেলেন। গটমট করে এক ফাঁকা টেবিলে আমি বসে পড়লাম। টাইপ-করা মেনু দিল হাতে। মেজাজ উষ্ণ—তালিকা ধরে একনাগাড় অর্ডার দিয়ে যাচ্ছি।
নিচে এসে দেখলাম, কলহের ফল ফলেছে। ছাড়পত্র মিলছে, আমার নামও জুড়ে দিয়েছে তালিকায়।
মেয়েরাই বেশি এই ছবি দেখার দলে। দুটি মেয়ে-দোভাষিও চলেছে একটি তো সুইং-ইঞা-মিঁ, আর একটির নাম—লিখে রেখেছিলাম, পেয়ে গেছি সম্প্রতি—চেন ইয়েন।

আর দেখছি, মেয়েরাই যেন অধিক জমিয়ে তুলেছেন। পুরুষদের ছাপিয়ে। রোহিণী ভাটে হলেন মধ্যমণি। তাঁর ঘরে এসে পিকিনের মেয়েরা ভারতীয় নাচ শেখে। রোহিণীও চীনা নাচ শিখে নিচ্ছেন। গানেরও এমনি পালটা-পালটি চলে। ভারত-চীনের মধ্যেকার হিমালয় পর্বত নিতান্তই নস্যাৎ করেছেন ওঁরা নাচ-গানের দাপটে।

আর ঐ গোলমেলে চীনা নামে তৃপ্তি হচ্ছে না বোধহয়। বাসের মধ্যে সেই কথা উঠল। রোহিণী বললেন, ভাই তোমাদের নাম দিয়ে দিচ্ছি আমাদের ভাষায়। সুইংকে বললেন, তোমার নাম হল উষা। চেন-ইয়েনকে বললেন, তুমি সন্ধ্যা।

ওরা হেসে খুন। উষা-উষা। বার কয়েক বলে বলে সুইং তো নতুন নাম রপ্ত করে নিল। সন্ধ্যা নামে কিন্তু আমাদের ঘোর আপত্তি। কাঁচাসোনার রঙের মেয়ে—সন্ধ্যা কেন সে হতে যাবে? দেশে ফিরে গিয়ে সন্ধ্যা কেন—নিশীথিনী, অমাবস্যা, ঘোরা তামসী—যত খুশি নামকরণ কোরো। মানাবেও চমৎকার।

সুইং বলে, মানে কি উষার? মানে জেনে খুশির অন্ত নেই। বলে, ভারি ভালো নাম—আমার বড পছন্দ। ভারতের যা-কিছু শোনে, সমস্ত ভালো ওর কাছে। বলে, তোমাদের ভারতে যাবো আমরা। দেখতে বড লোভ হয়। যাবো যখন, আমায় কিন্তু এই নামে ডাকবে।

তা যেন হল—কিন্তু তোমার ঐ আদি-নামের মানেটা কি, এবারে শুনি আমরা।

কিছুতে বলবে না। ফিক-ফিক করে হাসে। বলে, জানি নে—

তাই কি শুনি? এমন চালাক মেয়ে তুমি—গ্রাজুয়েট হয়েছ, তুনিয়ার তাবৎ ব্যাপারের মানে জেনে বেড়াও, আর নিজের নামের মানে জানো না।

মানে নেই আমার নামের—

তখন বোঝাচ্ছি, দেখ মিথ্যে কথা বলতে নেই। বিশেষ আমরা হলাম যখন থিয়েন-চু—

আধুনিকা এরা স্বর্গনরক মানে না, থিয়েন-চু বলে ভয় ধরানো যাবে না। তবু অতিথিজনে এমন করে বলছে--বিশেষ যেগুলোকে সে অহরহ তাডনা করে বেড়ায়। সলজ্জ কণ্ঠে বলল, বিশ্রী নাম—মানে বলতে লজ্জা করে আমার। তখন এত সমস্ত কেউ তো জানত না, ফিউডাল নাম রেখেছেন বাপ-মা।

ঘাড় নাড়ে আর হাসে।

না-না, সে আমি কিছুতে বলতে পারব না।

আরও কৌতূহলী আমরা।

বলতেঃ হবে। ফাঁস করব না হে, কানে কানে বলো। এইও, কেউ শুনবে না তোমরা—

'সুইং ইঞা-'ম', কথাটার মানে হল, গ্লোরি অব দ্য ফ্যামিলি—পরিবারের গৌরব।

এই ব্যাপার! আমরা ভাবলাম, কি না কি! খাসা নাম হে তোমার—গৌরব করার মতোই মেয়ে তুমি।

সুইং বলে, ছোট্ট একটু গণ্ডীর মধ্যে গৌরব হয়ে থাকা। পরিবার আবার কি! ওসব বাতিল, থাকা উচিত নয়।

বোঝানো যাচ্ছে, নিখিল মানব-গোষ্ঠীই হল একটা পরিবার! তার গৌরব তুমি। এই রকম মানে করে নাও না—লজ্জার কিছু নেই।

তারপর এক সময় গভীর কণ্ঠে বললাম, আর কোন দিন দেখা হবে না, কিন্তু এই নাম যেন সত্যি হয়ে ওঠে তোমার জীবনে। এই আশীর্বাদ রইল আমার।

পীস-হোটেলে ঢুকল বাস। কয়েকটি আমেরিকান বন্ধুকে তুলে নেবো। প্রতিশোধ নাও তুমি সুইং, ছাড়বে কেন? তোমাদের ভারতীয় নাম দিয়েছে, তোমরা পালটা চীনা নাম দিয়ে দাও এদের।

বেশ তো; বেশ তো—

রোহিণী প্রভৃতি কলকণ্ঠে উল্লাস প্রকাশ করেন।

কাকে কি নাম দিচ্ছ বলো, মুখস্থ করে ফেলি।

নাম বলতে গিয়ে মেয়ে দুটো থমকে গেল।

না, থাকগে এখন। ভেবে-চিন্তে দিতে হবে। এখন নয়, পরে।

নামকরণ হয়নি শেষ পর্যন্ত। অন্তত আমরা কিছু জানি নে।

আর্টস কলেজের মস্ত বড় বাড়ি। ঝকঝক-তকতক করছে। পরিচালকেরা এগিয়ে এসে সংবর্ধনা করলেন। ঘরে ঘরে নানান শিল্পকর্ম। ছাত্রেরা নিবিষ্ট মনে কাজ করছে, পা টিপে টিপে সরে আসতে হয়। তারপর দোতলায় উঠলাম।

সামনেই শ্মশ্রু-সমন্বিত আমাদের আপন মানুষটি—রবীন্দ্রনাথ। বিশাল হল-ঘরে অগণিত ছবির ভিড়ের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ আর সর্বপ্রধান। যত অন্যমনস্ক থাকুন, নজর আপনার পড়বেই।

সুদূর চীনের জ্ঞানী-গুণীদের সমাজের গুরুদেব আজও জমিয়ে বসে আছেন, আমরা খবর রাখি নে। এদেশে-ওদেশে চিরকালের ভালবাসাবাসি—নতুন

কালে সেই প্রীতি শান্তি ও সৌহার্দের তিনিই দূতিয়ালি করলেন। চীন ঘুরে তাদের চিত্তজয় করে এলেন, চীনা-ভবন গড়লেন শান্তিনিকেতনে—সে কতদিন আগের কথা! চিত্রপটের রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন হাস্যে তাঁর দেশের মানুষদের আহ্বান করলেন। শিল্পীর নাম চু-বি-হুয়াং (Chu-bei-huang)। কবিকে শিল্পী চোখে দেখেন নি—মানস-স্বপ্ন তুলির টানে তুলে ধরছেন। খরের অবধি নেই। ঘুরে ঘুরে দেখছি। হিন্দী কথাসাহিত্যের রাজা মুন্সি প্রেমচাঁদকে জানেন, তাঁর ছেলে অমৃত রায় বিস্তর নোট নিচ্ছেন ছবি সম্পর্কে। ক্ষণে ক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়ছেন কোথাও, ধীরে সুস্থে আনন্দ-স্নান করে চলেছেন যেন রসসমুদ্রে। আমি এক পাক ঘুরে দেখে নিয়েছি ইতিমধ্যে। আবার এসে ঐ দলে জুটেছি। দোভাষি অবাক—তাদের বলবার আগেই পরিচয় দিচ্ছে। অনেক ছবির; যেটা অতি উপাদেয়, রসিক বান্ধবদের টেনে দাঁড় করাচ্ছে তার সামনে। দুই চোখের অপলক সুধাপান—বর্ণনা দিয়ে কি বোঝাব ছবির কথা। পুরানো আর আধুনিক সকল রকম পদ্ধতিতে ছবি এঁকেছে। গ্রামে গ্রামে ছড়ানো লোকশিল্প থেকে অনুপ্রেরণা নিচ্ছে—সর্বক্ষেত্রে তার পরিচয়। আর ঐ যে ওদের নিয়ম, অকেজো বলে কোন জিনিস বাতিল হবে না—ছেঁড়া কাগজ আর টুকরো কাপড় নানান কায়দায় জুড়ে একটু-আধটু তুলির পোঁচ টেনে পুতুল, জানলার পর্দা, ফুলদান আরও কত কি শিল্পবস্তু বানিয়েছে। উডকাটই বা কত রঙের, আর কত রকমের। দেখে তাজ্জব। নতুন-চীনের আশা-আকাঙ্খা ও সংকল্প ছবি করে ফুটিয়ে তুলেছে। কুঁড়ে মানুষ, পরের উপর নির্ভর করে বাঁচতে চায়—আজকের দিনে তার লাঞ্ছনার অন্ত নেই; জনতা টিটকারি দিচ্ছে, মাথা নিচু করে আছে লোকটি—টিটকারির কথাগুলো যেন কানে শুনতে পাচ্ছি জনতার ভাবে-ভঙ্গিমায়।...ভূমি-সংস্কার হয়েছে-চাষী এবারে জমির মালিক, ঢাকঢোল বাজছে—সেকালের বাতিল দলিলপত্র স্ফূর্তিতে ছুঁড়ে দিচ্ছে আগুনে।...একটা মজার ছবি—সরল গ্রামবাসীরা ভোট দিতে এসেছে গ্রাম-সমিতি নির্বাচনে, প্রার্থীরা সারি সারি দাঁড়িয়ে—পিছনে ভোটের বাক্স, কোন বাক্সে ফেলবে ভাবছে ভোটদাতা।...আপোসে মামলা মিটিয়ে নিচ্ছে—আর ওরা মামলা করে উৎসন্নে যাবে না...শ্রমিকরা নৈশ বিদ্যালয়ে যাচ্ছে।...লড়াইয়ের দুর্দিনে বাচ্চা ছেলেদের শুকনো কুয়োর মধ্যে সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখছে এক মা-জননী...

নাঃ, খাটিয়ে মেরে ফেলবে! এই ছবি দেখিয়ে আনল—রাত্রে আবার অপেরা। নাচ-গান-অভিনয়—হাজার বছরের ঐতিহ্য এর পিছনে। যে সব মানুষ

অনেক কাল আগে অতীত হয়ে গেছে, তারাই রূপে উল্লাসে ঝলমল করে দাঁড়াল স্টেজের উপর। পুরানো চীনকে এরা একটুও ভোলে নি নতুন কালের ডামাডোলের মধ্যে। অপচয় ও বাহুল্যের বিরুদ্ধে এত জেহাদ— অপেরার ব্যাপারে কিন্তু দরাজ ব্যবস্থা। আলো, সাজপোশাক, বাজনা, দৃশ্য-পট—টাকা ধুলোর মুঠোর মতো ছড়িয়েছে। পরে আরও অনেক পালাও নাচ দেখেছি—পুরানো বনেদের উপর আধুনিক পালাও অনেক গেঁথেছে। চীনের এই নাচ অপেরা নমো-নমো করে সারবার বস্তু না, মউজ করে বসা যাবে আর একদিন কি বলেন?

(১৮)

শহর তোলপাড় বার্ষিক উৎসবের আয়োজনে। কাগজে পড়ছি, শুধু পিকিন শহর নয়—সারা চীন মেতে উঠেছে। ১লা অক্টোবর কাল। দেশের দূরতম প্রান্ত থেকে জনস্রোত অবিরল এসে পড়ছে। বাইরে থেকেও আসছে। তামাম দুনিয়ার যাবতীয় যানবাহনের বুঝি একটি লক্ষ্য—পিকিন।

সন্ধ্যায় ভোজ। ভোজ তো হামেশাই হয়ে থাকে—সে এক ভয়ের বস্তু। কিন্তু আজকে বড় স্ফূর্তি! চীন দেশটাই ধরুন ছোটখাটো এক পৃথিবী—উৎসব বাবদ তার সকল অঞ্চলের মাতব্বরা এসেছেন, তাঁরা খাবেন। যত দূতাবাস আছে ঢালাও নিমন্ত্রণ সকলের। আর তাবৎ দুনিয়ার শান্তি-সৈনিক আমরা তো আছিই। পৃথিবীর মানুষ পাশাপাশি পাত পাড়ব—নানান জাত নানান ধর্ম নানার ভাষার মানুষের একসঙ্গে পঙক্তি ভোজন।

খাওয়াচ্ছেন মাও-সে-তুং। ঐটে ভেবে দমে যেতে হয়। ভদ্রলোকের অবস্থা সুবিধের নয়—আমাদের অনেকের চেয়ে গরিব। মাইনে সর্বসাকুল্যে আটশ' (ইয়ং হিসাব দিল, জন তিনেকে আমরা কষে দেখলাম শ' আষ্টেকের বেশি আমাদের টাকায় কিছুতেই ওঠে না)। তাও শুনলাম, দিবারাত্রি হাড়ভাঙা খাটনি খেটে—রাত্রি একটা-দুটোর আগে কোনদিন শোওয়া জোটে নি। ঐ মাইনের ভিতর যাবতীয় ঠাটবাট বজায় রাখতে হয়। অতএব খান দুই-তিন ঘর নিয়ে বাসা, চৌপায়ায় শয্যা—আর অধিক কুলিয়ে ওঠে কি করে? এর চেয়ে প্রথম বয়সের পিকিন য়ুনিভারসিটির চাকরিটাই বোধ হয় ছিল ভাল। লাইব্রেরির কাজ করতেন ওখানে। আসল লাইব্রেরিয়ান নন। সহকারীদের একজন। ছাত্র ছাত্রীরা ডেকে ডেকে দেখায় আজকে, এখানে বসতেন আমাদের মাও-তুচি, এই টেবিলে লেখাপড়া করতেন। সে আমলে যেমনটি ছিল আসবাব পত্র ঠিক তেমনি ভাবে রাখা আছে। ওদের ম্যাগাজিন আছে—যেমন থাকে কলেজে ইস্কুলে। ম্যাগাজিনের জন্য লেখা চেয়ে পাঠিয়েছিল ওরা মাও-র কাছে।

আপনি পুরানো লোক এখানকার, সাহিত্যিক মানুষ—দিন আমাদের কাগজে একটা লেখা। মাও তাঁর জবাব দিয়েছেন, সময় কোথায় ভাই? সাহিত্যের পাট চুকিয়ে দিয়েছি। তোমাদের দিনকাল তোমরাই লাগো। সেই চিঠি ওরা সগর্বে দেখায় বিদেশি আগন্তুক যারা য়ুনিভার্সিটি দেখতে আসে।

তা সত্যি, ওদের মাও-তুচি সাহিত্যিক হিসাবেও খুব বড়—উঁচু দরের কবিতা-লিখিয়ে। রাজনীতির তালে না গেলে শুধু সাহিত্য করেই দেশ-বিদেশে নাম করতেন, দিব্যি বহাল-তবিয়তে থাকতেন। কিন্তু কপালের গেরো, তাছাড়া আর কি বলি! গুহার ইঁদুরের মতো উত্তর-চীনের পর্বতরন্ধ্রে কাটিয়েছেন কত কাল। যাতে ওঁদের বুলেটিন ছাপা হত সেই যন্ত্র, আর কিছু পরিমাণ সেই বুলেটিন মিউজিয়ামে রেখে দিয়েছে। দেখে হাসি ঠেকানো দায়। প্রথম স্ত্রীটাকে তো জ্যান্ত কোতল করল কুয়োমিনটাঙের লোকেরা; দ্বিতীয় স্ত্রী মরলেন আকাশের বোমায়। ঐতিহাসিক লং-মার্চের দলবল যখন অতি-দুর্গম দক্ষিণ পথে ধাওয়া করেছে, সেই গোলমালের মধ্যে খতম হল দুটো ছেলে। তা বেশ—অনেকখানি হাত পা-ঝাড়া অবস্থা বলতে হবে মাও-র।

আর, কাকে ছেড়ে কার কথাই বলি! খোদ কর্তা মশাই ঐ প্রকার, তা হলে মেজো-সেজোদের দশা আন্দাজ করে নিন। চাউ-এন-লাই, চু-তে ইনি প্রিমিয়ার, উনি কমাণ্ডার-ইন-চীফ—শুনতে ভারী ভারী, বেতন কুলো ছ-শ তঙ্কা। আমাদের আধা-মন্ত্রীদের ওর বেশি মাইনে দিয়ে থাকি। সুন-চিন-লিং ডক্টর সান ইয়াৎ-সেনের বিধবা। কচি কচি চেহারা আগুনের মতো দেহজ্যোতি—তিরিশ পেরিয়েছে কে বলবে? নতুন-চীনের জননী তো বটেই জগজ্জননী বলে ডাক পড়তে ইচ্ছে করে। তা সে যা-ই হোন রাজধানী পিকিনের বাস্ত দেড়খানা ঘর নিয়ে। সাংহাইয়ে সান ইয়াৎ-সেনের বাড়ি দেখেছি (এক বন্ধুর দান অবশ্য)। দোতালা বাড়ী, একটু লনও আছে—আশেপাশের বিশ-পঁচিশ তলা বাড়ি গুলোর সঙ্গে তুলনীয় না হলেও মোটের উপর ভালোই, ছবির মতন। কিন্তু ম্যাডামের ফুরসত কোথা সেখানে যাবার? অহোরাত্রি মাত্র চব্বিশ ঘন্টার না হয়ে যদি আটচল্লিশ ঘন্টার হত, তবে বোধ হয় দুনো খেটে ওঁরা আরও কিঞ্চিৎ সুখ করে নিতেন। এ চিত্র আমাদের অজানা নয়। মহাত্মা জীবনে হাঁটু ঢেকে কাপড় পরতে পারলেন না, দিল্লি এসে জায়গা হত ভাঙি-বস্তির মধ্যে। কিন্তু স্বাধীন-ভারতে চটপট ভোল পালটে ফেলেছি। পারেন তো কোনো ঐতিহাসিক লিখে রাখুন গে সে সব দিনের কথা, ভবিষ্যতে ছেলেরা পড়বে।

সন্ধ্যাবেলা ওঁরা খাওয়াবেন। দুপুরটাই বা ন্যাড়া যায় কেন? পাকিস্তান

তাঁদের খাইয়ে দিই আমরা। আপত্তি কি, যখন স্রেফ মুফতে খাওয়ানো চলে এক আধেলা খরচ-খরচা নেই। ওঁরা চাইবেন না আর আগ বাড়িয়ে কড়ি গুনে দেবে এমন আহাম্মক কে আছে কলিযুগে!

চিরকাল একসঙ্গে ঘরবসত—আজকেই ভিন্নভাগ হয়ে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান দু-এলাকার মানুষ হয়ে দর্শন দিয়েছি। দেশে থাকতে দশ জনে দশ রকম কথায় জাতিয়ে তোলে, বিদেশে-বিভুঁয়ে সেই দশম অবতারো নেই। খেতে খেতে অতএব মন খুলে সুখ-দুঃখের কথা চলল। এরোড্রাম অবধি ভারতীয়েরা গিয়েছিল পাকিস্তানিদের ডেকেডুকে আনতে। মন কেমন করে উঠল ভাই, মাঠের প্রান্তে আপনাদের দেখে। কত দেশের মানুষই তো এসেছে—কই, আ নারা চুপ করে ঘরে থাকতে পারলেন না তো আর সকলের মতো!

বলছিলেন—ভদ্রলোকের নাম পাওয়া গেল—মুজিবর রহমান। এই নাম তো জান আওয়ামি লীগের সেক্রেটারির, মানুষ পাগল করে তোলেন নাকি তিনি মিটিঙে! এই এক ছোকরা, এমন সারল্য কথাবার্তায়—নাম ভাঁড়িয়ে বলছেন না তো?

কিন্তু পরিচয়গুলো মুলতুবি থাক আপাতত। জরুরি চিন্তা মগজে। পরশু থেকে শান্তি-সম্মেলন। বহুতর উৎকৃষ্ট জবান ছাড়া হবে বিশ্বজনের হিতার্থে—ঘরে ঘরে নিশিরাত্রে বক্তৃতার মক্স চলছে, অনুমান করি। আর খোদার জীব আমরাও সেই ডামাডোলে নিতান্ত অবোলা হয়ে থাকব না। কিন্তু তোড়ের মুখে হঠাৎ যদি কেউ বলে বসে, বাপু হে, ঘর সামাল করে তারপর পরের ভালো কপচাতে এসো! হিন্দুস্থান-পাকিস্তানে তোমরা যে পায়তারা ভেঁজে বেড়াচ্ছ, সেইটের ফয়সালা আগে করো দিকি।

মিলেছি যখন এই কল্যাণ-পরিবেশে, উপায় কিছু বাতলাবই। মারামারি কাটাকাটি করে যে সুহৃৎবর্গের গোপন আনন্দ জুগিয়েছি, ভাব করে ফেলে তাদের মুখে কাষ্ঠহাসি ফোটাব। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া নিজেরাই মেটাব—বাইরে কেউ নাক গলাতে এসেছে কি নাক কেটে শূর্পণখা বানিয়ে দেব নির্ঘাত।

সত্যি, কি মিষ্টি লাগল যে সকল কথাবার্তা! মিষ্টি লাগল সেই ভোজের ঝাল দোলমা অবধি (লঙ্কার ঝাল-লংকার খোলে মাংস ইত্যাদির পুর)। দইকে বলে সাওয়ার-মিল্ক (sour milk)—ভোজের টেবিলে সেই দইয়েও যেন মধু ছিল সেদিন!

সন্ধ্যায় অনেক ধকল আছে—বিকালের বক্তৃতাদি থেকে রেহাই পাওয়া গেছে তাই আজ। দেদার ছুটি—কি করা যায়? আবার কি—ঘুরে ফিরে দেখে

বেড়াও কালকের উৎসব-ব্যবসাদি। দেখে দেখে সাধ মেটে না। বেলাবেলি কিন্তু ফেরা চাই হে—সেজেগুজে যে যার ঘরে বসে থাকবে, পাক্কা ছ'টার সময় বাসে পুরে ওঁরা অকুস্থলে চালান দেবেন। সবে তিনটে বাজল—ছ'টার অনেক দেরি। চলো।

সাহস কি পরিমাণ বেড়ে গেছে, শুনুন। আমার ধুতি-পাঞ্জাবিতে দৃষ্টি দিলে রক্ষে নেই—তেড়ে তেড়ে ধরছি তাদের। হাত টেনে নিয়ে শেকহ্যাণ্ড করি: —হিন্দি, হিন্দি। ভালবাসা কুড়িয়ে টহল দিচ্ছি পিকিনের রাস্তায় রাস্তায় রাজচক্রবর্তীর মতো।

কাল জাতীয় উৎসব—যেদিকে তাকাই তারই আয়োজন। মানুষের অন্য ভাবনা-চিন্তা লোপ পেয়ে গেছে। মরা-চীন নবীন মন্ত্রে মেতে উঠল এমন-দিনে তিনটে বছর আগে। নেপোলিয়ন সেই যে বলেছিলেন—'চীন? ঘুমন্ত দৈত্য পড়ে থাকুক অমনি ঘুমিয়ে। জেগে যদি ওঠে—আরে সর্বনাশ! তামাম দুনিয়ার ঝুঁটি ধরে ঘুরপাক খাওয়াবে।' সেই কাণ্ডই ঘটে গেল শেষ পর্যন্ত।

লাল সিল্কের উপর সোনার হরফ বসিয়ে যাচ্ছে। মূর্খ মানুষ—পড়বার ক্ষমতা নেই। কি হে, কি এত লিখলে বলো দিকি? একটুখানি পড়ে মানে বলে দাও। 'চিরকাল বেঁচে থাকুক আমাদের এত সাধের নবীন-চীন; দশ হাজার বছর বেঁচে থাকুন আমাদের মাও-তুচি...'

মাও-তুচি মানে হল চেয়ারম্যান মাও। কণ্ঠের সমস্ত মধু ঢেলে দিয়ে ওরা উচ্চারণ করে। কেন জানি আমার মনে হত, প্রীতি বা শ্রদ্ধা তত নয়—বাৎসল্যের রসে কানায় কানায় ভরা কথা দুটো। চীনের তাবৎ মেয়ে-মদ্দ বাচ্চা-বুড়ো মাও সে-তুঙের মা বনে গিয়েছে। আহা, বিস্তর কষ্ট পেয়েছ তুমি মাও —আর নয়, সর্বসুখ ও শান্তি আসুক এবার জীবনে। কোটি কোটির মনে অহোরাত্রি ঐ একটি কামনা।

আলো, ফুল, পাঁচ তারার রক্তনিশান, পীচবোর্ডের পায়রা—যেখানে চলে, সমস্ত খাটিয়ে ফেলতে হবে সন্ধ্যার আগে। আনন্দ-সজ্জায় ত্রুটি না থাকে কোন রকম। রাত্রে আজ বাড়িতে বাড়িতে ভোজ। বিয়ের আগে অধিবাসের মতন উৎসবের শুরু সন্ধ্যা থেকেই বলতে পারেন।

তিয়েন-আন-মেন—স্বর্গীয় শান্তির দরজা—নতুন গাঁথনি হয়েছে তাঁর এদিকে-সেদিকে, নতুন করে রং ধরিয়েছে। হামেশাই এ পথে গতায়াত—সকালে, সন্ধ্যায়, দুপুরে, কখনো বা রাত-দুপুরে। দিনে দিনে তিয়েন-আন-মেনের নতুন বাহার খুলছে। শরতের রোদে সমস্তটা দিন ঝিকমিক করে, আলো যেন ঠিকরে বেরোয়। শান্তির দরজা—তাই বটে! সুবিশাল অলিন্দের নিচে

বড় দুয়ারটা খুলে ফেললেই বুঝি বিক্ষোভ-বেদনার সীমান্ত-পারে নিশ্চয় মহিমময় শান্তি! দরজা ও পরিখা ইত্যাদির সামনের দিকটা বড় রাস্তা—পিকিনের চৌরঙ্গি বলতে পারেন। তার ওধারে অনেকগুলি পার্ক—পাঁচিল ভেঙে একসা করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত মিলে পিপল্‌স্ পার্ক। ভেঙে চুরে প্রতি বছরই জায়গা বড় করা হচ্ছে, এবারও হয়েছে, নইলে কুলোয় না। সবুজ ঘাস বসানো হয়েছে পার্কে, আর দূরতম প্রান্তে নানা রকম ফুল! কত ফুল ফুটে আছে, দুলছে হাওয়ায়।

সারারাত আলো-আলোময় করে রাখে উৎসব-ক্ষেত্র। তিন শ' কুড়িটা জোরালো বাতি—সিনেমা-স্টুডিয়োয় যে ধরনের বাতি লাগে। গেল-বছর যা ছিল, তা থেকে একশ' কুড়িটা বেড়েছে। মহাচীনের বহু কোটি মানুষের প্রত্যাশা কেন্দ্রিত যেন এই একটি জায়গায়। এ আলো সরিয়ে নেওয়া হবে না উৎসব অন্তে। বছরের প্রতিটি রাত্রে জ্বলবে।

শহর উৎসব সজ্জা পরেছে। কাল যা দেখেছি, সকালবেলা দেখি ভিন্ন এক রূপ। এখন আরও চমকদার। আর এই শহর জায়গা বলে নয়—শুনতে পাচ্ছি, কাগজে পড়ছি, দেশের তামাম জায়গা জুড়ে এই কাণ্ড।

দোকানের সামনে দরজায় দরজায় লাল সিল্কের গেট বানিয়েছে। চীনের ঐ চিরকালের রেওয়াজ—আমোদ-স্ফূর্তিতে এন্তার লাল সিল্ক ওড়ায়। আর বিশ-তিরিশ হাত অন্তর লাউড-স্পীকার। চতুর্দিক গমগম করছে। উৎসবের বাজনাবাদ্য এবং হৈ হুল্লোড় ঘরে বসেই কানে যাবে। কিন্তু যা কাণ্ড—ঘরে থাকবে কি একটা মানুষ কালকের দিনে?

শান্তি-সম্মেলনে দেশ-দেশান্তরের মানুষ আসছে। জল স্থল আকাশ—সকল পথে আনাগোনা। আসছে এখনও—ঐ যে ইয়ং-পায়োনিয়ররা এবং এক গাদা ফুলের তোড়া বাস বোঝাই হয়ে চলল এরোড্রোমে কিংবা রেল-স্টেশনে। উঃ, এতও পারে মানুষ! হরবখত অভ্যর্থনা! একটা দল আছে শুধু অভ্যর্থনা করতে। কদ্দিনে ফুল যা খরচ হল, শুধু সেই হিসাবটা ধরুন না! জমিয়ে রাখলে এক-পাহাড় হয়ে যেতো।

দেশে দেশে মানুষের কত রং রূপ চেহারা পোশাক এবং মেজাজ থাকতে পারে, এখন এই পিকিন শহরে পাদচারণা করেই অনেকটা আন্দাজ পেয়ে যাবেন। আর বাইরের মানুষ বলে কেন চীন—একাই তো প্রায় এক পৃথিবী। পাঁচ হাজার বছরের পাকা ইতিহাস আছে, সেই গুমরে-তো বাঁচেন না। কিন্তু মরুজঙ্গল ও গুহান্ধকারে হেন জাতও আছে, এই সেদিন অবধি যারা হাজার পাঁচেক বছর পিছনে ছিল। এখন অবস্থা পালটেছে অবশ্য—তারা আলোর

এসেছে। চীনা মহাজাতির সমান হকদার—আর দশটা মানুষের সঙ্গে তাদের সমান ইজ্জত।

আসছেন তা-বড় তা-বড় বীর—কৃষক বীর, শ্রমিক বীর। কোরিয়ার যুদ্ধে যারা ভলান্টিয়ার হয়ে গেছে, মেয়েরাও আছে তার মধ্যে—তাবৎ বিশ্বজনের কাছে তারা লড়াইয়ের টাটকা খবর ও চোখে-দেখা বৃত্তান্ত নিবেদন করবে। ইংরেজি নিউজ-রিলিজ ও সাংহাই-নিউজ দিয়ে যায় আমাদের রোজ। তার মধ্যে দেখতে পাই, পাল্লা চলেছে ফ্যাক্টরিতে ফ্যাক্টরিতে। উৎসব-ক্ষণে কাজের পরিচয় দিতে হবে না? প্রাণপাত করে খেটেছে—যে কাজ এক বছরে করবার কথা, আট মাসে তা সেরেসুরে বসে আছে। কাজ দাও, আরও কাজ, আরও পয়লা অক্টোবর তাদের পরম প্রিয় মাও তুচিকে দেখাতে চায় কে কি করেছে দেশের জন্য। মাও, তোমার পিছনে আছি আমরা—চীনের আবাল-বৃদ্ধ সকলে। তুমি যা চেয়েছ তারও এগিয়ে আছি, এই দেখ।

জিনিসপত্রের বেচাকেনা অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। পূজোর বাজার আর কি! আমাদের কলকাতায় এই হপ্তাখানেক আগেও যেমনটা ছিল। অনেক দুঃখ-ধান্দার পর দিন পেয়েছে—ঐ পরম-দিনে জগৎবাসীর সামনে সেজেগুজে জীবন-তারা অসামান্য হয়ে দাঁড়াবে। দাঁড়ানো বলি কেন—নেচে বেড়াবে, অফুরন্ত প্রবাহে ভেসে ভেসে বেড়াবে। দিকে দিকে তার আয়োজন।

ঘুরতে ঘুরতে মনের মধ্যে কেমন করে ওঠে। কি মাতামাতিটা করেছিলাম সাতচল্লিশ সনের পনেরই আগস্ট দিনটায়। তার পরে মিইয়ে এলো বছরের পর বছর। রীতরক্ষার মতো এক একটা নিশান—তাই বা তোলে ক'জন! মনে থাকে না তারিখটা।

হোটেলের দরজায় কুমুদিনী মেহতা। দরজা থেকে নেমে লনের এদিক-ওদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক একবার দেখে আসছেন।

শিগগির তৈরি হয়ে আসুন। দু-মিনিটের মধ্যে।

ছ'টার দেরি আছে এখনো—

হাতমুখ নেড়ে কথা বলা শ্রীমতীর অভ্যাস। সেই ভঙ্গিতে বললেন, সময় বদলে গেছে। খবর পাঠিয়েছে, রওনা হতে হবে সাড়ে-পাঁচটায়। দুঃখ প্রকাশ করেছে এই গোলমালের জন্য।

কিন্তু সময় আছে মনে করে যারা না ফিরবেন?

যাওয়া হবে না তাঁদের—

রায় দিয়ে তর-তর করে তিনি উপরে উঠে গেলেন। সময়-বদলের খবর চাউর হয়ে গেছে এদিকে। হন্তদন্ত হয়ে সবাই ছুটছেন। একে দুয়ে তৈরি হয়ে

নামতে শুরু করলেন আবার। নেমে এসে হলের ভিতর দাঁড়াচ্ছেন। সময় অতি-সংক্ষিপ্ত—এরই মধ্যে যেটুকু পারা গেছে। হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ক্রিম ঘসছেন—টেড়ি ঠিক করছেন কেউ কেউ। যে বঙ্গনন্দনকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোট-প্যান্ট ছাড়তে দেখি নি, তিনি দেখি ধুতি-কামিজে সেজেছেন, স্কন্ধোপরি শাল। মেয়েদের তো চেনাই দায়—এক একটি পটের পরী হয়ে আসছেন বাহারের সাজ-পোশাকে। ক্ষিতীশ বলে, কত শাড়ি বয়ে এনেছে রে বাপু, ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলানোর জন্য। তা দোষ দিলে হবে কেন—পাগড়ি বিহনে পেয়াদা অথবা খোলা বাদ দিয়ে চিংড়িমাছের কি বাকি থাকে বলুন? মুখের বাকা শুনে বিতৃষ্ণা ধরলেও ঐ সাজের দৌলতে লোকে সিকি মিনিট কাল চেয়ে থাকবে অন্তত। আজকের এই সব শাড়ি এত দিনের মধ্যে অঙ্গে ধরেন নি—তোলা ছিল পরম-দিনের জন্য। চাট্টিখানি কথা নয়—মাও-সে-তুঙের সঙ্গে এক ঘরে বসে খেতে হবে। আরও যদি কপালে থাকে, তিনি হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন শেকহ্যাণ্ডের জন্য। কিছু বলা যায় না। হাতের তলায় একটু ক্রিম ঘষে নেবেন নাকি? আমার পোশাকের কিঞ্চিৎ রকমফের আছে। বিলকুল সাদা। সাদা ধুতি পাঞ্জাবি এবং ধবধবে আলোয়ান। বলতে পারেন, কালো কালো হাত দুখানা ঐ যে বেরিয়ে রইল সাদা হাতা উত্তীর্ণ হয়ে। ছন্দপতন ঠিকই—কিন্তু আমি তার কি করতে পারি বলুন। স্রষ্টা যে অনেক উর্ধ্বে থাকেন—কৃষ্ণ হাতের নাগালের ভিতর থাকলে উত্তম রূপ পরিচয় করা যেত।

সুরলোকের ক্রিয়াকর্মে নারদ ঢেঁকি চড়ে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করতেন—আজকের ব্যাপারেও প্রায় তাই। পাইকারি নিমন্ত্রণ সকলের। আর এক তাজ্জব—এত নিমন্ত্রণ পত্র গিয়েছে, সমস্ত হাতের চিত্রকর্ম—মাও-সে-তুঙের সই প্রত্যেকখানা চিঠিতে।

হোটেল থেকে সারবন্দি মোটরগাড়ি আর বাস চলল নিমন্ত্রিতদের নিয়ে। ডক্টর জ্ঞানচাঁদের পাশে আমি। জাঁদরেল পণ্ডিত, ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন—প্রদীপ তুলে তাঁকে আমি আর কি দেখাব!

জ্ঞানচাঁদ বলেন, এক আই, সি, এস, সাহিত্যিক আছেন বাংলায়—হ্যাঁ, হাঁ, অন্নদাশঙ্কর রায়ই বটে! তাঁকে আমি জানি। লেখেন কেমন? তিনি এলে বেশ হত। মতামত যা-ই হোক, চোখ মেলে দেখলে তবে বিচারের সুবিধা হয়।

জনারণ্য পথের দু ধারে। কি করে অভিনন্দন জানাবে ভেবে পায় না। উল্লাস ফেটে পড়েছে তাদের চোখে মুখে। তাই তো ভাবি, কোন সে মন্ত্র যাতে সকল বয়সের মানুষকে মাতোয়ারা করে দেয়! মহাচীন, অতুলন তোমার

প্রাণ-শক্তি—আশ্চর্য গতিতে এগিয়ে চলেছ সকল দিকে। সমস্ত মানি। কিন্তু আনন্দের যে প্লাবন দেখে এসেছি দেশের সর্বপ্রান্তে, সমস্ত কর্মোদ্যম ছাপিয়ে তারই হাস্যধ্বনি আজ এই লিখতে লিখতে আমার কানে বাজছে।

সেক্রেটারি-দলের একজন হলেন ধর। উপাধি দেখে আন্দাজ হয়েছিল বাঙালি, ডক্টর নীলরতন ধরের জ্ঞাতগুষ্টি কেউ হবেন বা! তা নয়, পাঞ্জাব-পুঙ্গব। এক তাজ্জব, হাসতে দেখি নি ভদ্রলোককে। হাসতে জানেন না, তা বলি নে; কিন্তু দগ্ধ চক্ষুর দর্শন-ভাগ্য হয় নি। চলতি বাসের মধ্যেই তিনি তালিম দিয়ে যাচ্ছেন সেই থেকে। নিমন্ত্রণ-চিঠি আছে তো সকলের সঙ্গে? ভাল করে দেখে নিন! পরখ করবে ওরা তন্নতন্ন করে, নামধাম দেখবে। আর আলোয়ান-ওভারকোট ইত্যাকার জবড়জং বস্ত্র নিয়ে ঢোকা যাবে না, বাইরে রেখে যেতে হবে···

ভয় ধরিয়ে দিলেন দস্তুরমতো; গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে শুনতে শুনতে। মাও-এর সঙ্গে এক দালানে ঢুকবার আগে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি সার্চ হবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই! কি প্রক্রিয়ায় কতক্ষণ ধরে চলবে, সেই এক ভাবনা। অবস্থা গতিকে দোষও দিতে পারি নে। নতুন-চীন চক্ষু-শূল অনেকেরই। গোটা দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চল জুড়ে সাধুজন জগদ্ধিতায় দল পাকাচ্ছেন গা-ঢাকা দিয়ে। দুটো বছর আগে পঞ্চাশ সনের উৎসব-দিনে নায়কগণ সহ গোটা তিয়েন-আন-মেন ডিনামাইটে উড়িয়ে দেবার নিখুঁত ব্যবস্থা হয়েছিল—ব্যবস্থাপকরা তৎপূর্বে শুভার্থীর ভেক ধরে রাজ্যের আতিথ্য ভোগ করছিলেন। আজকের এই অতিথি-পল্টনের ভিতর থাকতে পারে তাদের চেলাচামুণ্ডা শিষ্য-সাগরেদ কেউ কেউ। মুখে হাসি—পকেটে পিস্তল, অসম্ভব কিছু নয়। সন্তর্পণে আমি পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। সকালবেলা নখ কেটেছিলাম—ব্লেডখানা রয়ে গেছে। সকলের অলক্ষ্যে ফেলে দিলাম সেটা— অস্ত্র রাখার দায়ে না পড়ি।

নিষিদ্ধ-শহরের এলাকা। আগের দিন হলে আপনার আমার শতেক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। খান পনেরো বাস আমাদের নিয়ে সারবন্দি মস্ত বড় কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকল। আরও কত মোটর, কত বাস এসে জমেছে। গাছে গাছে ভরা বিশাল চত্বর—বিস্তীর্ণ লেক একপাশে। জোরালো আলো দিয়েছে গাছের মাথায়—আলো ঝলমল করছে লেকের জল। গাড়ি চলছে কি না চলছে—অত্যন্ত মৃদু গতিতে চলেছে লেকের কিনারা ধরে।

বাস থেকে নেমেও অনেকখানি পথ। একের পিছনে আর একজন—চলেছি তো চলেইছি। পাঁচ-সাত গজ অন্তর ফ্লাশ-আলো—একেবারে দিনদুপুর বানিয়ে

তুলেছে। নিশ্চল দুটো সৈন্য—একের হাতে বন্দুক, অন্যের কোমরে রিভলবার মানুষ না পুতুল—নেড়েচেড়ে দেখতে ইচ্ছে করে। আর একটু এগিয়ে যেতে—ওরে বাবা! হাজার খানেক হাত শানিয়ে আছে শেকহ্যাণ্ডের জন্য! বিদেশ-বিভূঁইয়ে এবারে প্রাণটা গেল। প্রাণ না-ই যদি যায়—এ হাতে খাবার তুলে ভোজ খাব, তার কোন আশা নেই।

এমনি করে অসংখ্য জাতি ও অগণ্য মানুষের প্রীতির পথ বেয়ে এসে পড়লাম সুবিশাল হলঘরে। আজকে ভোজনাগার—পরশু থেকে শান্তি-সম্মেলন বসবে এখানে। রাজসূয় ব্যাপার—বর্ণনা পড়ে হেন বস্তু ধারণায় আনা যায় না। লম্বা টানা টেবিল সারি সারি চলে গেছে! একটু আধটু ব্যাপার! হাঁটুন না টেবিলের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। পা টনটন করবে। আর টেবিলের উপর থরে থরে সাজানো যাবতীয় খাদ্য ও পানীয়। গণে দেখলাম পঁচিশ পদ তো হবেই। টেবিলের দু'পাশে নিমন্ত্রিতেরা লাইনবন্দি দাঁড়িয়েছেন। বসবার ব্যবস্থা নেই—খেতে হবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বুফেঁ ডিনার বলে এমনি অবস্থায় খাওয়াকে। আগের দিককার জায়গা বেবাক ভরতি—সুইং ঠেলতে ঠেলতে আমাদের নিয়ে চলল। চলেছি তো চলেইছি। 'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী ?'

কিচলু দলপতি। তাঁকে রেখে দিল এদিকে—কর্তাদের সঙ্গে মোলাকাতের প্রয়োজন হবে। আর নিরামিষাশী যাঁরা—রবিশঙ্কর মহারাজ, যোশি, হোসেন, মালবীয়—এঁদের জন্য আলাদা রকমের সাত্ত্বিক বন্দোবস্ত। বন্দোবস্ত করে এ-দলেও যদি জুটতে পারতাম! পাকিস্তানিরা পিকিনে পরে এসেও, দেখা যাচ্ছে, অধিক এলেমদার—ঠিক সময়ে এসে উত্তম জায়গা বাগিয়ে বসে পড়েছেন। আর আমরা চলেছি, চলেছি—এবং চলেছি দূরপ্রান্তের এক রঙিন দেয়াল লক্ষ্য করে।

ঠিক সাতটায় মাও-সে-তুং এলেন। সঙ্গে তাবৎ নায়কবৃন্দ। চোখে কি আর দেখেছি কিছু! কানের পর্দা-ফাটানো হাততালিতে বোঝা গেল, এসেছেন এইবার। হাজার খানেক আমরা—বেশি হবে তো কম নই। নানান চেহারা, রকমারি সাজ-পোশাক। আর অগণিত ফ্লাশ-আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠছে, ক্লিক-ক্লিক—ফোটো তুলছে এদিক-ওদিক থেকে, ফ্লাশ-আলো নিবিয়ে দিচ্ছে তারপর। খর বলেছিলেন, নিমন্ত্রণ-পত্র দেখবে সার্চ করবে হলে ঢুকবার আগে। রামো! দ্বারে ঐ তো যাত্রাদলের দুই কাটা-সৈনিক, আর তাবৎ লোক এদিকে শেকহ্যাণ্ড ও হাততালিতে ব্যস্ত। অত হাঙ্গামের ফুরসত কোথা? এই তো এলাহি ব্যাপার অতি উৎসাহীরা খাবার ঠেলেঠুলে সামনে ধাওয়া করছেন

ভাগ্যবশে ফোটো উঠে যায় যদি কোন কর্তাব্যক্তির পাশে। নিদেন পক্ষে গা-ছোঁয়াছুঁয়ি হতেও পারে! আমার ভয় ভয় করছে—এলাকাড়ি এতদূর ভাল নয় বাপু, কিঞ্চিৎ ফাঁকে-ফাঁকে থাকো। সকলের লাথিঝাঁটা খাওয়া জাতটা মাথা খাড়া করে দাঁড়াচ্ছে—বহুত জনে মুখে সাবাস দিচ্ছেন, মনে মনে কিন্তু মোটেই ভাল ঠেকছে না।

সামনের দেয়াল ঘেসে উঁচু প্লাটফর্ম। ফুলে ফুলে অপরূপ। আটত্রিশটা দেশের নিশান সাজানো গুচ্ছ রূপে। নিশানগুলোর উপরে শিল্পী পিকাসোর আঁকা শান্তির পারাবত। এরই উপর নাজিম হিকমত কবিতা ফেঁদে বসলেন:

আটত্রিশটা নিশান হলের ভিতর—
মহীরুহের যেন আটত্রিশ শাখা।
শাখাদলের মধ্যে পাখা ঝাপটায়
শান্তির শ্বেত-কবুতর।

আন্দাজ করেছিলাম, উঁচু জায়গাটা মাও-সে-তুঙের জন্য। ভাল করে তাঁকে দেখবে সকলে। তা নয়, শুধু পতাকা ঐ জায়গায়।

বাজনা, আলো আর হাততালি। কি এক ব্যাপার চলছে, একজনে একরকম বলে! মাও এবার করমর্দন করছেন নানান জায়গায় মাতব্বরদের সঙ্গে··· সুন-চিন-লিং মেয়েদের মধ্যে চলে গেলেন······ চাউ-এন-লাই কিচলুকে কী বলছেন, ঐ দেখুন।

দেখছি না কোন কিছুই, শুধু অগণিত নরমুণ্ড।

এক ললনা—কোন দেশের জানি না, যেমন বেঁটে তেমনি মোটা—আকুলি-বিকুলি করছেন নজর খানেক মাওকে দেখে নেবার জন্য, একবার এদিক এক বার ওদিক যাচ্ছেন। মনে হয়, গড়িয়ে বেড়াচ্ছেন সুবিশাল এক পিপে। তার-পরে তাজ্জব কাণ্ড—সেই বস্তু টপাটপ দেয়াল বেয়ে অত্যুচ্চ এক কুলুঙ্গি মতো জায়গায় উঠে পড়লেন। রেলিঙ ধরে ঝুঁকে পড়ে দেখছেন। নিম্নস্থ আমাদের রক্ত হিম হয়ে গেছে। বোঝার ভারে রেলিঙ ভেঙে যাওয়া বিচিত্র নয়। ওজনে নেহাত তিনটি মনও যদি হন, মাথার উপর পতন হলে নির্ঘাত চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যাবো।

তারপর দেখি, যে যেমনে পারছেন—ঐ মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছেন। মেয়ে-পুরুষ কটা-কালোয় তফাত নেই। মানুষের আদিপুরুষ কারা ছিলেন, এতদ্দর্শনে আর সংশয় মাত্র থাকে না! হঠাৎ মালুম হল আমি শূন্যদেশে। দিব্যি করে বলছি, ইচ্ছে করে উঠি নি—পা দিয়েও উঠেছি কিনা সন্দেহ। দেয়ালে দেয়ালে ফুলের স্তবক ঝোলানো—তারই একটা দু-হাতে আঁকড়ে ধরেছি,

আর পায়ের ভর কাঠ পাথর কী মানুষের মাথার উপর—আজও তা সঠিক পারব না। দেখতে পেলাম মাওকে—স্পষ্ট দেখছি। আর দশজনের মতো নিচেই তাঁর আসন। প্লাটফরম আজকে শুধু পতাকার জন্যে—ব্যক্তি-মাণুষের চেয়ে পতাকা অনেক বড়।

বক্তৃতা করছেন মাও। চীনা ভাষায় বলছেন। রুশীয় এবং তার পর ইংরেজিতে তার তর্জমা হল। এক-একটা কথা—আর হাততালি ও আনন্দোচ্ছ্বাস।

'প্রিয় বন্ধুরা, সম্বর্ধনা জানাই সকলকে। মহাচীনের তৃতীয় মুক্তিবার্ষিকী এসে গেল। বিশ্বশান্তি ও লোকহিতের জন্য অতীতে আমরা কাজ করেছি, আগামী বছরে আরও অনেক কিছু করবার আশা রাখি।'

সর্বসাকুল্যে গোটা চারেক বাক্য। সবে ঘাম ঠেশান দিয়ে কান উঁচিয়ে জুত করে দাঁড়িয়েছি। বাস, খতম। বক্তৃতা ও তর্জমা ইত্যাদি নিয়ে সাকুল্যে মিনিট তিনেক। না মশায়, কথাতে ট্যাক্স লাগে যেন এদের! জওহরলালের রাজ্যের মানুষ—নিক্তি-মাপা কথায় আমাদের সুখ হয় না। অপচয় বন্ধ—তা বলে সভাস্থলের বক্তৃতাতেও?

একজন টিপ্পনি কাটলেন, ডালকুত্তা-কুকুর এরা—ঘেউ-ঘেউ করে না, একেবারে মোক্ষম কামড় হানে।

হবে তাই। ভোজন শুরু এবারে। পানপাত্র ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে নানান জাতের মধ্যে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের কামনা। এক চীনা ভদ্রলোক—ইংলণ্ড ও কন্টিনেন্টে পড়া বৈজ্ঞানিক—এগিয়ে এসে আলাপ করলেন। এমনি ঘুরে ঘুরে সকলে আলাপ-পরিচয় করছেন। বৈজ্ঞানিক একটু সুরা ঢেলে দিতে গেলেন গ্লাসে। আমরা নিলাম না। দুঃখ পেলেন বুঝতে পারছি। ম্লান হেসে বললেন, মোটেই চলবে না? ডক্টর জ্ঞানচাঁদ ও আমি লেমনেড ঢেলে নিয়ে গেলাস ঠেকিয়ে রীতি রক্ষা করলাম।

কত দেশের কত মানুষ। অনেক আসে তীর্থযাত্রীর মতো বছরে একটিবার। আসে মাওকে দেখতে, মাও'র সঙ্গে কথা বলতে। আত্মীয়-বন্ধু মরেছে লড়াইয়ে, সর্বাঙ্গে কত অস্ত্রের দাগ। সেই অতি-বড় দুর্দিনে ছিল একটিমাত্র পরম আশ্বাস, সকলের চেয়ে আপন জন, তাদের বড় আদরের মাও—মাও-তুচি। মাও আজকেও ঠিক সেদিনের মতো, একই রকমের নীল কোর্তা গায়ে! কোন রকম বিশেষ উর্দি নেই যাতে চেনা যায়, ইনি মাও-সে-তুং—পিকিন বাজারের রামা-শ্যামা দোকানদার নয়। পরমাত্মীয়ের মতো সেকালের মানুষগুলোকে কাছে টেনে নিচ্ছেন। পরিচিত কথাবার্তা। মাওকে যখন উচ্ছ্বসিত

হয়ে কেউ প্রশংসা করে, মাও দেখিয়ে দেন তাদের। তাঁর একার কিছু নয়, কৃতিত্ব সকলের। মাও আলাদা নন ঐ মানুষগুলো থেকে।

ভিড়টা এখন কিছু থিতিয়েছে। এগিয়ে গিয়ে অনেকেই মাওকে মুখো-মুখি দেখে আসছেন। অধ্যবসায়ী কেউ কেউ শেকহ্যাণ্ড করে এসেছেন, এমনও শোনা যাচ্ছে! সোয়া আটটায় মাও হল ছেড়ে চলে গেলেন!

আমাদের পাশের টেবিলে মঙ্গোলিয়ান ও উত্তর-পশ্চিম চীনের পিছনে-পড়া কয়েকটা জাত। একটি মেয়ে—হেন রঙ নেই যা তার অঙ্গের পোশাকে না আছে, তার উপর গাড়ির চাকার ধরনের পাগড়ি মাথায়। হাঁ, সাজ করতে হয় তো এমনি—মাও সে-তুঙের পরে সর্বচক্ষুর দৃষ্টি এখন মেয়েটার দিকে! এই নাকি জাতীয় পোশাক ওদের! কয়েকটা বছর আগেও শিকার করে ঝলসানো মাংস খেত। এমনি বিস্তর জাত চীনে—আজকে তাদের বড় খাতির। শ্রদ্ধার নব নামকরণ হয়েছে 'ন্যাশনাল মাইনরিটি'। যা কাণ্ড—সবুর করুন কয়েকটা বছর—পয়লা দলে টেনে ওদের তুলবেই।

চাউ-এন-লাই, দেখি, চলে এসেছেন এদিকে। চোখ মেলে দেখবার মতো। এক টেবিলের ধারে আছেন, হাত বাড়িয়ে দেয় সকলকে—পাঁচ-দশখানা যা হাতের মাথায় পাওয়া গেল কিঞ্চিৎ ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেলাস ঠোকাঠুকি করে গেলাসটা একটু ঠোঁটে ঠেকিয়ে চক্ষের পলকে আর এক জায়গায়। অত বড় হলের হাজার মানুষের ভিড়ে তুড়ুক-সওয়ার হয়ে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ডান হাত উঁচু করে কার্তিক ওদিকে তুড়িলাফ দিচ্ছে। চাউ শেকহ্যাণ্ড করে গেছেন আমার সঙ্গে—হেঁ-হেঁ, চালাকি নয়! সন্তর্পণে হাতে তুলে রেখেছে, ছোঁয়াছুঁয়িতে মহিমা এক তিল ক্ষয়ে না যায়!

আমি আরও রসান দিই, ও-হাত ধুয়ে ফেলবেন না খবরদার! ক'টা দিন বাঁ-হাতে খেয়ে নিন। দেশে ফিরে তারপর রূপোয় বাঁধিয়ে নেবেন।

নানান দেশের নানান সাজের মানুষ একখানা ঘরের মধ্যে অসংখ্য ভাষায় হুল্লোড় করছে। বসবার ব্যবস্থা নেই-দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হবার যোগাড়! উৎসবে কিছুতে ভাঁটা পড়ে না। পৃথিবীর যত ক্ষ্যাপা জুটে পড়েছে একটা জায়গায়? হঠাৎ এরই মধ্যে গান ধরে বসল একজন। একজন দু-জন করে বেশ একটা দল। তারপরে আর যাবে কোথায়—সকলকে প্রায় গানে পেয়ে বসেছে—দল তখন আর গোনাগুনতিতে আসে না। ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ' রুশীয়, আর চীনা তো আছেই—আমাদের মঞ্জুশ্রী দেবী বাংলায় গান ধরলেন। কত মানুষ এসে জুটল এই বাংলা গানের দলে। কোন পুরুষে বাংলা জানে না

অথচ কেমন দিব্যি ঠেকা দিয়ে যাচ্ছে। এই মানুষই জাত-বেজাত হয়ে এ-ওর বুকে গুলি মারে, এ কি একটা বিশ্বাস হবার কথা? না, হতে পারে না—এসে দেখে যান এই গানের আসর, আপনিও দিব্যি করে সেই কথা বলবেন।
ফিরছি, অসংখ্য মানুষের তেমনি কর-মর্দন আর হাত তুলে আনন্দ-জ্ঞাপন। রাস্তায় রাস্তায় সকল বয়সের মেয়ে-পুরুষের ভিড।—কাল উৎসব—আজকে এরা ঘুমোবে না, সারা রাত্ত পিকিন শহরে টহল দিয়ে বেড়াবে।
উৎসব-স্থানে বলেছি তো, আলোয় আলোয় দিনমান। মানুষ এখনই বোধ-হয় পাঁচ সাত হাজার। (খবরের কাগজের লোক নই—কাজেই আন্দাজে বলা। ওরা নজর হেনে সঠিক বলে দেন। গণে দেখবার উপায় নেই, অতএব ঘাড় হেঁট করে ওঁরা যা বলেন তাই মেনে নিতে হয়।) বাস পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। টের পেয়ে গেছে যে ভোজের আসরের ফেরত আমরা। হাততালি দিচ্ছে। এক মা যাচ্ছেন রিক্সায় চড়ে বছর খানেকের বাচ্চা ছেলে নিয়ে। হাসিমুখে সেই বাচ্চার দু'হাত ধরে তালি দেওয়াচ্ছেন তিনি। রিক্সাওয়ালা রিক্সা থামাল একটু: হাত তুলে আমাদের অভিবাদন জানাল। যারা দূরে ছিল সচকিত হল হাত তালির আওয়াজে। রে-রে করে আসছে অভিবাদন জানাতে। ভিড় হয়ে গেল—চালাও, চালাও গাড়ি। ছুটে আসছে এদিক-ওদিক থেকে—এসে পড়বার আগে পালাও।
হোটেলে এসে স্থির হওয়া গেল না। ঘরে বসতে মন চায় না। আবার বেরুনো হল—একটা গাড়ি নিয়ে বেরুলাম কয়েকজন। আনন্দ, আনন্দ—আনন্দের লহর খেলে যাচ্ছে আলোকজ্জল উৎসবমত্ত পিকিনের পথে। রোহিণী ভাটে হাতের বালা খুলে দিলেন একটা মেয়েকে। মেয়েটা যেন পাগল হয়ে উঠল—কি করবে ভেবে পায় না—গলার স্কার্ফ খুলে জড়িয়ে দিল রোহিণীর গলায়। চোখে জল বেরিয়ে আসে—মানুষ এমন মেতে যায় দরদি মানুষদের কাছে পেয়ে! মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ভাবের বন্যায় সারা দেশ ডুবিয়ে দিলেন। সে কেমনধারা? পুঁথিতে বর্ণনা পড়ি। উল্লসিত এই জনসমুদ্রের মধ্যে 'শান্তিপুর ডুবু-ডুবু ন'দে ভেসে যায়—' এই গানের কলি কেন জানি কেবলই আমার মনে আসছে।
ভোর হল। ঘুমের মধ্যেই মন নেচে ওঠে। সেই দিন আজকে, এসে অবধি যার নাম শুনেছি। যার সম্বর্ধনায় সারা চীন পাগল হয়ে উঠেছে।
ন'টা না বাজতেই তৈরি। তৈরি হয়ে ড্রইং-রুমে ভদ্রভাবে বসে থাকবার অবস্থা নেই। মন আকুলি-বিকুলি করছে। ঘড়ির কাঁটা যেন গোরুর-গাড়ির চালে চলেছে। ছোট্ না রে বাপু আজকের এই দিনটা। ছুটে চল—

উন্মুক্ত পথের উপর সকলে পায়চারি করছি। বাস দাঁড়িয়ে সারবন্দি। দোভাষিরা গণছে আমাদের, নামধাম মিলিয়ে নিচ্ছে। হিসাবপত্র চুকে গেলে তখন বাসে উঠতে বলবে। যত্রতত্র উঠে পড়লে হবে না—ঠিক করা আছে, কোন নম্বরের বাস কাদের বইবে। জামার উপরে রক্তবরণ ব্যাজ। শান্তি-সম্মেলনের মহামান্য বিদেশি অতিথি, যে-সে ব্যক্তি নই—ব্যাজের উপরের সোনালি চীনা-লিপি নিঃশব্দ চিৎকারে জানিয়ে দিচ্ছে সর্বজনকে।

ভারতীয়দের জন্য দুটো বাস। তিলধারণের জায়গা আছে নিশ্চয়, কিন্তু একটা গোটা দেহ ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া একেবারে দুঃসাধ্য। হেনকালে ডক্টর কিচলু এলেন। তিনি দলপতি—সকলের সঙ্গে একাসনে নয়, আলাদা মোটরে পুরে তাঁকে চালান দেবে। রবিশঙ্কর মহারাজ সহ দলপতি এবং বুড়ো মানুষ বলে তাঁকেও নিয়ে তুলল সেই মোটরে। যেন শহুরে বিয়ের শোভাযাত্রা—মোটরে কর্তাব্যক্তিরা, বাস ভরতি চলেছি বরযাত্রিদল।

পিকিন শহরে ঘরবাড়ির গোনাগুনতি নেই; গাছপালাও তেমনি অজস্র। গাছের মাথায়, বাড়ির ছাতে, পাঁচিলের উপরে—যেখানে একটু উঁচু জায়গা সেইখানে পতাকা তুলেছে। নির্মেঘ আজ আকাশ—উজ্জ্বল রোদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কনকনে হাওয়া বইছে সকাল থেকে, হাজার হাজার রক্ত-পতাকা ঝিলিক দিচ্ছে যেন। হাওয়া না থাকলে এমন বাহার খুলত না। নতুন আশায় ও আনন্দে উন্মত্ত হাজার লক্ষ মানুষের মন—সেই মনগুলো যেন নতুন সূর্যের রং মেখে চোখের উপর নেচে বেড়াচ্ছে।

পিপল্স-পার্ক পিকিন হোটেলের অনতিদূরে—হোটেলের এই একই রাস্তার উপর। ট্রাম-লাইন রাস্তার মাঝখান দিয়ে—দু'পাশে যথারীতি অপরাপর গাড়ি চলবার জায়গা। আজকে এ রাস্তায় গাড়ি যাওয়া মানা। বাস তাই ঘুরে ঘুরে অলিগলি দিয়ে চলল। একটা মানুষ দেখছি নে বিরস-মুখ, একটুকু জায়গা দেখছি নে সজ্জাবিহীন। ফুটপাথের উপর টুল পেতে বসে কয়েকটি বুড়ো-বুড়ি, আশে-পাশে খেলা করছে বাচ্চারা। গাড়িতে বসিয়ে ঠেলছেও দু তিনটিকে। বুড়োরা হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে আমাদের—বাচ্চারাও দেখাদেখি হাত নাড়ে। আজকে বাড়িতে আছে শুধু এরাই—ভীড়ের মধ্যে তাল সামলাতে পারবে না। বুড়োরা এইখান থেকে লাউড-স্পীকারে উৎসব শুনবে আর বাচ্চার খবরদারি করবে।

পৌঁছলাম অবশেষে। পিছন দিকে এসেছি—নিষিদ্ধ-শহরের মাঝামাঝি। সান-ইয়াৎ-সেন পার্কে বাস রাখল। পায়ে হাঁটা এখান থেকে। মোটরগাড়ি আরও কিছু এগিয়ে যাচ্ছে, মোটরওয়ালাদের কম হাঁটতে হবে।

পাথরে বাঁধানো প্রাচীন পথ। চলেছি তো চলেইছি! খানিক ডাইনে, খানিকটা বা বাঁয়ে। এগুতে এগুতে হঠাৎ পেছুতেও হচ্ছে দু-পাঁচ কদম। গোলকধাঁধা বিশেষ। রাজরাজড়ার ব্যাপার—ধরুন, পাঁচ-সাতশ' পুরস্ত্রী নিয়ে ঘরবসত। তাঁদের গতিবিধি আলাদা রকমের—নগণ্য সাধারণের মতো সাদা-মাটা সহজ পথে বেড়িয়ে সুখ হবে কেন?

মুশকিল এ যুগে আমাদের—পথ ভুল করে দেওয়ালে হুমড়ি খেতে হয়। মোড়ে মোড়ে তাই তীর-চিহ্ন দিয়ে পথ বাতলানো। তা ছাড়া লোকও রেখে দিয়েছে—সসম্ভ্রমে তারা গোলমেলে বাঁক পার করে দিচ্ছে। তিয়েন-আন-মেনের সামনে বাঁ-দিককার গ্যালারিতে আমাদের জায়গা—হঠাৎ এক সময় দেখি, তারই নিচে এসে দাঁড়িয়েছি। উঠে পড়ুন আর কি।

হেলতে দুলতে উপরে উঠে যে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়বেন, সে জো নেই। দেখতে হবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। দশটা থেকে শুরু, এটা ঠিক আছে—শেষ কখন হবে, সঠিক তার হদিস পাই নি। কেউ বলে একটা, কেউ পাঁচটা। পড়া-না-পারা ছাত্রের মতো অতক্ষণ ধরে বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাকা। বেঞ্চিই বটে একরকম—গ্যালারির উপরে থাকে-থাকে কংক্রিটের ধাপ বেঞ্চির মতন উঠে গেছে।

এদিকে এই আমরা। আর ডাইনের গ্যালারিতে আছেন শ্রমিকবীর, কৃষক-বীর; মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনারা; কোরিয়া যুদ্ধে হিম্মত দেখিয়ে ফিরেছেন যাঁরা। আর শহীদদের মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন। নিঃসীম জনসমুদ্র সামনে। কত মানুষ হবে, দশ লক্ষ? কোস্টারিকার ছাত্র ভেগা একেবারে বসিয়ে দিল —এক লক্ষ নাকি! তুমুল তর্ক। যাদের সালিশ মানি তারা আবার নতুন এক এক সংখ্যা বলে। আরও জট পাকিয়ে যায়। ক্লান্ত হয়ে শেষটা মুলতুবি রাখা হল কালকের দিনের জন্য। কাগজে কি বেরোয়, দেখা যাক। ছাপার অক্ষর তো মিছে কথা বলে না!

তা আমিই জিতলাম। ডেইলি নিউজ-রিলিজে লিখল পাঁচ লক্ষ। আমি বলেছিল্যম দশ লক্ষ—প্রায় তো মিলে গেল, আবার কি!

কি সুন্দর আবহাওয়া যে আজকের! প্রসন্ন সোনালি রোদ আর সেই সঙ্গে হলদে-সাগরের স্নিগ্ধ বাতাস। যেদিকে তাকাই—পতাকা। দিগ্‌ব্যাপ্ত পতাকার সমুদ্রে ঢেউ দিয়েছে বাতাসে! দুনিয়ার মানুষ আমরা পাশাপাশি—পাশের ইরানি ভদ্রলোক পরিচয় করলেন আমার সঙ্গে। কোথায় নিবাস, কি করা হয়, ছেলেমেয়ে ক'টি—ইত্যাকার প্রশ্ন। আমাদের গ্রামাঞ্চলে চাষীরা ভুঁয়ের আলে বসে হুঁকো টানতে টানতে পথিকজনকে যেমন ডেকে ডেকে শুধায়

এরই মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, আবার দেখি, অস্ট্রেলিয়ান মহিলাটি। এমনি জমাটি আড্ডা এখানে-ওখানে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলছে। চলবে যতক্ষণ না নিচের ওঁরা শুরু করে দিচ্ছেন।

মুক্ত-চীনের বয়স আজ তিন বছর পুরল—এই তৃতীয় উৎসব। প্রতি উৎসবেই মনে রাখবার মতো কিছু ঘটেছে। পয়লা উৎসবে সারা চীন চুঁড়ে নিয়ে আসা হল পিছিয়ে-পড়া জাতগুলোর প্রতিনিধি। দু-চারটে নয়, ষাট রকম আছে এই প্রকার। চীনের মানুষ হয়েও এতাবৎ তারা পরদেশির অধম হয়ে থাকত। খানা-পিনা আদর-আপ্যায়ন আমোদ-স্ফূর্তি হল তাদের সঙ্গে। সমঝে দেওয়া হল: ভায়ারা গুহায় থাকো, ঝলসানো মাংস খাও, আর সাতরঙা পোশাকই পরো—মোটের উপর কিন্তু তাবত চীনের মানুষ এক। কেউ কারো চেয়ে কম নয়। এ পিছিয়ে থাকা আর ক'দিন? হাত ধরো দিকি—হ্যাঁ, হাতে হাত মিলিয়ে মনে মন মিলিয়ে এক হয়ে এসো মহাজাতি গড়তে লেগে যাই। পরের বছর নানান দেশের মহামহোপাধ্যায়দের আহ্বান করা হল—দেখে শুনে আশীর্বাদ করে যান দু-বছরের নতুন-চীনকে। পুরানো আমলে কত যাতায়াত ছিল, তারপরে চীনের আপৎকালে বন্ধুত্বের পথে কাঁটা পড়ে গেল। আসুন আবার, আমরাও যাবো আপনাদের ওখানে—আসা-যাওয়ায় তো মানুষের কুটুম্বিতা! এই শুভেচ্ছা-মিশনে ভারত থেকে সুন্দরলাল প্রভৃতি এবং পশ্চিমবাংলার অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী ও নির্মল ভট্টাচার্য গিয়েছিলেন। আর এই তৃতীয় বারে এসেছি আমরা। নানা দেশের বহুতর গুণীজ্ঞানী এবং ধনীরা আছেন। আবার এমন মহাশয়রাও আছেন, যাঁদের নামের একটা বিশেষণ বলতে গিয়ে—হাতড়ে হাতড়ে শেষটা মরিয়া হয়ে বলতে হয় লেখক। অথবা সমাজকর্মী। জীবনে কোন এক বয়সে একখানা কি প্রেমপত্র লেখেন নি—নিদেনপক্ষে এক পাতা জমাখরচ? তবে লেখক হলেন না কিসে? আর চাকরি করেন কি রাজা-উজির মারেন, সমাজকে বাদ দিয়ে কোন কিছু নয়। সমাজকর্মী বললে, অতএব মিথ্যা পরিচয় দেওয়া হল না।

চুপ, চুপ! দশটা বাজল—বিপুল উল্লাসধ্বনি লক্ষ-লক্ষ কণ্ঠে। আকাশ বুঝি বা ফেটে যায়! কেন—হঠাৎ কি হল রে বাপু? আমাদের পিছন দিকে প্রধান-ফটকের অলিন্দ। মাও-সে-তুং এসে দাঁড়িয়েছেন সেখানে। সারা চীনের আনন্দ-সাগর-তরঙ্গের মতো উত্তাল হয়ে ভেঙে পড়ছে সেই অভিমুখে। তাদের মাও-তুচি! পাশে রয়েছেন সুন-চিন-লিং। তাঁর পাশে চু-তে এবং সারবন্দি নতুন-চীনের নায়কেরা।

মিছিল শুরু। মিলিটারি ব্যাণ্ড। ঝকঝকে বাজনাগুলোয় রোদ পড়ে

আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। গণতিতে এক হাজার। পায়োনিয়র ছেলে-মেয়ে—তারা বিশ হাজার, পরের দিন কাগজে পেলাম। চু-তে এর মধ্যে নিচে নেমে গেছেন কোন সময়—মোটর-বাইকে ভটভট আওয়াজ করে এসে আদেশ নিয়ে গেল তাঁর কাছ থেকে। সৈন্যরা মার্চ করছে—স্থল জল ও আকাশবাহিনী। অশ্বারোহী-দল—ঘোড়ার পা পড়ছে তালে তালে, খটাখট খটাখট—চলেছে তো চলেইছে। চার ঘোড়ায় টানছে কামানের গাড়ি—দু'জন করে চালক—জোড়া-ঘোড়া চালাচ্ছে প্রতি জনে। সারিতে এমনি চারখানা করে গাড়ি, চারটে কামান। লরিবোঝাই সাঁজোয়া বাহিনী আর বিমানধ্বংসী কামান। চলেছে রকেটবাহী আর কামান টানা লরি—গড়গড় করে রাস্তার উপর দিয়ে শত শত কামান টেনে নিয়ে চলেছে।

কামানের নাক উঁচিয়ে কালো কালো দৈত্যের মত ট্যাঙ্ক চলেছে সগর্জনে। মাথার উপরে প্লেনের মিছিল। আশ্চর্য বেগবান জেট প্লেন চক্ষের পলকে দিগন্তপারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মোটর-সাইকেল চেপে যাচ্ছে নারীসৈন্যের পুরো এক রেজিমেন্ট।

মিছিলের পুরোভাগটা এমনি। ভদ্র-সন্তানের পিলে চমকে যাবার কথা। তার পরে বন্যা এলো—বিচিত্র সাজসজ্জার, ফুলের, উল্লাসের এবং হাজার হাজার শান্তি-কবুতরের। বিদেশী দর্শক আমরা যে ভদ্রস্থ হয়ে দেখছি—নিতান্তই উপরতলায় আছি এবং ঝাঁপিয়ে পড়বার সহজ কোন রাস্তা নেই বলে। হাজার হাজার মুখের হাসি এই যে আসছে পিছনে—মিলিটারি কামান-বন্দুক উঁচিয়ে আগে ভাগে তারই যেন সতর্ক পাহারা দিয়ে ফিরছে। মাথার উপরে প্লেনের ঝাঁক বুঝি দূরবীন কষে দেখে গেল, দুশমন কেউ ঘাপটি মেরে আছে কি কোথাও।

সাদা পোশাক-পরা ভলান্টিয়ারদল—সঙ্গে ব্যাগপাইপ জাতীয় বাজনা। সোনার রঙের অতিকায় এক প্রতীক মাথায় তুলে ধরেছে। আসছে ফুলের তোড়া হাতে কলহাসিনী মেয়েরা—যে দিকে তাকাই ফুলের সমুদ্র। আবার আসে ভলান্টিয়াররা পতাকা নিয়ে। কত রং আর কত চেহারার পতাকা।

কি প্রকাণ্ড ছবি সান-ইয়াৎ-সেন ও মাও-সে-তুঙের! জনতা মাথায় নিয়ে চলেছে। অমন বিশাল মূর্তি মানুষের হয় কখনো! আমার আপনার চোখে অবাস্তব, কিন্তু চীনের কোটি কোটি নরনারীর কাছে সত্যি সত্যি এমনই বিরাট ওঁরা। সাধারণ মাপের মানুষের পাঁচ ছ' গুণ বড় করে এঁকে শিল্পীর তবু যেন তৃপ্তি নেই! ছবি আরও অনেক—কার্ল মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন, চাউ-এন-লাই, চু-তে…এঁরা হলেন প্রমাণ সাইজের।

আর পার্কের প্রান্তে অনেক দূরে ঐ যে ফুলের বাগান এসে অবধি দেখছি—হঠাৎ তারা দুলতে লাগল। লাল ফুল, হলদে ফুল, সবজে ফুল, সাদা ফুল—ফুলে ফুলে কিন্তু মেশামেশি নেই, চৌকো চৌকো সমআয়তনের বাগান যেন আল বেঁধে আলাদা করা। এ বড় তাজ্জব—বাগানগুলি, একের পিছনে অন্য, এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। এদেরও মিছিল—ফুলপাতা দুলিয়ে দুলিয়ে আসছে। লাল বাগান ধীরে ধীরে চলে গেল আমাদের গ্যালারি তার-পর নেতাদের অলিন্দের সামনে দিয়ে। এলো তার পিছে বেগুনি, এলো হলদে, এলো সবুজ, এলো সাদা···দক্ষিণের গ্যালারির পাশে গিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ব্যাপারটা বুঝলেন? ইস্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েগুলোর কীর্তি। এতও জানে কাগজের ফুল-পাতা-ডাল বানিয়েছে। সত্যিকারের ফুল-পাতাও আছে—রং বাছাই তোড়া বাঁধা। পাঁচ-শ' সাত-শ' নিয়ে এক একটা দল—একই রঙের ফুল-পাতা তারা ধরছে মাথার উপর। আমরা উপর থেকে দেখছি। দেখতে পাচ্ছি, মানুষ নয়—শুধুই ফুল। কাছে এসে এসে যখন মিছিল যাচ্ছে, তখনও সেই ফুল! স্বাস্থ্যে ও আনন্দে ঝলমল উৎসাহ-প্রদীপ্ত নতুন-চীনের ছেলেমেয়ে—ফুলই তো ওরা! সুবিশাল পিপল্স্-পার্কে কতক্ষণ ধরে রং-বেরঙের ফুল ছাড়া কিছু আর নেই···

আমার চোখে কিন্তু জল এলো। দোহাই পাঠকবর্গ, কথাটা ওদের কানে যেন না যায়! এত সমাদরের অতিথি—কিন্তু মন খুলে হাসতে পারি নি সেদিন তাদের আনন্দে। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছেছি। এর আগে শুনেছিলাম ঐ পিপলস-পার্কের একটুখানি ইতিহাস। ১৯১৯ অব্দে প্রথম-মহাযুদ্ধের অন্তে রফা নিষ্পত্তি হল—জাপানিরাও ভোগদখল করবে চীনভূমির এখানে-ওখানে। হেন উদার পরার্থপর প্রস্তাব ছাত্রদের বরদাস্ত হল না। বেরিয়ে এলো তারা এইখানে—ঐ পার্কের উপর। এক টুকরো লাঠিও নেই, একেবারে খালি হাত। এদের উপর নির্ঝঞ্ঝাটে বীরত্ব দেখানো চলে। তাই করলেন কর্তারা—সৈন্য লেলিয়ে দিলেন মিছিলের উপর। ঠিক আমাদের জালিয়ানওয়ালাবাগ—আর ঐ একই সনের ব্যাপার। পার্কের মাটি ভিজে গেল ছাত্রছাত্রীর রক্তে। আজকে নতুন কালে, দেখ দেখ, তারা সব ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। সেই রক্তাক্ত ভূমির উপর আজকের ফুলবাগিচা। সেদিনের আর্তনাদ, শোন শোন, হাজার কণ্ঠের উচ্ছলিত হাসি। কাণ্টেনের পথে ওং-ঊন সেই যে বলেছিল, মৃত্যুর জন্য দুঃখ নেই, তারা যা চেয়েছিল, পাওয়া যাচ্ছে—গরীব মেয়েটার কথাগুলো মন বড় ব্যাকুল করে তুলছে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের চেহারা ভাবছি—পিপলস-পার্কের সীমান্তে দাঁড়িয়ে। ও-বছর অমৃতসরে দেখে এলাম। সারা বিকালটা বসেছিলাম এক গাছের তলে। সে গাছে বুলেটের দাগ—সামনের বড়-দেওয়ালেও দাগ ঐ রকম। ডায়ারের কীর্তি-চিহ্নগুলো পরিচায়ক-বোর্ড ঝুলিয়ে পরম যত্নে রক্ষা করছে। সে আমলে ছিল একটা মাত্র সিঁড়িপথ, যার মুখ কামান বসিয়ে আটকে ফেলেছিল। এখন দরাজ ব্যাপার—একটা দিকে পাঁচিল উড়িয়ে রাস্তার সঙ্গে একশা করে দিয়েছে হিন্দু-মুসলমানে সেই বড দাঙ্গার সময়টা। ডায়ারের কামানে জাত বিচার ছিল না—আজাদির আমলে আমরা এজাত ওজাত করে বস্তি পুড়িয়েছি, পাঁচিল-ভেঙেছি। পোড়ার দাগ, স্বচক্ষে দেখলাম, মোছে নি আজও। ডায়ারের চেয়ে আমাদের নিজ কীর্তি তবে কম হল কিসে? এক-কালের শোকবিধুর পিপলস পার্কে আজকের এই মাতামাতি, আর আমাদের জালিওানওয়ালাবাগের প্রান্তে নিরীহ মানুষের পোড়া ভিটেগুলো সারি সারি শবদেহের মতো নিঃসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে। হিংসার বিষে আরও কালো হয়ে এসেছি চীন থেকে—সত্যি বলছি, এত কালো এর আগে ছিলাম না।

দলের পর দল ধীর পায়ে এগিয়ে চলে—একটুকু থেকে দাঁড়ায় অলিন্দের সামনে এসে। যেখানে মাও অপর মহানায়করা। হাত তুলে পতাকা নেড়ে কুসুমগুচ্ছ দুলিয়ে তাঁদের সম্ভাষণ জানায় ফুটফুটে এক দল মেয়ে আসছে—চুলে সবুজ ফিতে, হাতে সবুজ পতাকা। আসছে পিচবোর্ডে আঁকা শান্তির শ্বেত কবুতর বয়ে—আরে,—আকাশ ভরে গেল যে উড়ন্ত কবুতরে। আঁকা ছবি কোন ম্যাজিকে পাখনা মেলে আকাশে ওড়ে? তামাম মানুষের দৃষ্টি এবার উপর দিকে। করেছে কি শুনুন—জ্যান্ত পায়রা এনেছে কাপড়ের মধ্যে ঢেকে ঢুকে। একটা দুটো নয়—হাজার দু হাজার। মাও তুচির সামনে এনে ছেড়ে দিল! উড়ছে, উড়ছে—মুক্তির আনন্দে উড়তে উড়তে দৃষ্টির সীমানা পার হয়ে গেল।

চলেছে ঐ বেলুন নিয়ে। উড়িয়ে দিল এক সঙ্গে নানান রঙের বেলুন পায়রা-গুলোর মতো। ঝাঁকে ঝাঁকে বেলুন উড়াচ্ছে পায়োনিয়র দল। কি হাত-তালি, এরা যখন অলিন্দের সামনে মাও-র দিকে চেয়ে দাঁড়াল।

একটি খোকা আর এক খুকু দুড়দাড় ছুটছে ফুলের তোড়া নিয়ে। উঠছে উপরতলায়। ফুল নিয়ে এলো তাদের মাও-তুচির হাতে। ফুল দিয়ে ফিরে আসার পর তবে সে দল নড়ে সেখান থেকে। পতাকা নিয়ে উঠে গেল আর একটা দলের প্রতিনিধি। নিচের মাঠে তখন কি কলরব চলেছে আন্দাজ করে নিন। মিছিলে দলের পর দল চলেছে ফুল আর ছবির পায়রা নিয়ে, বেলুন আর

জীবন্ত পায়রা উড়িয়ে। বেলুন ওড়াচ্ছে অবিকল আঘ্রুলের খোলার মতো করে, কত কি লেখা বেলুনের গায়ে। ফুলের সমুদ্র—মানন্দের উন্মত্ত কল্লোল। দালান-কোঠা ভেঙে ফেলবে যে চেঁচানির ঠেলায়! কি বলছে, মানেটা একটু সমঝে দেবেন কেউ? জয় হোক সর্বজাতি আর সকল মানুষের, ব্যাপ্ত হোক বিশ্বভুবন জুড়ে নির্বাধ আনন্দ আর নিশ্চল শান্তি!···

গ্যালারির স্বর্গধামে চড়েও ঢেঁকি এদিকে যথারীতি ধান ভেনে চলেছে। সবাই মগ্ন হয়ে দেখছে, হাততালি দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে—এ অধমেরই কেবল হাত-জোড়া। বাঁহাতে ছোট খাতা, ডান হাতে কলম। আপনাদেরই আতঙ্কে। ছিটেফোঁটাও ভাণ্ডারে না জমিয়ে তাবৎ আনন্দ একা একা যদি হজম করতাম, আস্ত রাখতেন কি পাঠক-সজ্জনেরা? তবে ছিটেফোঁটা নিতান্তই—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ অবস্থায় অধিক সঞ্চয় কি করে সম্ভব?

সদ্য-জোটানো ইরানি বন্ধু হাসছেন আমার গতিক দেখে। সর্দার পৃথ্বী সিং এগিয়ে এসে বললেন, নিচে যান নি একবারও? রোদে দাঁড়িয়ে আধমরা হয়েছেন—জলটল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসুন। লেখা দু-দশ মিনিট মুলতুবি থাকুক—ভুবন রসাতলে যাবে না।

গ্যালারির নিচের তলায় সারবন্দি খোপ—উঠবার মুখে নজর করে এসেছি। তথায় চেয়ার-বেঞ্চি পাতা, সামনে টেবিল। টেবিলে গরম চা, ঠাণ্ডা মিনারল-ওয়াটার এবং ফলটা বিস্কুটটারও বন্দোবস্ত আছে। যেমন আপনার অভিরুচি। চাই কি উপরের গ্যালারিতে আদৌ না গিয়ে সাধারণ ঠাণ্ডা ঘরে বসে চা-সেবন এবং গুলতানি করতে পারেন। কথার কথা বলছি অতদূর আয়েসি অবশ্য কেউ নেই কোন দলে। খররৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিতান্ত অপারগও হলে তবেই নিচে নামছে জিরোবার জন্য। নামলেই তো লোকসান—আমার জন্য থেমে থাকবে না উৎসব। একটা দিনের পরম দৃশ্যে নেহাত দশটা মিনিটের অঙ্গহানি হবে তো! পারতপক্ষে কে যেতে চায় তবে আড়ালে?

রবিশঙ্কর মহারাজ, অধ্যাপক শুকলা ও উমাশঙ্কর যোশি নেমে যাচ্ছেন। মহৎ সঙ্গ ধরলাম। এসে দেখি, অধ্যাপক জৈন আর তাঁর আনন্দ-প্রতিমা মেয়েটা। নানা দেশের আরও বহুতর ব্যক্তি। খোপের মধ্যে বাড়তি জায়গা বড় বেশি নেই।

চেয়ারে চেপে বসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। কই-গো, গেল কোথায় ওরা? এই প্রথম দেখছি, খেজমতের লোকের অভাব। সামান্য দু পাঁচজন আছে—তারা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। ব্যাপার কি মশায়, এদ্দিন রয়েছি—খাতির তাই কমে গেল নাকি? সেই যে এক ঘর-জামাইয়ের গল্পে আছে—পরলা কিস্তিতে,

হবিষে নয়, মানুষে টান ধরল?
উঁহু, ওদের দোষ নয়—সদয় হয়ে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন পূর্বোক্ত যারা সব এখানে এসেছিলেন। সে কী কথা—উৎসব দিনে আটকে থাকবে কেন এত জন? যাও তোমরা দেখেশুনে বেড়াওগে। হাত পা, চোখ কান আছে—আমাদের ব্যবস্থা আমরাও করে নিতে পারব!
কেটলি ভরা চা এলো বটে কিন্তু পাত্রের অভাব। খেয়ে খেয়ে লোকে রেখে গেছে, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় পড়ে আছে। চক্রেশ তাড়াতাড়ি দুটো কাচের গ্লাস নিজ হাতে ধুয়ে নিয়ে এলো। যোশি বললেন, এঁকে দাও—বই লিখবেন। সকলের আগে দাও এঁকে, বইয়ে তোমার নাম থাকবে।
অধ্যাপক জৈন গম্ভীর মানুষ। ঘাড় নেড়ে মৃদু হেসে সায় দিলেন। অতএব সকলের আগে আমি। আর এক গ্লাস দিল শ্রান্ত ক্লান্ত এক বুড়ো ইংরেজকে। চোঁ চোঁ করে সাহেব গরম চা সরবতের মতো গিলছে।
চক্রেশ আবদারের সুরে বলে, আপনার বই বেরুলে আমায় পাঠাবেন কিন্তু। অবিশ্যি যদি আমার নাম থাকে। নয় তো দেবেন না। নিজের নাম নেই, পরের একগাদা নাম পড়তে যাবো কি জন্য?
কিন্তু তুমি তো বাংলা পড়তে জানো না। মিথ্যে করে যদি বলি নাম আছে তোমার—
সে আমি শিখে নেবো এর মধ্যে। বইতে নিজের নাম পড়বার লোভে।
তা সত্যি। জলের মতো ইংরেজি ও হিন্দী বলে। চীনাও শিখেছে, অল্প অল্প চীনা বলতে পারে এই তিনমাসের মধ্যে। চক্রেশের পক্ষে কঠিন নয় বাংলা শেখা।
বাপও বললেন, প্রবন্ধ বা বই যা ই লেখেন, আমরা যেন পাই।
পিকিন ছেড়ে তাঁরা এখন বোম্বাইতে। তাগিদ এসে গেছে ইতিমধ্যে, কি লিখলেন?
আবার উপরে এসে দেখি, মিছিলের ভিন্ন চেহারা। ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা চলেছে—নীল পোশাক, হাতে হাতে লাল পতাকা আর ফুল। তাদেরই এক বাজনার দল—পোশাক হল নীল প্যান্ট' সাদা জামা, কোমরে লাল কাপড় ঝুলানো। চলছে রেলকর্মীরা, বিশাল এক ইঞ্জিন—পিচবোর্ড কিম্বা শোলার তৈরি—তাদের কাঁধে। ইলেকট্রিক শ্রমিক—নতুন আবিষ্কারের নমুনা লোহার জালের ফ্রেমে আটকে নিয়ে চলেছে। এক দল চলেছে ইয়াং সি নদী আটকাবার যে পরিকল্পনা হচ্ছে তারই বিরাট নক্সা বয়ে নিয়ে। ছাপখানার কর্মীরা নিয়ে চলেছে মাও-সে-তুঙের লেখা এক বই। এত বড় করে বানিয়েছে—একটা

মানুষের পক্ষে সে বস্তু বয়ে নিয়ে যাওয়া দুষ্কর। দাঁড়িয়ে ছাড়া পড়া চলবে না, পাতা উল্টাবার জন্য আলাদা মানুষ ঠিক করে রাখতে হবে।

এমনি চলেছে—কত আর লিখব। এক বছরের মধ্যে তারা কি করেছে, বড় বড় হরপে তাই তুলে ধরেছে। কি বেগে এগিয়ে চলেছি চেয়ে দেখ সকলে চক্ষু মেলে দেখছে তাবৎ বিশ্ববাসী। নব্বুই হাজার এমনি কর্মী—আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। ত্রিভুবন থোড়াই কেয়ার করে, চলনে এমন উদ্ধত ভঙ্গিমা।

আসে এবারে চাষীর দল। যে যেখানে লাঙল চষে, সেটা এখন তাদেরই জমি। চাষীর প্রাণে সকলের বড় সাধ, এতদিনে তাই মিটেছে। কত রকম কায়দায় ফসল ফলাচ্ছে! নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বের করেছেই বা কত! নমুনা দেখিয়ে যাচ্ছে সেই সব জিনিসের। রাক্ষুসে কুমড়ো-শশা নিয়ে যাচ্ছে। সত্যি সত্যি অত বড়, না মাটি দিয়ে বানানো কুমোরের চাক?

এবারে অফিস-কর্মচারী, ছাত্রদল, শিক্ষকবৃন্দ। শিল্পী ও সাহিত্যিকরা। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির দল। বিজ্ঞান-ছাত্রদের চিনতে পারি অতিকায় এক মাইক্রোস্কোপ নিয়ে চলেছেন, তাই থেকে।

জনস্রোতের কি শেষ নেই? তাবৎ চীনদেশ যেন এসে জুটিয়েছে পিপলস পার্কে। আর শৃঙ্খলা কেমন—লাইন ভাঙছে না কোন দিকে একটি মানুষ। কচি কচি ছেলেমেয়েরা হাত ধরাধরি করে নেমে চলেছে মিছিল ঘিরে।

ছবি তুলছে নানা দিক থেকে। মোভি-ক্যামেরাও চলছে অনেক। পারবে কি বন্ধুরা মুক্তির এই রূপ ছবিতে গেঁথে রাখতে? আমার কলম তো হার মেনে নিল।

অপেরা দল চলেছে মজার পোশাকে। গায়ক বাদক আর ফিল্মের লোক—কোন শ্রেণীর কেউ বাদ নেই। গেরুয়া আলখেল্লায় চলেছেন বৌদ্ধ শ্রমণরা, সাদা টুপি মাথায় মুসলমানরা। চিত্রবিচিত্র সজ্জায় বিভিন্ন মাইনরিটি দল। এক বিপুল পৃথিবী বয়ে নিয়ে যাচ্ছে—তার উপর বিরাট শান্তি কবুতর পাখনা মেলে আছে। পৃথিবীর ঠিক সামনের দিকটায় আমাদের ভারতের মানচিত্র। পায়রার পাখা দুলছে চলার তালে তালে। পাখনার স্নিগ্ধ ছায়া সমস্ত এশিয়া অঞ্চলটা জুড়ে। খেলোয়াড়রা চলেছে—তরুণ আর তরুণীর দল। স্বাস্থ্য দেখে চোখ জুড়ায়—দৃষ্টি ফেরানো যায় না। মেয়ে খেলোয়াড়রা যাচ্ছে বিলকুল সাদা পোশাকে। ছেলেদের সাদা প্যান্ট সকলেরই—জামা হল, দল হিসাবে লাল হলদে আর সবুজ। পতাকার রঙও আলাদা। এক হাজার এমনি আনন্দ-মূর্তি সমান তালে পা ফেলে রূপের লহর তুলে চলেছে। মাও হাত তুলে আদর জানাচ্ছেন এই ভাবী চীনদের। মাও-র মুখোমুখি এসে গতি শ্লথ হয়—কী করবে

তারা যেন ভেবে পায় না, কত রকমে মনের উল্লাস পৌঁছে দেবে মাও-র কাছে! ঘণ্টায় মিছিল শেষ—পুরো সাড়ে তিন ঘণ্টা। তার পরেও মাও-সে-তুঙের উদ্দেশ্যে কী আনন্দোচ্ছাস! সমুদ্রের আলোড়নের মতো—তার যেন শেষ নেই সীমা নেই। আর বুঝে দেখুন এ কর্তাদের অবস্থা! বেজুত ঠেকলে আমাদের নিজের খোপ আছে—তথায় ছড়িয়ে বসুন এবং যৎকিঞ্চিৎ সেবা নিন। ওদের সে জো নেই—কড়া রোদে লক্ষ চক্ষুর সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণ! বারবার তাকিয়ে দেখছি, অলিন্দের ঠিক মাঝখানে মাও—নিশ্চল নিস্তব্ধ—পটে আঁকা ছবির মতন। কী ভাবছেন কবি মাও? সেই সমস্ত ছেলেমেয়ে···পথের মাঝে যাদের হারিয়ে এসেছেন, আজকের আনন্দ-দিনে যারা নেই? কিংবা সামনের দিনের আরও এক মধুরতর স্বপ্ন—নতুন চীন যেখানে গিয়ে পৌঁছবে? উৎসব শেষে এবারে তিনি ছুটোছুটি করছেন এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত—হাত তুলে চারিদিকের অগণিত মানুষকে প্রীতি সম্ভাষণ জানাচ্ছেন।

হোটেলে ফিরে গড়িয়ে পড়লাম। ধকল কম নয়—অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকের পোষায়? ঘুমোই নি তা বলে—জেগে জেগেই দিবাস্বপ্ন।···মিছিল চলেছে বুঝি এখনো অফুরন্ত প্রবাহে—কলরোল কানে আসে। আহা, যাই হোক—এ আনন্দ না ফুরোয় যেন কোন কালে! মানুষ দুঃখ পায়, মানুষের চোখে জল আসে—আজকের এই ব্যাপার দেখে আর কে বিশ্বাস করছে বলুন? পৃথিবী এমন গরিব নয় যে মানুষগুলোর পেটের ভাত জোগাতে পারে না, এত সঙ্কীর্ণ নয় যে বাসিন্দাদের জায়গা দিতে পারে না। কাজ করো আর স্ফূর্তি করো ভাই—কেন মিছে ঝামেলা!

সন্ধ্যার কাছাকাছি ইয়ং এলো।

মিছিলের শেষ হয় নি, রাত্তিরেও আছে। আলো দেবে, বাজি পোড়াবে, নাচবে গাইবে খেলবে ছেলেমেয়েরা। আপনাদের জন্য বাসের ব্যবস্থা আছে—আমি এসে ডেকে নিয়ে যাবো।

তার মানে বাসে তুলে নিয়ে ভদ্রজন মাফিক স্থাপনা করবে গ্যালারির উপরে। খাতিরের অতিথি হয়ে উপর থেকে নাচ ইত্যাদি দেখে হাততালি দিয়ে ফিরে আসব সকালবেলার মতো। সেটি হচ্ছে না। ব্রজরাজ কিশোরের সঙ্গে যুক্তি আঁটলাম, আমরা হেঁটে বেড়াবো। হাঁটতে হাঁটতে মিশে যাবো উল্লসিত জনতার সঙ্গে। সে আনন্দ আমরা তো ধারণায় আসে না। ওদের সঙ্গে মেশামেশি করে গায়ে গা ঠেকিয়ে ওদের মনের স্ফূর্তির একটুখানি ছোঁয়াচ নিয়ে দেশে ফিরব।

ইয়ং-এর সাড়া পেয়ে কাতরাচ্ছি, বিষম মাথা ধরেছে রে ভাই—হাঁ,

স্থ-জনেরই। যন্ত্রণায় ছটফট করে এতক্ষণ পরে একটু বুঝি চোখ বুজেছেন—ডেকো না কিশোর মশায়কে।

বিশ্রাম নেবার যথাযথ উপদেশ দিয়ে ইয়ং অগত্যা চলে গেল। দরজা ফাঁক করে করিডরে এদিক-ওদিক দেখে নিঃসন্দেহ হই। গেছে চলে সকলেই—সাততলা হোটেলবাড়িতে সব ঘর ফাঁকা। একশ-পাঁচ নম্বর রুমের আমরা দুই ষড়যন্ত্রী এইবার জামা-কাপড় পরে বেরুবার তোড়জোড় করছি।

পৌনে আটটা। পায়ে হাঁটা—অতএব বড়-রাস্তা দিয়ে যেতে বাধা নেই। চতুর্দিক কি আলোয় সাজিয়েছে রে! আমাদের হোটেল-বাড়িটারই বা কি রূপ—লনে বেরিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। এখন দাঁড়িয়ে থাকার মুশকিলও কিছু নেই—ফাঁকা লন হা হা করছে, সব গিয়ে জড়ো হয়েছে তিয়েন-আন-মেনে লাউড-স্পীকারে দ্রুততালের বাজনা—ফ্লাশ-লাইটের প্লাবন বইয়ে দেওয়া হচ্ছে ঘন ঘন। বুকের ভিতর নাচিয়ে তোলে। ঘরের মধ্যে হেন অবস্থায় কে পড়ে থাকবে—শহরের কোন বাড়িতে বুঝি একটা মানুষ নেই। বাচ্চা ছেলে মেয়েরা হাত ধরে, কোনটাকে বা কোলে কাঁখে তুলে চলেছে বাপ মায়েরা। একটা পুলিশের টিকি দেখতে পাই না—অথচ সবাই কেমন নিয়ম মেনে চলেছে। এতটুকু বেচাল নেই কোন দিকে।

শোঁ শোঁ করে বাজি উঠছে আকাশে—লাল সবুজ হলদে তারা কাটছে। এক কনফারেন্সে ওদের ঔপন্যাসিক মাও-তুন বক্তৃতা করছিলেন, দেখ হে—বারুদ আমরাই আবিষ্কার করেছি, কিন্তু তাই দিয়ে বানালাম শুধু আতসবাজি—বাজি দেখিয়ে মানুষকে আনন্দ দিলাম। সেই বারুদ কামান বন্দুকে পুরে মারণ কর্মে লাগাল অন্য জাত। ঠিক তাই, তাবৎ বিশ্ব বাজির হাতে-খড়ি নিয়েছে চীনের কাছ থেকে। আদি আমল থেকে হালফিল অবধি বহুত রকমের বাজি তৈরি করেছে, তারই নমুনা ছাড়ছে মুহুর্মুহু। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে মানুষজন ফুটপাথের উপর বসে পড়ে বাজি দেখছে।

বিপুল এই জনারণ্যের মধ্যে এতটুকু ময়লা কি একটুকরো ছেঁড়া কাগজ বের করুন দিকি! দগ্ধাবশেষ সিগারেট হাতে নিয়ে চলেছি—খুঁজে পেতে আবর্জনার জায়গা না পাই তো শেষ অবধি পকেটে পুরে ফেলতে হবে। যত এগোচ্ছি ভিড় এঁটে আসে। সকলে তাকাতাকি করে আমাদের দিকে—বিশেষ করে আমার পোশাকের প্রতি। হিমরাত্রিতে লম্বা ওভারকোট চাপিয়ে অনেকখানি তবু ঢেকে দিয়েছি। বুকে ব্যাজ—কৌতূহলীদের চোখের উপর সগর্বে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াচ্ছি, পড়ে দেখ সোনার অক্ষরে কি লেখা! দেখছ কি—রবাহুত নই—বড় কর্তাদের নিমন্ত্রণে সকালবেলা ঐ ঊর্ধ্বলোকে ছিলাম। ইচ্ছে করলে এখনো এক লহমায় উঠে বসতে পারি। দর্শন ও পঠন অন্তে নর নারী ঘাড় নেড়ে অভিনন্দন জানায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মজা পেয়ে গেছে—ঘিরে ধরছে আমাদের। কচি কচি হাত টেনে আচ্ছা করে মলে দিচ্ছি। কত খুশি? খিল খিল করে হাসছে মুখের দিকে চেয়ে। বালখিল্যের আরও নতুন নতুন

দল হাত বাড়াচ্ছে নিচের থেকে।

নাচছে এক এক জায়গায়। মানুষ জমে গেছে—বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে দেখছে। নৌ সৈন্যের সঙ্গে নাচছে মেয়েরা। বড় বড় মেয়ে—কলেজের ছাত্রী হয় তো! পবিত্র নিষ্পাপ—মুখ আর হাসি দেখে কণ্ঠের গান শুনে সাধ্য কি আপনি অন্য কিছু ভাবেন! আনন্দের বন্যায় সকলে এক। এক মানুষে ও আর মানুষে তফাত আছে—কোন মূঢ় আজ উচ্চরণ করবে হেন বাক্য! কানামাছি খেলছে এক জায়গায়। এমনি কত! কাছে এসে আল গোছে কাঁধে হাত ঠেকাচ্ছে, কথা তো বুঝব না—নির্বাক ভালাবাসা জানিয়ে যাচ্ছে এমনি করে। বিদেশী আমরা দু জন নিঃসীম এই জনসমুদ্রে দুটো বারিবিন্দুর মতো মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছি।

অথচ, বছর পাঁচ সাত আগেকার খবর নিন—কেমন ছিল এখানটায়? গা ঘিন ঘিন করবে শুনে। কালোবাজারির চাঁদনি-চক—ফাটকা জুয়ার আড্ডা। সন্ধ্যার পর নরক গুলজার—পৃথিবীর যত নোংরামি ও সামাজিক পাপের কথা জানা আছে, সমস্ত একখানে। সে সব ভেঙে এখন চুরমার করে দিয়েছে। ছোট পা পঙ্গু-মেয়ে আর লাস্যবতী পণ্য মেয়ে নেই, খুনি বোম্বেটে, পিঠ-কুঁজো কুলিও নেই—নতুন মানুষ এরা।

একটা নৃত্য চক্রের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি। কয়েকটি হঠাৎ এগিয়ে এলো। হাত ধরে টানছে। একটু না-না করি। কিন্তু হাতের আর ভালবাসার টান—সাধ্য কি এড়িয়ে পালাব! নাচের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। কি হাততালি। আমরা দু'জনেও হাততালি দিই। তার পরে, ও হরি! নাচতে বলছে তাদের সঙ্গে। আকারে ইঙ্গিতে বলে, তবু বুঝতে আটকায় না। কিন্তু সাহসটা কি—আমরা কি দূরের মানুষ, অবোধ ছেলেমেয়েরা ঠাহর পাচ্ছে না। কথা বুঝবে না—ঠাহর করাই বা কি করে? আবার দেখিয়ে দিচ্ছে, কেমন কায়দায় নাচতে হয়। আসরের মধ্যেই নাচের ক্লাস। নৃত্য গুরুর বয়স—তা বছর দশেক হবে বই কি! পরম গাম্ভীর্যে আনাড়ি ছাত্রদ্বয়কে হস্ত পদ চালনার প্রণালী শেখাচ্ছে। নেশা লেগে গেল। আহা, এই সুদূর দেশে এদের মধ্যে আবার একটা দিন কয়েকটা মুহূর্ত যাই না কেন ছেলেমানুষ হয়ে! কে দেখছে যে মহাবিজ্ঞ অমুক মহাশয় শিশুসুলভ চাপল্যে মত্ত হয়ে পড়েছেন! গিয়েই ভালমানুষ হয়ে শুয়ে পড়ব। কাল থেকে শান্তি-সম্মেলন—অনবসর কর্মপ্রবাহ, তাবৎ বিশ্বভুবনের জন্য দুশ্চিন্তা, তার মধ্যে কেউ খোঁজই পাবে না এক রাত্রের এই ক্ষণিক মতি-বিভ্রম।

আমি নাচছি, নাচছেন ব্রজরাজ। ঢেঙা মানুষ তিনি, মাথায় চকচকে টাক—আর আমি কিঞ্চিৎ গায়ে-গতরে আছি। সিনেমা-ছবিতে লরেল-হার্ডিকে দেখে থাকেন, ধরে নিন তেমনি একটি জোড়া। বিলাতি পোশাক বলে ব্রজ-রাজের কিছু বাঁচোয়া। আমার আবার একখানা হাত সতত কোঁচা ধারণ করে আছে। নাচের বাহার আন্দাজ করে নিলেন তো রসগ্রাহী পাঠক-সুজন?

এতেই রক্ষা নেই—একের পর এক আসছে হাত ধরে এক একপাক নাচবার জন্য। বাজনা বাজছে, গাইছে সকলে। কি গান বুঝিনে—একই কথা বারংবার আবৃত্তি করে যাচ্ছে। আমরাও করছি তাই। একটা ছোট মেয়ে—মাথায় লাল রিবন—তিড়িং করে এসে পড়ল আমাদের চক্রের মধ্যে। পঞ্চাশ আর পাঁচে হাত-ধরাধরি করে ঘুরঘুর করে নাচছি। সে তাজ্জব দেখলেন না চোখে—লেখা পড়ে কি মজা পাবেন! আবার ভুল বাতলে দেয়—অমন নয়, পা ফেল, এমনি-এমনি করে। আরো বেতালা হয়ে যাচ্ছে আপনাদের কথা স্মরণ করে। হেন নৃত্যের পর আপনারা হলে কি কাণ্ডটা করতেন—টিটকারি না ই দিলেন, হেসে ফেটে পড়তেন। অথবা মুখে কাপড় দিয়ে প্রাণপণে হাসি চাপতেন—সেইটে হল আরও মারাত্মক। আর এই বাচ্চার দল, দেখুন, ভারি ভদ্রলোক—মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, শ্রদ্ধা সম্ভ্রম আর আনন্দ জলজল করেছে মুখের উপর।

এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম কতক্ষণ। আবার এক জায়গায় গ্রেপ্তার করে আসরে নিয়ে দাঁড় করাল—নাচতে হবে। অত ফেলনা নই বাপু, যে বললেই অমনি নাচতে লেগে যাবো। এখন মনে হচ্ছে, নেচেছি নিশ্চয় উত্তম। দেখে তাক লেগে গেছে, তাই এমনিধারা পশার। এই মওকায় কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করব নাকি পিকিন অপেরা দলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে? সে অবশ্য পরের কথা আপাতত এক নাচনেই হাঁপিয়ে পড়েছি—প্রাণপক্ষী পঞ্জর-পিঞ্জরের মধ্যে পাখা ঝাপটাচ্ছে॥ দু-হাত নেড়ে সোজা বেকবুল যাই। হবে না—কোন উপায় নেই। ওরাই আমাদের ঘিরে নাচে তখন। স্বপদে না নাচলেও হাততালি দিয়ে তাল রাখছি। তালমাত্রায় কেমন পরিপক্ক হয়ে গেছি, এই আধঘন্টাখানেকের ভিতর। বাজিতে বাজিতে আকাশে আগুন ধরবার যোগাড়। চাঁদ হাসছে। নাক-ঢাকা পরে ঘুরছে অনেকেই—বারুদের বাতাসে নিশ্বাস নিলে স্বাস্থ্য খারাপ হবে। এই স্বাস্থ্য-স্বাস্থ্য করেই এরা মরবে— আমি নিরঙ্কুশ কেমন দেখুন দিকি!

রাত অনেক হয়েছে, উৎসবের তবু ক্ষান্তি নেই। ফিরে আসছি আনন্দোন্মাদ জনতার মধ্যে দিয়ে। এ ছবি আর কোথাও দেখব! মানুষে মানুষে এমন মেশামেশি, নিশিরাত্রে একসঙ্গে গাইছে বড় বড় ছেলে আর মেয়ে! হাতধরা-ধরি করে নাচছে—

ব্রজরাজ জিজ্ঞাসা করেন, কেমন দেখলেন?

'স্বর্গীয় শান্তির দরজা' ঐ সামনে—এই তো স্বর্গধাম!

কি বলেন, স্বর্গ তো মানেই না এরা—

পাঁকের জীব আকাশের দিকে হাত বাড়ায়। স্বর্গের উল্লাস মাটিতে যারা নিয়ে আসছে, আর-এক স্বর্গ কি করবে তারা?

আরও খবর পাচ্ছি ক্রমশ। ক্ষিতীশ গায়ক মানুষ—কাঁধে কাঁধে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে তাকে। গাইতে গাইতে গলা ভেঙে সে ফিরল। রোহিনী ভাটে

আর চক্রেশও পাগল হয়ে নেচে বেড়িয়েছেন। সবাই ফিরছেন হোটেলে। নেচেকুঁদে রাক্ষসের খিদে নিয়ে আসবে—ঘরে ঘরে এক গাদা করে স্যাণ্ডউইচ আর কলা-আঙুর-আপেল দিয়ে গেছে। দেড়টা বাজল, রাস্তার বাজনা শুনতে পাচ্ছি এখনো। সারা রাত্রি এমনতরো মচ্ছব চলবে নাকি?

এখন একটা চিন্তা। আজকের বৃত্তান্ত দেশে-ঘরে না পৌঁছায়! এমনি তো সভায় কুল পরিমাণ—সাহিত্য-ব্যাপারে আছে, চীনের কথা শোনবারও বিস্তর হুকুম আসবে। কত আর অজুহাত রচনা করা যায় বলুন! না না করেও হাজির হতে হবে বহুত গুণীজনের সামনে। এর উপর নাচের খবর প্রচার হয়ে গেলে মারা পড়ব। পিকিন-রাস্তায় নেচে এসেছি—অতএব বক্তৃতাদি খণ্ডে সুনিশ্চিত নৃত্যের ফরমাস হবে। আমার শত্রু বাড়বে—পেশাদার নাচিয়েরা ভাববেন, চীন থেকে ফিরে এই বুঝি আবার এক নতুন লাইন ধরল। তা আমিও সঙ্কল্প করেছি, সে নাচ কিছুতেই দেখাবো না আপনাদের। রাগ করলে নাচার। বলবার কথা আছে—এনে দিন আমার সেই দেব-শিশু নৃত্যসঙ্গী ও সঙ্গিনীদের। আর দশ বছরের সেই নৃত্যগুরুকে—পা ফেলবার কায়দাগুলো যে বাতলে দেবে। আর সেই পিকিন-পথের রসিক দর্শককুল—মাধুরীময় দৃষ্টি দিয়ে যারা অভিনন্দন করবে। দিলখোলা খুশির প্রবাহ চতুর্দিকে; আকাশে চাঁদ; আলো, আতশবাজি ও বাজনায় মর্তলোকে ইন্দ্রপুরি। পারবেন জোটাতে এত সব? তবে রাজি আছি। নয় তো সে-ই আমার জীবনের প্রথম নাচ এবং সে-ই শেষ।

এইখানে একটু দাঁড়ি টানি। প্রথম পর্বের ইতি। কাল দোসরা অক্টোবর—মহাত্মাজীর জন্মদিন। প্রত্যূষে তাঁর স্মৃতির আরাধনা। রবিশঙ্কর মহারাজ পুরোধা। শান্তি-সম্মেলনের শুরু তার পরে। আমার চীনের কাহিনীর পরের অধ্যায়।

প্রায় একটানা প্রশংসা চলল এত দিন। নিজেরই লজ্জা করছে। নিছক ভালো ভালো বস্তু নিয়ে ধর্মব্যাখ্যা হতে পারে, কাহিনী জমে না। থাকত দেবাসুর অথবা সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব—আপনারা রোমাঞ্চিত কলেবরে পড়তেন। বুঝি—সমস্ত বুঝি। আর ভেবেওছিলাম, দিই এক আধটা কাল্পনিক ভিলেন ছেড়ে কাহিনীর মধ্যে। কিন্তু সেই যে যাত্রা-মুখে কয়েকটি তরুণ বন্ধুকে কথা দিয়েছিলাম, নিজের চোখে-দেখা জিনিস ও অন্তরের উপলব্ধি হুবহু লিখব—তাই কাল হয়েছে। মন্দ মানুষ তবে কি কুলো বাজিয়ে একেবারে দেশ ছাড়া করেছে? এতখানি বিশ্বাস করি নে। সেই ভরসায় যথাযথ খোঁজাখুঁজিও করলাম। কিন্তু তাঁরা এমন গা-ঢাকা দিয়ে রইলাম যে কোন রকমে পাত্তা পাওয়া গেল না। অদৃষ্ট আমার—আর কি বলব। খোঁজ পেলে তো লেখা মজাদার করা যেত। চীনকে যারা নখের উপর তুলে টিপে মারতে চান সেই মহদাশয়েরাও কিঞ্চিৎ স্ফূর্তি পেতেন।

প্রথম পর্ব শেষ

॥ এক ॥

সে কি আজকের কথা ?

মহিম বি. এ পাশ করলেন। অঙ্কে অনার্স পেয়েছেন। মহিমারঞ্জন সেন বি. এ. (হনস্)। নামের শেষে লেখে না কেউ এসব, রেওয়াজ উঠে গেছে। কিন্তু য়্যুনিভার্সিটির ডিগ্রি—লিখবার এক্তিয়ার আছে ষোল আনা।

গাঁয়ের ছেলে, আলতাপোল গ্রামে বাড়ি। পাশও করেছেন মফস্বল-শহর থেকে। খবর বেরুনোর পরে পাড়ার এবাড়ি ওবাড়ি থেকে পায়েসটা তালক্ষীরটা খাবার নিমন্ত্রণ আসছে। মা বললেন, এত দিনের কষ্ট সার্থক হল বাবা। কাজটাজ ধরতে হবে এইবারে একটা। পায়েস-পিঠে খেয়ে হাসিখুশিতে যাতে চিরকাল কাটে। চাকরির যোগাড় দেখ—যেমন-তেমন চাকরি ঘি-ভাত। মাছনার সাতু ঘোষ বাপের শ্রাদ্ধে বাড়ি এসেছে, তার কাছে যা একদিন। সে যদি কিছু করে দেয়।

সাতকড়ি ঘোষ কলকাতায় থাকেন। নানা রকমের ব্যবসা, সেই সূত্রে ভাল ভাল লোকের সঙ্গে দহরম-মহরম। রোজগারও ভাল—বাপের শ্রাদ্ধের আয়োজন দেখে বোঝা যাচ্ছে। চার গ্রামের সমাজ ডেকে বসেছেন। এ হেন সাতু ঘোষ চেষ্টা করলে কোন একখানে কি লাগিয়ে দিতে পারবেন না? ঠিক পারবেন।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটলে মহিম একদিন গেলেন মাছনায় সাতু ঘোষের কাছে। শুনে সাতু ঘোষ মহিমের পিঠে সশব্দে এক থাবা ঝেড়ে বললেন সাবাস! আমাদের গৌরব তুমি, ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছ। আমার সঙ্গে চল, আমার কাছে থাকবে। কোন চিন্তা নেই। ও মা, ও পিসিমা, ও মেজদি, দেখে যাও তোমরা। খুশিটা গেল কোথায়, একটু চা করে দিলেও তো পারে। ও, তুমি চা খাও না? তবে থাক। দেখ মা, বি. এ. পাশ করেছে এই ছেলে অনার্স নিয়ে। বিদ্যের জাহাজ। আর চেহারাটাও দেখ—রাজপুত্তুর। এক্সারসাইজ করে থাক ঠিক—ডাম্বেল, মুগুর, হরাইজেন্টাল-বার? নয়তো এমন চেহারা খোলে না। আছি আমি আরও হপ্তা দুই। কারো গোলামি করি নে, ইচ্ছাসুখে ঘুরে বেড়াব। যাবার আগে তোমায় খবর দেব। একসঙ্গে যাব দুজনে।

এতেই হল না। একদিন সকালবেলা সাতকড়ি হাঁটতে হাঁটতে নিজে চলে

এলেন আলতাপোলে। মহিমের মায়ের সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করলেন : খুড়িমা, কাজকর্মে শহরে পড়ে থাকি। অনেকদিন পরে পিতৃদার উদ্ধারের জন্ত বাড়ি এলাম। তারপরে কেমন আছেন আপনারা সব ?

মহিমের মা পিঁড়ি পেতে বসতে দিলেন। ছেলের কথা তুললেন : তুমি বাবা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছ, শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। চেষ্টা করে যদি একটা কাজকর্ম করে দিতে পার।

পরশু যাচ্ছি, সেই খবরটাই দিতে এলাম। বলি, লোক পাঠিয়ে খবর দেবার কি, নিজে যাই না কেন হাঁটতে হাঁটতে। খুড়িমার পায়ের ধুলো নিয়ে সামনাসামনি কথাবার্তা বলে আসি। আপনি বোধহয় জানেন না খুড়িমা, কলকাতায় গিয়ে প্রথম আমি রঙ্গলাল কাকার বাসায় উঠি। মুখ্যু মানুষ আমি, 'ক' লিখতে কলম ভাঙে—তবু যে অমন শহর জায়গায় করে খাচ্ছি, গোড়ায় তাঁর খুব সাহায্য পেয়েছিলাম সেই জন্ত। সে কথা ভুলতে পারি নে। তিনি রান্না করতেন, আমি কলতলায় জল ধরে আনতাম, বাটনা করতাম। এনামেলের ডিসে ভাত বেড়ে খেতাম দুজনে। উঃ, আজকের কথা। মহিম তখনও পাঠশালায় যাবার মতো হয়নি। তারপরে রঙ্গলাল কাকা একটা কাঠের আড়তে ঢুকিয়ে দিলেন। তিন টাকা মাইনে আর খাওয়া। আমি লোকটা মুখ্যু হই যা-ই হই, উপকারের কথা মনে রাখি। সেই কাঠের আড়তের সঙ্গে সম্পর্ক আজও বজায় আছে, তাদের দিয়ে অনেক কাজকর্ম করাই। মহিমকে আমি নিয়ে যাচ্ছি, নিজের কাছে রাখব। আমারও একজন শিক্ষিত লোকের দরকার। ব্যবসা বড় হয়ে যাচ্ছে, নানান জায়গায় ইংরেজিতে চিঠিপত্র লিখতে হয়। আজকালকার ব্যবসায়ে অনেক রকম ব্যাপার—বাইরের লোককে ঘাঁতঘোত কেন শেখাতে যাব ? নিজের লোক পেয়ে গেলাম, ভাল হল।

একগাদা কথার তুফান বইয়ে দিয়ে, সাতু ঘোষ উঠলেন। মহিমের বিধবা বড় বোন সুধা এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, এত খাতির কি জন্তে বুঝতে পার মা ?

উনি যদ্দিন বেঁচে ছিলেন, পরের জন্ত বিস্তর করে গেছেন। ওঁর কাছে সাতু ঘোষ উপকার পেয়েছিল।

সুধা হেসে বলেন, উঁহু। কবে ঘি খেয়েছে, সেই গন্ধ বুঝি এতকাল লেগে থাকে মা। সাতুর এক সোমত্ত ছোট্ট বোন আছে, খুশি-খুশি করে সবাই ডাকে, সেই মেয়ে গছাবার তালে আছে। পশ্চিম-বাড়ির ছোটবউ মাছনার মেয়ে। তার কাছে সমস্ত শুনলাম। খাঁদা-নাক চ্যাপ্‌সা গড়নের মেয়ে, রং কালো—

মা ঘাড় নেড়ে বললেন, সে হবে না। কিছুতে নয়। এক ছেলে আমার। তোমাদেরও একটি ভাজ। টুকটুকে বউ ছাড়া ঘরে আনব না। সাতু ঘোষ যতই করুক, এ কাজ হবে না। যাক গে, এখন রা কাড়বে না কেউ। বিয়ের কথাবার্তা মুখের আগায় আনবে না। চলে যাক মহিম, কাজকর্মে লেগে পড়ুক। তার পরে ওসব।

সাতু ঘোষের সঙ্গে মহিম রওনা হয়ে গেলেন। বাপ রঙ্গলাল কলকাতায় থাকতেন। নানান ঘাটের জল খেয়ে হাইকোর্টের এক বাঙালি জজের বাড়ি স্থিতি হয়েছিল তাঁর অবশেষে। কায়েমি ভাবে থাকলেন সেখানে। অনেকগুলো বাড়ি জজসাহেবের—বাড়ি-ভাড়া আদায়, বাড়ি মেরামত, বাড়ি সম্পর্কিত মামলা-মকদ্দমা, এইগুলো প্রধান কাজ। বাড়তি ঘরোয়া কাজকর্মও ছিল, জজগিন্নি বড় ভালবাসতেন রঙ্গলালকে, তাঁর অনেক ফাইফরমাশ থাকত। রঙ্গলাল যখন দেশে আসতেন স্ত্রীর জন্য শাড়ি-সিঁদুর-আলতা কিনে দিতেন জজগিন্নি।

ছেলে হল না, বংশলোপ হয়ে যায় বলে মনে দুঃখ। অবশেষে বুড়া বয়সের ছেলে মহিম। মহিমের বয়স যখন ছয়, চাকরি ছেড়ে সাংঘাতিক অসুখ নিয়ে রঙ্গলাল আলতাপোল চলে এলেন। জ্বর, কাশি, মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত ওঠে—কেউ বলে রক্তপিত্ত, কেউ বলে যক্ষা। বছর দুই ভুগে নাবালক ছেলে এবং দুই অবিবাহিত মেয়ে রেখে তিনি চোখ বুজলেন। তারপরে সেজগিন্নি দুটো মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, ছেলেকে বি. এ. অবধি পড়ালেন। বুদ্ধিমতী এবং শক্ত মেয়েমানুষ তিনি। সেইজন্যে পেরেছেন।

রঙ্গলাল সেন—যিনি বলতে গেলে কলকাতার উপর জীবন কাটিয়ে গেছেন—তাঁরই বি. এ. পাশ-করা ছেলে মহিম শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন। চোখে বুঝি পলক পড়ে না।

সাতু ঘোষ বলেন, হল কি তোমার ?

এত মানুষজন যাচ্ছে কোথায় ?

সাতকড়ি অবাক হলেন। বি. এ. পাশ করল—কলকাতায় না আসুক, এতাবৎ কালের মধ্যে লোকের মুখেও শোনেনি শহর-কলকাতা কি বিরাট বস্তু !

হাসি চেপে নিয়ে বললেন, যাচ্ছে ওরা রথের মেলায়।

হাঁদারাম তবু ধরতে পারেননি। বিড়বিড় করে হিসেব করে নিয়ে বললেন, রথ এখন কোথায় ? আরও তো এক মাসের উপর বাকি।

সাতু ঘোষ বলেন, নিত্যরোজ রথের মেলা এই শহরে। বারোমাস, তিরিশ দিন।

মনে মনে হতাশ হলেন তিনি। একেবারে উৎকট গেঁয়ো—এ মানুষকে দিয়ে ব্যবসায় কাজ কদ্দুর হবে কে জানে!

মেসে থাকেন সাতু ঘোষ। জাঁদরেল নাম মেসের—ইম্পিরিয়াল লজ। রাস্তার উপরের ছোট একখানা ঘর সম্পূর্ণ নিয়ে সাতু ঘোষ আছেন। সেই রাস্তার দরজার উপর তাঁর নিজস্ব আলাদা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড: ঘোষ এণ্ড কোম্পানি, কণ্ট্রাক্টর্স, বিলডার্স, ব্যাঙ্কার্স, জেনারেল মার্চাণ্টর্স, অর্ডার সাপ্লায়ার্স —ছোট অক্ষরে হিজিবিজি আরও অনেক সব লেখা। যত রকম ব্যবসার কথা মানুষের মাথায় আসে, লিখতে বোধহয় বাকি নেই। সাতু বলেন, কেন লিখব না? সাইনবোর্ডের মাপ হিসাবে দাম। কথা দুটো বেশি হল কি কম হল, দামের তাতে হেরফের হয় না।

সরু একটা দরজা দিয়ে ভিতরের উঠানে ঢুকে সাতকড়ি ওদিককার দরজার চাবি খুলে ফেললেন। হাঁক দিয়ে উঠলেন: ও ঠাকুর, ফ্রেণ্ড আছে আমার একজন। পার্মানেণ্ট ফ্রেণ্ড। খেয়াল রেখো।

ঘরে ঢুকে বাইরের দিককার দরজা খুললেন না। বলেন, রাতের বেলা এখন শয়নকক্ষ। দিনমানে অফিস—সেই সময় ও-দরজা খুলি। বাইরের লোকজন আসে।

চেয়ারগুলো ঠেলে ঠেলে একপাশে করছেন। একটুখানি জায়গা বেরুল। মাদুর পেতে ফেললেন মেঝেয়। বালিশ-চাদর কাঠের আলমারির ভিতরে থাকে, তা-ও বেরুল।

বলছেন, ঘর একেবারে পাওয়া যায় না। পাশাপাশি দুখানা ঘর হলে হয়—একটায় অফিস, একটায় বেডরুম। তোমায় বলব কি ভাই, চার বচ্ছর আজ পা লম্বা করে শুইনি। সরিয়ে ঘুরিয়ে বিস্তর দেখেছি, এর বেশি আর জায়গা বেরয় না। বাড়ি গিয়ে এদ্দিন পরে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে বাঁচলাম।

মহিম সবিস্ময়ে বলেন, কিন্তু যেদিকে তাকাচ্ছি শুধুই তো বাড়ি। ভাবছি, এত ইট পেল কোথায়? তবু বলছেন, লোকের ঘর জোটে না?

লোকও যে পোকার মতন কিলবিল করছে। কত লোক ফুটপাথে পড়ে থাকে, রাত্তিরবেলা রাস্তায় বেরিয়ে দেখো। বেরতেও হবে তো মাঝে মাঝে।

খাওয়াদাওয়া সেরে পান চিবাতে চিবাতে সাতকড়ি মহিমের জায়গা দেখিয়ে দেন: আমার পাশে ঐখানে তুমি গড়িয়ে পড়। বাব্বা, ছাতি যা চওড়া—চীৎ হয়ে শুলে তো পাক্কা দু-হাত ভুঁই লেগে যাবে তোমার। মুশকিল! টেবিলটা আরও একটু ঠেলে দাও দিকি। কাজকর্ম সেরে শুতেশুতে ক-ঘণ্টাই

বা বাকি থাকে! কত লোকে তো বসে বসেই ঘুমোয়। সেই রকম মনে করে নাও। তারপরে মা গন্ধেশ্বরী আর বাবা গণেশের দয়ায় ব্যবসায়ে উন্নতি হয় তো তখন দু-পাশে দুই পাশবালিশ নিয়ে গদিয়ান হয়ে শোব। কি বল?

সাইনবোর্ডে ভারি ভারি কাজকারবারের নাম দেখে মহিম ভেবেছিলেন না জানি কত বড় ব্যাপার। শোওয়ার গতিক দেখে মুষড়ে গেলেন। শুয়ে শুয়ে যতক্ষণ ঘুম না আসে, অনেক কথা শুনলেন ব্যবসা সম্পর্কে। হাতেগাঁটে একটি পয়সা এবং পেটে এককোঁটা বিদ্যে না নিয়ে শুধুমাত্র অধ্যবসায়ের জোরে সাতু ঘোষ এতদূর গড়ে তুলেছেন। আশা পর্বতপ্রমাণ বলেই সাইনবোর্ডে বড় বড় কাজের ফিরিস্তি। একদিন ঐ সমস্ত করবেন নিশ্চয়ই, সাইনবোর্ডের লেখা ষোল আনা সত্য হবে। মহিমের মতো শিক্ষিত আপনার লোক পাবার পরে একেবারে নিঃসংশয় হয়ে গেছেন। আপন লোকের এই জন্য দরকার যে ব্যবসায়ের গুহ্যকথা মরে গেলেও বাইরে চাউর হবে না। কলকাতা শহর হল চালিয়াতের জায়গা—খদ্দের চালিয়াত, ব্যবসাদার চালিয়াত, দালাল-মহাজন সবাই চালিয়াত। ভিতরের অবস্থা যা-ই হোক, লম্বা লম্বা বচন ছাড়ে—ওর থেকে খোলা বাদ দিয়ে সারটুকু বুঝে নিতে হয়। সেই খোলার পরিমাণ সাড়ে-পনের আনাই কোন কোন ক্ষেত্রে।

আলো-নেবানো অন্ধকার ঘর বলে সাতু ঘোষ দেখতে পেলেন না, শহরের মানুষের রকম শুনে মহিমের মুখ আমসি পারা হয়ে গেছে। কী সর্বনাশ, সকলের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে বেড়াতে হবে? মিথ্যাচার অহরহ?

সাতকড়ি বলে যাচ্ছেন, পাড়াগাঁয়ের মানুষ তুমি। গোড়ায় গোড়ায় অসুবিধা লাগবে, পরে ঠিক হয়ে যাবে। একদিন আমারই উপর দিয়ে চলবে, এই বলে রাখলাম। শহরের জলের গুণ আছে। ঘুমোও এখন তুমি, সকালবেলা কাজে নিয়ে যাব।

সকালবেলা সাতু ঘোষের সঙ্গে মহিম কাজ দেখতে বেরলেন। কাঠের আড়তে গেলেন, সাতু ঘোষের সর্বপ্রথম চাকরি যেখানে।

অনেক দিন তো ছিলাম না, বাক্সগুলো কদ্দুর?

প্রায় হয়ে গেছে। এই মাসের ভিতর ডেলিভারি দেব।

খুব খাতির দেখা গেল সাতুর। যাওয়া মাত্র সিগারেট এনে দিল, চায়ের ফরমাস হয়ে গেল। দারোয়ান সঙ্গে করে পিছন দিকে নিমগাছতলায় গেলেন। চৌকো সাইজের পাইপের মতন জিনিসটা—কাঠ দিয়ে বানানো। পনের-বিশ

হাত লম্বা—ভিতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে অক্লেশে এদিক-ওদিক করা যায়। বাক্স হল এর নাম?

বাক্সই বলে। সুন্দরবন অঞ্চলে সাহেবের আবাদের অর্ডার। বাঁধ বেঁধে নদীর নোনাজল ঠেকায়—সেই বাঁধের মাঝে মাঝে বাক্স বসিয়ে দেয় এই রকম। আবাদের খোলে জল বেশি হয়ে গেলে দরকার মতো বের করে দেওয়া চলে। কিন্তু নদীর নোনাজল এক ফোঁটাও ভিতরে ঢুকবে না, বাক্সের মুখ আটকে যাবে জলের চাপে।

হঠাৎ এক টুকরো কাঠ তুলে দিয়ে সাতকড়ি গরম হয়ে বলেন, এটা কি হচ্ছে, সেগুন লাগাতে কে বলল? এই রকম বর্মা-সেগুন?

হেঁ-হেঁ করে হাত কচলাচ্ছে—লোকটা আড়তের মালিকই বোধ হয়। বলল, সেগুন কাঠের বাক্স বলে অর্ডার—তাই ভাবলাম, অন্তত বাক্সর বাইরের মুখটায় দু-চার টুকরো সেগুন থাকা ভাল।

সাতকড়ি বলেন, ভাবাভাবির তো আপনার কিছু নেই মশাই। অর্ডার সেগুনের তো হবেই। নয়তো দাম বাড়বে কিসে? আপনাকে জারুল দিতে বলা হয়েছে, তাই দেবেন। থাকবে বাঁধের নিচে, সেখানে জারুল কি সেগুন কে দেখতে যাচ্ছে?

জারুল কাঠেরই হল তা আগাগোড়া। বাক্সের মুখটা বাইরে থাকছে—সেইজন্যে ভয় হল, কি জানি, কাঠের কারচুপি সাহেবের যদি নজরে পড়ে যায়।

ভয়ের কিছু নেই। বলতে বলতে এবারে সাতু হেসে বললেন: সাহেবের নজর পড়বে না, তার উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে। কেউ আঙুল দিয়ে দেখাবে—এইটে সেগুন এইটে জারুল, তবেই তো নজর পড়বে। কেউ তা করতে যাবে না, সব মুখে ছিপি-আঁটা। কেউ পনের কেউ বিশ—যে মুখের যে রকম খোল। দামী কাঠকুটো সরিয়ে ফেলুন মশায়, মিস্তিরি ভুল করে হয়তো বা লাগিয়ে বসল দু-একখানা।

সেখান থেকে নিয়ে চললেন, ওঁদের বন্দোবস্তে একটা বাড়ি বানানো হচ্ছে সেই জায়গায়। ট্রামে চলেছেন। বেজার মুখে সাতকড়ি বলেন, এইরকম ভিড় ঠেলে কাজকর্ম হয় নাকি? একদিন জুড়িগাড়ি হাঁকাব দেখ না। কোচোয়ান জুতো ঠুকে ঘণ্টা বাজিয়ে পথের লোক সরাবে। গাড়ি থামলে উর্দি-পরা সহিস দোর খুলে দেবে পিছন থেকে নেমে এসে। তাড়াতাড়ি কাজকর্মগুলো শিখে নাও, সোজাসুজি আমরা কনট্রাক্ট ধরব।

ব্যবসার হালচাল মুখে মুখে কিছু শুনিয়ে যাচ্ছেন। বড় বড় কোম্পানি

আছে, তাদের অনেক টাকা, বিস্তর তোড়জোড়—যত কনট্রাক্ট তারাই বাগিয়ে নেয়। নিয়ে তারপর সাব-কনট্রাক্ট দিল আর একজনকে। কিছুই না করে কুড়ি মেরে কিছু পয়সাকড়ি বের করে নিল। সাব-কনট্রাক্টরেরও নিজে করতে বয়ে গেছে। কাজ ভাগ ভাগ করে একে খানিকটা ওকে খানিকটা দিয়ে দেয়। আমায় ঘোষ কোম্পানি হল এরও দু-তিন ধাপ নিচে, আমার নিচে আর নেই। রস আগে থেকে সব চুমুক মেরে নিয়েছে—আমার হলগে, কাজকর্ম নিজে দেখাশুনো করে শিটে নিংড়ে যদি কিছু বের করতে পারি। ভাঁড়ে মা-ভবানী যে—খালি হাতে কত আর খেল দেখাব? তবে এ দশা থাকবে না বেশিদিন। পয়সা উড়ে বেড়াচ্ছে—কায়দা শিখে গেছি, তোড়জোড় করে ধরে নেওয়ার ওয়াস্তা।

একদিন খুব রাত করে ফিরলেন সাতু ঘোষ। মহিম খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছেন। সাতকড়ি ফিসফিসিয়ে ডাকেন, শোন। ঘুমিয়ে পড়লে এর মধ্যে? উঠতে হবে, কাজ আছে।

মহিম ধড়মড় করে উঠে বসলেন। সাতকড়ি বলেন, নতুন রাস্তায় যে চারতলা বাড়িটা হচ্ছে, সেইখানে চলে যাও। মোড়ের কাছে লরী দাঁড়িয়ে আছে, ড্রাইভারের পাশে উঠে বোসোগে। এই চাবি নাও গুদোমের। তোমায় কিছু করতে হবে না। লরীতে কুলিরা আছে, যা করবার তারাই সব করবে।

যন্ত্রচালিতের মতো মহিম হাত পেতে চাবি নিলেন। লরী গেল নতুন রাস্তায়। ঠিক রাস্তার উপর নয়, পাশে আধ-অন্ধকার গলিতে। ড্রাইভার নেমে গিয়ে বড় রাস্তায় সতর্কভাবে ঘোরাঘুরি করছে। হঠাৎ একবার এসে ফিসফিসিয়ে বলে, খুলুন এইবারে গুদোম। তাড়াতাড়ি। খুব তাড়াতাড়ি।

গুদামের দরজা গলিতেই। চাবি খুলে ফেলে বস্তা বস্তা সিমেন্ট লরীতে তুলে ফেলেছে। আঁটি আঁটি লোহার রড। গা কাঁপে মহিমের। সাদা কথায় এর নাম চুরি। আজকের আমদানি এইসব মাল। দিনমানে এই লরীতেই বয়ে এনে হিসাবপত্র করে তুলেছে, রাত্রিবেলা সরিয়ে দিচ্ছে। সাতু ঘোষ নিজে না এসে তাঁকে পাঠালেন। ধরে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে জেল। লেখাপড়া শিখে শেষটা সাতু ঘোষের চুরির কারবারে এসে ভিড়লেন। এ কাজে থাকলে আজ না হোক কাল জেল আছে অদৃষ্টে। চালাক মানুষ সাতকড়ি—তিনি নিজে এগোন না, পর-অপর দিয়ে সারেন। মরতে হয় তো মর তোমরা, উনি সাচ্চা থেকে যাবেন। সাংঘাতিক মানুষ!

ঘণ্টা তিনেক পরে লরী আবার মহিমকে মোড়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে গেল, যেখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। মেসে দরজায় গিয়ে টোকা দিলেন। মৃদু টোকা দেবার কথা, কড়া নাড়তে মানা করেছেন সাতকড়ি। জেগে বসে আছেন তিনি, দরজা খুলে ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন। মহিমের বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করছিল, ধড়ে প্রাণ এল এতক্ষণে। ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিয়ে বাঁচলেন।

সাতকড়ি বলেন, হয়ে গেল সব? মাল পৌঁছে গেছে বর্মণ মশায়ের ঘরে?

মহিম বললে, পিতৃপুণ্যে বেঁচে এসেছি দাদা।

সাতু ঘোষ হাসেন: ভয় পেয়ে গেছ। মফস্বলের মানুষ কিনা! ব্যবসার মধ্যে ঢুকে যাও ভাল করে, তখন আর এসব থাকবে না।

কিছু উত্তেজিত হয়ে মহিম বলেন, ব্যবসা কি বলছেন—এ তো চুরি! স্পষ্টাস্পষ্টি চুরির ব্যাপার। আইন সদরে মফস্বলে এক। ধরতে পারলে জেলে নিয়ে পুরবে।

ধরতে পারবে না। সেইটে জেনে বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ কর। ব্যবসাই হল তো এই।

দেখুন, অনেষ্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি—সাধুতাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। সাচ্চাপথে কাজ করে যান, আপনি উন্নতি হবে।

ক্ষণকাল অবাক হয়ে সাতু ঘোষ মহিমের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

এই সেরেছে! ওই সমস্ত পড়ে এসেছ বুঝি বইতে? মাথার মধ্যে গজগজ করছে। ভুলে যাও, ভুলে যাও। নয়তো কিছু করতে পারবে না জীবনে। ওসব এগজামিন পাশ করতে লাগে, সাংসারিক কাজকর্মে পদে পদে বাগড়া দেবে। মন থেকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে ফেল।

মহিম সোজাসুজি প্রশ্ন করেন, আমায় কি এই কাজের জন্যে নিয়ে এলেন দাদা?

দায়ে-বেদায়ে করতে হবে বইকি! কনট্রাক্টরি লাইনে নতুন আসছি, এখন যেখানে জল পড়বে সেইখানে ছাতা মেলে ধরতে হবে। আমি এই করব তুমি ওই করবে—ভাগ করে বসে থাকলে হবে না। জমিয়ে নিই একবার, তখন ফাইল সাজিয়ে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বোসো। দরদাম ঠিক করে বর্মণের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে এসেছি—পাঁচ টন মাটি আর বারো হন্দর রড রাতের ভিতরে পৌঁছে যাবে। সকালে এই মালই হয়তো অন্য কোথাও সাপ্লাই দেবে বর্মণ।

হেসে ফেলে বললেন, হয়তো আমাদেরই কাছে। সকালবেলা আমাদেরই গুদোমে আবার এসে উঠবে।

দেখুন বড্ড ভয় করছিল আমার—

সাতু ঘোষ উদার ভাবে বললেন, গোড়ায় গোড়ায় করবে এইরকম। আমাদেরই কি করত না? কিন্তু যে বিয়ের যে মন্তোর। ধুকপুকানি থাকলে কাজ হবে কি করে।

মহিম বলেন, জানেন না দাদা। দুটো কনেস্টবল পাহারা দিচ্ছিল নতুন রাস্তায় ঐ জায়গাটায়।

অনেক বাড়ি উঠছে ঐ তল্লাটে। একটা কথা উঠেছে, রাতে নাকি গুদোমের মাল পাচার হয়ে যায়। বাড়ির মালিকের বড্ড সন্দেহ-বাতিক, পুলিশে তদ্বির করে বাড়তি কনেস্টবলের ব্যবস্থা হয়েছে ওদিকটা। কিন্তু কনেস্টবলে যদি মাল ঠেকানো যেত!

মহিম বলেন, টহল দিতে দিতে কনস্টেবলরা অন্য দিকে চলে গেল, তাই। ড্রাইভার এসে বলল, এই ফাঁকে—

অন্য দিকে গেল তো! যাবেই।

মানে?

নয়তো ফাঁক বুঝে তোমরা মাল সরাবে কেমন করে? ভাল লোক ওরা। অবস্থা বিবেচনা করে সরে পড়ল।

মহিম ভেবে দেখছেন, সেই রকমই বটে। কিন্তু সিমেন্ট পাচার হয়ে গেল তো গাঁথনি হবে কিসে?

যা আছে তাই দিয়ে হবে। কাল থেকে দশটা বালিতে একটা সিমেন্ট দেবে। তোমায় বলা রইল।

তিনটেয় একটা দেবার কথা। সেই স্পেসিফিকেশনে কাজ হয়ে আসছে। বাড়িওয়ালার তরফে এতদিন ওভারশিয়ার ছিল, তার মাথার উপরে পাশ-করা ইঞ্জিনিয়ার বসিয়েছে একজন। কাজকর্ম ভাল করে বুঝে নেবার জন্য।

সাতু ঘোষ বিরস মুখে বলেন, সেই তো বিপদ। খরচ বেড়ে যাচ্ছে আমাদের। ওভারশিয়ারের পঁচিশ টাকা বরাদ্দ তো ইঞ্জিনিয়ারের পজিসন বড়—তাঁর হবে একশ টাকা। তার মানে আরও মাল সরাতে হবে। লোকের পর লোক এনে মাথায় বসাচ্ছে—এর পরে তো শুধু-বালির গাঁথনি দিয়েও পোষানো যাবে না।

মাস দুয়েক কাটল। আর পারেন না মহিম। লেখাপড়া শেখা এইজন্ম? কলেজের ছাত্র ছিলেন চারু-দা—অনেক দিন ধরেই নাম টেনে যাচ্ছেন কলেজে। মহিমরা গাঁয়ের ইস্কুলে পড়তেন তখন। গ্রীষ্মের ছুটি আর পুজোর ছুটিতে চারু-দা আলতাপোল আসতেন বাইরে থেকে একরাশ নতুন আলো নিয়ে। দুপুরবেলা গোপন ক্লাস করতেন চারু-দা। দেশ-বিদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস, স্বামী বিবেকানন্দের বই—এই সমস্ত পড়া হত। আলোচনাও হত অনেক রকম। চরিত্র গঠনের কথা, সাধু সত্যনিষ্ঠ ও আত্মত্যাগী হবার কথা, দেশের প্রয়োজনে প্রাণ-বিসর্জনের সঙ্কল্প। শরীর-চর্চাও হত খুব। সেই অভ্যাসটা কলকাতা আসার আগে পর্যন্ত মহিম বজায় রেখেছেন—এমন সুঠাম দেহখানি সেইজন্ম। চারু-দা মুখে যা বলতেন, দেখা গেল, নিজের জীবনে ঠিক তাই করলেন। গুলিতে প্রাণ দিলেন তিনি।

সামান্ত মানুষ মহিম অত দূর না পারুক—সাতু ঘোষের সঙ্গে দম বন্ধ হয়ে আসে তাঁর। রীতিমতো পাপচক্র। যারা রক্ষক, তারাই ভক্ষক। লক্ষ্য করেছেন, কারসাজির সময়টা উপরের কর্তাব্যক্তিরা চট করে একদিকে সরে পড়ে, মুখের উপরে মৃদু হাসি খেলে যায় কেমন। কেউ ভাল নয় এ দলের। উপরে নিচে একটি সৎমানুষ নেই।

মহিম বলেন, পেরে উঠছিনে দাদা। আমায় অব্যাহতি দিন।

সাতকড়ি হেসে সান্ত্বনা দেন: পারবে, পারবে। ঘাবড়াচ্ছ কেন? দু-মাসে হল না, কুছ পরোয়া নেই—লাগুক না দু-বছর।

তাতেও হবে না। আপনি অন্য লোক দেখে নিন।

সে লোক পাব কোথায়? এইসব গুহ্য ব্যাপারে বাইরে প্রকাশ হলে সর্বনাশ। নয়তো তোমায় এত করে বলছি কেন? খাঁটি কথা বল দিকি। পোষাচ্ছে না, মাইনে-বৃদ্ধি চাই?

কাজই করব না। মাইনের কথা কাজ করলে তবে তো!

সাতু ঘোষ দরাজ ভাবে বললেন, পাঁচ টাকা মাইনে বাড়াচ্ছি আসছে মাস থেকে। মাইনে তো রইলই—মন দিয়ে কাজকর্ম কর, কারবারের এক আনা বখরা দিয়ে দেব ওর উপর। বুঝে দেখ ঠাণ্ডা মাথায়। কারবার কত বড় হতে চলল। তোমার এক আনা অংশে কম-সে-কম বছরে পাঁচ হাজার উঠতে পারে। মহিম চুপ করে আছেন।

কি ঠিক করলে বল।

আমায় মাপ করুন। টাকার জন্য মনুষ্যত্ব বেচতে পারিনে।

এ সমস্ত অনেককাল আগেকার কথা। নতুন বয়স মহিমের। স্পষ্টাস্পষ্টি বলে ফেলে সোয়াস্তি বোধ করলেন।

সাতকড়ি শুনে গুম হয়ে গেছেন। ঘাড় নেড়ে বললেন, হুঁ, পিছনে লোক লেগেছে। তা মনুষ্যত্ব বজায় রেখে কোন কর্ম করা হবে শুনি?

ঠিক কিছু হয়নি। রমেন আমাদের সঙ্গে পড়ত, করপোরেশনে ঢুকেছে। তার শ্বশুর হলেন লাইসেন্স-অফিসার। চেষ্টাচরিত্র করে লাইসেন্স-ইনস্পেক্টর একটা হয়তো হয়ে যেতে পারে।

সাতু ঘোষ তারিপ করে ওঠেন: ভাল চাকরি। করপোরেশনের নিয়ম হল —চাকরি একটা দিয়ে ছেড়ে দিল, তারপরে তুমি চরে খাওগে। কিন্তু মনুষ্যত্ব যে তুবড়ে যাবে ভাই। দোকানদারদের প্যাঁচে ফেললে তবেই তারা পয়সা বের করে। এক বস্তা সিমেন্ট লরীতে তুলতেই তোমার মাথা ঘোরে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্যাঁচ কষতে পারবে কি?

ব্যঙ্গের সুরে বলেন, পারবে না, উপোস করে মরবে। ইস্কুল-মাস্টারি হল তোমার কাজ—মানুষ গড়ার মহাব্রত। বারো বছর যে কাজ করলে গাধা হয়ে যায়। তোমার অতদিন লাগবে না, এখনই অর্ধেক হয়ে আছ। নইলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে কেউ এমন!

পরবর্তীকালে মহিম আশ্চর্য হয়ে ভেবেছেন এইসব কথা। যেন দৈববাণী। একটা তৃতীয় নেত্র ছিল সাতু ঘোষের। ব্যবসা বিষম জাঁকিয়ে তুললেন দু-পাঁচ বছরের ভিতরে। আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া বলে, তা নয়—উনি শালগাছ। আর মহিমারঞ্জন সেন বি.এ. মানুষ তৈরির মহাব্রত নিলেন ভারতী ইনস্টিট্যুশনের শিক্ষক হয়ে।

॥ দুই ॥

প্রভাতকুমার পালিত স্বনামধন্য ব্যক্তি। ভাল লেখাপড়া শিখেছেন। পাবলিক প্রসিকিউটার, বাইরের প্র্যাকটিশও ভাল। তাছাড়া খুব নাম-করা বনেদি বংশের সন্তান, জমিদারির আয়ও নিতান্ত হেলা-ফেলার নয়। প্র্যাকটিসের ফাঁকে ফাঁকে ইদানীং আবার দেশের কাজও করছেন। খবরের কাগজে নাম ওঠে হামেশাই। বহুকাল পূর্বে একদা তিনিও শিশু ছিলেন। তখন নাকি মহিমের স্বর্গীয় পিতৃদেব রঙ্গলাল এ-বি-সি পড়িয়েছিলেন তাঁকে দিনকতক। গল্পটা শোনা ছিল মায়ের

কাছে। মা গর্বভরে বলতেন, ওই যে প্রভাত পালিতের নাম শোন, উনি মাস্টার ছিলেন তার, ওঁর কাছে পড়েছে। কে জানে কতদিন ধরে পড়িয়েছেন, কি দরের মাস্টার ছিলেন রঙ্গলাল। মা তার সঠিক হিসাব দিতে পারেন না।

সাতু ঘোষের কাজ ছেড়ে দিয়ে মহিম সেই মেসেই পুরো মেম্বার হয়ে আছেন। এবং সাতু ঘোষ ইতিমধ্যে জোড়া ঘর পেয়ে ঘোষ এণ্ড কোম্পানি তুলে নিয়ে গেছেন মেস থেকে। রমেন ও তার অফিসার শ্বশুরের পিছনে ঘোরাঘুরি করে বিশেষ কোন আশা পাওয়া যায় না। কলকাতা শহর হঠাৎ যেন অকূল সমুদ্র হয়ে দাঁড়াল। সেই সমুদ্রের মধ্যে প্রভাত পালিতমশায় অনেক দূর-থেকে-দেখা আলোকস্তম্ভ। ঐ আশ্রয়ে উঠতে পারলে হয়তো সুরাহা হবে একটা।

যা থাকে কপালে—মহিম সাহস করে একদিন ঢুকে পড়লেন পালিতের সুবিশাল কম্পাউণ্ডের ভিতরে। ড্রইংরুমের বাইরে বেঞ্চির উপরে বসে থাকেন। ক'দিন এসে এসে বসছেন এমনি। পাঁচুলালবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। দাড়িওয়ালা কালো চেহারার মাঝ-বয়সি মানুষটা—পোর্টকমিশনার অফিসে চাকরি করেন, বাকি সময় পালিত-বাড়ি পড়ে থাকেন। খাওয়া-দাওয়াও এখানে। শনিবারে শনিবারে দেশের বাড়ি গিয়ে বউ-ছেলেপুলে দেখে আসেন। কমিশনার সাহেবকে বলে প্রভাতই তাঁর চাকরি করে দিয়েছেন। প্রভাতের পরিবারের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী তিনি। অতি-দূর একটু আত্মীয়তাও আছে বুঝি। প্রভাতের নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসৎ হয় না—বাড়ির দেখাশুনার ভার পাঁচুলালের উপর অনেকটা। দেখাশুনা আর কি—মেয়েপুরুষ ছেলেবুড়ো সকলকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে যাওয়া। এই একমাত্র কাজ তাঁর।

পাঁচুলাল কোনদিকে যাচ্ছিলেন, ঘুরে এসে মহিমের কাছে দাঁড়ালেন : কী বাপু, কি দরকার বল দিকি তোমার ? ক'দিনই দেখছি বসে বসে থাক।

মহিম তখন পরিচয় দিলেন : বাবা মারা গেলেন, আট বছর বয়স আমার তখন। মা'র মুখে শোনা কথা, সত্যি-মিথ্যে জানি নে। মিথ্যে যদিও হয়, কাজকর্ম একটা করে দিতে হবে। নইলে শহরে থাকা হয় না। দেশে ফেরত গিয়ে কি খাব, তা জানি নে। আমায় পড়াতে আর দিদির বিয়ে দিতে দেনা হয়ে গেছে অনেক।

সরল কথাবার্তা পাঁচুলালের খুব ভাল লাগল, করুণা হল মহিমের উপর। প্রভাতকে গিয়ে বললেন, রঙ্গলাল সেন বলে কারো কাছে পড়েছেন আপনি ?

রঙ্গলাল···রঙ্গলাল···হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল প্রভাতের। রঙ্গলালই নাম ছিল বটে। কি চায় তাঁর ছেলে ? তা বেশ, মামলাটা নিয়ে এ ক'দিন তো বড্ড

ঝামেলা—সোমবারে নয়, মঙ্গলেও নয়, বুধবারে আসতে বলে দিন।

বুধবারে মহিম এল। ভোরবেলা থেকে বসে আছে। ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় আটটা—সেই সময় টের পেল, সাহেব এইবার নিচেয় এসে বসেছেন। তার পরে কত মানুষ এল, কতজনে দেখা করতে গেল ভিতরে, কথাবার্তা সেরে ফিরে চলে গেল। মহিম বসেই আছেন। স্লিপ পাঠিয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রথমে মহিম—নেমে আসবার অনেক আগে। প্রতিক্ষণে মনে হচ্ছে, এইবার বেয়ারা বুঝি তাঁর স্লিপ হাতে করে আসে—তাঁর ডাক পড়েছে। টং করে ঘড়িতে সাড়ে-ন'টা বাজে, আর প্রভাত ফের দোতলায় উঠে গেলেন। বসে বসে মহিম সমস্ত বুঝতে পারছেন। বেয়ারা এসে বলে, চলে যান বাবু, আজকে আর হবে না।

পরের দিন এলেন। এসে অমনি বসে আছেন। পাঁচুলাল দেখতে পেলেন: ও, দেখা হয়নি বুঝি? বড্ড কাজের চাপ কিনা! আচ্ছা, আমি বলব আর একবার।

ক'দিন চলল এমনি। বসে বসে মহিম ফিরে চলে যান। একদিন বেয়ারার কথা শুনলেন না, চলে যেতে বলল তবু বসে আছেন একভাবে। প্রভাতের মোটর বেরিয়ে যাচ্ছে—পিছনের সিটে প্রভাত, পাশে ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা এক ভদ্রলোক। সামনে ড্রাইভারের পাশে আর একজন অমনি। দারোয়ান গেট খুলে গাড়ি বেরনোর রাস্তা করে দিচ্ছে। মহিম সেইখানে ছুটে এসে মোটরে মুখ ঢোকালেন।

মুহূর্তে এক কাণ্ড হতে যাচ্ছিল! প্রভাতের পাশের লোক এবং সামনের সিটের লোক পাঞ্জাবির নিচে থেকে দুই রিভলবার বের করে তাক করল মহিমের দিকে। হয়ে যায় আর কি! অনেকগুলো স্বদেশি মামলা চলছে তখন আদালতে। আগেও কয়েকটা হয়ে গেছে। প্রভাত পালিত সরকারের পক্ষে। একজনের ফাঁসি হয়েছে ইতিপূর্বে, কয়েকজনের দ্বীপান্তর। পাবলিক প্রসিকিউটার আশু বিশ্বাসকে আদালতের প্রাঙ্গণে গুলি করল, সেই থেকে সরকারি নানা সতর্ক ব্যবস্থা। সামাল হয়ে চলাফেরা করেন এঁরা, সাদা পোশাকে সশস্ত্র পুলিশ সর্বদা আগুপিছু থাকে।

চাকরি করা হয়ে যাচ্ছিল এখনই মহিমের। প্রভাত 'উঁহু' বলে মানা করে উঠলেন। অস্ত্র দুটো তখনই আবার পাঞ্জাবির নিচে চলে গেল। শামুক যেমন পলকের মধ্যে খোলের ভিতর মুখ ঢুকিয়ে নেয়। মুহূর্তে আবার নিরীহ দুটি ভদ্রলোক প্রভাত পালিতের পাশে এবং সামনে।

প্রভাত লক্ষ্য করেছেন, ছেলেটা দিনের পর দিন এসে বসে থাকে।

পাঁচুলালের কাছে শুনে আন্দাজে চিনে নিয়েছেন মহিমকে। বললেন, তুমি তো রঙ্গলালবাবুর ছেলে? চাকরির যা বাজার, বুঝতে পারছ। সোমবারে এস। দেখা যাক কি করতে পারি।

নিজের মুখে দিন বলে দিলেন। মহিমের কথা প্রভাত তবে একটু মনে নিয়েছেন। আহা, বেচারির প্রাণটা যাচ্ছিল—অন্নের জন্ম রক্ষা হয়েছে। পেট থেকে বেরিয়ে মোটর চড়তে আরম্ভ করেছে। প্রভাত ভাবছেন, সত্যিই কিছু করা যায় কিনা ছেলেটার সম্বন্ধে। ভারতী ইনস্টিট্যুশনের প্রেসিডেন্ট তিনি। একটা চিঠি হয়তো লেখা যায় হেডমাস্টারকে। মস্ত বড় ইস্কুল—কলকাতার সেরা ইস্কুলগুলোর একটি।

মুখ বাড়িয়ে ইশারায় মহিমকে কাছে ডাকলেন: সোমবারে সন্ধ্যাবেলায় এস তুমি—

পাঁচুলাল যে ঘরটায় থাকেন, মহিম সেখানে গেলেন। পাঁচুলাল ব্যাপার শুনেছেন, তিনি বকে উঠলেন: একেবারে গেঁয়ো তুমি—ছি-ছি, অত বড় লোকের কাছে অমনি ভাবে ধেয়ে যায় কখনো!

বেকুবি হয়েছে সেটা এখন বুঝতে পারছেন মহিম। লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করলেন।

কিছু নরম হয়ে পাঁচুলাল জিজ্ঞাসা করেন, কি বললেন উনি?

সোমবার সন্ধ্যায় আসতে বলেছেন। চেষ্টা করে দেখবেন।

পাঁচুলাল বললেন, ছুটে গিয়ে তবে তো ভালোই হয়েছে দেখছি। চেষ্টা করবেন বলেছেন তো? তার মানে হয়ে গেছে। নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোওগে এখন। গবর্নমেন্টে বিষম খাতির—এক কথায় এক্ষুনি রাইটার্স বিল্ডিং-এর যে কোন চেয়ারে বসিয়ে দিতে পারেন। কিংবা অন্য কোথাও। ভারি ক্ষমতা। আর, ও-মানুষ বাজে কথা বলবেন না কখনো।

পাঁচুলালের পাঁচখানা মুখ হলেও প্রভাতের গুণ-ব্যাখ্যান শেষ হত না। বললেন, কী দরের মানুষ—কোন সব লোকের সঙ্গে মেলামেশা! তার মধ্যেও দেখ, ছেলেবয়সে কে-একজন কি-একটু পড়িয়েছিলেন তাঁর কথা মনে রেখেছেন। কত শ্রদ্ধা সেই প্রথম মাস্টারের উপর! গুণ না থাকলে এমনি এমনি মানুষ বড় হয়!

মহিম ঘাড় নাড়েন। বিষম বদনাম প্রভাত পালিতের। ইংরেজের পা-চাটা, যারা স্বদেশি করে তাদের তিনি চিরশত্রু। মহিম যখন কলেজে পড়তেন, ছেলেরা শুধু ক্ষেপাত তাঁর নামে। কাগজে প্রবন্ধ লিখে বিপ্লবীদের তিনি গালি

পাড়েন—দেশের সর্বনাশ করছে নাকি ওরা ইংরেজ খেপিয়ে দিয়ে। ইংরেজের অনেক গুণ—লোকের ধন-মান-প্রাণ নিরাপদ হয়েছে তাদের শাসন-গুণে। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তারা চলে যায়, তাসের ঘরের মতো শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে-চুরে পড়বে।

এই সঙ্গে সূর্যকান্ত মাস্টারমশায়ের নাম মনে পড়ে মহিমের। মহিম তাঁর প্রিয় ছাত্র। আলতাপোল থেকে ক্রোশ তিনেক দূরে ঘোষগাঁতি গ্রামে বাড়ি। সে আমলে আলতাপোলে মাস্টারি করবার সময় সূর্যবাবু শনিবারে-শনিবারে বাড়ি চলে যেতেন, সোমবার ফিরতেন। আজ তাঁর কী দুর্গতি! সংসার বলতে দুই মেয়ে—রানী আর লীলা। রানীর তুলনা ছিল না, বুড়া বাপকে চোখে হারাত। তার কাছে থাকতেন সূর্যবাবু। কিন্তু ভাগ্য খারাপ—রানী মারা গেল, জামাই বিয়ে করল আবার। তখন সূর্যবাবু ছোট মেয়ে লীলার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠলেন। লীলার অল্পদিন বিয়ে হয়েছে, জামাইটা কিছু করে না। শাশুড়ি মুখ বেজার করেন সর্বদা, বেহাইয়ের সঙ্গে ভাল করে দুটো কথাও বলেন না। কিন্তু উপায় কি—বুড়ো বয়সে আশ্রয় চাই একটা। সামান্য সঞ্চয় ভেঙে হাটবাজার করে ওদের মনে রাখেন। আর চুপচাপ পড়ে থাকেন বাইরের ঘরে।

ক্লাসে তখন একটা বই পড়ানো হত—ইংল্যাণ্ডস ওয়ার্কস্ ইন ইণ্ডিয়া। য়ুনিভার্সিটি থেকে বের করেছিল বইটা, ইতিহাসের মাস্টার সূর্যকান্ত পড়াতেন। প্রভাত পালিত যা সমস্ত বলে থাকেন, অবিকল তাই—ইংরেজদের গুণের ফিরিস্তি বইয়ে ঠাসা। তার ভিতরের একটা অধ্যায় ভাল করে পড়িয়ে সংক্ষেপে করে লিখিয়ে দিয়ে সূর্যবাবু বলতেন, মুখস্থ করে রাখ বাপসকল। ভাল নম্বর পাবে। কিন্তু একবর্ণ বিশ্বাস কোরো না। বাজে কথা, সমস্ত ধাপ্পা।

প্রভাতের ঠিক উল্টো। তিনি মুখেই শুধু বলেন না, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। নয়তো উদ্যোগ করে কাগজে প্রবন্ধ ছাপতে যাবেন কেন? বাইরের এমন প্র্যাকটিশ সত্ত্বেও সরকারের মাইনে খেয়ে স্বদেশি ছেলের পিছনে লাগেন কেন এমন করে? এক-একটা মামলা নিয়ে এমন পরিশ্রম করেন, যেন একটি আসামীকে লটকে দিতে পারলে চতুর্বর্গ লাভ হবে তাঁর জীবনে! সর্বসাধারণ এইজন্যে তাঁর সম্বন্ধে যে সব বিশেষণ ছাড়ে, শুনে কানে আঙুল দিতে হয়। কিন্তু আজকে মহিম একটা নতুন দিক দেখতে পেলেন। দুর্লভ ক্ষমতাবান পুরুষ—নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস ও বিচারের উপর অটল আস্থা। যা তিনি বিশ্বাস করেন, গলা ফাটিয়ে দশের মধ্যে প্রকাশ করতে ভয় পান না প্রতিক্ষণ জীবন বিপন্ন জেনেও।

মহিম বললেন, উনি আমায় সোমবার সন্ধ্যেবেলা আসতে বললেন।

পাঁচুলাল বলেন, এস ভাই।

তারিখটা একটু সরিয়ে রবিবার করা যায় না? আমার বড্ড সুবিধা হয়। একটা টুইশানি পেয়েছি—টালিগঞ্জে নতুন যে রাস্তা বেরুচ্ছে সেইখানে। অনেকটা দূর! নতুন জায়গা বলে কামাই করতে ভয় লাগে। টুইশানিটা চলে গেলে মেসের খরচ চালাতে পারব না। রবিবার হলে কোন অসুবিধা হত না।

পাঁচুলাল বললেন, রবিবারে আসবে কি। ওদিন সাহেব বাড়ি থাকেন না।

তাহলে শনিবার সন্ধ্যেয়। শনিবারে ইস্কুল দুটোয় ছুটি হয়ে যায়। ছাত্রকে বলে রাখব, দুপুরবেলা পড়িয়ে আসব ও দিন। কথাটা শুনবে বোধহয়।

সতীশ টাইপিস্ট। পাঁচুলাল একটা চিঠি টাইপ করতে দিয়েছিলেন, সেটা হাতে করে সে এল। সতীশ বলে, শনিবারে কোর্টের পর সাহেব বেরিয়ে যান, আসেন সোমবার সকালবেলা। এসেই কাজকর্মে লেগে পড়েন।

বড়লোকের ব্যাপারে মাথা গলানো উচিত নয়। কিন্তু যতই হোক, মহিম পাড়াগাঁ থেকে এসেছেন—না ভেবেচিন্তে ফস করে প্রশ্ন করে বসেন, কোথায় যান তিনি?

প্রশ্নটা সতীশকে। কিন্তু সে শুনতে পায় না। টাইপ-করা চিঠিটা পাঁচুলালের হাতে দিয়ে চোখে অর্থপূর্ণ হাসি ঝলসে তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে গেল।

পাঁচুলাল চটে গিয়ে বললেন, সে খোঁজে তোমার দরকার কি শুনি? তোমার কাজের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে? সন্ধ্যেবেলা না পেরে ওঠ তো এসই না মোটে। জোরজার কিছু নেই।

বেকুব হয়ে গিয়ে মহিম বললেন, আজ্ঞে না। আসব বই কি। জীবনে ভুলব না আপনাদের দয়া।

কপাল খুলল অবশেষে। প্রভাত সোমবারে সন্ধ্যার পর মহিম আর সতীশকে একসঙ্গে ভিতরে ডাকলেন। বললেন, ভারতী ইনষ্টিট্যুশন জান? চিঠি দিয়ে দিচ্ছি হেডমাস্টারকে। মাস্টারের যদি এখন দরকার থাকে, তোমায় কয়েকটা দিন পরীক্ষা করে দেখবেন। দেখ, শিক্ষাবৃত্তির মতো পুণ্যকর্ম নেই। দেশের কাজও বটে। দেশের ভাবী নাগরিকদের উপযুক্ত রূপে গড়ে তোলা—এর চেয়ে দায়িত্বের ব্যাপার আর কি হতে পারে। জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট বল, মিনিস্টার বল, এমন কি গবর্নর বল, শিক্ষকের মতো সম্মান কারো নয়। গোখলে মাস্টার

ছিলেন, বিদ্যাসাগরও তো সংস্কৃত কলেজের মাস্টার। আমার ছেলে-মেয়েদের আমি মাঝে মাঝে পড়িয়ে থাকি। বড় ভাল লাগে। কিন্তু কি করব—অবসর পাইনে মোটে।

ভাল মেজাজে ছিলেন। ভূমিকাটুকু শেষ করে সতীশকে বললেন, নাও—

বলে যাচ্ছেন, সতীশ নোটবই বের করে সর্টহ্যাণ্ডে নিয়ে নিল। প্রভাত বললেন, টাইপ করে আন, সই করে দিচ্ছি। চিঠি নিয়ে কাল হেডমাস্টারের কাছে চলে যাবে তুমি। দেখ, কি হয়।

বলে মামলার ফাইল খুলে মাথা নিচু করে বসলেন। অর্থাৎ কাজ ঢুকেছে, বেরিয়ে পড় এবার। চিঠি নিয়ে মহিম বেরিয়ে যাচ্ছেন, এই সময় পাঁচুলালের সঙ্গে দেখা : বাঃ রে, আমায় দেখালে না ?

খাম খুলে একবার নজর বুলিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পাঁচুলাল বলেন, কপাল বটে তোমার ছোকরা! আর, সাহেব মানুষটা কি রকম তা-ও বুঝে দেখ। এক কথায় চাকরি।

মহিম বিরস মুখে বললেন, চাকরি আর হল কোথায় ? ওঁদের মাস্টারের দরকার থাকে, তবে তো! শুধুমাত্র পরীক্ষা করে দেখতে লিখেছেন—তা-ও তো দু-চার দিনের জন্য।

হো-হো করে হেসে উঠলেন পাঁচুলাল : দিয়েই দেখই না! এ চিঠি। খোদ প্রেসিডেন্ট লিখছেন, মাস্টারের দরকার নেই কি রকম! পড়ানোর পরীক্ষা করতে বলছেন—খবর চলে আসবে, এমন মাস্টার ভূ-ভারতে কখনো জন্মেনি। দু-চার দিন কি, যাবৎ চন্দ্রসূর্য এই মাস্টার রাখবে তারা ইস্কুলে। বলি, হেড-মাস্টারের একটা আখের নেই ? তিনিও চান, দশ-বিশ টাকা মাইনে বাড়ুক, বুড়ো হয়েছেন বলে ঝটপট তাড়িয়ে না দেয় তাঁকে। চলে যাও ড্যাং-ড্যাং করে, গিয়ে দেখগে কী ব্যাপার।

অনেক রাত্রি অবধি মহিমের ঘুম আসে না। সাতু ঘোষ ব্যঙ্গ করে যা-ই বলুন, বড় কাজ করবার সুযোগ এই চাকরিতে। চারুদাকে মনে পড়ল। সর্বত্যাগী সেই তরুণ দাদার উদ্দেশ্যে মনে মনে বলেছেন, বড় গরিব আমরা। একরাশ ধারদেনা করে মা আমার মুখ চেয়ে আছেন। অন্ধের যষ্টির মতন আমি। তোমাদের পথ নিতে পারলাম না চারু-দা। কিন্তু দশটা মানুষ তোমরা চলে গিয়ে থাক তো ঠিক তোমাদেরই মতন দু-শ জন আমি তৈরী করে পাঠাব। ... আমার ব্রত। সূর্যবাবুর কাছে পড়েছেন চারু-দাও। যত্ন করে পড়াতেন। ... যাচ্ছেন

সশব্দে বই বন্ধ করে ফেলা : যা পড়ালাম বাপসকল, সমস্ত মিথ্যে কথা। ইস্কুলের মাস্টার শুর্ববাবু—এমনি সব মাস্টার ইস্কুলে থাকতে ইংরেজ স্পাই লাগিয়ে পুলিশ দিয়ে ছেলে ঠেঙিয়ে কি করবে ? পারে তো ইস্কুল-কলেজগুলো তুলে দিক, মাস্টার-প্রফেসারগুলো আটক করুক।

॥ তিন ॥

ভারতী ইনষ্টিট্যুশন বনেদি ইস্কুল। বয়সে অতি প্রবীণ। সুবর্ণজয়ন্তী হয়ে গেছে ও-বছর। ইস্কুলের যখন জন্ম, চতুর্দিকে পতিত জলাভূমি জঙ্গল কাঁচা-নর্দমা এ তল্লাটে মানুষও ছিল কত সামান্ত! অত জায়গাজমি তাই ইস্কুলবাড়ির এখনকার দিনে ওর সিকির সিকি পরিমাণ জমি নিতে হলে আক্কেলগুড়ুম হয়ে যাবে। এক-একটা বাড়ি আছে, তিন-চার পুরুষ ধরে পড়ছে এই ভারতী-ইস্কুলে। পিতামহ পিতা পুত্র—এমন কি প্রপিতামহ কোন কোন ক্ষেত্রে। দিকপাল অনেকে শৈশবকালে ছাত্র ছিলেন এখানকার। মাস্টারমশায়রা সেইসব কৃতী ছাত্রের নাম করে পাশাপাশি নতুন ইস্কুলগুলোকে দুয়ো দেন। ইস্কুলের বার্ষিক রিপোর্টে ওই বাঁধা গৎ ছাপা হয়ে আসছে একাদিক্রমে বিশ-পঁচিশ বছর ধরে।

প্রভাত পালিতের চিঠি নিয়ে মহিম ইস্কুলে ঢুকলেন। বড় সকাল-সকাল এসে পড়েছেন, ইস্কুল বসবার দেরি আছে। ছেলে কত রে বাবা, আসছে তো আসছেই। একতলা দোতলা তেতলা বোঝাই হয়ে গেল। আরও আসছে। সামনে ছোট একটু উঠানের ফালি, পিছনে বড় উঠান। বাচ্চাদের মধ্যে কেউ বড় সময়ের অপব্যয় করে না। ক্লাসের বেঞ্চিতে ধপাস করে বই ছুঁড়ে দিয়েই বাইরে ছোটে। মার্বেলের গুলি বেরোয় পকেট থেকে, বল বেরোয়। বিনা সরঞ্জামে চোর-পুলিশও খেলছে ছুটাছুটি করে। আর এক খেলা, কলের মুখ চেপে ধরে ফোয়ারার মতন জল ছিটিয়ে দেওয়া : এক-পায়ে লাফিয়ে খেলা হচ্ছিল ওদিকটা—জলের ধারায় কাপড় ভিজিয়ে দিল তো খেলা ছেড়ে ঘুসি বাগিয়ে এসেছে একটা ছেলে—

সহসা যেন মন্ত্রবলে স্তব্ধ। সামনের সরু উঠানের চেঁচামেচি একেবারে নেই। পরম সভ্যভব্য ছেলেপুলে পিলপিল করে ক্লাসে ঢুকছে। হেড স্যার, হেড স্যার—চোখ-মুখের ইশারায় চাপা গলায় কথা।

গম্ভীর পদক্ষেপে হেড মাস্টার ডি-ডি-ডি এসে ঢুকলেন। পুরো নাম ... দাশ। গৌরবর্ণ দীর্ঘমূর্তি, মাথা-জোড়া টাক—হাজার লোকের

মধ্যেও আলাদা করে নেওয়া যায়। কুচকুচে কালো রঙের গলাবন্ধ কোট গায়ে, গলায় পেঁচানো সুতি চাদর, পায়ে স্প্রিং-দেওয়া চীনেবাড়ির জুতো। যেমন যেমন এগুচ্ছেন, সামনে ও দু-পাশে নিঃশব্দ হয়ে যাচ্ছে। মসমস করে উঠে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। লাইব্রেরী-ঘরে শিক্ষকেরা বসে দাঁড়িয়ে—তর্কাতর্কি কথাবার্তা রঙ্গরসিকতা তুমুল বেগে চলেছে। কেউ কেউ ওর মধ্যে ঘুমিয়েও নিচ্ছেন বসে বসে। দরজার বাইরে হেডমাস্টারকে দেখে সকলে তটস্থ হলেন, চোখ-বোঁজা মানুষ ক'টি তাড়াতাড়ি চোখ খুললেন। দুখিরাম বেয়ারা ছুটে এসে হাত থেকে ছাতাটি নিয়ে নিল। হেডমাস্টারের জন্য আলাদা একটা কামরা—কামরার দরজা খুলে পাখায় জোর বাড়িয়ে দিল।

কামরায় ঢুকে যেতেই চতুর্দিক আবার যেমন-কে-তেমন। ঘুসি বাগিয়ে এসে যে ছেলেটা হাত তাড়াতাড়ি পকেটে ঢুকিয়েছিল, হাত বের করে সে ধাঁই করে মেরে দিল কলের ধারের ছেলেটার উপর। নবীন পণ্ডিত বলছিলেন, নরীম্যানের তুলনা? উঁ, ঢাকের কাছে—ওইখানে থেমে গিয়ে খবরের কাগজে মনোযোগ করেছিলেন। ডি-ডি-ডি ঘরে ঢুকে যেতেই মুখ তুলে উপমাটা শেষ করলেন: ঢাকের কাছে ট্যামটেমি?

টেবিলে কি চিঠিপত্র আছে, হেডমাস্টার নেড়েচেড়ে দেখছেন। অ্যাসিস্টান্ট-হেডমাস্টার চিত্তরঞ্জন গুপ্ত ঘরে ঢুকে বেঁটে সাইজের বেঢপ মোটা একখানা খাতা তুলে নিলেন টেবিল থেকে। অ্যারেঞ্জমেণ্ট বুক—মাস্টাররা যমের মতো ডরান ঐ খাতাকে। যাঁরা কামাই করেছেন, ক্লাস তাঁদের খালি যাবে না। অন্য মাস্টারের লিসার-ঘণ্টা কেটে নিয়ে সেখানে পাঠানো হয়। অর্থাৎ সেই সেই মাস্টার অবসর পেলেন না আর সেদিন। এই বেঁটেখাতায় তার ব্যবস্থা।

খাতা নিয়ে বেজার মুখে চিত্তবাবু বলছেন, চারজন আসবেন না, এখন অবধি খবর পেলাম। কি করে কাজ চলবে নিত্যিদিন এমন হতে থাকলে?

ডি-ডি-ডি বললেন, বিশ্রী আইন করে রেখেছে—বছরে পনের দিন ক্যাজুয়াল ছুটি। সেই সুযোগ নিচ্ছে। পড়াশুনো কিছু আর হতে দেবে কি? আপনাকে বলা রইল, কামাই করার পরে কেউ যখন ফের ইস্কুলে আসবেন, একনাগাড়ে চার-পাঁচ দিন তাঁর লিসার কেটে যাবেন। সমুচিত শিক্ষা হবে তাহলে।

তারপর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ঘণ্টা বাজিয়ে দাও দুখিরাম।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চিত্তবাবু বললেন, তিন মিনিট আছে সার এখনো।

ডি-ডি-ডি বললেন, হোকগে। গোলমালে মাথার টনক নড়ে যাচ্ছে।

ছেলেরা আর কতটুকু গোল করে! মাস্টারমশায়রা, দেখুনগে, লাইব্রেরী-ঘরে মেছো-হাট বসিয়ে দিয়েছেন।

জবরদস্ত হেডমাস্টার। গার্জেনরা শতমুখ ডি-ভি-ডি'র প্রশংসায়। দেড়-হাজার ছেলে কী রকম ভেড়ার পাল হয়ে আছে, দেখে এস একদিন ইস্কুলের সময় গিয়ে। কমিটিও খুশি—বিশেষ করে সেক্রেটারি। মিষ্টি কথার রাজা হলেন তিনি—মাস্টাররা দায়ে-দরকারে গেলে খুব খাতির করে বসান: ইস্কুল তো আপনাদেরই। কমিটি কিংবা এক হেডমাস্টার কী করতে পারেন উৎকৃষ্ট শিক্ষক যদি না থাকেন। এর পরে দশরকম কথার মারপ্যাঁচে বের করে ফেলেন হেডমাস্টার সম্বন্ধে মাস্টারদের কি রকম মনোভাব। খুশি হন মনে মনে: হ্যাঁ, মাস্টারগুলোকে কেমন ঠাণ্ডা করে রেখেছেন, এই না হলে হেডমাস্টার!

ঠুন-ঠুন-ঠুন-ঠুন—মন্দিরের আরতির মতন ভূখিরাম লম্বা বারাণ্ডা ধরে ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছে। ওয়ার্নিং-এর প্রথম ঘণ্টা: ছেলেরা সব ক্লাসে ঢুকে যাও, ঘর থেকে বেরিয়ে টিচাররা ক্লাসমুখো রওনা হন এবারে। এর পরে ঢং-ঢং করে পেটা-ঘড়ি বাজবে। ইস্কুল বসে গেল তখন, ক্লাসে ক্লাসে পাঠগুঞ্জন। ফ্যাক্টরির কল চালু হয়ে যাবার মতন। পিরিয়ডের পর পিরিয়ড পার হয়ে অলস ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে টিকোতে টিকোতে এখন চলল পশ্চিমের প্রকাণ্ড লাল বাড়িটার আড়ালে সূর্য অদৃশ্য না হওয়া অবধি।

ডি-ভি-ডি অফিস-ঘরের সামনে বেরিয়ে দাঁড়িয়েছেন, নজর চতুর্দিকে পাক খাচ্ছে। মাস্টারমশায়রা তাড়াতাড়ি খড়ি-ঝাড়ন নিয়ে নিলেন, বই নিয়েছেন কেউ কেউ। ভূগোলের মাস্টাররা গোটানো ম্যাপ আর লাঠির আকারের পয়েন্টার, এবং অঙ্কের মাস্টাররা দীর্ঘ স্কেল নিয়েছেন হাতে। হাতিয়ার পত্তরে সজ্জিত হয়ে ক্লাসে চললেন। ভূদেববাবু এর মধ্যে বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়েছেন হেডমাস্টারের দিকে। তিন-তিনটে মিনিট জুলুম করে আজ খেয়ে দিল। কী অটুট স্বাস্থ্য, অসুখও একদিন করতে নেই। সেই দিন তোমার ইস্কুলের কী হাল করি, বুঝবে।

মহিম দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন। ডি-ভি-ডি'র নজর পড়ল: ইউ বয়, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং—ক্লাসে না গিয়ে ঘুরছে কেন ওখানে?

ছাত্র ভেবেছেন মহিমকে। এসব অনেক দিনের কথা—ফুটফুটে সতেজ চেহারা তখন। বি.এ. পাশ করেছেন, তবু ইস্কুলের উপরের ক্লাসের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলে বেমানান দেখাবে না বোধহয়।

ইউ বয়, গো অ্যাটওয়ান্স টু য় ক্লাস—

মহিম কাছে গিয়ে প্রভাত পালিতের চিঠিটা দিলেন।

কিসের চিঠি? সকাল সকাল ছুটি—

চিঠি পড়ে চোখ তুলে তাকালেন মহিমের দিকে। আর একবার পড়লেন। পাশের বড় ঘরটা দেখিয়ে বললেন, যান, লাইব্রেরীতে গিয়ে বসুনগে। চিত্তবাবু, বাইরে আসুন একটু, এই দেখুন।

অতএব মহিম লাইব্রেরি-ঘরে ঢুকে গেলেন। লাইব্রেরি আছে যখন ইস্কুলে, বইটই বেশ পড়া যাবে। বই মহিমের বড় প্রিয়, বই মুখে ধরে থাকতে পারলে আর কিছু চান না তিনি। উঃ, সাতু ঘোষের সঙ্গে কী নাগপাশে আটক হয়ে পড়েছিলেন! বই পড়া সাতু হাস্যকর খেয়াল বলে মনে করে, ওটা বোকা মানুষের লক্ষণ। শুধুমাত্র পয়সাই চিনেছে, পয়সার পিছনে ছোটা ছাড়া জীবনে ওদের অন্য লক্ষ্য নেই। লেখাপড়ার আবহাওয়ায় এসে মহিম পুনর্জীবন পেয়ে গেলেন যেন।

কিন্তু দেড় হাজার ছাত্র এবং এতগুলো শিক্ষকের জন্য গোণাগুণতি চারটে আলমারি। অন্য কোন ঘরে আছে বোধহয় আরও। একদিককার দেয়াল ঘেঁষে আলমারিগুলো, মাঝখানে টানা টেবিল, টেবিলের এদিকে-ওদিকে সারবন্দি চেয়ার। মাস্টারমশায়রা ক্লাসে চলে গেছেন, চেয়ার প্রায় সমস্ত খালি। যাঁদের এখন ক্লাস নেই, তাঁদেরই জনকয়েক রয়েছেন। দু-জন তার মধ্যে লম্বা হয়ে পড়েছেন টেবিলের উপর। পাখা ঘুরছে, পাখার নিচে পড়ে আরামে চোখ বুজেছেন। মহিম আলমারির কাছে দাঁড়িয়ে বইয়ের নাম পড়েন। এনসাইক্লো-পেডিয়া বৃটেনিকা আঠার শ'-পঁচানব্বুই সালের এডিসন। অপর বইগুলোও দস্তুরমতো প্রাচীন। ইস্কুলের গোড়ার দিকে দিকপালেরা সেই যখন ছাত্ররূপে এখানে ঢুকেছিলেন, তখনই উৎসাহ বশে বোধহয় বই কেনা হয়েছিল। পরবর্তী-কালে আর উদ্যোগ হয়নি। কাচের বাইরে থেকে চেহারা দেখে অন্তত খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

এমনি সময়ে বেঁটেখাতা নিয়ে ছুখিরাম এসে পড়ল। মাস্টারদের দেখিয়ে দেখিয়ে সই করিয়ে ঘুরছে। অমুক পিরিয়ডে যে লিসার আছে, অমুক ক্লাসটা নিতে হবে সেই সময়।

ঘুমাচ্ছিলেন গগনবিহারীবাবু, টেবিলের উপর তড়াক করে উঠে বসলেন। এসে গেল চিত্রগুপ্তের খাতা? কই, আমার কোথায় হে? আমায় বাদ দিলে তো ইস্কুল তোমাদের উঠে যাবে।

ছুখিরাম বলে, আপনার কাজ নেই মাস্টারমশায়।

অবাক কাণ্ড! দু-দুটো লিসার-ঘণ্টায় চিত্রগুপ্তের ছোঁয়া পড়ল না? কলি উলটে গেল নাকি?

ধপাস করে শুয়ে পড়লেন; চোখ বুজলেন পূর্ববৎ।

দুখিরাম বলে, পতাকীবাবু আপনার আছে। টিফিনের পরের ঘণ্টায়। দেখে নিন।

খাতা মেলে ধরল পতাকীচরণের সামনে। সই মেরে দিলেন পতাকী। হেসে উঠে বলেন, বিলকুল ছুটি আজকে। বাঁচা গেল।

দাশুর বয়স কম, অল্পদিন ঢুকেছেন। ভাল নাম দাশরথি—দাশু দাশু করে সবাই ডাকে। বুঝতে না পেরে তিনি বলেন, ছুটি হয়ে গেল কি রকম?

প্রিন্সিপল নিয়ে চলি আমি ভায়া। যেদিন লিসার মারবে, সব ক'টা পিরিয়ড সেদিন ছুটি করে নেব। কিচ্ছু করব না কোন ক্লাসে গিয়ে। দশ বছর মাস্টারি হয়ে গেল, তিনটে ইস্কুল ঘুরে এসেছি। অনিচ্ছেয় আমায় দিয়ে কাজ করাবে, এমন তো কোন বাপের বেটা দেখিনে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গগনবিহারী বলেন, আঃ, বাপ তোল কেন পতাকী? ওটা কি ভাল?

পতাকী থতমত খেয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখেন। দাশুর দিকেও তাকালেন একবার। শোনা যায়, দাশু হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে লাগানি-ভাঙানি করেন। এমনিভাবে চাকরির উন্নতি চেষ্টা। কথা একটা বলে ফেলে পতাকীচরণ গিলে নেবার জন্য আঁকুপাঁকু করেছেন: ভি-ডি-ডি কিংবা চিত্তবাবু ওদের কথা বলছি নে তো। টিচার কামাই করলে কারো-না-কারো লিসার যাবেই। ওঁরা করবেন কি? বলছিলাম ছোঁড়াগুলোর কথা। সেকেণ্ড-সি'র এত বদনাম শোনেন—ভূদেববাবুর ক্লাসে পর্যন্ত মেজেয় পা ঠোকে। আমি তো কাল এক প্যাসেজ ট্রানশ্লেশন দিয়ে চা খেতে নেমে এলাম—মরে আছে কি বেঁচে আছে, বাইরে কেউ বুঝতে পারবেন না। তাই বলছিলাম, মুখে রক্ত তুলে পড়িয়ে তবে ক্লাসের ছেলেপুলে ঠাণ্ডা রাখতে হবে, এ কেমন কথা!

অবান্তর এমনি সব বলে বেফাঁস কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা। দুখিরাম ওদিকে বেঁটে খাতার পাতাটা পড়তে পড়তে হিমসিম হচ্ছে। বলে, দেখুন তো দাশুবাবু, এই যে—এম-আর-এস এই মাস্টারমশায় কে বলুন দিকি?

এম-আর-এস—তাই তো! পতাকীবাবু, এম-আর-এস কে আমাদের ভিতর?

করালীকান্ত এসে ঢুকলেন। কটকটে কালো রং, ছিপছিপে দেহ, ধবধবে

কাপড়জামা, মাথায় এলবার্ট-টেরি—চড়কডাঙার দত্তবাড়ির ছেলে বলে জাহির করেন সর্বদা। হেডমাস্টার, চিত্তবাবু এবং সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, বৃদ্ধ গঙ্গাপদবাবু পদমর্যাদায় বড়। করালীবাবুও খানিকটা কাছ ঘেঁসে যান ওঁদের। ইস্কুলের কেয়ারটেকার ও লাইব্রেরিয়ান। কালি-নিব-খড়ি ফুরিয়ে গেছে, পায়খানায় চুনকাম করতে হবে, বেঞ্চিটার ঠ্যাং ভেঙেছে ইত্যাদি যাবতীয় দায়ঝক্কি কেয়ার-টেকারের। ভাতা এই বাবদে মাসিক পাঁচ টাকা। এবং প্রাচীন আলমারি চতুষ্টয়ের দায়িত্ব বহন করায় অতিরিক্ত ভাতা আরও পাঁচ। তাছাড়াও ঘণ্টা কয়েক বেশি লিসার অন্যদের চেয়ে। ঐ লিসার পিরিয়ডগুলো নিয়ে করালীকান্ত সর্বদা সশঙ্ক—কখন কাটা পড়ে যায় চিত্তবাবুর খোঁচায়। বেঁটেখাতা লেখার সময় সেইজন্য ঘুণ হয়ে বসে থাকেন তাঁর পাশে। উঁহু, করছেন কি—ঐ সময়টা চুনের মিস্তিরি আসবে, দেখিয়ে-শুনিয়ে দিতে হবে। ক্লাসে ঢুকে থাকলে কেমন করে চলবে? আজকেও ছিলেন এতক্ষণ, ফাঁড়া কাটিয়ে হাসিমুখে এখন এসে বসেছেন।

এম-আর-এস কে হলেন করালীবাবু?

ওই যে, মহিমবাবু—নতুন যিনি এলেন আজকে। দাঁড়িয়ে কি করেন মশায়—আসুন, আলাপসালাপ করি। প্রেসিডেন্টকে কি করে বাগালেন বলুন দেখি?

দু-তিনজনে প্রায় সমস্বরে বলে ওঠেন, অ্যাঁ—প্রেসিডেন্ট?

করালী বলেন, খোদ হাইকোর্ট থেকে ফরমান নিয়ে এসেছেন, রোখে কে আপনাকে মশায়। কোন ক্লাস দিচ্ছিস রে দুখিরাম—এইট্থ বি? চিত্তবাবুকে বললাম, প্রেসিডেন্টের লোককে রৌরবকুম্ভীপাক ঘোরাচ্ছেন কি জন্যে? বললেন, টুইশানিওয়ালারা কেউ যেতে চায় না—নিচের মাস্টারকে কেউ তো পড়াতে ডাকে না। নতুন লোক উনি, টুইশানির টান নেই—ঘোরাঘুরি করুন না এখন দিনকতক।

দুখিরাম বেরিয়ে গিয়ে ক্লাসে ঘুরছিল। দ্রুতপায়ে ফিরে এল: গগনবিহারী-বাবু, উঠুন—দেখতে পাইনি সে সময়।

আছে তো? বল সেই কথা। চিত্রগুপ্ত সাধে নাম দিয়েছি! চিত্ত গুপ্ত নয়, চিত্রগুপ্ত—যমরাজের ম্যানেজার। বার মাস তিরিশ দিন এই কাণ্ড চলেছে। গোটা মানুষটা মারতে পারেন না, তাহলে ধরে নিয়ে ফাঁসিতে লটকাবে—লিসার মেরে মেরে তাই হাতের সুখ করে নেন। কি বলেন পতাকীবাবু?

পতাকীচরণ সমদুঃখী বটে, কিন্তু আপাতত আর এসবের মধ্যে নেই। দাঙ

এখনো বসে রয়েছেন, তার উপরে করালীকান্ত। নতুন আবার এই উদয় হয়েছেন প্রেসিডেন্সের লোক। ত্র্যহস্পর্শ-যোগ। পকেট থেকে বিড়ি বের করে নীরবে একটি ধরিয়ে নিলেন।

ঘণ্টা পড়ল। সেকেণ্ড পিরিয়ড। মহিম ক্লাসে যাবেন এবারে। ইস্কুল-কলেজে পড়েই এসেছেন এতদিন, জীবনে এই প্রথম ইস্কুলে পড়ানো। কতকাল আগেকার কথা! সেদিনের এইটথ ক্লাসের সেই আধো-আধো কথা-বলা শিশুগুলো এখন ছেলেপুলের বাপ। বলা যায় না, পিতামহও হতে পারে কেউ কেউ।

ঘণ্টা পড়লে মাস্টারমশায়রা সব ফিরছেন লাইব্রেরী-ঘরে। গোটা চারেক কুঁজো, কুঁজোর মাথায় গেলাস বসানো। ঢকঢক করে সব জল খেয়ে নিচ্ছেন, বিড়ি ধরাচ্ছেন। বেয়ারাদের ঘরের পাশে জানলাহীন আধ-অন্ধকার ছোট্ট একটা ঘরও আছে, সেখানে হুঁকো ও কলকের ব্যবস্থা। হুঁকো বিনে যাঁদের চলে না, তাঁরা সব ছুটলেন সেদিকে। উঃ কতগুলো মাস্টার রে বাবা, চিনে নিতে মাসখানেক লাগবে অন্তত। মহিম পাড়াগাঁয়ের ইস্কুলে পড়েছেন, এমন বিরাট কাণ্ডকারখানা তাঁর ধারণায় আসে না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গঙ্গাপদবাবু—খুনখুনে বুড়ো, দেহ নুয়ে পড়েছে, মাথায় একটা কাঁচা চুল নেই—বলছেন, কি বাবাজি, আজ থেকে লাগলে বুঝি? কোন ক্লাসে এখন? ভাল, খুব ভাল। দেখ, নিচের ক্লাস বলে তাচ্ছিল্য করে মাস্টার পাঠানো হয়। ঠিক উল্টো। ভিত তৈরি হয় ওখানে।—হেডমাস্টারেরই যাওয়া উচিত। উপরের ক্লাসে আমরা তো একটুখানি বাহার করে ছেড়ে দিই। ভিত কাঁচা থাকলে উপরের চাপে নড়বড় করে, ধ্বসে পড়ে ফাইনালের সময়। ভিত ভাল থাকলে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হয় না। এই দুখিরাম, ক-ছটাক জল রাখিস রে কুঁজোয়, গেলাসে ঢালতে ফুরিয়ে যায়। তুমি-তুমি করে বলছি বাবাজি, কিছু মনে কোরো না।

মহিম বলেন, বলবেন বইকি! ছাত্রতুল্য তো আমি।

তুল্য কেন বলছ? আমার অনেক ছাত্রের ছেলে তোমার চেয়ে বড়। একটা কথা বলি বাবাজি—বড় পুণ্যকর্ম এটা। হাসিভরা মুখ আর পবিত্র মন নিয়ে ক্লাসে ঢুকবে। দুখিরাম, নতুন মাস্টারমশায়কে ক্লাস দেখিয়ে দিয়ে আয় বাবা। নয়তো খুঁজে খুঁজে হয়রান হবে বেচারি।

বুড়ো হয়ে বেশি কথা বলেন গঙ্গাপদবাবু। বকতে বকতেই ছুটলেন আবার

ক্লাসে। ছুটবার সময় আর দেহ কুঁজো থাকে না, সরলরেখায় মত খাড়া হয়ে ওঠেন।

লম্বা একটা ঘর। এক ঘরের মধ্যে এইটথ ক্লাসের ছুটো সেকশন—'এ' আর 'বি'। 'সি' আর 'ডি' সেকশন ঠিক এমন মাপের উল্টো দিকটার ঘরে। পার্টিশন নেই মাঝে। আরে, পার্টিশনে যে জায়গা যাবে সেইখানেই কোন না দশটা ছেলে বসে আছে। ইস্কুলে জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না—জায়গা থাকলে দেড় হাজার ছেলে স্বচ্ছন্দে আড়াই হাজারে তোলা যেত। ভারতী ইনস্টিট্যুশনের খুব নাম বাজারে।

হাতাওয়ালা মান্ধাতার আমলের ভারী চেয়ার টেবিল দেখে মনে হবে, আস্ত চারটে গুঁড়ির উপর পেরেক ঠুকে এই পুরু পুরু তক্তা বসিয়ে দিয়েছে। পাকাপোক্ত কাজ। পঞ্চাশ বছর আগে ইস্কুলের জন্মকালে এই আসবাব গড়া হয়ে থাকে তো হেসে-খেলে আরও অমন দুই পঞ্চাশ কেটে যাবে।

কি হবে তোমাদের এ ঘণ্টায় ?

পয়লা বেঞ্চিতে সকলের প্রথম-বসা ছেলেটা বলে, বাংলা হবে সার।

অন্য সকলে কলরব করে ওঠে,—গল্প—গল্প হবে।

গল্পের নামে ওদিককার 'এ' সেকশনের ছেলেগুলোও সচকিত হয়েছে। নতুন সার যখন, নিশ্চয় বেশ নরম আছেন ; তার কাছে আবদার চলবে। তারাও চেঁচিয়ে দল ভারী করে : গল্প সার।

মহিম প্রশ্ন করেন, কে আছেন তোমাদের সেকশনে ?

রামকিঙ্করবাবু। তিনি আসেননি।

মহিম বললেন, আচ্ছা গল্পই হবে। চেঁচিয়ে গল্প করব, তোমরাও শুনতে পাবে। তার আগে পড়াটা হয়ে যাক। ততক্ষণ তোমরা কিন্তু চুপ করে থাকবে। কোথায় পড়া ?

সামনের বেঞ্চির সেই ভাল ছেলেটি বলে, ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর।

ও, সেই যে পোষা কুকুরের সঙ্গে বনের বাঘের দেখা। কুকুর খায়-দায় ভাল, কিন্তু গলায় শিকলের দাগ—সেই তো ? আচ্ছা, পড়ার গল্পই হবে আগে। ভাল খাবে জেনেও কেন বাঘ গৃহস্থবাড়ি যেতে চাইল না, সেইটে বলব।

ভাল ছেলেটা বলে, কাল জগদীশ্বরবাবু সার পড়িয়ে গেছেন। সমস্ত কথার মানে লিখে আনতে বলেছিলেন বাড়ি থেকে। আমি নিয়ে এসেছি।

বাহাদুরি নেবার জন্য খাতা থেকে গড়গড় করে পড়ে শোনাচ্ছে : সমস্ত লিখেছি। ব্যাঘ্র মানে বাঘ, পালিত মানে প্রতিপালিত, কুকুর মানে সারমেয়।

সহসা তুলতুলে একখানা হাত এসে পড়ে মহিমের মুখ ফিরিয়ে ধরছে ওদিকে। দেবশিশুর মত টুকটুকে এক ছেলে! গল্প শুরুতেই ভেস্তে যায় দেখে থাকতে পারেনি, সিট ছেড়ে উঠে এসেছে। আধো-আধো মিষ্টি সুরে, বলে, গল্প সার। ও সমস্ত নয়, গল্প—

দু-তিনটে ছেলে হাত নেড়ে ডাকছে তাকে: চলে আয় মলয়, অমনি করে বুঝি! সারের গায়ে হাত দেয়?

মহিমকে বলছে, নতুন ছেলে সার, জানে না। পরশুদিন ভর্তি হয়েছে। কখনো ইস্কুলে পড়েনি। ওকে কিছু বলবেন না।

অনেক তো বলবার ইচ্ছে করে কোলের উপর বসিয়ে! ক্লাসের ছেলেগুলো মানা করছে। মায়ের কোল ছেড়ে এসেছে—আহা, কাউকে এখনো পর ভাবতে শেখেনি। ভালবেসে গায়ে হাত দিয়েছে, একেবারে কিছু না বলে পারা যায় কেমন করে?

বললেন, নাম তোমার মলয়? দিব্যি নাম। ভাই-বোন ক'জন তোমরা?

তুই হতভাগা চেয়ার ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছিস। মুখ টিপলে দুধ বেরোয়— কী সাহস রে বাবা! যা, সিটে গিয়ে বোস।

হুঙ্কার দিয়ে রামকিঙ্কর ঘরে ঢুকলেন: মুখ নড়ছে সর্বক্ষণ সুপারি চিবান। গালের দুই প্রান্তে চিবো সুপারির কষ বেরিয়ে পড়ছে। ছেলেরা উঠে দাঁড়িয়েছে। মহিমের একেবারে পিছনে তিনি, 'বি' সেকশনের এলাকার মধ্যে। তাকিয়ে দেখে মহিমও চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

রামকিঙ্কর বললেন, এত এলাকাড়ি দিচ্ছেন কেন মশায়? যা ভাবছেন, সে গুড়ে কিন্তু বালি।

কি ভাবছি?

হি-হি করে হেসে রামকিঙ্কর বলেন, চেহারায় ধরেছেন ঠিক। ভাল ঘরের ছেলেই বটে, চৌধুরী বাড়ির ছেলে। কিন্তু টোপ গেঁথে গেছে, নজর দিয়ে আর মুনাফা নেই। দাশু পড়াচ্ছে। দাশু খলিফা লোক, বয়স কম হলে কি হয়— মাথায় খুব প্যাঁচ খেলে—ওর সঙ্গে আমরা পেরে উঠিনে। 'বি' সেকসনে বলতে গেলে আমারই বুকের উপরে তিন তিনটে দিন চরে ফিরে বেড়াল, আমি পারলাম না, দাশু ঠিক বড়শি গেঁথে তুলে নিয়ে চলে গেল।

রামকিঙ্করের তাড়া খেয়ে মুখ কাচুমাচু করে মলয় জায়গায় গিয়ে বসেছে। আর সে এদিকে তাকায়নি, হয়তো বা কাঁদবে বসে বসে। বিরক্তি চেপে নিয়ে

মহিম বললেন, আমি কিন্তু একেবারে কিছু ভাবিনে। ক্লাসে নতুন এসেছি, ছেলেদের সঙ্গে চেনাশুনা করে নিচ্ছি।

হতে পারে। মহিমের আপাদমস্তকে বার দুয়েক দৃষ্টি বুলিয়ে রামকিঙ্কর ভ্রূকুটি করলেন: সদ্য আমদানি! উঁ, গোঁফও ওঠেনি ভাল করে। তা বেশ, সবে তো কলির সন্ধ্যে—আজকে ভাবেননি, ভবিষ্যতে বিস্তর ভাবতে হবে। কিন্তু দরজা হাঁ-হাঁ করে কী রকম পড়ানো মশায়। বাইরের গোলমাল ঘরে আসে, ঘরের গোলমাল বাইরে চলে যায়। ক্লাসে এসে দুয়োরটা আগে এঁটে দেবেন। নিজের কায়দা অপরকে দেখতে দেবেন কেন?

নিজ হাতে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে হেলতে দুলতে 'এ' সেকশনের দিকে চললেন। চেয়ারে বসে টেবিলের উপর পা দুটো তুলে দিলেন।

কি আছে রে?

অঙ্ক—

খিঁচিয়ে উঠলেন রামকিঙ্কর: সবে এই ছুটোছুটি করে এলাম, অঙ্ক এখন কিরে? অঙ্ক হবে বিকেলবেলা।

রুটিনে আছে সার।

থাকবে না কেন? চিত্তবাবুর রুটিন তো। নিজে কস্মিনকালে ক্লাসে যাবেন না, একে তাকে পাঠিয়ে কাজ সারেন—বুঝবেন কি করে রোদে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আবার তক্ষুণি বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঙ্ক কষানোয় কি ঠ্যালা! ইতিহাস কখন।

টিফিনের পরের ঘণ্টায় সার।

সেইটে এখন হয়ে যাক। বের কর ইতিহাসের বই।

এইটথ ক্লাসের ক্লাস-টিচার রামকিঙ্করবাবু—'এ' সেকশনের। চিরকাল ধরে এইটথ আর নাইন্থ ক্লাসে পড়াচ্ছেন, অন্য মাষ্টারের মতো অনুযোগ নেই। অন্যের অনুপস্থিতিতে চিত্তবাবু কখনো-সখনো দু-এক ক্লাস উপরে দিতে গেছেন—রামকিঙ্করবাবুই হাঁ-হাঁ করে ওঠেন: বয়সকালে দিলেন না, কেন সার বুড়ো বয়সে ঝামেলায় ফেলেন। জানিই কী। একবালে জানতাম, এখন বেমালুম হজম করে বসে আছি। নতুন ক্লাসে চোখে সর্ষের ফুল দেখব।

অন্য মাস্টাররা বলেন, তা উনি বলবেন বইকি! তিন ছেলে রোজগেরে। টুইশানি একটা-দুটো হল ভাল, না হলেও অচল হবে না। রামকিঙ্করবাবুর মতন ভাগ্য কার!

রামকিঙ্কর বলছেন, ইতিহাসের কোন্‌খানে পড়া—শাজাহান ও তাজমহল?

পড়ে এসেছিস ভাল করে? একটা এদিক-ওদিক হলে পিতৃদত্ত নাম ভুলিয়ে দেব।

ছেলেরা চুপ করে আছে। পিতৃদত্ত নামের মতো শক্ত ব্যাপারের মানে বুঝবার এখনো বয়স হয়নি। রামকিঙ্কর সহসা সদয় হয়ে বললেন, লিখে ফেল ওটা আগাগোড়া। লেখাই আসল। যত্ন করে খুব ধরে ধরে লিখবি।

ইতিহাসের বই খুলে নিল সমস্ত ছেলে। টেবিলের ওপর পা আগেই তোলা ছিল, অতঃপর রামকিঙ্কর চোখ বুজালেন। ক্ষণে ক্ষণে নাসার ধ্বনি। আবার সামলে নিচ্ছেন। ইতিহাস লেখা বন্ধ করে ছেলেরা কাটাকাটি খেলা শুরু করেছে। প্রয়োজনে পড়ে এরা নানা রকম নিঃশব্দ খেলার আবিষ্কার করেছে। তাতে আপত্তি নেই, শব্দ না হলেই হল। তারপরে সারকে গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন জেনে সাহস ক্রমশ বেড়ে যায় ওদের। খেলার রকমফের চলেছে। এ-ওর পেন্সিল কেড়ে নিচ্ছে, বই ছুড়ে দিচ্ছে—বলের মতো লুফে নিচ্ছে আবার চিমটি কাটছে পরস্পর। জায়গা বদলাবদলি করে এর কাছ থেকে ওর কাছে গিয়ে বসেছে। একজনের বই পড়ে গেল এরই মধ্যে মেঝেয়। ঘুমলে কি হবে, ক্ষীণতম শব্দও কানে এড়ায় না। রামকিঙ্কর তাড়া দিয়ে ওঠেন সঙ্গে সঙ্গে, এইও—

ছেলেরা থতমত খেয়ে একবার তাকায়। তারপর যথারীতি খেলা চলতে থাকে। ওটা কিছু নয়, ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ আওয়াজ। চোখ না খুলেই চলে ওটা। তিরিশ বছর ধরে এই অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্লাসে কানামাছি খেল, যা ইচ্ছে কর— শব্দ না হলে শঙ্কার কিছু নেই।

বাইরের কয়েকটা ছেলে অল্পদিন আগে ভর্তি হয়েছে। তারা অতশত বোঝে না। লেখা শেষ করে একটি এসে ডাকছে, সার—

অন্য ছেলেরা হাত নেড়ে নিঃশব্দে ইঙ্গিতে প্রাণপণে তাকে ডাকছে জায়গায় ফিরে এসে বসবার জন্যে। ছেলেটা হয় বুঝতে পারছে না, নয়তো সকলের আগে লেখা দেখিয়ে বাহাদুরি নিতে চায় মাস্টার-মহাশয়ের কাছে।

হয়ে গেছে সার।

ঘুমের মধ্যে রামকিঙ্কর সাড়া দিয়ে ওঠেন, উঁ—

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গে ত্রিভুবন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, রামায়ণে আছে। রামকিঙ্কর মাস্টারমহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ আসন্ন। চক্ষের পলকে পট-পরিবর্তন। ছেলেরা যে যার জায়গায় বসে খাতার উপরে ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগে লিখে যাচ্ছে।

স্যার, লেখা শেষ হয়ে গেছে।

এরই মধ্যে ? দেখি।

একটানে খাতা কেড়ে নিয়ে নিদ্রারক্ত চোখ দুটো বিঘূর্ণিত করে রামকিঙ্কর হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন : শাজাহানে কোন্ শ, তাজমহলে কোন্ জ ?

ছেলেটা লেখাপড়ায় ভাল। তবু দোনলা বন্দুকের দুই গুলি একসঙ্গে তাক-করায় ঘাবড়ে গিয়ে বলে তালব্য-শ উঁহু, দন্ত-স।

মূর্ধন্য-ষ কেন হবে না।

মূর্ধন্য-ষ স্যার।

আর চিলে যেমন করে ছোঁ মারে, চাদরের নিচে থেকে বাঁ-হাতখানা বেরিয়ে এসে চুলের মুঠি ধরে আচমকা দিল হেঁচকা টান। ডান হাতের দুটো আঙুল বেঁকে চিমটার মতো হয়ে চেপে ধরেছে তার কনুয়ের কাছটা। চামড়ার উপরে পাক পড়ছে।

লাগছে কেমন—মিষ্টি ?

নতুন নিয়মে ক্লাসে বেত নিয়ে যাওয়া বন্ধ হেডমাস্টারের কড়া নিষেধ। লাইব্রেরি-ঘরের কোণে আলমারির একটু আড়াল করে বিশ-পঁচিশ গাছা বেত থাকত, মাস্টারমশায়রা দরকার মতো নিয়ে যেতেন। বেয়ারাদের এখন সমস্ত দিয়ে দেওয়া হয়েছে উনুনে পোড়ানোর জন্য। বুড়ো শিক্ষকরা মুখ তাকাতাকি করেন : মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি, স্পেয়ার দ্য রড এণ্ড স্পয়েল দ্য চাইল্ড—শাস্ত্রবাক্য রয়েছে। সে বাক্যের অন্যথাচরণ করে দিন-কে-দিন কী হতে চলল ! শুধু রামকিঙ্করের দৃকপাত নেই : বয়ে গেছে, বেতের কি গরজ ? বলি, আঙুল দুটো তো কেটে নিচ্ছে না ! ছেলেরা বলে, রামকিঙ্কর স্যারের আঙুল নয়—লোহার সাঁড়াশি। আঙুল দিয়ে দেহের উপর ওই প্রক্রিয়াটির নামকরণও হয়েছে ভাল—মধুমোড়া।

মোড়া দিতে দিতে রামকিঙ্কর প্রশ্ন করেন, মিষ্টি লাগছে তো ? মধুর মতো ?

এই ব্যাপার হচ্ছে, পিছনে আবার এক হাঁদারাম এসে দাঁড়িয়েছে। আহা রে, বড়-বড় চোখ, থোপা-থোপা চুল—। কিন্তু গতিক বুঝে ছোঁড়াটা এখন সরে পড়বার তালে আছে। সে সুযোগ দিলেন না রামকিঙ্কর। পয়লাটাকে ছেড়ে ধাঁ করে তার হাত থেকে কেড়ে নিলেন খাতাখানা। যেন সমরে নেমেছেন—যে সামনে এগুবে, কোনমতে তার নিষ্কৃতি নেই দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেন খাতায়। মুখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখলেন ছেলেটার দিকে। আবার পড়লেন। কোথাকার হতভাগা রে—একটা ভুল রাখে না। একটা

লাইন বাঁকা নেই, ই-কার উ-কার এমন কি একটা মাত্রার অবধি হেরফের নেই। আগাপাস্তলা অক্ষেন্ত বর্ম পরে এসেছে যেন। খাতাটা গোল করে পাকিয়ে তাই দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলেন তাকে: সিটে গিয়ে বোস। একবারে হয় না, আরও লেখ। দু-বার তিনবার ধরে ধরে লেখ ভাল করে। তিনবার হলে আসবি, তার আগে নয়।

সমস্ত ক্লাসে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, নিয়ে আয় রে, অন্য কার হল—

কারও হয় নি। হবেও না ঘণ্টার মধ্যে। পুরানো ছেলে তারা, বহুদর্শী—এ ছুটোর মতো হালফিলের ভর্তি হওয়া নয়। নিশ্চিন্ত হয়ে রামকিঙ্কর পুনশ্চ চোখ বুজলেন।

ঘণ্টা পড়তে রামকিঙ্কর চোখ মেলে উঠে পড়লেন। বেরিয়ে যাবার মুখে মহিমের কাছে দাঁড়ালেন।

ভায়া নতুন এসেছ কিনা—শুনছিলাম তোমার পড়ানো। ক্লাসে গোল হয় কেন? বদনাম হয়ে যাবে।

মহিম বলেন গোল কোথা? বোঝাচ্ছিলাম। একেবারে শব্দ না করে পড়ানো যাবে কেন?

আমি তবে পড়াই কি করে? তিরিশ বছর হয়ে গেল। কত গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করেছি। সুখময় চকত্তির নাম শুনেছ—ছোট আদালতের জজ। আমার ক্লাসের ছাত্র। হাফ-ইয়ার্লিতে ইংরেজীতে পেল তের। পড়াতে লাগলাম। এন্থ্রান্সে উঠে গেল তিরানব্বুই। স্বভাবচরিত্র পালটে গেল। একেবারে চুপচাপ থাকে, সাত চড়ে কথা বলেন না। হাকিম হয়ে এজলাসে বসে এখনো তাই। সেই অভ্যাস রয়ে গেছে—সারাটা দিন চুপচাপ, রা কাড়ে না মুখে।

মহিমের কাঁধে হাত দিয়ে একসঙ্গে বেরচ্ছেন ক্লাস থেকে। বলেন, তুমি ভাই বড্ড শব্দ করে পড়াও। 'এ' সেকসনের অসুবিধে হয়। ফুসফুস বড্ড খাটাও তুমি। নতুন আনকোরা কিনা, বিষদাঁত ভাঙেনি। লাইনে এসে পড়েছ যখন, তিরিশ-চল্লিশ বছর চালাতে হবে। নেচেকুঁদে একদিনে সব বুঝিয়ে দিলে তো পরে থাকল কি? ফুসফুসেই বা সইবে কেন?

ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ডি-ডি-ডি কামরা ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ান। মাস্টাররা এক ক্লাস বেরিয়ে অন্য ক্লাসে যান—হচ্ছে-হবে করে পরস্পর একটু গল্প-সল্প করে ওরই মধ্যে যে ক'টা মিনিট কাটিয়ে নেওয়া যায়। ছেলেরাও ক্লাস ছেড়ে বেরোয় মাস্টার বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে। হেডমাস্টার দাঁড়িয়ে থাকলে পেরে

ওঠে না তেমন। রামকিঙ্করকে ডি-ডি-ডি ডাক দিলেন, শুনুন এ দিকে। ইস্কুলে ক'টায় এসেছেন ?

সাড়ে দশটায়।

লিখেছেন তাই বটে। সাড়ে-দশটাও নয়, দশটা পঁচিশ। এসেছেন এগারোটার পর।

রামকিঙ্কর চুপ করে আছেন।

কি বলেন। ভেবেছেন আমি টের পাইনে ?

হাত কচলে রামকিঙ্কর বলেন, আজ্ঞে না। সে কি কথা ! আপনি অন্তর্যামী। আপনার অজান্তে এ ইস্কুলে কোনটা হতে পারে ?

দেরী করে এসে দশটা পঁচিশ কেন তবে লিখলেন ?

ভুল হয়ে গেছে।

কালও দেরি হয়েছিল আপনার। রোজই হয়।

আজ্ঞে—

কেন হয়, সে কথা জিজ্ঞাসা করছি।

এবারে অনেকগুলো কথায় রামকিঙ্কর জবাব দিলেন : বউমা বড়ি দিয়ে বেগুনের ঝোল করেছিলেন। নতুন বেগুন উঠেছে এখন, ঝোল খেতে খাসা লাগে। আবার সামনের উপর বসে বউমা এটা খান ওটা খান করেন। তা মজা করে খাব, তার জো আছে ? ভয়ে ভয়ে মরলাম চিরকাল। আপনার কথা মনে পড়ে গেল—খাওয়া ফেলে মুখ-হাত ধুয়ে ছুটবার দিশে পাইনে। তবু তো দেরি। এবারটা মাপ করে দিন, আর দেরি হবে না।

মাস্টারদের তিনি আতঙ্ক, ডি-ডি-ডি বড় প্রসন্ন হন শুনে। আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। বিশেষ করে এই রামকিঙ্কর—বয়সে অন্তত দেড়গুণ যিনি হেডমাস্টারের। মৃদু হেসে তিনি এগিয়ে গেলেন। অর্থাৎ রামকিঙ্করের ব্যাপার মিটল। দ্রুত খানিকটা এগিয়ে মহিমের কাছে এলেন। বলা নেই, কওয়া নেই, নিজের চাদরটা নিয়ে মহিমের কাঁধে ঝুলিয়ে দিলেন।

মহিম সবিস্ময়ে তাকান। ডি-ডি-ডি বলেন, কী সর্বনাশ ! বিনি চাদরে এতক্ষণ ক্লাস করলেন নাকি ? আজকের দিনটা আমার চাদর নিয়ে ক্লাসে যান। কাল থেকে চাদর নিয়ে আসবেন।

মহিম এইবারে লক্ষ্য করবেন, চাদর সব মাস্টারের কাঁধেই। কনেস্টবলের যেমন কোমরে চাপরাশ, মাস্টারের তেমনি চাদর গলায়। ডি-ডি-ডি বলেন, ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের তফাৎ থাকা চাই তো একটা—চাদর হল তাই।

এই এক খেয়াল হেডমাস্টারের। চাদর চাই-ই চাই, নয় যেন ভারিক্কি হয় না। মহিমের ভাল লাগে না। চাদরের সঙ্গে বিশ-ত্রিশ বছর বয়সও যেন বাড়তি চাপিয়ে দিলেন কাঁধের উপর। চপলতা মানা। ইস্কুলের এলাকার ভিতর মুখ গম্ভীর করে থাকতে হবে, এমনি সব নির্দেশও যেন নামাবলীর মতন চাদরের উপর লেখা রয়েছে। বুড়ো না হয়ে পাকা মাস্টার হওয়া যায় না—চাদর জড়িয়ে জবরদস্তি করে যেন তাই বুড়ো করে দেওয়া হল।

সামনের ছোট উঠানের প্রান্তে জলের ঘর। অনেকগুলো কল সারবন্দি—ছেলেরা সব পাশাপাশি জল খাচ্ছে। রামকিঙ্করও জল খাচ্ছেন তাদের মধ্যে ঢুকে তাদের মতন কলে হাত পেতে। জল খেতে খেতে মুখ তুলে দেখলেন, জগদীশ্বরবাবু অদূরে। সিনার বোধহয় তাঁর, দাঁড়িয়ে দেখছেন। অপ্রতিভ ধরনের হাসি হেসে রামকিঙ্কর বলেন, আমি মশায় জলটা একটু বেশি খাই। পঞ্চাশজন মাস্টারের জন্ত চারটে কুঁজো—জল তো দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে। অমন মাপা গেলাসের জল খেয়ে আমার পোষায় না।

জগদীশ্বর বলেন, ও সমস্ত কি বললেন আপনি হেডমাস্টারের কাছে? কাল আপনার দেরি কোথা? একসঙ্গেই তো দুজনে এলাম।

রামকিঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন: বটেই তো! দেরি আজকে হয়েছে, কাল হয়নি।

তবে হাঁ বলে ঘাড় নাড়লেন কেন? হেডমাস্টারকে বলতে পারতেন সে কথা।

এক গাল হেসে রামকিঙ্কর বললেন, উপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই। যা বলে 'হাঁ' দিয়ে যেতে হয়।

বলেছেন কিন্তু আর দেরি হবে না কোনদিন—

রামকিঙ্কর নিশ্চিন্ত ঔদাস্তে বললেন, তিরিশ বছরের চাকরিতে অন্তত পক্ষে তিনশবার বলেছি অমন। ওঁকে বলেছি, ওঁকে আগে যিনি হেডমাস্টার ছিলেন তাঁকে বলেছি কত দিন। তার আগের জনকেও বলেছি। বউমার পাঁচ ছেলেমেয়ে, ঝি-চাকর নেই—অতগুলোকে সামাল দিয়ে তবে তো রান্না চাপাবেন! সময়ে আসা ভাগ্যিভোগা একদিন হল তো দশদিন হবে না। ক'দিন আর খাব বলুন মশায়। তাই বলি খেয়ে নিই, ইস্কুল তো আছেই। কিন্তু বুঝিয়ে বলতে গেলে শুনছে কে? ঘাড় নেড়ে দিয়ে সরে পড়া ভাল।

॥ চার ॥

টিফিনের ঘণ্টা একটু ঠুন-ঠুন করেছে কিনা, একতলা দোতলা তেতলার সকলগুলো ঘর থেকে একসঙ্গে তুমুল আওয়াজ। হু-উ-উ-উ—। দেড় হাজার সোডার বোতলের মুখ ফেটে একসঙ্গে জল উৎসারিত হচ্ছে, এই গোছের একটা কথা মনে আসে। তিনঘণ্টা কাল ছিপি-আঁটা অবস্থায় যেন ক্লাসের বেঞ্চিতে বেঞ্চিতে সাজানো ছিল, লহমার মধ্যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। বারান্দা, হল, দুই উঠোন ভরে হুড়োহুড়ি চেঁচামেচি মারামারি। ইস্কুলে আসবার সময় একজন-দুজন পাঁচজন-দশজন করে আসে। ভারতী ইনস্টিট্যুশন যে কত বড় ব্যাপার, পরিমাণটা তখন ধারণায় আসে না।

অজয়-বিজয় দুই ভাই। মুখের চেহারা প্রায় এক রকম—দুই ভাই সেটা বলে দিতে হয় না। দু-ভাই রোজ পোশাকও এক রকমের পরে আসে। সাদা হাফপ্যাণ্ট আর সাদা হাফসার্ট। সদ্য পাট-ভাঙা—ভাঁজগুলো সরলরেখায় স্পষ্ট হয়ে থাকে। ওয়ার্নিং ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে মোটরগাড়ি গেটে এসে দাঁড়ায়; দু-ভাই নেমে পড়ে যেন নাচতে নাচতে দোতলায় উঠে যায়। গাড়ি সশব্দে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যায় পলক না ফেলতে। তখন গাড়ির ভিতরে থাকে আশ্চর্য সুন্দরী একটি মেয়ে। মাস্টারমশায়রা অনেকে দেখেছেন। আজকে জগদীশ্বরবাবু হন-হন করে ঢুকছেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন অজয়-বিজয়ের গাড়ি। থমকে দাঁড়ালেন অমনি গেটের পাশে। মেয়েটাকে এক নজর দেখে নেওয়া, বয়সের ফারাক তখন মনে থাকে না। এই ব্যাপারে দু-মিনিট দেরি হয়ে গেল নাম সই করতে। হেডমাস্টার অদূরে, অতএব দশটা সাতাশই লিখলেন, রামকিঙ্করের মতো সময় চুরি করতে যাননি। দেরি হওয়ার দরুন নামের নিচে যথারীতি লাল পেন্সিলের দাগও পড়ল। তবু এক ধরনের তৃপ্তি পলকের ওই দেখে নেওয়ার মধ্যে। কথায় কৌশলে জগদীশ্বর ক্লাসের মধ্যে মেয়েটার পরিচয়ও নিয়েছেন। অজয়-বিজয়ের বড় বোন। ভাই দুটোকে ছেড়ে দিয়ে অফিসে চলে যায়, ভাল কাজ করে কোন অফিসে। এত সমস্ত জেনে নিয়েছেন জগদীশ্বরবাবু।

টিফিনের ঘণ্টায় আধবুড়ো একটি লোক অজয়-বিজয়ের টিফিন নিয়ে এসেছে। বেশি কিছু নয়—দুটো করে সন্দেশ আর কাচের কুঁজোয় জল। রোজই দেখা যায় লোকটাকে এবং রোজই এই এক জিনিস। গেটের বাইরে রাস্তার পাশে গরম গরম পকৌড়ি ভাজে টিফিনের এক সময়টা। রেলিঙের ফাঁক দিয়ে হাত

বাড়িয়ে অনেক ছেলে শালপাতার ঠোঙায় পকৌড়ি কিনে খাচ্ছে। সন্দেশ হাতে নিয়ে বিজয় করুণ চোখে তাকায় সেদিকে। একটা ছেলে বলল, কি গো, লোভ হচ্ছে? খাবে?

বিজয় বলে, সন্দেশ খাও না তুমি একটা।

উঁচু ক্লাসের ছেলে। সে মুখ বাঁকায়: দুর, সন্দেশ কেন খাব? যা নরম—জিভে লেপটে যায় কাদার মতো।

একটু পরে, যেন মহৎ একটা ত্যাগ স্বীকার করছে এমনি ধরনের মুখ করে বলে, তা দাও একটা সন্দেশ। আমি পকৌড়ি দিচ্ছি দুটো। একটার বদলে দুটো দিচ্ছি—খাও।

দুটো পকৌড়ি দু-ভাই তারা ভাগ করে নিয়েছে। পরম আনন্দে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে। ওদের সেই লোকের দিকে চেয়ে বলল, তুমি তো আর-কিছু দেখতে পাও না মথুর। সন্দেশ আর সন্দেশ।

মথুর হেসে বলে, বা ঠাকরুন তাই বলছেন যে। তিতু ময়রার দু-আনাওয়ালা সন্দেশ নিয়ে যাবে দুটো করে। তোমরাও কিছু বলনা তো দাদাবাবু।

অজয় বলে, পকৌড়ি ভাল, ভালমুট ভাল, ফুচকা ভাল। আমরা এইসব খাব এখন থেকে, বুঝলে?

মথুর বলে, শক্ত কিছু নয়—রোজই কিনে আনা যায়। এক একদিন একরকম। তোমাদের খাবার ইচ্ছে, আমি কেন এনে দেব না? তবে মা টের পেলে আস্ত রাখবেন না। পষ্টপষ্ট করে বলেছেন, সন্দেশ ছাড়া অন্য-কিছু তোমাদের পেটে না যায়।

বিজয় বলে, আমরা কিছু বলব না। জিজ্ঞাসা করলে বলব, সন্দেশ খেয়েছি। টের পাবে কেমন করে মা?

তবুও চিন্তাকুল ভাব মথুরের।

বিজয় বলে, আজকে পকৌড়ি হল যা-হোক একখানা করে। কাল ভালমুট নিয়ে আসবে। কেমন?

মথুর বলে, মুশকিল হল, মা তো মাত্তোর চার আনা করে পয়সা দেন। চারটে সন্দেশ টায়েটোয়ে হয়ে যায়। কিন্তু ভালমুট চার আনায় কুলোবে কিনা ভাবছি।

অজয় বলে, ফুচকা?

শিউরে উঠে মথুর বলে, তাতে তো আরো বেশি খরচ।

অজয় অভয় দিল: ভেবো না মথুর-দা, আমার কাছে টাকা আছে।

পিসেমশায় পুজোর সময় পাঁচ টাকা বাজার-খরচ দিয়েছিলেন। খরচ করিনি, তোলা আছে। সেই টাকা কাল তোমায় দিয়ে দেব। কাউকে কিছু বলব না। ফুচকা নিয়ে এস তুমি কাল।

মহিমের প্রথম দিন আজ, অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন। পিছন দিকে হাত পড়ল একখানা। তাকিয়ে দেখেন মলয় চৌধুরি হাত রেখেছেন তাঁর গায়ে। মুখ মলিন—ঠাহর করলে বুঝি চোখের কোণে জলের আভাস নজরে পড়বে।

তুমি খেলা-টেলা করছ না মলয়?

ভাল লাগে না সার। আমি বাড়ি যাব। আপনি একবার দারোয়ানকে বলে দিন। মার জন্য প্রাণ পুড়ছে।

হাত জড়িয়ে ধরে গেটের দিকে নিয়ে চলল মলয়। চললেন মহিম—অমন করে বলছে, হাত ছাড়িয়ে নেবেন কেমন করে?

বাপে ছেলেয় দারোয়ানি করে। দু-জনে গেটের পাহারায় আছে। ছেলেটা রীতিমতো পালোয়ান, দু-হাতে দুই পাল্লার রড এঁটে ধরে বুক চিতিয়ে আছে—ভাবখানা, কে কত ক্ষমতা ধর এগোও এদিকে। বুড়ো দারোয়ান খানিকটা আগে থেকে ভিড়টা চারিয়ে দিচ্ছে—সবাই একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে গেটের উপর না পড়ে। হেডমাস্টারের সই-দেওয়া টিফিন-পাশ যাদের আছে তারাই শুধু বেরতে পারবে। আর বেরবেন মাস্টারমশায় ও গার্জেনরা।

মহিমের কাছে এগিয়ে এসে বুড়ো দারোয়ান হুঙ্কার দেয়, পাশ?

মহিম হতবুদ্ধির মতো তাকালেন। দারোয়ান বলে, পাশ নেহি' তো ভাগো। বজ্জাত, বাঁদর—

করালী কখন পিছন দিকে এসেছেন, হো-হো করে হেসে উঠলেন: পাশ লাগবে না দারোয়ানজি, টিচার ইনি। নতুন এলেন। বয়স কম দেখেছে কিনা ছাত্র বলে ধরে নিয়েছে। কাঁধে চাদরটা ছিল, সেইটে রেখে এসেই গোলমাল। বাইরে বেরবেন বুঝি? আমি বেরচ্ছি, আসুন।

নাঃ আমার গরজ নেই। ছেলেটা যাবে-যাবে করছে।

মুখ টিপলে দুধ বেরোয়, বাইরের টান ধরেছে এর মধ্যে? বাইরে যাবে তো গার্জেনের চিঠি নিয়ে এস। বিনি-পাশে যেতে চায়, আব্দা বুঝুন এটুকু ছেলের। এই এক কায়দা। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে, থাকে—টিফিনের প্রথম মুখে বড্ড চাপ পড়ে তো—পাশওয়ালাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে গোলমালে এমনি দু-পাঁচটা ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে বেরোয়।

মলয়ের দিকে ফিরে রসিকতা করে করালী বলেন, সে ঝোঁক কেটে গেছে বাবা। আজকে আর সুবিধে হবে না। লেট করে ফেললে যে। ঘণ্টা পড়তে না পড়তে ভিড়ের মধ্যে সেঁদিয়ে যাবে। তবেই হবে।

ছেলেটা কি বুঝল, কে জানে। মুখখানা আরও বিষণ্ণ করে চলে গেল। করালী বলেন, আসুন না ঐ মোড় অবধি। পান খাওয়াব। দারোয়ানজি, মাস্টারমশায়কে চিনে রাখ। আর যেন ভুল হয় না।

মহিমের পান খাবার গরজ নেই, কিন্তু করালীবাবুর হাত এড়ানো যায় না। টানতে টানতে নিয়ে চললেন। পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেলেন অন্য এক মাস্টার। সলিলবাবু। দীর্ঘ অস্থিসার দেহ, মাথাভরা টাক, দু-চোখ কোটরে বিলুপ্ত। কিন্তু ছুটেছেন বাতাসের বেগে।

করালী চোখ টিপে বলেন, মজাটা দেখুন :

চেঁচাচ্ছেন, ও সলিলবাবু, শুনুন দরকারি কথা আছে একটা, শুনে যান!

বারংবার ডাকাডাকিতে সলিলবাবু পিছনে চেয়ে একটিবার হাত ঘুরিয়ে আরও বেগ বাড়িয়ে দিলেন।

ও সলিলবাবু, আপনার জামাইয়ের চাকরি হয়েছে। খবর পেয়েছেন?

হুঁ-উঁ-উঁ—একটা অব্যক্ত স্বর বের করে সলিলবাবু অদৃশ্য হলেন।

করালী হেসে উঠলেন, দেখলেন! গুপ্ত-অধ্যাপনার শাহান-শা। এখন হল যাত্রা-মুখ—ছেলে ছাত থেকে পড়ে গেছে শুনলেও অমনি হাত ঘুরিয়ে দিয়ে ছুটবেন।

হিম বুঝতে পারেন না : গুপ্ত-অধ্যাপনা ব্যাপারটা কি?

করালী বলেন, সে কী মশায়, মাস্টারি লাইনে এলেন, গুপ্ত-অধ্যাপনা জানেন না? ওই তো আসল। ইংরেজিতে যাকে বলে প্রাইভেট টুইশান। কিন্তু আমার অ্যাদ্দিনেও ওটা রপ্ত হল না। দু-বেলায় মোটমাট চারটের বেশি পেরে উঠি নে।

সলিলবাবু পড়াতে চললেন এখন?

করালী বলেন, সকালে বিকালে রাত্রে তো আছেই। ঠাসা একেবারে, নিঃশ্বাস ফেলার ফাঁক নেই। বাড়তি একটা এই ইস্কুলের মধ্যে সেরে আসেন। চিত্তবাবুকে রোজ চা খাইয়ে জপিয়ে-জপিয়ে রেখেছেন—টিফিনের পরের পিরিয়ডটা ফাঁক করে দেন। চালাকি কেমন! বেঁটে বইতে লিখলে রেকর্ড থেকে যাবে, অমুক মাস্টারের ক্লাসে রোজ একে তাকে পাঠানো হচ্ছে—সেজন্য আলাদা স্লিপ পাঠানো হয়। বাইরে থেকে লোকে জানে, বড্ড সাধাসিধে গোবেচারা মাস্টার আমরা—ভিতরে ঢুকলে হরেক মজা দেখবে।

পানের দোকানের সামনে দাঁড় করালেন। জবল-খিলি কিনে দিলেন এক পয়সা দিয়ে। সিগারেট কিনতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু মহিম খান না। মাস্টার মানুষের পক্ষে রীতিমতো সদাব্রতের ব্যাপার। তবে করালীকান্তর কথা স্বতন্ত্র, ষোল আনা মাস্টার তিনি নন। তার উপরে বড় ঘরের ছেলে। মুক্তি, লক্কা, গোলা আর লোটন—চার রকমের একশ'টা পায়রা পুষতেন তাঁর ঠাকুরদাদা—শুধুমাত্র পায়রার বাবদে কত টাকা যেত মাসে মাসে! আজকে পয়সা না থাকুক মেজাজটা যাবে কোথা?

বলেন, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কি, বলুন দেখি।

সম্পর্ক কী আবার!

তাই বললে কি শুনি মশায়। সম্পর্ক না থাকলে নিজে লিখে পাঠিয়ে চাকরি দিতেন না। বলতে চান না, সেইটে বলুন।

মহিম বলেন, সত্যি এমন কিছু নয়। আমার বাবা ছেলেবেলায় কিছুদিন তাঁকে পড়িয়েছিলেন—মহৎ ব্যক্তি তিনি—

কথা লুফে নিয়ে করালী বলেন, সে তো একশ বার। হাজার বার। কেউ কেউ আবার কি বলে জানেন?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বললেন, ছোট ভাইয়ের মতন আপনি। বলেই ফেলি। কেউ কেউ বলছে, ভিতরের খবরাখবর নেবার জন্য প্রেসিডেন্ট একজন নিজের লোক বহাল করলেন। তাই যদি হয়, আমি তো দোষের কিছু দেখিনে। এত নামডাকের ইস্কুল, ইন্দ্র-চন্দ্র বায়ু-বরুণ বেরিয়েছেন এখান থেকে—আজ তিন বছর ধরে যা রেজাল্ট হচ্ছে বলবার কথা নয়। যাবতীয় গুহ্য ব্যাপার কর্তাদের কানে যাওয়া উচিত। নয় তো সংশোধন হবে কি করে? এই যে সলিলবাবু ইস্কুল ছেড়ে টুইশানি সারতে চললেন—কিংবা ওই চিত্তবাবুই বেঁটেখাতায় প্রকাশ্যে মারেন, আবার চোরাই-মার মারেন স্লিপ পাঠিয়ে। বড়দের গা ছুঁতে সাহস পান না, মরণ যত হাবাগোবা নবম মাস্টারের।

একটু থেমে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে আবার বলতে লাগলেন, এই আমার কথা ধরুন। ভালমানুষ বলে কোনদিন আমি কিছু বলতে যাই নে কেয়ারটেকারের কাজ কত রকমের তার অন্ত নেই। চক-স্টক কিনতে এখন এই কলুটোলা ছুটলাম। এমনি তো হামেশাই। কতটাকা দেয় বলুন তো—পাঁচটি টাকা মাসিক এলাউন্স। আর লাইব্রেরিয়ান করে রেখেছে, সেই জন্যে পাঁচ। ভাবতে পারেন? কমিটির মিটিং শিগগির—আমি দরখাস্ত দিয়েছি।

কথায় কথায় আপনি আমার সম্বন্ধে শুনিয়ে রাখবেন তো প্রেসিডেন্টকে। ছোট ভাইয়ের মতন মনে করি, সেইজন্য বললাম কথাটা।

ভাবেন কি এঁরা। প্রেসিডেন্ট যেন পেয়ারের লোক—হরবখত দেখাসাক্ষাৎ হয়, গল্পগুজব চলে! ইস্কুলের খবরাখবরের জন্য তাঁরা উৎকর্ণ হয়ে আছেন, করালীবাবুর জন্যে সুপারিশ করে দিলেই এলাউন্স সঙ্গে সঙ্গে দুনো-তেদুনো হয়ে যাবে!

রামকিঙ্কর, দেখা গেল, ছেলেদের ঠেলেঠুলে সরিয়ে ডান হাতে মুখ মুছতে মুছতে জলের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। জামার হাতা আর বুকের উপরটা ভিজে জবজবে। উপরে গিয়ে উঠলে জগদীশ্বর বললেন, এ কি রামকিঙ্করবাবু, একেবারে চান করে এসেছেন!

ছোঁড়ারা নড়িয়ে দিল ধাক্কা দিয়ে। পিছন দিকে দুটো চোখ যদি থাকত দেখে নিতাম শয়তানগুলোকে।

জগদীশ্বর বলেন ; বড্ড জল খান আপনি। অত ভাল না। এই তো থার্ড পিরিয়ডের মুখে অতক্ষণ ধরে খেলেন।

রামকিঙ্কর হাসিমুখে বলেন, সকলের একবার টিফিন, আমার ঘণ্টায় ঘণ্টায়। থার্ড পিরিয়ডে একবার হয়ে গেছে, আবার এই। আরও হবে।

কিন্তু অত খেয়ে এলেন, বউমা সামনে বসে খাওয়ালেন। এখন আবার জলে পেট ভরাতে হচ্ছে?

চটে গিয়েছেন রামকিঙ্কর: কোথা থেকে গল্প বানান, বলুন তো শুনি।

বানান কেন? আপনিই তো বললেন হেডমাস্টারকে।

উপরওয়ালার কাছে মানুষে কত কি বলে থাকে। সে সব ধর্তব্যের মধ্যে নাকি? সত্যি কথা শুনুন তবে। বউমা হারামজাদী ভারি দজ্জাল—অজাতের ঝাড়। ইস্কুলের মাইনে একুশ টাকা পয়লা তারিখে নিয়েছে। টুইশানির পনর টাকা বরাবর সাত তারিখের মধ্যে আদায় করে দিই। ক'দিন থেকে তাগাদা দিচ্ছে। তা টুইশানি কোথা এখন? সে ঘোড়ার ডিম ও-বছরের সঙ্গে সঙ্গে ডিসেম্বরে খতম হয়ে গেছে। নতুন আর গাঁথতে পারিনি বলবার জো নেই—বললেই ক্ষেপে যাবে। সন্দ করেছে তবু বোধহয়। এটা-ওটা ওজুহাত করে আজ তো মোটে রাঁধতেই গেল না ইস্কুলের আগে।

এত শিক্ষকের মধ্যে জগদীশ্বরের সঙ্গেই ভাবসাব বেশি। মনের দুঃখ তাঁর কাছে বললেন। বলে ফেলেই সামাল করে দেন: কাউকে বলবেন না কিন্তু—খবরদার! হেডমাস্টার টের না পান। দশের কাছে তা হলে পশার থাকবে না!

টিফিন শেষ হওয়ার সামান্য একটু আগে দুখিরাম এক টুকরো কাগজ এনে মহিমের হাতে দিল: এম-আর-এস উইল প্লিজ টেক থার্ড-ই ইন দ্য ফিফথ পিরিয়ড। করালীবাবু যা বলে গেছেন, সেই বস্তু—স্লিপ পাঠিয়ে চোরাইমার মারা।

গগনবিহারীবাবু বলেন, এসে গেলো তো? আসতেই হবে। নতুন মাস্টার আপনি, ফোঁস করতে পারবেন না—এই চলল এখন একনাগাড়। কোন্ ক্লাস, না দেখে বলে দিতে পারি। থার্ড-ই—মিলেছে? কি পড়াতে হবে, বলে দিচ্ছি। অঙ্ক। ক্লাসে গিয়ে দেখবেন, মেলে কিনা। কার ক্লাস তা-ও বলে দিই তবে। খোদ ছোটবাবু—চিত্ত গুপ্তের। ভুলেও ক্লাসে যান না। আরে মশায়, হাতে ক্ষমতা আর হাতের কাছে বেঁটেখাতা রয়েছে—কোন্ দুঃখে ক্লাস নিতে যাবেন?

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে অ্যাসিস্টান্ট-হেডমাস্টার চিত্ত গুপ্ত। থতমত খেয়ে গগনবিহারী থেমে গেলেন। মহিম ফিরে তাকিয়েছেন, হাতছানি দিয়ে চিত্তবাবু কাছে ডাকলেন: গ্র্যাজুয়েট সুশিক্ষিত মানুষ আপনি—পর পর তিনটে নিচের ক্লাসে দিয়ে মনে মোটে ভাল ঠেকছিল না। যান এবারে উপরের ক্লাসে। প্রেসিডেণ্ট আপনাকে বাজিয়ে দেখতে বলেছেন, তা 'বালক পাঠ' আর 'গণিত মুকুল' নিয়ে কী আর বাজানো যায়। বিস্তর কষ্টে তাই ব্যবস্থা করেছি। সিঁড়ি দিয়ে তেতলা উঠে যান। চৌকাঠের মাথায় নাম-লেখা বোর্ড ঝুলছে—থার্ড-ই দেখে নেবেন।

উপরের ক্লাসে পড়াতে গিয়ে কৃতকৃতার্থ করেছেন—মুখে চোখে তেমনি এক গরিমার ভাব এনে চিত্তবাবু নিচে তামাক খাবার ঘরে চললেন। কয়েক পা গিয়ে ফিরে এসে বললেন, বলে দিই একটা কথা। ক্লাস ঠাণ্ডা থাকে যেন। ছেলেগুলো ত্যাঁদড়। ক্লাসের ভিতরে বসে কি কাজ করছেন, কেউ দেখতে যাবে না। কিন্তু গোলমাল হলে বাইরের লোকের কানে আসবে। তাই বুঝে কাজ করবেন।

কত কালের কথা, ভাবতে গেলে মহিমের এখনও সব মনে পড়ে। দুর্দান্ত ক্লাস থার্ড-ই'তে দুর্গানাম স্মরণ করে ঢুকে পড়লেন মহিম। দৈত্যসম একজন পিঠ-পিঠ ঢুকল—লম্বায় চওড়ায় এবং ওজনে মহিমের দেড়গুণ তো হবেই। গার্জেন ভেবে মহিম শশব্যস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি সার এই ক্লাসে পড়ি। জল খেতে গিয়েছিলাম।

টিফিনের পরে হাজিরা-বইটা আবার ডেকে নেওয়ার নিয়ম। সেই সময়

ছাত্রের নামটা দেখে নিলেন : মণীন্দ্রমোহন ঘোষ। দেখা গেল, দৈত্য ঐ একটা মাত্র নয়—আধ ডজনের উপর। বড্ড বুক ঢিবঢিব করছে। তবু কিন্তু তাই নিয়ে মহিম পরবর্তীকালে দুঃখ করতেন। কী রকম ভরভরতি ক্লাস তখনকার! এক ছেলে দু-ছেলের বাপ কতজন বই খাতা নিয়ে বেঞ্চিতে এসে বসেছে। মণি ঘোষের অবশ্য তা নয়। বয়স কমই, তবে স্বাস্থ্যটা বাড়াবাড়ি রকমের ভাল। আর এখনকার ক্লাসের ছেলেদের তো দেখাই যায় না চোখে, হাই-বেঞ্চির ফাঁকে উহ্য হয়ে থাকে। কলির শেষে সব বামন হয়ে যাবে, বেগুনতলায় হাট বসবে—সেইসব দিন এসে যায় আর কি!

মাথার উপর বন বন করে পাখা ঘুরছে, তবু দস্তুরমতো ঘাম দেখা দিয়েছে মহিমের। দুর্বলতা দেখানো চলবে না। কারো মুখের দিকে না চেয়ে মহিম বললেন, কি অঙ্ক হচ্ছে তোমাদের?

টাইম এণ্ড ওয়ার্কস—

মণি ঘোষ তড়াক করে উঠে দাঁড়াল : তার আগে এই অঙ্ক ক'টা করে দিন স্যার। হচ্ছে না।

মহিম ঘাড় নাড়লেন : এখন নয়, পরে।

একবার আড়চোখে তাকালেন মণির খাতার দিকে। বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা। প্রেসিডেণ্ট হেডমাস্টারকে পরখ করে দেখতে বললেন, তার আগে এই ক্লাসের ছেলেরাই পরীক্ষা করবে তাঁকে। ফাঁদের ভিতরে পা না দেওয়াই ভাল।

ক্লাসের কাজ হয়ে যাক, তারপরে ওইসব বাইরের অঙ্ক—। গম্ভীরভাবে রায় দিয়ে মহিম পাটিগণিত খুললেন। খুব সহজ করে বোঝাচ্ছেন। একটা অঙ্ক ধরে তার ভিতর গল্প এনে ফেলেছেন। এ জিনিসটা ভাল পারেন তিনি। সেই নন-কো-অপারেশনের সময়টা কলেজ ছেড়ে কিছুদিন হাটে-মাঠে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছিলেন নিরক্ষর চাষাভূষোর কাছে। ঢংটা ভোলেননি এখনো দেখা যাচ্ছে। নতুন মাস্টার সম্পর্কে-কৌতূহল থাকায় ছেলেরা গোড়াতেই একেবারে নস্যাৎ করে না—শোনা যাক কি বলেন। কি বলছেন তা নিয়ে মাথাব্যথা নয়, কিন্তু বলার ধরনটা বেশ ভাল। হঠাৎ মহিমের কানে গেল—মণি ঘোষ ফিসফিসিয়ে বলছে, বিষম চালাক। এমনি করেই ঘণ্টা কাবার করে দেবে, গোলমালের মধ্যে মাথা ঢোকাবে না।

মহিমের অভিমানে লাগল। অঙ্কে অনার্স-পাওয়া মানুষ, আর উঁচু ক্লাসেই একটি মেয়েকে অঙ্ক কষিয়ে থাকেন রোজ সন্ধ্যাবেলা। ছেদ টানলেন

পড়ানোর। মণির দিকে চেয়ে বললেন,. দাও খাতাটা তোমার। কিন্তু একটা কথা—

ক্লাসে সর্বত্র দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, অঙ্ক করছি আমি। কিন্তু বোর্ডের দিকে ফিরে অঙ্ক কষব, তোমরা সেই সময় গণ্ডগোল করবে না কথা দাও।

মণি ঘোষ প্রধান পাণ্ডা। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, টুঁ শব্দটি হবে না সার। আপনি করুন।

প্রথম অঙ্কটা হয়ে গেল। মহিম বললেন টুকে নাও তোমরা।

মণির চোখ বড় বড় হয়ে গেছে : এর মধ্যে হয়ে গেল ?

উত্তর মিলিয়ে দেখ হয়েছে কিনা ? তাড়াতাড়ি কর। এতগুলো কষতে দিয়েছ এই সামান্য সময়ের মধ্যে।

কেল্লা ফতে, বুঝতে পারছেন মহিম। এদের মন চিনে নিয়েছেন। আগের অঙ্ক মুছে ফেলে পরেরটা ধরছেন ইতিমধ্যে! খটখট খটাখট—দ্রুতবেগে খড়ি চলেছে ব্লাক-বোর্ডের উপর। হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, এবারে এই উপরের রাশিটা বাদ দিয়ে নিলেই উত্তর। বুঝতে পারছ ?

মণি বলে, আর করতে হবে না সার। বাকিগুলো বাড়িতে কবব আমি। পাটীগণিতের যেখানটা হচ্ছিল, তাই হোক এবারে।

ক্লাস চুপচাপ একেবারে। ঘণ্টা পড়লে মহিম বেরুলেন, মণিও এল সঙ্গে সঙ্গে। বলে, পায়ে ধরে মাপ চাচ্ছি সার। আমাদের ক্লাসের বদনাম শুনে এসেছেন। কিন্তু রোজই নতুন এক একজন এসে উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে হাতির মুণ্ড গণেশের ধড়ে চাপিয়ে—কোন রকমে সময় কাটিয়ে চলে যান। কিছু জানেন না তিনি, ধরেপেড়ে আচমকা ক্লাসে পাঠিয়ে দিয়েছে—তিনি কি করবেন ? আমরাও তেমনি ঘায়েল করবার জন্য অঙ্ক ঠিক করে রেখেছি। আপনি আসবেন সার, একটুও গোলমাল হবে না দেখতে পাবেন।

মাস্টারির সেই প্রথমদিনেই আত্মবিশ্বাসে মন ভরে গেল। থার্ড-ই'র ছেলেগুলো নাকি বাঘ—দুটো অঙ্ক কষেই বাঘের দল মহিম বশ করে ফেলেছেন। ছেলেরা সব সত্যি ভাল—মণি ঘোষ ভাল, মলয় ভাল। ভাল লাগছে না ওই মাস্টারমশায়দের! শিক্ষিত জনেরা মহৎ কাজের ভার নিয়ে আছেন, আর ফাঁক পেলেই ইনি ওঁর গায়ে কালি ছিটোবেন, এ কী ব্যাপার ? লিসার কাটিলে সবাই ক্ষেপে যান, আর মহিমের উল্টো—লিসার উপভোগ না করে ক্লাসে ছেলেদের মাঝে বসতে পারলেই বেঁচে যান যেন। অলিগলির অন্ধকার কাটিয়ে খোলা মাঠের ঝলমলে আলোর আসার মতন।

সলিলবাবু ডাকছেন, দাঁড়ান মশায়, অত ছুটছেন কেন? ক্লাস তো আছেই। বছরের পর বছর কত ক্লাস করবেন, করতে করতে ঘেন্না ধরে যাবে। আলাপ-পরিচয় করি এক মিনিট—

পাশে এসে নিচু গলায় বললেন, করালীবাবু কি বলছিলেন তখন? আমার কথা কিছু?

মহিম ঘাড় নেড়ে দিলেন। চারু-দা ওঁরা বলতেন, সবচেয়ে বড় কাজ হল মানুষ গড়ে তোলা। সেই কাজে এসে পরনিন্দা-পরচর্চায় জড়িয়ে পড়বেন না। কিন্তু নাছোড়বান্দা যে সলিলবাবু। বললেন, তবে?

নিজের সম্বন্ধে বলছিলেন দু-এক কথা।

আছেন তো রাজার হালে। দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ান। ওঁর আবার কি কথা?

মহিম ইতস্তত করে বলেন, কেয়ারটেকারের এক কাজ—এলাউন্স মাত্র পাঁচ টাকা। এই সমস্ত আর কি—

সেই তো অনেক হে!

পতাকীচরণ ইতিমধ্যে এসে জুটেছেন। তিনি বললেন, কমিটি কাজটা নিলামে তুলে দিন। এলাউন্স এক পয়সাও দেওয়া হবে না, উল্টে মাসে মাসে কে কত দিতে পারেন ইস্কুলকে। আমার ডাক থাকল দশ টাকা।

সলিলবাবু বলেন, আমার পনের—

হেসে নিলেন খানিকটা। বলেন, দাদামশায়ের এক চাকর ছিল, সব জায়গায় তার দস্তুরি। একটা সন্দেশ কিনতে দিয়েছেন একদিন—কী আর করে জিভে চেটে নিল সন্দেশটা? আমাদের করালীবাবুরও তাই। ইস্কুলের এক বোতল ফিনাইল। কিনলেও সিকি পরিমাণ শিশিতে ঢেলে বাড়ি রেখে আসবেন। ক্ষুদিরাম জানে অনেক-কিছু, তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করবেন।

হেডমাস্টারের মুখ দেখতে পেয়ে নিমেষে তাঁরা ক্লাসে ঢুকে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

কালীপদ কোনার পরিচালক কমিটির মেম্বার—মাস্টারদের প্রতিনিধি, তাঁরা ভোট দিয়ে পাঠিয়েছেন। তেমনি আর একজন মেম্বার চিত্তবাবু। হেডমাস্টার তো আছেনই।

গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন কালীপদ। পাঁচ-সাত জনে তাঁকে ঘিরে ধরেছেন। পতাকীচরণ, জগদীশ্বর ও সলিলবাবু আছেন। হৃদয়ভূষণ চার বছর অস্থায়ীভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তিনিও গলা বাড়িয়েছেন পিছন দিক থেকে। কমিটির মিটিং হওয়া সর্বোদয়-যোগ কিংবা কুম্ভমেলার মতন ব্যাপার। একবার হয়ে গেল তো আবার কবে হবে কেউ বলতে পারে না। সেক্রেটারী অবনীশ চাটুজ্জে ডাক্তার মানুষ, আর প্রেসিডেন্ট হলেন এডভোকেট। একজনের সময় হল তো অন্য জনের সময় হয় না। অথচ অনেক কাজ আছে। কাল রাত্রে কালীপদবাবু ও চিত্তবাবু ডেপুটেশনে গিয়েছিলেন সেক্রেটারির কাছে—কবে মিটিং হবে আলোচনার জন্য।

কি ঠিক হল বলুন। সেক্রেটারি কি বললেন ?

কথা বলতে বলতে কালীপদ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছেন। বললেন, পুজোর মধ্যে হয়ে উঠবে না। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীর দিকে স্পোর্টস আর প্রাইজ-ডিষ্ট্রিবিউশন হবে, সেই সময়। এবারে অনেক কষ্টে প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারির সময় হল তো মুশকিল রায়মশায়কে নিয়ে। তিনি বৃন্দাবন চলে গেছেন।

রাখহরি রায় ভাইস-প্রেসিডেন্ট। বুড়ো হয়ে কাজকর্ম থেকে রিটায়ার করে তীর্থধর্ম করে বেড়ান। ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর পিতামহ—তাঁকে বাদ দিয়ে মিটিং হলে ক্ষেপে যাবেন বুড়ো একেবারে: ন-মাসে ছ-মাসে একবার তো বসবে, আমায় ছেঁটে ফেলার মানেটা কি ? জঙ্গল কেটে জলাজমিতে মাটি ফেলে ঠাকুরদা-মশায় ইস্কুল-ঘর বানালেন, আমি কেউ হলাম না—তৈরী রুটি ফয়তা দিতে এসেছে, তোমরা কারা হে চাঁদ ? পিতৃপুরুষের জমাখরচ খুঁজে দেখো তো একটি পয়সা কেউ কখনো দিয়েছেন কিনা।

বড় কটুকাটব্য করেন বুড়ো, বাড়ি বয়ে গালিগালাজ দিয়ে আসেন। কাউকে গ্রাহ্য করেন না। তাঁকে বাদ দিয়ে মিটিং হয় না।

জগদীশ্বর ক্ষেপে গিয়ে বললেন, রায়মশায় নেই আজ পাঁচ-সাত দিন। এদ্দিন কি হচ্ছিল—নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমচ্ছিলেন আপনাদের সেক্রেটারি ?

কালীপদ বলেন, ঘুমুবেন কি—রুগি দেখে সময় করতে পারেন না। রাত্রি-বেলাতেও ঘুমতে দেয় না। বলছিলেন সেইসব কথা।

ছেড়ে দিলেই তো পারেন।

কালীপদকে সাহসী ও স্বাধীনচেতা বলে নাম বজায় রাখতে হবে মাস্টার-মশায়দের কাছে। পরের বারেও ভোট পাবার জন্ত। সায় দিতে হবে অতএব সেক্রেটারির নিন্দায়। এঁরা যা বলবেন, অন্তত পক্ষে তার ডবল বাড়িয়ে বলতে হবে।

পতাকীচরণ বললেন, সময় নেই তবে ছেড়ে দেন না কেন ?

কালীপদ হেসে বলেন, আজকে পশার আছে, কাল যদি না থাকে। তখন সময় কাটবে কিসে? হাঁকডাক করবেন কাদের উপর? দলে দলে সব পাশ করে ডাক্তার হয়ে বেরচ্ছে—ডাক্তারের গাদি লেগে যাবে। ওঁর মতন ক্যাম্বেল-ইস্কুলের ডাক্তারের কাছে কে তখন আসবে? এইসব ভেবেই আঁকড়ে রয়েছেন বোধহয়।

পতাকীচরণ রসান দিয়ে বলেন, নতুন ডাক্তার লাগবে না, নিজেই তো মেরে মেরে শেষ করে দিচ্ছেন। মানুষ-বেঁচে থাকলে তবে তো রুগি! সবাই বলে, অবনীশ ডাক্তারের হাতে রুগি ফেরে না। যমরাজের দোসর। তা উনি দেশের কাজও করছেন বটে! দু-চারশ অমন ডাক্তার থাকলে দেশে আর খাদ্যসমস্যা বলে কিছু থাকত না। মানুষ না থাকলে কে খাবে?

কালীপদ বলেন, তবু গিয়ে একবার দেখে আসুন পশারটা। আমরা সময় ঠিক করে গিয়েছিলাম, যে সময়টা রুগিপত্তর থাকবে না। কিন্তু কথা বলছেন তার মধ্যেও অমন পাঁচবার টেলিফোন। প্রেস্কৃপসন হাতে কম্পাউণ্ডার এসে ঢুকছে, উঠে উঠে রুগির সঙ্গে কথা বলে আসছেন।

পতাকী বলেন, হবেই। মাছ-মানুষ-মশা যত মারবে তত কোলঘেঁসা। ছিপে যত মাছ তুলবেন, চারে ততই মাছের ঠেলাঠেলি পড়ে যাবে। মানুষও তাই।

জগদীশ্বর অধীর হয়ে বলেন, মস্করা রাখুন মশায়। পূজো এসে পড়ল, একশ গণ্ডা খরচ মাথার উপরে, পূজো-বোনাস চাই। আর এদ্দিন টালবাহানা করে রায়মশায়কে বৃন্দাবনে পার করে এখন বলছেন মিটিং হবে না।

কালীপদ বলেন, বোনাসের কথাবার্তা হয়ে গেছে। সকলেই সই দিয়ে একখানা দরখাস্ত পাঠান। হেডমাস্টারের পঞ্চাশ টাকা, চিত্তবাবুর চল্লিশ আর সকলের পঁচিশ করে নিজ দায়িত্বে দিয়ে দেবেন সেক্রেটারি। সেটা মিটিয়ে এসেছি একরকম।

করালীকান্ত বলেন, ঐ ছিটেফোঁটাই শুধু। আসল যে মাইনে-বৃদ্ধির ব্যাপার, সেটা কেবলই চাপা দিয়ে যাচ্ছে। তিন বছর অন্তর মাইনে বাড়ার কথা—কদ্দিন হয়ে গেল দেখুন।

রামকিঙ্কর ছুটোছুটি করে আসছিলেন। দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভ্রূভঙ্গি করে তিনি বলেন, মাইনে বৃদ্ধি করে ওরা অখণ্ড হিমালয়পর্বত দিয়ে দেয়। আপনারাও যেমন! আমার সেবারে পনের আনা বৃদ্ধি হয়েছিল।

কালীপদ ঘাড় নেড়ে বলেন, উঁহু, আমায় তো হয়নি, ভুল বলছেন রামকিঙ্করবাবু।

মাইনে কুড়ি টাকা ছিল, একুশ করে দিল। কুড়িতে স্ট্যাম্প লাগত না। স্ট্যাম্পের দাম বাদ দিয়ে কত বেড়েছে, হিসাব করুন।

লাইব্রেরি-ঘরের সামনের বারান্দায় তখন অনেকে এসে জমেছেন। বেশ একটা গুলতানি হচ্ছে। সলিলবাবু বলেন, আমি মশায় মাইনে-বৃদ্ধি চাই নে। স্ট্যাম্প-কাগজে লিখে দস্তখত করে দিতে পারি। ওঁরাই বরঞ্চ দাবি করতে পারেন, ট্রেডমার্ক দেগে দেওয়ার দরুন। ভারতী ইনস্টিট্যুশন-ব্রাণ্ড আমরা, যেমন ওদিককার ওঁরা হলেন প্রাচী শিক্ষালয় ব্রাণ্ড। ব্রাণ্ড দেখে লোকে টুইশানিতে ডাকে আমাদের, ব্রাণ্ড অনুযায়ী দর। মাস্টারি চাকরি ছেড়ে দিন—তখন আর কেউ ডাকবে না। সকালে বিকালে খোকাকে কোলে নাচানো ছাড়া কাজ থাকবে না আর তখন।

হৃদয়ভূষণ ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। এতক্ষণ ধরে সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন, একটিবার মুখ খোলেননি। নিঃশ্বাস ফেলে কতকটা যেন আপনার মনেই বললেন, সাধ ছিল ভারতীর পুরো মাস্টার হয়ে যাব চোখ বুঁজবার আগে। মফস্বলের হেডমাস্টারি ছেড়ে চলে এসেছি। সে বোধ হয় আর ঘটে উঠল না। চিরকাল প্রিন্স-অফ-ওয়েলসই থেকে গেলাম। যেমন হচ্ছিল টেকো-এডোয়ার্ডের বেলা।

করালীবাবু ওদিকে হতাশভাবে মহিমকে বললেন, মিটিং হল না, আমার তো ভাই সমস্ত বরবাদ। আপনাকে সেই বললাম—তারপরে মেম্বারদের বাড়ি বাড়ি হেঁটে নতুন একজোড়া জুতোর তলা ক্ষইয়ে ফেলেছি। কোন কালে মিটিং হবে, তখন কি আর মনে থাকবে ওঁদের? আবার তখন গোড়া থেকে তদ্বির।

হঠাৎ চিত্তবাবু বেরিয়ে এলেন: কি হচ্ছে আপনাদের? ছেলেরা আশে-পাশে ঘুরছে—যা বলার থাকে, ঘরের ভিতর গিয়ে বলাবলি করুন গে।

মহিমকে একান্তে নিয়ে গেলেন: শুনুন সুখবর দিচ্ছি। প্রেসিডেন্টের কাছে হেডমাস্টার গিয়ে আপনার কথা বলে এসেছেন। আমি বলে দিয়েছিলাম, অঙ্ক ইংরেজি বাংলা তিনটে বিষয়ে চৌকোস—অ্যারেঞ্জমেণ্ট-বইতে চোখ বুঁজে নাম ফেলা যায়, ভাবতে হয় না। হাতে পেয়ে এমন মাস্টার কে ছাড়ে বলুন। আর ভারতী ইনস্টিট্যুশন, দেখতে পাচ্ছেন, সমুদ্র বিশেষ। ছাত্র-মাস্টার উভয় দিক দিয়ে। এ সমুদ্রে এক-এক ঘটি জল ঢাললেই বা কি, তুলে নিলেই বা, কি! একজন মাস্টারের কমবেশিতে কিছু আসে যায় না।

হল তাই, চাকরি আপনার বরাবর চলবে। প্রেসিডেন্টের লোক আপনি—উন্নতি সুনিশ্চিত। ওঁদের ঐ খেয়োখেয়ির মধ্যে কখনো যাবেন না।

মহিমও তা চান না। কিন্তু নিজে কিছু না বললেও কানে শুনতে হয় অবিরত। লিসার-পিরিয়ডে কানের ভিতর তুলো ঢুকিয়ে বসে থাকতে পারেন না তো!

পুজোর ছুটি এসে যায়। ক্লাসে ক্লাসে সার্কুলার গেছে, দু-মাসের মাইনে দিয়ে দেবে সব বাইশ তারিখের মধ্যে। ইস্কুল খুলেই এগজামিন। ডি-ডি-ডি একদিন মিটিং করলেন মাস্টারদের নিয়ে: কোন্ বইয়ের কতদূর অবধি এগজামিন, এই হপ্তার মধ্যে লিখে আপনারা চিত্তবাবুর কাছে দিয়ে দেবেন। গত বছরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তারপর খাতায় তোলা হবে। কম হবে না, অন্তত সিকি পরিমাণ বেশি হওয়া চাই আগের তুলনায়। গতবার এই নিয়ে না-হক কথা শুনতে হল সেক্রেটারীর কাছে। কমিটিতেও উঠেছিল, কালীপদ-বাবুর কাছে শুনে দেখবেন।

বাইরে এসে গগনবিহারী ফেটে পড়লেন: রুগি দেখে সময় পায় না, সেক্রেটারির বয়ে গেছে প্রোগ্রেস মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে। বোঝেও কচু। সেক্রেটারির বাড়ি কে কে যায়, খবর নিয়ে দেখ। সকল মাস্টার নিয়ে ব্যাপার—মাস্টারদের কেউ বলতে যাবেন না। বলে অমূল্যটা! কেরানি মানুষ—তা জন্মে কোনদিন কলম ছুঁয়ে একটা দুর্গানাম লিখতে দেখলাম না। কাজ একটা তো চাই—সে-ই গিয়ে সেক্রেটারির কাছে ধরিয়ে দিয়ে আসে।

ভূদেব বলেন, লাগিয়ে কি করবে? পড়ানো নিয়ে কথা—প্রোগ্রেস কম হয়ে থাকে, বেশ, দিচ্ছি এই পনের-বিশ দিনে বইয়ের আগাপাস্তালা পড়িয়ে। ডরাই নাকি?

চলল পড়ানো। জানুয়ারি থেকে যদি অর্ধেক আন্দাজ হয়ে থাকে তো বাকি অর্ধেক এই ক'দিনের ভিতর সারতে হবে। টানা পড়ে গেলেও তো হয় না। গগনবিহারী বলেন, কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। আমাদের কি, দিন ছুটিয়ে পাঞ্জাব-মেল।

ঘণ্টা বাজতে বাজতেই মাস্টাররা এখন ক্লাসে যান, ক্লাসে ঢুকেই গড়গড় করে পড়ান। মুশকিল হল, ভাল ছেলেও দু-একটা থাকে ক্লাসে। একটা যেমন অশোক। বেটা যেন মুখিয়ে থাকে: এইখানটা বুঝতে পারছি নে সার।

বাড়ি গিয়ে বুঝো—

বাড়িতে টিউটর নেই। বাবা টিউটর রাখবেন না। তাঁদের সময় টিউটর থাকত না, তবু তাঁরা ভাল করে পাশ করতেন।

তবে বাবাই পড়াবেন। সকলে দিব্যি বুঝে যাচ্ছে, একা তুমি না বুঝলে কী করতে পারি বাবা ?

প্রমাণ হিসেবে একজন দুজনকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে হয়। শেষ বেঞ্চির কোনে দুটো ছেলে কাটাকাটি খেলছে। অভিজ্ঞ শিক্ষক দূর থেকে দেখেই বুঝতে পারেন। তাদের সামনের ছেলেটাও নিশ্চয় গল্পের বই পড়ছে হাই বেঞ্চির নিচে রেখে। অমন অখণ্ড মনোযোগ নয়তো সম্ভব না। গগনবিহারী তাদেরই ডাক করে বললেন, কি হে, বুঝতে পারছ না তোমরা ?

রঙ্গভঙ্গে বিচলিত হয়ে তারা একসঙ্গে হাঁ-হাঁ করে ওঠে : হাঁ সার—

তবে ? তোমার একার জন্যে প্রোগ্রেস আটক রাখা যায় না। বিশেষ সেসনের এই শেষ মুখটায়।

এই সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদে তবু খানিকটা সময় চলে গেল। দিব্যি বুঝিয়ে দেওয়া যেত এর মধ্যে। কিন্তু না, আশকারা দেওয়া চলবে না। তা হলে পেয়ে বসবে।

'ক্লাসটিচার' বলে বিশেষ ভাবে যাঁর উপরে ক্লাসের যাবতীয় দায়িত্ব। পতাকীচরণ থার্ড-বি'র ক্লাসটিচার। ক্লাসে গিয়ে তিনি বলছেন, কি রে, ছুটির দিনে কি করবি তোরা ? চাঁদা কেমন উঠছে ? ডি-সেকসনের, যা শুনেছি, ধুমধাড়াক্কা ব্যাপার। এক টাকা করে দিচ্ছে প্রত্যেকে, কেউ বাদ নেই। তবে তো চল্লিশ টাকা—বেশি ছাড়া কম নয়। অনন্তবাবুকে সিল্কের চাদর দেবে, বলাবলি করছে।

আবার থার্ড-ডি'র ক্লাসটিচার অনন্ত ঠিক অমনি কথা বলছেন। বি-সেকসন তো বিষম তড়পাচ্ছে। এবারে নাকি বসিয়ে দেবে তোদের। তাই নিয়ে তর্কাতর্কি আজ পতাকীচরণবাবুর সঙ্গে—ব্যারিস্টার সিংহসাহেবের ছেলে রয়েছে এই ক্লাসে, হারিয়ে অমনি দিলেই হল !

শঙ্কিত থার্ড-ডি'র ছেলেরা ছুটির পরে পরামর্শে বসেছে। বি-সেকশনের কি আয়োজন, ওদের সঙ্গে ভাবসাব করে জেনে নিতে হবে। ব্যারিস্টার সিংহের ছেলে বলে, দশটাকা চাঁদা দেব আমি। দরকার হলে আরও দেব। হারাতেই হবে ওদের। আর দেখ, আমরা কি করছি না করছি কেউ যেন ঘুণাক্ষরে না বুঝতে পারে। খবরদার !

রামকিঙ্করের নিচু ক্লাস—এইটথ-এ। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, পয়সা কে তাদের

হাতে দেবে? চাঁদা উঠেছে অতি সামান্য, পুরোপুরি পাঁচ টাকাও নয়।
রামকিঙ্কর বেজার মুখে বলছেন, ছি, ছি, এত খেটেখুটে এই মাত্তর হল? লোক-সমাজে কহতব্য নয়। তা ওই উনিশ সিকে কিসে খরচ হবে, ঠিকঠাক করলি কিছু?

নাইনথ ক্লাস থেকে ফার্স্ট হয়ে উঠেছে সেই ছেলেটা বলে, গোড়ের মালা আসবে একটা সার। আর জলখাবার।

রামকিঙ্কর বলেন, পূজোর মুখে মিষ্টিমুখ—সেটা খুব ভাল। দিস জলখাবার যেমন তোদের খুশি। সন্দেশ দিস, লেডিকেনি দিস। চপ-কাটলেট দিলেও খাব। ক'দিন আর খেতে পারব বল। যা তোরা হাতে করে দিবি, চেটেপুছে খেয়ে নেব।

আবার বলেন, কিন্তু মালার বুদ্ধি কে দিয়েছে শুনি? গুচ্ছের জঙ্গল কিনে আনবি পয়সা দিয়ে। গোড়ের মালা ঝুলিয়ে নৃত্য করে বেড়াব নাকি? এক ঘণ্টা তো পরমায়ু—শুকিয়ে তার পরে আমসির মতো হয়ে যাবে। মফস্বল হলে পোষা গরু-ছাগলের মুখে দেওয়া যেত, কলিকাতা শহরে তা-ও তো নেই।

ছেলেটা বলে জলখাবার হয়ে যা বাঁচে, তাই দিয়ে তবে বই কিনে দেব সার। যে বই আপনি বলবেন।

রামকিঙ্কর বলেন, এই দেখ। ছেলেমানুষ তবে আর বলি কেন! বই কি হবে রে? পাহাড় প্রমাণ বই-টই পড়ে তবে তো শিক্ষক হয়েছি। বই বয়েই জনম কাটল—কোন বইটা না পড়া? বই দিতে যাস না, ওতে লাভ নেই।

ছাত্রেরা মুখ তাকাতাকি করে: তবে কি দেব সার?

কি দিবি? তাই তো, ঝট করে কী বলি এখন তোদের! এক কাজ করিস, টাকাপয়সা যা বাঁচে নগদ ধরে দিস আমায়। আমি কিনে নেব। ভেবে দেখতে হবে কিনা, কোন জিনিস হলে আমার কাজে আসবে।

নগদ টাকা দেওয়া—সেটা কী রকম! মালা হলে গলায় পরিয়ে দিত, বই হলে ফিতে বেঁধে নাম লিখে টেবিলের উপর রাখা চলত। তা নয়—টাকা দিলাম আর রামকিঙ্কর সার পকেটে ফেললেন, কাকপক্ষী কেউ টের পাবে না। তবু ক্লাসটিচারের কথার উপর আপত্তি চলে না। ঘাড় নাড়তে হল মনমরা ভাবে।

॥ ছয় ॥

পূজোর ছুটিতে মহিম আলতাপোল এসেছেন। কার কাছে যেন শুনলেন, সূর্যকান্ত ঘোষগাঁতির বাড়ি এসে উঠেছেন ছোট মেয়েকে নিয়ে। লীলা বিধবা। আহা, এইটুকু বয়সে বিধবা—মেয়ে বড় দুর্ভাগা। বাপও তাই—এই লীলার কাছেই থাকতেন তিনি শেষটা। বেহান ঠাকরুন অর্থাৎ লীলার শাশুড়ি কালো মুখ করতেন, বাক্যবাণ ছুঁড়তেন অন্তরাল থেকে। তা হলেও পাখির আহারের মতো বুড়োমানুষের দুই বেলা সামান্য চাট্টি ভাতের অসুবিধা ছিল না। সে বাসা ভেঙেছে। জামাই ননীভূষণ মারা গেল।

মরল আবার গলায় দড়ি দিয়ে। বিষয়ভোগী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। দূরদর্শী পূর্বপুরুষেরা জমিজিরিতে রেখে গিয়েছেন—তার মধ্যে কতক খাসখামার, কতকটা প্রজাবিলি। বছর খাওয়ার ধান আসত খাসখামার থেকে। আর প্রজার কাছ থেকে যা আদায়পত্র হত, তাতে মালেকের মালখাজনা দিয়ে কাপড়চোপড় ও হাটবাজারের খরচা হয়ে যেত। ছেলেপুলেদের নড়ে বসতে না হয়, কর্তারা তার নিখুঁত ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু দিনকাল সব পালটে গিয়ে সব হিসাব বানচাল করে দিল। ক্ষেতে ধান হয় না আর তেমন। জিনিস-পত্র অগ্নিমূল্য, আদায়পত্তর যা হয় এখন তাতে কুলিয়ে ওঠা যায় না। চাকরি-বাকরি করে দুটো বাইরের পয়সা ঘরে আনা দরকার।

কিন্তু বংশের নিয়মে ননীভূষণ তেমন-কিছু লেখাপড়া শেখেনি, ধরাধরির মুরুব্বিও নেই—তবে চাকরি কে দেবে? মায়ের গঞ্জনা—শেষটা লীলাও শাশুড়ির সঙ্গে যোগ দিল। খুব ঝগড়াঝাটি হল একদিন। দেখা গেল, ঘরের আড়ায় দড়ি ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস এঁটে ননী মরে আছে। এবং তার পরেই বিধবা মেয়ে নিয়ে সূর্যকান্ত ঘোষগাঁতির পোড়ো ভিটেয় চলে এলেন।

জাঁকিয়ে পূজা হয় সূর্যবাবুদের বাড়ি। অঞ্চলের মধ্যে এই পূজোর নাম। যেখানেই থাকুন পূজোর সময় অন্তত কয়েকটা দিনের জন্য তিনি বাড়ি আসতেন। এখন তো কায়েমি হয়েই আছেন। সব সরিকের এজমালি পুজো ছিল আগে। কিন্তু মাস্টার মানুষ সূর্যবাবু অংশমতো খরচ দিয়ে উঠতে পারেন না। জ্যাঠতুত ভাইয়ের ছেলেরা সব কৃতি হয়েছে—একজন স্টেশনমাস্টার, একজন পুলিশ-ইনস্পেক্টর। আরও একজন কেদারনাথ কোন জমিদার এস্টেটের তহশিলদার।

পয়সাকড়ি আয় করে কেদারনাথই সবচেয়ে বেশি। পিতৃপুরুষের নাম নষ্ট হতে দেব না, আর মানুষজন খাওয়ানোয় বিষম ঝোঁক তার। তা দোষ নেই কেদারনাথের। বলেছিল সমান সমান অংশ দিতে বলছি নে কাকামশায়; কমবেশি যা-হোক কিছু দেবেন। কিন্তু সূর্যবাবুর এক পয়সাও দেবার উপায় নেই। দেবেন কোত্থেকে? মাস্টারি চাকরিতে দুর্গোৎসব হয় না। তা-ও তো রিটায়ার করে মেয়ের ভাতে ছিলেন এতাবৎ।

অগত্যা পুজোয় ইদানিং আর সংকল্প হয় না সূর্যকান্তর নামে। উনি কিছু মনে করেন না। বলেন, খুনখুনে বুড়ো—কোন রকমে দিনগত পাপক্ষয় করে যাওয়া। মা-দুর্গা কোন হিতটা করবেন এখন আমার।

মান-অপমান গায়ে বেঁধে না সূর্যবাবুর। রানী বরাবর মাথা ভাঙাভাঙি করত: যেও না বাবা, সামনে দাঁড়িয়ে যেচে কেন অপমান নিতে যাব? কিন্তু এর বাড়ি তার বাড়ি যখন কুমোর এসে পটের উপর প্রতিমা গড়তে বসে যায়, সেই সময়টা মন কেমন করে ওঠে ঘোষগাঁতির ভিটার জন্য। গ্রামে চলে আসেন। সেই আগেকার মতন আসুন রে বসুন রে—নিমন্ত্রিত মানুষজনের আদর-অভ্যর্থনা। চাকরে ভাইপোদের উপর হম্বিতম্বি, বউমাদের ও নাতিনাতনিদের সম্পর্কে খবরদারি। ঠিক যেন এক-সংসারে আছেন তাঁরা—একান্নবর্তী পরিবার। ভাইপোদের যে খারাপ লাগছে তা নয়। বারোমাস তারাই নিজ নিজ সংসারের কর্তা। এই ক'টা দিন গার্জেন হয়ে সূর্যকান্ত ধমকধামক দিচ্ছেন, দায়িত্বের বোঝা কাঁধ থেকে নামিয়ে মুক্তি পেয়ে যায় যেন তারা। বেশ লাগে। এমন কি চটুলতা ও দুষ্টুমি পেয়ে বসেছে দোর্দণ্ড প্রতাপ দারোগাবাবুকে। পুরানো দীঘির মাঝখানে পদ্ম তুলতে গিয়ে ডোঙা আটকে গেল ফিরে আসতে পারেন না। জল নেই যে সাঁতার কেটে আসবেন। পাঁকে কোমর অবধি ডুবে যায়—হেঁটে আসবারও উপায় নেই। কাকামশায়ের কানে গিয়ে সে কী চেঁচামেচি। দারোগা-গিন্নি সাত ছেলের মা মনোরমা টিপিটিপি হাসেন স্বামীর গালি খাওয়া দেখে।

এই সূর্যকান্ত। তাঁর বিপদের কথা শুনে মহিম ঘোষগাঁতি ছুটলেন। বাড়ির ঠিক নিচে নদী। এবং সতীঘাট। সূর্যকান্তর প্রপিতামহী ওখানে সতী হয়েছিলেন। ঘাটের আর কিছু নেই—শুধুমাত্র প্রাচীন এক বটগাছ। নদী দূরে সরে গেছে। নদীও ঠিক বলা চলে না আর এখন। বর্ষাকালটা ছাড়া জল চোখে পড়ে না—জঙ্গল। হোগলা কচুরিপানা আর হিঞ্চেকলমির দাম এপার-ওপার ছেয়ে থাকে। গরু-ছাগল চরতে চরতে দামের উপর দিয়ে অনেক দূর অবধি চলে যায়। এখন এই দশা, আর সেকালে খেয়ানৌকোয় পারাপারের

সময় অতি-বড় সাহসীরও বুক কাঁপত। হ্যালিডে সাহেবের বর্ণনায় আছে। হ্যালিডে সাহেব তখন জেলার কালেক্টর—নিজের চোখে-দেখা অনেক ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশ সম্বন্ধে বই লিখে গেছেন। সতীর কাহিনীও তার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

বটগাছের পাশেই ছিল শ্মশান। লক্ষ মড়া পুড়েছে বলে মহাশ্মশান বলত। মড়া নামিয়ে রেখে শ্মশান-বন্ধুরা ওই বটতলায় বিশ্রাম নিত। জোয়ারের জল থলবল করত বটের শিকড়-বাকড়ের মধ্যে। রামজীবন মারা গেলেন—সূর্যকান্তর প্রপিতামহ তিনি। প্রথম পক্ষের ছেলে, ছেলের বউ আর নাতিনাতনিরা। শেষ বয়সে আবার নতুন সংসার করেন তিনি। শাস্ত্র অনুযায়ী বিধবার সজ্জা নেওয়ার কথা—কিন্তু নতুন-বউ আড় হয়ে পড়ল। চুড়ি ভাঙবে না, সিঁদুর মুছবে না, থানকাপড় পড়বে না, বিধবা হবে না সে কিছুতে।

তারপর আসল মতলব প্রকাশ হয়ে পড়ল। সতী হবে নতুন-বউ, স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় পুড়ে মরবে। ছেলে-বউরা বোঝাচ্ছে: বাবা বিস্তর দিন সংসারধর্ম করে সকল সাধ মিটিয়ে ষোল আনা সমস্ত বজায় রেখে স্বর্গে চলে গেলেন, তুমি কোন দুঃখে এই বয়সে চিতায় উঠতে যাবে মা?

নতুন-বউ কানে নেয় না। হাসি-খুশি নিরুদ্বিগ্ন ভাব। কপাল জুড়ে সিঁদুর দিয়েছে, টকটকে রাঙা-পাড় শাড়ি পরেছে। দু-চার ক্রোশ দূরের মানুষও আসছে সহমরণের ব্যাপার দেখতে। শ্মশানঘাটা নয়, মেলাক্ষেত্র যেন। বউ-ঝি সকলে কৌটা ভরে সিঁদুর এনে একটুখানি নতুন-বউয়ের কপালে ছুঁইয়ে সিঁদুর কৌটো আঁচলে গিঁট দিয়ে রাখছে।

এ সমস্ত হ্যালিডের বর্ণনা। তিনি তখন গ্রামের শেষে মাঠের উপর তাঁবু খাটিয়ে আছেন। সেদিন ব্রেকফাস্ট খেয়ে সাহেব সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে পাখি-শিকারে বেরিয়েছেন, পথের মধ্যে কে এসে বলল সতীর বৃত্তান্ত। সতীদাহ আইন পাশ হয়নি, তা হলেও অনুষ্ঠানের কথা কালেভদ্রে শোনা যেত। শিকার বন্ধ করে সাহেব শ্মশানমুখো ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

জনতা তটস্থ হয়ে সাহেবের পথ ছেড়ে দেয়। চিতার ধারে নতুন-বউয়ের কাছে সোজা চলে গেলেন সাহেব। মুনসির মারফতে কথাবার্তা। সাহেবের কথা মুনসি বউকে শোনাচ্ছেন, বউয়ের কথা ইংরেজি করে দিচ্ছেন সাহেবের কাছে।

সাহেব বললেন, তুমি মরছ কেন?

বউ বলে, স্বামীর কাছে যাচ্ছি। স্বামী ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

আগুনে পুড়ে মরার কী কষ্ট, তোমার ধারণা নেই।

বউ হেসে বলে, খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি? দেখি, প্রদীপটা আন দিকি তোমরা কেউ।

চিতায় ঘি ঢালছে। আর একটা বড় ঘৃতের প্রদীপে সাতটা সলতে ধরিয়ে দিয়েছে।—ওই প্রদীপ থেকে চিতায় আগুন দেবে। বউয়ের কাছে প্রদীপ এনে রাখে। বাঁ-হাতের বুড়ো-আঙুলটা বউ প্রদীপের উপর ধরল।

হ্যালিডে লিখছেন: আশ্চর্য দৃশ্য। আঙুল কুঁকড়ে গেছে, মাংসপোড়া গন্ধ বেরিয়েছে। বউ ফিরেও তাকায় না, হাসিমুখে কথা বলছে আমার সঙ্গে। আমি আর না দেখতে পেরে ফিরে চলে এলাম। লোক-মুখে শুনেছি, দাউদাউ করে চিতা জ্বলছে, সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাসতে হাসতে বউ আগুনের মধ্যে ঢুকে স্বামীর শব জড়িয়ে ধরে যেন আরামের বিছানায় শুয়ে পড়ল।

বর-বউ ঘোষগাঁতি ঢুকবার মুখে সতীঘাটে প্রথম পালকি এনে নামাল। বিয়ের পর গাঁয়ের কনে প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, এই বটতলায় গড় হয়ে সে আশীর্বাদ কামনা করে: সতী-মা, মাগো, দু-জনের মধ্যে বিচ্ছেদ না আসে যেন জীবনে মরণে। রানী যেদিন যায়, সে বলেছিল এই কথা। লীলাও বলেছিল।

সতীঘাটের রাস্তা ধরে মহিম সূর্যকান্তর বাড়ি এলেন। বেড়ার ধারে সূর্যবাবু—কয়েকটা ভেরেণ্ডাগাছের ডালপালা বেড়ে গিয়ে যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে, কাটারি নিয়ে ঠুকঠুক করে কাটছেন সেইগুলো। মহিম এসে পায়ের ধুলো নিলেন।

কি রে? অ্যাঁ, তুই? কবে বাড়ি এলি? চল ঘরে গিয়ে বসি।

নড়বড়ে চৌরিঘর লেপেপুঁছে খানিকটা বাসযোগ্য করে নেওয়া হয়েছে। লীলা দুটো মোড়া রেখে গেল দাওয়ার ওপর। একটা কথা বলল না—যেমন এসেছিল, নিঃশব্দে তেমনি চলে গেল। অনেকদিন পরে মহিম তাকে দেখলেন। কী হয়ে গেছে মেয়েটা! চোখে জল আসবার মত হয় চেহারা দেখে।

সূর্যবাবু বললেন, আমি আর ক'দিন! তখন মেয়েটার কি হবে, সেই চিন্তা। কাঁচা বয়স—লম্বা জীবন পড়ে আছে সামনে। আমার বুড়ো-ঠানদিদি সতী হয়েছিলেন সেকালে। নিজের মেয়ে হলেও ভাবি সেই রেওয়াজটা আজকার দিনে থাকলে অনেকের অনেক ভাবনা চুকে যেত!

তারপর মহিমকে জিজ্ঞাসা করেন, কলকাতায় আছিস তা জানি। মাছনার সাতু ঘোষ নিয়ে গেছে। তা আছিস বেশ ভাল?

মহিম বলেন, ভাল আছি মাস্টারমশায়। সাতু-দা'র কাজ ছেড়ে দিয়ে এখন ইস্কুলের শিক্ষক হয়েছি।

সূর্যকান্তর বার্ধক্যের ঘোলাটে দৃষ্টি জলজল করে ওঠে। তাকালেন তিনি মহিমের দিকে। তাকিয়ে রইলেন। মহিমের মনে হয়, স্নেহ আর আশীর্বাদ ঝরে ঝরে পড়ছে তার দুই চোখ দিয়ে। বললেন, ভাল করেছিস। এর চেয়ে মহৎ বৃত্তি আর নেই।

বলতে বলতে আবার ওই মেয়ের কথা এসে পড়ে: আমার বড় ভাইপো, সে হল পুলিশের দারোগা—তার শালা এসেছে এখানে। ছেলেটা কলকাতায় পড়াশুনো করে। ওরা নাকি চেষ্টা করে ট্রেনিং-ইস্কুলে ঢুকিয়ে দিতে পারে লীলাকে। পাশ করলে করপোরেশন-ইস্কুলে মাস্টারি দেবে। তুই কি বলিস মহিম?

মহিম বলেন, ভালই তো। আপনি চিরকাল আগলে থাকতে পারবেন না। ওর একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

আমিও তাই ভাবছি। তারপর, কোন ইস্কুলে তুই আছিস সেটা তো শুনলাম না।

ভারতী ইনষ্টিট্যুশন।

ওরে বাবা! বিরাট ইস্কুল। আমাদের এ সমস্ত উইঢিবি, সে হল হিমালয় পর্বত। কত সব ছাত্র বেরিয়ে এসে নাম করেছেন। ভাল ভাল ছাত্র পড়িয়ে সুখ পাবি, সার্থক জীবন তোর।

মহিম বলেন, বাইরে এত নাম, কিন্তু মাইনেপত্তর বড় কম।

কত? সূর্যকান্ত প্রশ্ন করলেন।

অনার্স-গ্রাজুয়েট বলে আমার হল চল্লিশ। আণ্ডার-গ্রাজুয়েটদের বিস্তর কম।

সূর্যকান্ত বলেন, খাতায় লিখিস চল্লিশ টাকা। দেয় কত আসলে!

দেয়ও চল্লিশ।

ক-বারে দেয়? মানে, আমাদের এইসব ইস্কুলে যেমন যেমন ছাত্রের মাইনে আদায়, সেই অনুপাতে কাউকে দশ কাউকে পাঁচ এমনিভাবে দিয়ে যায়। তোদের কি নিয়ম?

আমাদের একদিনে দেয়। মাসের পয়লা তারিখে।

ধমকের সুরে সূর্যকান্ত বলেন, কী আশ্চর্য, এই ইস্কুলের নিন্দে করছিস তুই। শিক্ষককে কি আর লাটসাহেবের বেতন দেবে।

জানেন না মাস্টারমশায়, অফিসের দারোয়ানও আজকাল চল্লিশ টাকায় পাওয়া যায় না।

সূর্যকান্ত বলেন, কিন্তু তোর কাজ তো দারোয়ানের নয় বাবা, শিক্ষকের। মাইনের টাকা ক'টি ছাড়া দারোয়ানের আর কি প্রাপ্য আছে? তোদের অন্য দিকে পুষিয়ে যায়।

টুইশানি মেলে, সে কথা ঠিক। সাত-আটটা টুইশানিও করেন কেউ কেউ। তাঁরা পুষিয়ে নেন এই দিক দিয়ে। কিন্তু আমি পারিনে মাস্টারমশায়। দুটো করতেই হাঁপিয়ে উঠি, ছাড়তে পারলে বেঁচে যাই। আমার প্রবৃত্তি হয় না।

সূর্যকান্ত বলেন, পোষানোর কথা আমি বাবা ওসব ভেবে বলি নি। ছেলেদের মধ্যে বসে পড়ানো, তিলে তিলে পরিপূর্ণ করে মানুষ গড়ে তোলা—কত বড় আত্মতৃপ্তি! বাচ্চা ছেলে বড় করে তুলে মায়ের যে আনন্দ, এ হল ঠিক তাই। স্রষ্টার আনন্দ, শিল্পীর আনন্দ। টাকা পয়সা আর ভোগসুখই জীবনের সব নয়। আদর্শহীন জীবন হল পশুর জীবন।

এই এক আজব মানুষ। দুর্লভ হয়ে আসছেন এঁরা। সূর্যকান্ত মোড়ায় বসেছেন, মহিমকেও মোড়া দিয়েছিল লীলা। কিন্তু মহিম উঁচু আসনে বসলেন না। তালপাতার চাটাই নিয়ে মেঝের উপর তিনি বসে পড়লেন। ঠিক পায়ের নিচে এমনিভাবে বসা ভাগ্য।

সতীঘাটের বিশাল বটগাছের মাথা একটুখানি দেখা যাচ্ছে। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সূর্যকান্ত। বলতে লাগলেন, চারু আমার ছাত্র। জীবন দিল সে আদর্শের জন্য। আমার প্রপিতামহী সেকেলে গৃহস্থদের সাধারণ স্ত্রীলোক। কিন্তু তিনি যা আদর্শ বলে জানতেন, তার জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিলেন। বিদেশি সাহেব মুগ্ধ হয়ে লিখে গেছে। ওঁরা সবাই এক জাতের—চারু আর বুড়ো-ঠানদিদির মধ্যে আমি কোন তফাৎ দেখিনে। দেখ, একটা কথা বলি তোকে। মানুষ গড়ার কাজ নিয়েছিস, এ ব্রত অবহেলা করবি নে। ক্লাস হচ্ছে মন্দির—বালগোপালদের নিত্যসেবা সেখানে। মন্দিরে যাবার মতো মন নিয়ে ক্লাসে ঢুকবি।

কথাবার্তা চলল অনেকক্ষণ। ঘোষগাঁতিতে মহিম পুরো বেলা কাটিয়ে এলেন। ফিরে আসছেন—মনে হচ্ছে, মানুষ হিসেবে অনেকখানি উঁচুতে উঠে গেছেন।

বড় বোন সুধা একদিন গল্পে গল্পে বললেন, খুশির কথা মনে আছে মহিম—সাতু ঘোষের বোন খুশি? অবুঝের মত ঘাড় নাড়লে শুনিনে—তুমি আমার

বিধান ভাই, মনে আছে সব, চালাকি করা হচ্ছে। খুশির মার বড্ড পছন্দ তোমায়। সে কী কাণ্ড—

মেয়ের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সেনগিন্নি নিজে বলতে লাগলেন, খুশির মা একদিন গরুর গাড়ি করে সেই মাছনা থেকে মেয়ে বয়ে নিয়ে আমাদের এখানে হাজির। পাড়াগাঁয়ে যা কখনো কেউ করে না। এসে বলেন, পদতলে মেয়ে নিয়ে এলেম মহিমের মা। ঘরে তুলে নেবেন না লাথি মেরে ছুঁড়ে দেবেন, বিবেচনা করুন। চিঁড়ে-দুধ-বাতাসা-আমসত্ত খাইয়ে মিষ্টি কথায় তো বিদেয় করলাম। কি হবে, তারপর ভেবে মরি। সুধা এদিকে আড় হয়ে পড়েছে: সে হবে না, ওই ভিটেকপালি নাক-থ্যাবড়া মেয়ে ভাইয়ের পাশে দাঁড়াবে, সে আমরা চোখ মেলে দেখতে পারব না।

সুধা বলেন, আমিই বুদ্ধি দিলায়, সোজাসুজি না পার তো বড়মামার দোহাই পেড়ে দাও। কুষ্ঠি ঘাঁটাঘাঁটির বাই আছে তাঁর—পাত্রীর জন্মপত্রিকা চেয়ে পাঠাও। বিচারে যা আসবে সেই মতো হবে।

হেসে উঠে বলেন, মেয়েওয়ালা ভাগানোর আচ্ছা এক ফিকির এই কুষ্ঠি। ভাগিয়ে দিয়ে আমরা মুখে হা-হুতাশ করছি, তারাও চটতে পারছে না।

মা বললেন, এদ্দিনে মেয়েটার সম্বন্ধ গেঁথেছে একটা। পশ্চিমবাড়ির ছোটবউ বলছিল। অঘ্রাণে বিয়ে, পাকা-দেখা হয়ে গেছে। ম্যাট্রিক পাশ ছেলে, জজ-আদালতের পেস্কার। মেয়ের মা নাকি মুখ অন্ধকার করে বেড়াচ্ছেন। ছোটবউ বলছিল, কী চোখে আমাদের ঠাকুরপোকে দেখেছেন, কোন পাত্রই তার পরে পছন্দ হয় না। তা বলে ওই কুচ্ছিৎ মেয়ের সঙ্গে কী করে হয়। খরচপত্রও তেমন করতে পারছে না, শুনলাম। সাতুর ব্যবসা নাকি বড্ড টালমাটাল যাচ্ছে।

মহিমের কাছে এটা নতুন খবর। কিন্তু তিনি আশ্চর্য হন না। বললেন, আরও হবে, ব্যবসা একেবারে যাবে। অধর্ম করে ব্যবসা চলে না। সাধে যা ছেড়েছুড়ে চলে এলাম?

সুধা বলেন, মুখে তো রাজা মারেন, উজির মারেন। এই দাওয়ার উপর বসে সেবারে লম্বা-লম্বা কথা বলে গেলেন।

মহিম বলেন, কোন্ দিন না শোন যে জেলে গেছেন সাতকড়ি ঘোষ। নুন খেয়েছি, নিন্দেমন্দ করা ঠিক নয়। কিন্তু যে পথে চলেছেন, তাই আছে ওঁর অদৃষ্টে।

সেনগিন্নি শিউরে উঠে বলেন, তুই ভাল করেছিস বাবা বেরিয়ে এসে। ধর্মপথে থেকে শাক-ভাত জুটলেও সে অনেক ভাল।

ছুটি দেড় মাসের, কিন্তু বিজয়া-দশমীর পরদিনে মহিম টিনের সুটকেসে কাপড়চোপড় ভরছেন।

সেনগিন্নি বলেন, সে কিরে! ইস্কুল খুলবে সেই জগদ্ধাত্রী-পূজোর পর। এর মধ্যে যাবার কি তাড়া পড়ল?

সে ছুটি মা ইস্কুল দিয়েছে—দুপুরবেলায় যারা মনিব। সকাল-সন্ধ্যার মনিব নিয়েই মুশকিল। ইস্কুল খুলে এগজামিন। সারা বছর বই ছোঁয়নি, বছরের পড়া একটা মাসে সারা করে দিতে হবে। ছেলে যত না খাটবে, মাস্টার খাটবে তার দুনো তেদুনো। নয় তো বারোমাস মাইনে খাওয়াচ্ছে কেন?

সুধা হাসিমুখে এদিক-ওদিক ঘাড় নাড়েন: ওসব নয় মা। সাতু ঘোষের বোনের সঙ্গে না হোক, মেয়ের তো আকাল হয়নি। গণ্ডায় গণ্ডায় কত রয়েছে এদিক-সেদিক। বিয়েথাওয়ার যোগাড় দেখ, ভাই তখন আর পালাই-পালাই করবে না।

মহিম বললে, এগজামিনের মুখে বিয়ে বললেও মাপ হয় না দিদি। বিয়ে তো বিয়ে—মরে গেলেও বোধ হয় বলবে, কি কি ইম্পর্টান্ট আছে দাগ দিয়ে রেখে তবে গঙ্গাযাত্রা করুন। বড় শক্ত ঘানি গো দিদি।

মরাছাড়ার কথা মায়ের কানে খারাপ লাগে। সংক্ষেপে তিনি প্রশ্ন করলেন, কতগুলো টুইশানি?

সকালে একটা, রাতে একটা। তাইতে হিমসিম খেয়ে যাই। ইস্কুলমাস্টারি করে মাত্র দুটো টুইশানি—অন্য মাস্টাররা অপদার্থ কুলাঙ্গার ভাবেন আমায়। কিন্তু দুটোই তো আমার ধাতে সয় না। পাকা হয়ে গিয়ে খরচপত্র চলার মতো মাইনে কিছু বাড়লে টুইশানি একেবারে ছেড়ে দেব। ছেলেদের যাতে উচিত শিক্ষা দেওয়া যায়, তাই নিয়ে পড়াশুনো ভাবনাচিন্তা করব। গ্রীষ্মের পুরো সাত হপ্তা বাড়ি থেকে যাব। টিউটর হয়ে বাড়ি বাড়ি বিদ্যের ফিরি করে বেড়ানো—ইজ্জত থাকে ওতে কখনো! ছেলেরাই বা মানবে কেন?

॥ সাত ॥

পুজোর ছুটির পর ইস্কুল খুলেছে। বার্ষিক পরীক্ষা আসন্ন। দুখিরাম ছুটোছুটি করে সার্কুলার ঘুরিয়ে আনল: ছুটি হলেই শিক্ষকরা আজ বাড়ি চলে যাবেন না, লাইব্রেরি-ঘরে অপেক্ষা করবেন। কাজ আছে।

ডি-ডি-ডির চালচলন গম্ভীর। ছুটির আগে থাকতেই নিজের কামরায়

দরজা এঁটে আছেন। ক্ষুদিরাম লাইব্রেরির ঘর থেকে এক-একজন করে ডেকে পিছন-দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তিনি বেরিয়ে এলে আর একজন। একখানা ডায়েরি-বই ডি-ডি-ডি'র হাতে। এটি তাঁর নিজের কাছে থাকে, কাউকে দেখতে দেন না। চিত্তবাবুকেও না! বই দেখে ফিস ফিস করে প্রতি মাষ্টারকে বলে দিচ্ছেন, কোন ক্লাসের প্রশ্নপত্র করবেন তিনি; কোন্ ক্লাসের খাতা দেখবেন। অতিশয় গোপন ব্যাপার—কেউ কাউকে বলবেন না যেন, একজনের খবর অন্যে টের না পায়।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চিত্তবাবু মুখ টিপে টিপে হাসছেন: বাজে খাটনি এত খাটতে পারেন! এই কখনো গোপন থাকে! ভূত যে সর্ষের মধ্যে। ইনি ওঁকে ডেকে কানে কানে বলবেন। জিজ্ঞাসা করতে হবে না, নিজের গরজে বলে বেড়াবেন সবাই।

কিন্তু মহিমের গরজ নেই। দুটিতো টুইশানি। একটা মেয়ে পড়ান—তার সম্পর্কে কাউকে কিছু বলবার নেই। আর ছেলেটা এই ইস্কুলের হলেও ন্যায্যর বেশি সিকি নম্বর বাড়াতে যাবেন না, এ বিষয়ে দৃঢ়পণ তিনি। তাঁর কাছেও অতএব পালটা কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করল না। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার—জিজ্ঞাসা না করেও জেনে ফেলেছে দেখছি অপরে।

করালীকান্ত এসে বললেন, চেক আছে আমার ভাই! বেশি নয়, তিনখানা। নোট-বই আছে?

কিসের চেক, কোন্ ব্যাপার—মহিম কিছু বুঝতে পারেন না। নোট-বই লাগছে বা কিসের জন্যে?

করালী হেসে বলেন, নতুন মানুষ আপনি। ভিতরের অনেক ব্যাপার শিখতে হবে। বলি, শুধু কি পড়িয়ে যাবেন? ছাত্র পাশ করে যাবে, সেটা আপনার দায়িত্ব নয়?

মহিম বলেন, দায়িত্ব কিনা জানিনে, তবে পাশ করে যাক নিশ্চয় চাই সেটা। পাশ করবে না তো কী পড়ালাম এদ্দিন ধরে!

শুধু পড়িয়েই কি পাশ হয় ভাই? নতুন আপনি, জানেন না। সেই জন্যে চেক। চেক মানে হল এক টুকরো কাগজে লেখা ছাত্রের ক্লাস আর রোল-নম্বর। রোল-নম্বর স্পষ্টাস্পষ্টি বললে খারাপ শোনায়, বাইরের কানে পড়ে যেতে পারে—সেজন্যে চেক নাম দিয়ে কাজকর্ম চলে। টুকরো টুকরো এমনি কাগজ অনেক আসবে, আমরা তাই নোট-বুকে সঙ্গে সঙ্গে টুকে রাখি। অমুক বাবুর এই নম্বর। খাতা দেখবার সময় নম্বরগুলো পাশে রেখে বিবেচনা করতে হবে।

বিবেচনা কি ছাই—পাশ করিয়ে দেবেন, ভাল নম্বর দেবেন। নয়তো টুইশানি খসে যাবে। আবার আপনিও যেসব চেক দেবেন, অন্যেরা তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করবেন। পালটাপালটি ব্যাপার।

মহিম বিরক্ত হয়ে বলেন, আমি কোনদিন কাউকে চেক দিতে যাব না মশায়।

দায়ঝক্কি নেই—আজকে তাই বলছেন বড় বড় কথা। কিন্তু লাইনে যখন এসেছেন, করতেই হবে ভাই। আজ না হয় তো কাল; কাল না হয় তো পরশু। সে যাকগে—ভবিষ্যতের কথা, এখন তার কি! আপনি চেক না দিতে পারেন, আমি এই দিয়ে যাচ্ছি তিনটে। সামাল করে রেখে দিন।

মহিম দেখলেন, নম্বরগুলো সবই থার্ড ক্লাসের। থার্ড ক্লাসের অঙ্ক দেখতে হবে তাঁকে। আশ্চর্য হয়ে করালীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, জানলেন কি করে বলুন তো?

হাত গণে—

না সত্যি বলুন। হেডমাস্টার মানা-করে দিলেন, কারও কাছে আমি প্রকাশ করিনি। অথচ জানতে তো বাকি নেই দেখছি।

করালী হেসে বলেন, অঙ্ক কষে জেনেছি ভাই। স্রেফ যোগবিয়োগের ব্যাপার। প্রসেস অব এলিমিনেসন। অঙ্কে অনার্স আপনি—উপরের ক্লাসের অঙ্কই দেবে আপনাকে। অন্য সব ক্লাসের জানা হয়ে গেল, থার্ড ক্লাসের অঙ্কের হদিস মেলে না। অতএব আপনি।

গঙ্গাপদবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এতগুলোর মধ্যে এই একটি মানুষকে মহিমের বড় ভাল লাগে। তিনিও খোঁজখবর নেন। একদিন বললেন, লাগছে কি রকম বাবাজি?

মহিম বলেন, ছেলেরা খুবই ভাল। আপনাকে খুলে বলি—মাস্টারমশায়রা সব শিক্ষিত ব্যক্তি, বড় কাজ নিয়ে আছেন। কিন্তু তাদের বড্ড নিচু নজর, নোংরা কথাবার্তা। আমার মোটেই ভাল লাগে না, গা ঘিনঘিন করে। দেখুন, ভাল পয়সার চাকরি ছেড়ে এসেছি। এখানেও মনে হয়, ছেড়ে দিয়ে চলে যাই। কিন্তু ক্লাসে ছেলেদের কাছে বসলে আর সে কথা মনে থাকে না তখন ভাল লাগে।

গঙ্গাপদবাবু পুরানো শিক্ষক, সেকাল-একাল অনেক দেখেছেন। ধীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, তোমার ব্যথা যে কোন্‌খানে তা ভালই বুঝতে পারছি। কিন্তু

মাস্টারমশায়দের দিকটাও ভেবে দেখ। টুইশানি করে করে মাথায় আর সাড় থাকে না। ইস্কুলটা আছে তাই রক্ষে—ইস্কুল হল বিশ্রামের জায়গা। হাত-পা ছেড়ে জিরিয়ে নেন এখানে, ফাঁক মতো ঘুমিয়েও নেন। কষ্টনষ্ট করেন। ক্লাসে হল পাইকারি পড়ানো, ফাঁকি ধরবার মা-বাপ নেই। বাড়ির পড়ানোয় সেটা চলবে না। টিউশানি না করলেও চলে না—সাধ করে কেউ পাড়ায় পাড়ায় উঞ্ছবৃত্তি করে! এত বড় ইস্কুল—গ্রাজুয়েটদের তিরিশ টাকা দেন, সেই দেমাকে বাঁচেন না। মাস্টাররাও ঐ তিরিশ টাকা ফাউ হিসাবে ধরে নিয়েছেন। আসল খাটনি ইস্কুলের বাইরে।

টুইশানির গল্প হয় নানারকম। মতিবাবু মস্ত বড়লোকের বাড়ির গৃহশিক্ষক হয়ে আছেন। সেইখানে খাওয়া-থাকা। এলাহি ব্যাপার মশায়। গদির বিছানা, বনবন করে পাখা ঘুরছে মাথার উপরে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চা খাবেন ভোরবেলা, দেরি হলে নাকি মাস্টার-মহাশয়ের মাথা ধরে। কলিং-বেল টিপছেন তো দুটো চাকর হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসবে। ইস্কুলে মোটরগাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে যায়। আবার চারটে না বাজতে গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে। কপাল, কপাল, বুঝলেন মশায়, পূর্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে এ রকম বাড়ি থেকে ডাক আসে না।

জগদীশ্বরবাবু বলছেন, আমার এক মেয়ে-পড়ানো আছে, তার কথা বলি। পড়াতে গেলেই চটে যায়—মেয়ে নয়, মেয়ের মা আর বাবা। পড়ার ঘরে বসে পা দুলিয়ে খবরের কাগজ পড়ছি। মেয়ের মা এসে বললেন, এর মধ্যে এসেছেন —ইস্কুল থেকে ফিরে একটু জিরতেও দিলেন না যে! ঘড়িতে সাড়ে সাতটা তখন। চারটেয় বাড়ি এসে সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যেও মেয়ের জিরানো হল না। আবার আটটা বাজতে না বাজতে মা চলে এসেছেন: আর নয়, ঘুম পাচ্ছে পলির, এবারে যেতে দিন। পরের দিন হয়তো বাবা এসে বললেন, আজকে আর পড়বে না পলি; ওর মাসি মাসতুত-বোনেরা সব এসেছে। তার পরের দিন বললেন, আজকে থাক; সিনেমায় যাচ্ছে। ফিরে আসছি—বললেন, দাঁড়ান একটু। মাইনেটা অগ্রিম চুকিয়ে দিয়ে বললেন, পলির মাসি এসেছেন দিল্লী থেকে—এ মাসের ক'টা দিন আসবেন না আর। নতুন মাসে গিয়েছি—গিন্নি—বললেন, পলি রোজ পড়বে না, হপ্তায় তিন দিন করে আসবেন মাস্টারমশায়। বেশী পড়লে শরীর খারাপ হবে। তাই চলছে; তিন দিন করে যাই—পড়ে হয়তো একটা দিন। মাসের ঠিক পয়লা তারিখে পুরো বেতন।

ভূদেববাবু সদুঃখে বলেন, আমার কাহিনী তবে শুনুন। আমার কপালে এক হারামজাদা জুটেছে। বলে, এগজামিনের মুখে এখন রবিবারেও আসুন না সার। উঠে দাঁড়িয়েছি তখনো বলবে, জ্যামিতির এই প্রবলেমটা বুঝিয়ে দিয়ে যান। পিছু পিছু রাস্তা অবধি নেমে এল গোটা পাঁচ-সাত ইংরেজি ইডিয়াম মুখে করে নিয়ে: এইগুলোর মানে কি হবে বলুন। পড়ার কী চাড়—ব্যাটা আমার বিদ্যেসাগর হবে! কিছু না, বুঝলেন, স্রেফ শয়তানি। মাস্টার-জ্বালানো ছেলে থাকে এক-একটা। ব্রাহ্মণ-সন্তানকে জ্বালিয়ে মারিস, টের পাবি—পরীক্ষার খাতায় পাতায় পাতায় গোল্লা। উঃ, পূর্বজন্মের কী মহাপাপ ছিল, তাই অমন নরক-ভোগ করছি। ভাল চাই নে, মাঝামাঝিও একটা পেতাম—তার পরে একটা দিনও আর ওদের ছায়া মাড়াতে যাব না।

মহিম আর ভূদেববাবু মেসে ফিরছেন। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে ট্রাম-রাস্তার মোড়ে নতুন বাড়ি হচ্ছে। মার্বেলের মেঝে, কালো মোজেয়িকের বড় বড় থাম, লতাপাতা-কাটা কাচের আবরণ সিঁড়ির সামনেটায়। ভারি শৌখিন বাড়ি। যেতে যেতে ভূদেববাবু চট করে ভিতরে ঢুকে দারোয়ানকে গিয়ে ধরলেন: মনিবের বাড়ি কোথা দারোয়ানজি।

জলপাইগুড়ি। চা-বাগানের মালিক—বিস্তর পয়সা।

পুলকে ডগমগ হয়ে ভূদেববাবু ফিরে এলেন। বলছেন, জলপাইগুড়ির লোক অদ্দুর থেকে প্রাইভেট মাস্টার ট্যাঁকে করে আসছে না। কি বলেন মহিমবাবু? ঘট পেতে গৃহপ্রবেশ করবে, নজর রাখতে হবে দিনটার উপরে!

মহিমকে সামাল করে দিচ্ছেন: আপনার খাঁই নেই জানি, আপনার কাছে সেইজন্যে বলে ফেললাম। খবরদার, খবরদার—অন্য কানে না যায়।

আবার বলেন, একেবারে ইস্কুলের পথের উপর—সব টিচারের নজর পড়ে যাচ্ছে। কতজনে এর মধ্যে খোঁজখবর নিয়ে গেছে, ঠিক কি!

॥ আট ॥

গার্ড দিচ্ছেন মহিম। সঙ্গে পতাকীচরণ আছেন। পতাকী বড় ভাল। পরিশ্রমীও খুব। ঘুরে ঘুরে পাহারা দিয়ে বেড়ান: এই, পেট মোটা কেন—বই-টই আছে নাকি রে? শার্টটা তোল দিকি উঁচু করে। ব্লটিং-পেপার টানাটানি করবি নে। ন্যাকা আমরা, কিছু বুঝি নে—উঁ! কাঁচা কালির

উপর ব্লটিং চাপিস, ব্লটিং-এর উপর লেখা উল্টো হয়ে ছাপ পড়ে যাচ্ছে। ওরে কাশী বাঁ-হাত চিত করে অত কি লিখিস? দেখুন মহিমবাবু, কাণ্ডখানা দেখে যান। হাতের তলা ভরতি করে কপিং-পেন্সিলে কত সব লিখে এনেছে।

যত দেখেন, মহিম অবাক হয়ে যাচ্ছেন : আমরাও পড়াশুনো করেছি। কিন্তু এ কী! সাতজন্ম ভেবেও এত সব ফন্দি মাথায় আসত না।

পতাকীচরণ হেসে বলেন, ভাবতে কে বলছে আপনাকে? আমি একাই পারব। আপনারা মফস্বলের ইস্কুলে পড়েছেন, কলকাতার বিচ্ছুদের হদিশ কি করে পাবেন? কিচ্ছু করতে হবে না, যদি কখনো বাইরে যাই সেই সময়টা দেখবেন আপনি।

সত্যি, চোখ দুটো বিঘূর্ণিত করে পতাকীচরণ ঘরময় চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছেন। একটা মশা উড়লেও তাঁর নজর এড়াবে না। মহিম নিতান্তই বাহুল্য এক্ষেত্রে।

পতাকী বলেন, কাজ না থাকে বই-টই পড়ুন না বসে বসে। দেখবার কিছু নেই, আমি একাই একশ।

এটা মন্দ কথা নয়। এনসাইক্লোপেডিয়ার বাঁধানো পিঠগুলো দেখে থাকেন আলমারিতে। পড়বার ইচ্ছে হয়। এডুকেশন সম্বন্ধে কি লিখেছে—সেই ভল্যুমটা এনে পড়া যাক। হোক পুরানো এডিশন, প্রাচীন মনীষীদের ভাবনাটা জানা যাবে।

আসছি আমি একটা বই নিয়ে।

করালীবাবুকে খুঁজছেন। কেয়ারটেকার মানুষ, কখন কি কাজের দরকার পড়ে—সেজন্য তাঁকে গার্ড দিতে হয় না। চিত্তবাবু বললেন, তিনি কি আছেন এতক্ষণ? একটা কোন কাজের নাম করে বেরিয়ে পড়েছেন। বাড়ি গিয়ে ঘুম দিচ্ছেন, নয় তো টুইশানি সেরে বেড়াচ্ছেন এই ফাঁকে। দেখুন খুঁজে। কপালে থাকলে পেয়েও যেতে পারেন।

দুখিরাম বলে, তামাক খাবার ঘরটা দেখুন দিকি। ওই দিকে একবার যেতে দেখেছিলাম।

সেইখানে পাওয়া গেল। বাড়ি যান নি, কিন্তু ঘুমুচ্ছেন ঠিকই। জানলাহীন আধ-অন্ধকার—একটিমাত্র দরজা, দরজাটা ভেজিয়ে পুরোপুরি রাত করে নিয়েছেন।

করালীবাবু—

অ্যা—? করালীবাবুর সজাগ ঘুম, ধড়মড় করে উঠে বসে আতঙ্কে চোখ কচলাচ্ছেন : কী মহিমবাবু যে! আপনি ডাকছেন ?

একটিবার উপরে চলুন। একটা বই দিয়ে আসবেন।

বই—তা আমার কাছে কেন? বিনোদ দেবে, তার কাছে বলুনগে।

মহিম বলেন, বিনোদের বই নয়—

খড়ি ডাস্টার স্কেল ম্যাপ ইত্যাদি এবং ক্লাসে পড়বার বই বিনোদের জিম্মায় থাকে। ভদ্রলোকের ছেলে বলে বেয়ারা বলা ঠিক হবে না তাকে। টিচাররা ক্লাসে যাবার সময় যার যা দরকার, বিনোদের কাছ থেকে নিয়ে যান। এই নিয়ে বিনোদের অহঙ্কারের অন্ত নেই! বলে একদিন যদি না আসি, ক্লাসের কাজ বন্ধ। খালি হাতে মাস্টারমশাইরা কি পড়াবেন ?

আর, মরে যাও যদি বিনোদ ?

বিনোদ এক কথায় অমনি জবাব দেয়, ইস্কুল উঠে যাবে!

এই বিনোদ। মহিম বললেন, টেক্সটবুক চাচ্ছি নে করালীবাবু। লাইব্রেরি থেকে একটা এনসাইক্লোপেডিয়া নিয়ে নেব।

লাইব্রেরির বই ?

করালীবাবু এমন করে তাকালেন যেন কড়াৎ করে আকাশের এক মুড়ো থেকে খানিকটা ভেঙে পড়ল সেখানে। বলেন, লাইব্রেরির বই তো আলমারিতে তালাবন্ধ রয়েছে।

নাছোড়বান্দা মহিম বলেন, তালা খুলে দিন একটু কষ্ট করে গিয়ে।

তালা খুলব, কিন্তু চাবি তো লাগবে—

অতিমাত্রায় বিরক্ত হয়েছেন, বোঝা যাচ্ছে। প্রেসিডেন্টের লোক বলে মুখে কিছু বলছেন না। বললেন, চাবি কোথায় কে জানে!

ধীরেসুস্থে মহিমের সঙ্গে দোতলায় গিয়ে বিনোদকে বলেন, লাইব্রেরির আলমারির চাবি তোমার কাছে ?

বিনোদ বলেন, আমায় কবে দিলেন ?

হুঁ, মনে পড়েছে। অনেক দিনের কথা বলে ভুলে যাচ্ছ বিনোদ। সেই যে ইস্কুলের জুবিলির বছরে চারদিক ঝাড়ামোছা হচ্ছিল, আলমারি সেই সময় খোলা হয়েছিল। বন্ধ করে তারপর চাবির তাড়া তোমার কাছে দিলাম একটা কৌটোর মধ্যে রেখেছিলে, খুঁজে দেখ।

বিনোদ বলে, কৌটোয় রেখে থাকি তো এরই মধ্যে আছে।

কোথা থেকে এক বিস্কুটের টিন এনে মেঝেয় উপুড় করল। ঝিঙে-চোকানো

কলঙ্ক-ধরা একতাড়া চাবি তুলে নিয়ে করালী বললেন, এই দেখ। রয়েছে তোমার কাছে—তুমি বলছ, কবে দিলেন ?

আলমারির তালার ভিতর চাবি ঢুকিয়ে করালী অনেক চেষ্টাচরিত্র করলেন। শেষটা ঘাড় নেড়ে বলেন, খোলে না—

তবে কি হবে ?

বিরক্তস্বরে করালীকান্ত বললেন, আপনার হল কংসরাজার বধের ফরমাস। যা হবার নয়, তাই হওয়াতে বলছেন ! তালা খুললেও তো পাল্লা খুলবে না, কবজায় জং ধরে আছে। টানাটানি করলে ভেঙে যাবে।

মহিম বললেন, কী আশ্চর্য ! লাইব্রেরিয়ান রয়েছেন। বই কেউ নেয় না কোনদিন ?

পাঁচ টাকার লাইব্রেরিয়ান—ওতে আর বই দিতে গেলে চলে না !

পরক্ষণে আবার নরম স্বরে বলেন, বই পড়বেন তো বাড়ি থেকে নিয়ে আসবেন। আলমারি খুললেই বা কী হত ভাই ? বইয়ের কিছু আছে নাকি, হাত লাগালেই গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাবে। যাঁরা কিনেছিলেন, তাঁরা সব গত হয়ে গেছেন—বই আর কতকাল টিকবে !

পরের দিন থেকে একটা-কিছু হাতে করে আসেন মহিম। পরীক্ষা চলছে। পতাকীচরণ অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে চতুর্দিকে পাহারা দিয়ে ফিরছেন। মহিম উঠতে গেলেই হাঁ-হাঁ করে ওঠেন : পড়ছেন, পড়ুন না। কী দরকার। আমি তো রয়েছি—কোন বেটার খাতা থেকে মুখ উঁচু হবে না।

সেকেণ্ড ক্লাসের প্রশ্নপত্র একখানা হাতে করে এলেন।

দেখছেন মশায়, কোয়েশ্চেনের রকমটা দেখুন। আই. সি. এস. পরীক্ষায় দিলেও বেমানান হত না। এই ইকুয়েশন। দুটো—ভাবলাম, কষেই দেখি না কেমন দাঁড়ায়, তা এই দেখুন, এক পাতা করে ফেললাম তবু কোন মুড়োদাঁড়া পাওয়া যায় না। ইস্কুলের ছেলেদের এই অঙ্ক দিয়েছে, আক্কেল-বিবেচনা বুঝুন।

মহিম অঙ্ক-কষা কাগজখানার দিকে তাকিয়ে দেখলেন : আপনি যে সোজা সড়ক ধরে চলেছেন—এতে হবে না পতাকীবাবু। ফাইভ-বি আছে, ওটা ভেঙে থ্রি-বি প্লাস টু-বি করে নিন। ফরমূলায় পড়ে যাবে। দেখি—

পেন্সিল আর কাগজটা হাতে নিয়ে টুকটুক করে কষতে লাগলেন। লহমার মধ্যে হয়ে গেল। একটা শেষ করে পরেরটাও করলেন।

দেখুন—

পতাকীচরণের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল : সার্থক পড়াশুনো করে এসেছেন মশায়। আপনার উন্নতি কেউ রুখতে পারবে না। ছেলে-মহলে একবার চাউর হয়ে গেলে টুইশানির গাদি লেগে যাবে। ঠেলে কূল পাবেন না।

শেষ ঘণ্টা চলেছে। খাতা দেবার সময় হয়ে আসে। বাইরে যাবার বড্ড হিড়িক এইবার। একজন ছেলে ফিরে এল তো চার-পাঁচটি উঠে দাঁড়ায়।

উঁহু, একের বেশি হবে না। যা নিয়ম।

ছেলেরা কলরব করে : তবে তো যাওয়াই হবে না আমাদের। এর মধ্যে ঘণ্টা বেজে যাবে।

কিন্তু কড়া মাস্টার পতাকীচরণ কোনক্রমে নিয়ম শিথিল করবেন না।

নতুন বছরের পাঠ্য-বই নির্বাচন এইবারে, নানান কোম্পানির ক্যানভাসার আসছে। হেডমাস্টারের কামরার বাইরে তাদের জন পাঁচ-সাত ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে পি. কে. পাবলিশিং হাউসের প্রাণকেষ্ট পালের সর্বাগ্রে ডাক পড়ল। এ তো জানা কথাই। মডেল ট্রানশ্লেশন নামে ডি-ডি-ডির-র একখানা বই বের করে সম্পর্ক ওঁরা পাকা করে রেখেছেন।

প্রাণকেষ্ট এলে ডি-ডি-ডি বললেন, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বসুন। সেই দশটা থেকে আপনারা সব হানা দিচ্ছেন, এখনও চলছে। কাজকর্ম হবার জো নেই।

প্রাণকেষ্ট বলে, এই একটা মাস সার। প্রাচী শিক্ষালয়ের হেডমাস্টার আমার উপর খিঁচিয়ে উঠলেন। পাশাপাশি ইস্কুলের হেডমাস্টার আপনার বই ছেপেছি —বুঝতে পারছেন তো, সেই হিংসে। আমিও ছাড়িনি : বছরের মধ্যে একটা মাস আমরা এসে আজ্ঞে-হুজুর করে যাই, এর পরে কেউ থুতু ফেলতেও আসব না। দোকানে গেলে একখানা টুল এগিয়ে দেব বসতে। ছাড়ব কেন, আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়ে এসেছি। বই না হয় না ধরাবে।

ডি-ডি-ডি বলেন, এবারে কি করবেন আমার বইটার? গেল বারে তো মোটমাট সাতান্নটি টাকা ঠেকালেন।

চেষ্টা তো করা যাচ্ছে সার। সাড়ে চারশ চিঠি চলে গেছে মফস্বলের হেডমাস্টারদের নামে। ছাপা চিঠি নয়, ছাপা জিনিস কেউ পড়েন না। আপনি নিজের হাতে সব প্রাইভেট লিখে পাঠিয়েছেন।

ডি-ডি-ডি অবাক হয়ে বলেন, সে কি! আমি লিখতে গেলাম কবে চিঠি?

একগাল হেসে প্রাণকেষ্ট বলে, লিখছে আমাদের লোকে আপনার নাম-ছাপা

প্যাকেটের উপরে। হাতের লেখা কে চিনে রেখেছে? যিনি চিঠি পেলেন, তিনি কৃতার্থ হয়ে যাবেন—অত বড় ইস্কুলের হেডমাস্টার বই ধরানোর জন্য কাতর হয়ে নিজের হাতে লিখছেন। কাজ হবে বলে মনে হয়। এ ছাড়া আপনাকেও কিন্তু সত্যি সত্যি কিছু করতে হবে সার। সেই জন্যে এসেছি।

বলুন—

ব্যাগ খুলে দশ-বারোখানা বই প্রাণকেষ্ট টেবিলের উপর রাখল: এইগুলো পাঠ্য করে দিতে হবে আপনার ইস্কুলে।

সে কি করে হবে? মাস্টারমশায়রা দেখেশুনে বই পছন্দ করে দেন। এই এখানকার নিয়ম।

ভাল নিয়ম। ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে সার—যাঁরা পড়াবেন, বই বেছে দেওয়া তাঁদেরই তো কাজ। এ-বি-সি ফাঁদতে কালঘাম ছুটে যায়, ভোটের জোরে মেম্বার হয়ে তারাই সব নাক গলাতে আসে। বুঝুন কাণ্ড! তা মাস্টারমশায়রা দেখেশুনে যাতে পছন্দ করেন, সেই ব্যবস্থা করে দিন আপনি। আমাদের তরফ থেকে ক্যালেণ্ডার আর পকেট গীতা দিয়ে যাব। আর বেশি দামের ভারিক্কি বই ধরালে নতুন বছরের ডায়েরি একখানা করে।

ফসফস করে দু-তিনটা বইয়ের প্রথম পাতা খুলে দেখাল। বাজে বই নয়, দেখছেন? অথচ হয় হেডমাস্টার নয়তো অ্যাসিস্টাণ্ট-হেডমাস্টার। ওঁদের বই করুন, ওঁরাও আপনার মডেল ট্রানস্লেশন করবেন। পাকা কথা নিয়ে এসেছি। হয়ে গেলে ছাপা লিষ্টি দেখিয়ে যাব।

ডি-ডি-ডি ঝেড়ে ফেলে দেন: সে এখন বলতে পারছি নে। মাস্টাররা আছেন। তার উপর কমিটি—তাঁদের প্রত্যেকের দু-একখানা করে উপরোধের ব্যাপার থাকে।

প্রাণকেষ্ট মুখ কালো করে: কমিটি কি আর ওই সব ইস্কুলে নেই? রাগ করবেন না সার। বই অন্য লোকে লিখে দিল, আপনাকে ঝক্কি পোহাতে হয়নি, ছাপা হয়ে বেরিয়ে এলে তবে তো আপনি চোখে দেখলেন। এখন এইটুকুও যদি না পারবেন, তবে কেন লাভের বখরা কম হওয়ার কথা তোলেন?

ডি-ডি-ডি চোখ তুলে তাকালেন প্রাণকেষ্টর দিকে। এ ভিন্ন মানুষ—ভারতী ইনষ্টিট্যুশনের টিচার নয়, ছাত্রও নয়—বছর বছর বাড়ি এসে নগদ তঙ্কা গণে দিয়ে যাওয়ার মানুষ। সুর নরম করে অতএব বললেন, আচ্ছা রেখে তো যান। দেখি।

প্রাণকেষ্ট বলছে, সবগুলো না পারেন, খান আষ্টেক অন্তত করে দেবেন। আর একটা কথা বলছিলাম সার। শুনুন—

কাছাকাছি মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলে, অন্তত আটখানা বই যদি ধরিয়ে দেন বুকলিস্ট মাংনা ছেপে দেব আমরা।

ডি-ডি-ডি ঘাড় নেড়ে বলেন, ওসব এখানে নয়। ভারতী ইনষ্টিট্যুশনের টাকার অভাব নাকি? মাংনা ছেপে নেব কোন্ দুঃখে?

প্রাণকেষ্ট বলে, ছেপে দেব আমরা। আটখানা না হোক, ছ-খানা অন্তত ধরাবেন। ছেপে তারপরে যে রকম বিল করতে বলেন, করব। বিলের সে টাকা ঘরে নেব না। আপনার হাতে দিয়ে যাব। তারপরে যা করবার আপনি করবেন। টিচারদের কোন ফাণ্ড-টাণ্ড থাকে তো দিয়ে দেবেন সেখানে।

ডি-ডি-ডি বলেন, কদ্দূর কি হয়ে ওঠে দেখা যাক। পরের কথা পরে। আপনি আর একদিন আসুন। বাইরে আরও সব দাঁড়িয়ে আছে। ঘণ্টা পড়ার সময় হল, ছেলেরা সব বেরবে। দু-এক কথায় সেরে দিই ওঁদের।

প্রাণকেষ্ট উঠল। হেডমাস্টার হাঁক দিলেন, আসুন আপনারা এক এক করে—

কিন্তু অন্য কেউ ঢোকবার আগে সকলকে ঠেলে সরিয়ে দাশু একটা ছেলের হাত ধরে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এলেন।

এই কাগজটা ওর কাছে পাওয়া গেছে সার। জলের ঘরে ঢুকে পকেট থেকে বের করল। আমার ওখানে ডিউটি—ট্যাঙ্কের ওপাশে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলাম। ছিঁড়ে কুচিকুচি করে নর্দমায় ফেলে দিত, কঁ্যাক করে অমনি চেপে ধরেছি।

হেডমাস্টার একেবারে মারমুখি। চারিদিক সচকিত করে চেঁচিয়ে উঠলেন: নাম কেটে তাড়িয়ে দেব। পড়াশুনো না পারুক, তার মার্জনা আছে। কিন্তু দুর্নীতি-মিথ্যাচার এ ইস্কুলের ত্রিসীমানায় চলবে না। কাগজ কোথায় পেলি, সত্যি করে বল।

ছেলেটা চুপ করে থাকে।

চিৎকারে চিত্তবাবু ছুটে এসেছেন। এদিক-ওদিক থেকে আরও দু-একটা এসেছে।

কাগজ কে দিয়েছে, বল সেই কথা। উড়তে উড়তে এসে পকেটে ঢুকে পড়ল?

ছেলেটা বলে, কথা অঙ্ক টুকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি বাবাকে দেখাব বলে।

এই তোর হাতের লেখা? মিথ্যে বলার জায়গা পাসনি? ওই যা

বললাম—মিথ্যেবাদীর এ ইস্কুলে জায়গা নেই। চিত্তবাবু, ছেলেটা কোন ঘরে বসেছে দেখুন তো। ওর খাতাটা নিয়ে এসে বাতিল করে দিন। এগজামিনারের কাছে যাবে না।

শেষ ঘণ্টা পড়বার দেরি নেই। ভুখিরাম ছুটতে ছুটতে মহিমের কাছে এসে চিত্তবাবুর স্লিপ দিল: কাশীনাথ সরকারের খাতা হেডমাস্টার এখুনি চেয়ে পাঠিয়েছেন।

কাশীনাথ? মহিম নজর ঘোরালেন ঘরের চতুর্দিকে: কাশীনাথ সরকার কে আছে, উঠে দাঁড়াও। হেডমাস্টারের কাছে খাতা যাবে।

পতাকীচরণ বলেন, কাশীনাথ বাইরে গেছে। কাণ্ড ঘটিয়ে এসেছে একখানা। এক নম্বরের শয়তান—বুঝলেন? যেমন শয়তান তেমনি হাঁদা। ধরা পড়েছে কি করতে গিয়ে। ঠিক হয়েছে!

ঘণ্টা পড়ে ছুটি হয়ে গেল। কাশীনাথ তখনও দাঁড়িয়ে। হেডমাস্টার বলেন, কী রকম গার্ড দেন পতাকীবাবু? অঙ্ক কষে বাইরে থেকে ছেলের হাতে দিয়ে যায়, আপনারা দেখতে পান না?

ছেলেটাকে পতাকী এই মারেন তো এই মারেন। বলছেন, আমি স্যার চেয়ারে বসি নে, সর্বক্ষণ ঘুরে ঘুরে গার্ড দিই। মহিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন। ছোঁড়াটা বার বার বাইরে যাবে,—সেই সময় কোথা থেকে সাপ্লাই হয়েছে। ধরে আগাপাস্তলা চাবকালো যেত—কাগজ কোত্থেকে আসে তাহলে বেরিয়ে পড়ত। সে তো স্যার হবার জো নেই।

মহিমকে পতাকীচরণ সাক্ষি মেনেছেন, কিন্তু তিনি একেবারে থ হয়ে গেছেন। অঙ্ক কষা তাঁরই—যে ইকুয়েশন দুটো খানিক আগে পতাকীচরণ কষিয়ে নিয়ে গেলেন! ছি-ছি-ছি কিংবা চিত্তবাবু ভাগ্যিস তাঁর হাতের লেখা চেনেন না! চোরের দায়ে তাঁরই তো পড়বার কথা! আর কাশীনাথ ছেলেটাও কী ঝানু রে—পতাকীচরণ এমন যাচ্ছেতাই করছেন, মুখে তবু টু-শব্দটি বের করে না।

মহিম আর পতাকীচরণ পরের দিনও সেই ঘরের গার্ড। পয়লা ঘণ্টা পড়ে গেছে, প্রশ্নপত্র এইবার আসবে। কাশীনাথ যথারীতি সিটে গিয়ে বসল। কালকের একটা বেলার খাতাই শুধু বাতিল।

ছেলেরা কাশীনাথকে ঘিরে ধরেছে: অঙ্ক তোকে কে করে দিয়েছিল?

কাশীনাথ রহস্য-ভরা হাসি হাসেঃ জানি নে। সত্যিই জানি নে কিছু আমি। হলের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, এক টুকরো কাগজ হাওয়ায় উড়তে উড়তে এল। হাতের মুঠোয় ধরে নিলাম।

চুকেবুকে তো গেছে—কেন লুকোচ্ছিস? বল ভাই, শুনি।

অসঙ্কোচে বেশ জোরে বলছে ওরা। তুখড় ছেলে মাত্রেই করে থাকে, না করাটাই বোকার লক্ষণ—এমনিতরো ভাব কথাবার্তায়।

পতাকীচরণ সগর্বে মহিমের দিকে চোখের ইঙ্গিত করলেন। কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বলেন, শুনছেন তো মশায়? সোনার টুকরো ছেলে ওই কাশীনাথ। ক্লাসের ছেলের কাছেও কথা ভাঙে না। আর কাল তো দেখলেন হেডমাস্টারের সামনে। যেমন সাহস, তেমনি সত্যনিষ্ঠা। আমার কাছেও সত্য করেছিল, গলা কেটে ফেললেও কিছু বলবে না। ঠিক তাই। কাশীর কাছ থেকে কথা বের করবে, সে মানুষ আজও জন্মে নি।

মহিম তখন অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছেন কৃষ্ণকিশোর নাগ হেডমাস্টারের কথা। তাঁরই এক ছাত্র সূর্যকান্ত। দোর্দণ্ডপ্রতাপ হেডমাস্টার—কমিটি-ফমিটি কেঁচো তাঁর কাছে। কমিটি তো ছার—সেই স্বদেশি যুগে লালমুখ পুলিশ সুপার দলবল নিয়ে ইস্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, একটা ছাত্রকে অ্যারেস্ট করবে, কিন্তু ঢোকবার সাহস নেই। কৃষ্ণকিশোর বেরিয়ে এলেন: এখানে কেন? চলে যান আপনারা। ছেলেরা ভয় পেয়েছে, পড়াশুনোর ব্যাঘাত হচ্ছে। যেতে হল পুলিশ-সুপারকে থোতা মুখ ভোঁতা করে।

কৃষ্ণকিশোর কবে গত হয়েছেন, আজও দেশ-জোড়া নাম। সূর্যবাবুর কাছে মহিম তাঁর অনেক গল্প শুনেছেন। ইস্কুল যেন বিশাল এক যৌথ পরিবার—সে বাড়ির কর্তা হলেন বৃদ্ধ কৃষ্ণকিশোর। ছাত্র হোক শিক্ষক হোক, বাইরের কেউ ছুঁয়ে কথা বললে রক্ষে থাকবে না। তোমার কোন অভিযোগ থাকলে হেডমাস্টার কৃষ্ণকিশোরকে বল, তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর, কিছু করণীয় থাকলে তিনিই তা করবেন।

একবার শীতকালে ইনস্পেক্টর এলেন ইস্কুলে। পাড়াগাঁয়ের ইস্কুলে ইনস্পেক্টর আসা রাজসূয় ব্যাপার। ইনস্পেক্টর দেখেশুনে ভিজিট-বুকে মন্তব্য লিখে চলে গেলেন, ফাঁড়া কেটে গেল—মাস্টার-ছাত্র ও কমিটির কর্তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এই ফাঁড়া কাটানোর কতরকম তোড়জোড় কতদিন থেকে। খাতাপত্র ঠিকঠাক বানিয়ে ফেল দিনরাত্রি খেটে। রেজেস্ট্রীতে যত আজেবাজে ছেলের নাম আছে, তাদের ডেকেডুকে দু-একদিন ক্লাসে বসিয়ে কিছু তালিম

দিয়ে নাও। ইস্কুলের উঠোনের জঙ্গল সাফ কর, ঘরদুয়ারে ঝাটপাট দাও। ছেলেপুলে ও মাস্টাররা কাপড়চোপড় কেচে ফর্শা করুন আগে থাকতে। শতেক বায়নাক্কা। ওদিকে গাঁয়ের পুকুরগুলোয় দাঁড়জাল নামিয়ে সবচেয়ে বড় মাছটা ধরিয়েছে, গোপালভোগ-চন্দ্রপুলি-ক্ষীরের ছাঁচ বানিয়ে রেখেছেন এবাড়ির-ওবাড়ির মেয়েরা। আসছেন যেন গ্রামসুদ্ধ মানুষের সরকারি জামাই।

কিন্তু কৃষ্ণকিশোরের ইস্কুলে সে ব্যাপার নয়। ইন্‌স্পেক্টর আসার খবর নিশ্চয়ই আগে চিঠিতে জানিয়েছিল। কিন্তু সরকারের কর্মচারী আসছেন কর্তব্য করতে, এসে যা দেখবার দেখে যাবেন—অপরের সে খবরে কি প্রয়োজন? সাধারণ কাজকর্মের একতিল এদিক-ওদিক হবে না ইনস্পেক্টর আসার জন্যে।

এসেছেন ইনস্পেক্টর। অফিসে বসে খাতাপত্র দেখে নিলেন। উঠলেন তারপরে। ক্লাস দেখবেন। মাস্টারমহাশয়রা বিশ্রামঘরে। শীতেরবেলা উঠোনে রোদ পোহাচ্ছেন কেউ কেউ। কৃষ্ণকিশোরকে ইনস্পেক্টর জিজ্ঞাসা করেন, ক্লাসে যাননি ওঁরা?

বার্ষিক পরীক্ষা হচ্ছে, ক্লাসের পড়ানো নেই। সেইজন্য ওঁদের ছুটি।

স্তম্ভিত ইনস্পেক্টর: কি বলেন! পরীক্ষার হলে মাস্টারমশায় কেউ নেই—টোকাটুকি করে দফা সারবে তবে তো!

কৃষ্ণকিশোর বিরক্ত হয়ে বলেন, শিক্ষকরা থাকেন পড়ানোর জন্য। পুলিশ-পাহারাদার তাঁরা নন—তাঁদের আজ কাজ কি? ছেলেরাও পড়াশুনো করতে আসে, ইস্কুল চোর-ছ্যাচোড়ের জায়গা নয়—তারাই বা কেন টোকাটুকি করতে যাবে?

ইনস্পেক্টর অবাক হয়ে আছেন তো কৃষ্ণকিশোর বললেন, আপনার সঙ্গে আমি ক্লাসে যাচ্ছিনে। যেখানে খুশি আপনি একলা ঢুকে পড়ে দেখে আসুন। ছেলেদের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা থাকবে, আমি সেটা চাইনে। দেখেশুনে নিঃসংশয় হয়ে আসুন।

ইনস্পেক্টর একলাই চললেন দেখতে। আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়েও দেখলেন। সব ছেলে নিজ নিজ খাতা লিখে যাচ্ছে নিঃশব্দে—ঘাড় তুলে তাকায় না কোনদিকে। জলের কলসির ধারে বেয়ারা জন দুই বসে। কেউ জল খেতে এলে মাটির গেলাসে করে দিচ্ছে, খাওয়ার পরে ফেলে দিচ্ছে সেই গেলাস। এ ছাড়া আশেপাশে কোথাও কেউ নেই।

ইনস্পেক্টর কমবয়সি। অফিসে ফিরে এসে বললেন, পায়ের ধুলো দিন আমায়। আর কিছু দেখবার নেই, আমি যাচ্ছি।

মহিম ভাবছেন, হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নেওয়া যায় সে সব মানুষ বড় দুর্লভ। অতিকায় ডাইনোসর লোপ পেয়ে গেছে। বড় মাপের সৃষ্টির দিন যেন ফুরিয়ে এল।

॥ নয় ॥

নিচের ক্লাসের ছেলেদের মুখে-মুখে পরীক্ষা ; বড়দের মতন তারা লিখে পরীক্ষা দেয় না। লেখা পরীক্ষাগুলো আগেভাগে হয়ে যায়, টিচাররা বাড়িতে নিয়ে খাতা দেখেন, আর ইস্কুলে এসে মৌখিক পরীক্ষা নেন। এমনি প্রোগ্রাম হওয়ায় পরীক্ষার কিছু সময়-সংক্ষেপ হয়। নগদ কারবার মৌখিক পরীক্ষার ব্যাপারে। প্রশ্ন হল—হর্ষবর্ধন কে ছিলেন, তাঁর দানযজ্ঞের কাহিনী বল। হর্ষবর্ধন সার একজন রাজা—। ততক্ষণে এই প্রশ্নের বাবদ নম্বর পড়ে গিয়ে ভিন্ন প্রশ্ন এসে গেছে : হজরত মহম্মদ কি করেছিলেন ? পরীক্ষা চারটে পর্যন্ত হতে পারবে, কিন্তু তার অনেক আগে একটা-দেড়টার মধ্যে কাজ শেষ করে নম্বরের কাগজটা চিত্তবাবুর কাছে জমা দিয়ে মাস্টারমশায়রা বিদায় হয়ে যান।

এইটথ ক্লাসের ইতিহাস নিচ্ছেন মহিম। দাশু এসে বলেন, একটু গোপন কথা আছে মহিমবাবু।

মহিম বলেন, ছাত্র আছে, এই তো ? দু-হপ্তা ধরে এই চলেছে, সবাই এসে গোপনে বলে যান। কাকে যে কে গোপন করছেন জানি নে। চেক-টেকের দরকার নেই—রোল-নম্বর বলে দাও, মার্কসিটের পাশে দাগ দিয়ে নিচ্ছি।

দাশুর ছাত্রের রোল-নম্বরে দাগ দিয়ে নিয়ে পরীক্ষার্থীর দিক চেয়ে বললেন, হ্যাঁ, কি বলছিলি ? থেমে গেলি কেন রে, বলে যা—

দাশু তবু দাঁড়িয়ে আছেন।

হবে, যাও তুমি। সবাইকে দিচ্ছি, তোমার বেলা কেন দেব না ?

ছেলেটাকে আরও গোটা দুই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শেষ করে দিলেন। তারপরে বিরক্তস্বরে মহিম বলেন, দু-জনেই আমরা অল্পদিন ঢুকেছি, তোমার বয়স দু-চার বছর কমই হবে আমার চেয়ে। তাই কথাটা বলছি দাশু। পরীক্ষা একেবারে ফার্স হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ভাবছি, একটা লেখা . নিয়ে রাখলে হয়—কোন কোন ছেলে ইস্কুলের মাস্টার রেখেছে। তারা তো পাশ হবেই। তাদের বাদ দিয়ে রেখে বাকিগুলোর পরীক্ষা করলে খাটনি অনেকখানি কমে।

দাশু আমতা-আমতা করেন : কথা তো ঠিকই। কিন্তু অন্যায় জেনেশুনেও পেটের দায়ে করতে হয়। নইলে টুইশানি থাকে না।

মহিম বলেন, কাল আমি হিসাব করে দেখলাম। পঁচাশিখানা খাতো পেয়েছি। তার মধ্যে পঞ্চাশের উপর চেক এসে গেছে। আরও আসবে। পনের-বিশটা হয়তো বাকি থাকবে—সেই হতভাগাদের মাস্টার রাখবার সঙ্গতি নেই, কিংবা সস্তায় পেয়ে বাইরের টিউটর রেখেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পড়াশুনো করা আর পরীক্ষায় পাশ হওয়ার মধ্যে সম্পর্ক এমন কিছু নেই। দেখা যাচ্ছে, দুটো গোষ্ঠি ছাত্রের মধ্যে—পয়সা দিয়ে যারা মাস্টার-টিউটর রেখেছে, যাদের সুপারিশ করতে এসে মাস্টারমশায়রা ভাতভিত্তির দোহাই পাড়েন। আর হল—যারা টিউটর রাখতে পারেনি, যা খুশি করা যায় তাদের নিয়ে, বলবার কেউ নেই।

দাশু বলেন, গালিগালাজ করেছেন। উচিত বটে! কিন্তু দোষ শুধুই কি আমাদের? ইস্কুলের কর্তাদের নয়—তিরিশ টাকায় গ্রাজুয়েট রেখে যাঁরা দেমাক করেন? বিশ টাকা আণ্ডার গ্রাজুয়েটের মাইনে। মাস্টারদের ন্যায্য মাইনে বাড়ানো কি ইস্কুলের হিত সম্বন্ধে দুটো আলাপ-আলোচনা—এর জন্যে একটা মিটিং ডাকার যাদের সময় হয় না। শিক্ষিত মানুষ প্রথম যখন আসেন, মনের মধ্যে বড় বড় আদর্শ মরে দুদিনে ভূত হয়ে যায়। দোষ গার্জেনেরও—বেশি টাকায় ইস্কুলের মাস্টার রেখে যাঁরা ভাবেন কর্তব্য শেষ হয়ে গেল। ছেলে কি করছে তার কোনরকম খোঁজ নেবেন না। এগজামিনের রেজাল্ট বেরলে তখন কৈফিয়ৎ চান ছেলের কাছে নয়—মাস্টারের কাছে। ছেলের সামনেই মাস্টারের উপর হুমকি ছাড়েন।

উচ্ছ্বাস ভরে দাশু অনেক কথা বলে ফেললেন। মহিম এক নজরে চেয়ে শুনে গেলেন। বললেন, যাও তুমি ভাই। ঠিক করে দেব। কিছু বলুক আর না বলুক, হেসে নম্বর দিয়ে দেব তোমার ছাত্রকে।

দাশু ঘাড় নেড়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলেন, না না মহিমবাবু। ঠিক উল্টো। টরটর করে বলে যাবে, সব প্রশ্নের ভাল জবাব দেবে। নম্বর দিতে হবে খুব চেপে। তিরিশে পাশ, একত্রিশ কি বত্রিশ নম্বর দেবেন। তার বেশি কক্ষণো নয়।

মহিম একেবারে দস্তুর মতো চটে গেলেন : ছি-ছি! নিরীহ শিশুকে ন্যায্য নম্বর থেকে বঞ্চিত করব—এ কাজ আমায় দিয়ে হবে না। নম্বর বাড়িয়ে দিতে বল, সে এক কথা, কিন্তু কমিয়ে শত্রুতা সাধন করা—এ জিনিস ক্রিমিন্যাল।

দাশু বলেন, শত্রুতা সাধন কার উপরে মশায়? আমিই তো পড়াই ছেলেটাকে। আগে বুঝে দেখিনি—এখন দাদা গণেশের শূল গেঁথে যাবার যোগাড়। আপনি রক্ষে না করলে বাঁচবার উপায় নেই।

হাত জড়িয়ে ধরতে যান মহিমের।

রাখ, রাখ—আহা, উতলা হয়ে পড়েন কেন? বল সব কথা, শুনি।

মহিম আদ্যোপান্ত শুনলেন।

গণেশ নামে একটি ছেলে এই ইস্কুলের এইটথ ক্লাসে পড়বার সময় মারা যায়। বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে—তাঁরা স্কলারশিপ দিয়েছেন গণেশের নামে। গণেশ-স্মৃতি স্কলারশিপ। এইটথ ক্লাস থেকে যে ছেলে ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পাবে, এক বছর তাকে মাসিক বারো টাকা করে দেওয়া হবে। এবার খুব ভাল ছেলে আছে—প্রাক্তন ছাত্র সেই সুখময় জজের ছেলে। কিন্তু দাশু অতশত বোঝে নি, নিজের ছাত্রের জন্য তদ্বিরটা বড্ড বেশি করে ফেলেছে। গণেশ-স্কলারশিপ এর ঘাড়ে এসে চাপলে নজর পড়ে যাবে সকলের, নানা রকম খোঁজ-খবর হবে—

দাশু বলছেন, সব টিচারের সঙ্গে ভালবাসাবাসি, সকলে খাতির করেন। এইটথ ক্লাসের যাঁরা প্রশ্নপত্র করেছেন, তাঁরা সব ইম্পর্টাণ্ট বলে দিয়েছিলেন। এই বছরের নতুন টুইশানি বলে আমিও যত্ন করে উত্তর লিখে দিয়ে মুখস্থ করতে বললাম। অঙ্কগুলো কষিয়ে কষিয়ে রপ্ত করে দিয়েছি। হতভাগা ছেলে—যা বলেছি, তাই কিনা অক্ষরে অক্ষরে করে রেখেছে। এতাবত কি রকম করল, খোঁজ নিতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ—ফার্স্ট বয়কে ছাড়িয়ে বেটা পঞ্চাশ নম্বরের উপরে বসে আছে। আর সব হয়ে গেছে—বাকি এই ইতিহাসের আপনি, আর জগদীশ্বরবাবু কাল অঙ্ক নেবেন। তাঁকে বলা আছে, সমস্ত অঙ্ক নির্ভুল করলেও নম্বরটা তিরিশের বেশি উঠবে না। এখন আপনি দয়া করলে স্কলারশিপটা কোন রকমে রক্ষে হয়ে যায়।

দাশুর ছাত্র অন্য কেউ নয়—মলয়। সেই মলয় চৌধুরি। চেহারা যেন আরও সুন্দর হয়েছে। কী মধুর কণ্ঠস্বর! দেবশিশু একটি। প্রশ্ন না করতেই গড়গড় করে বলে যাচ্ছে। কিন্তু হলে কি হবে জাদুমণি—হাত বাঁধা, টায়টোয়ে পাশের নম্বরটা শুধু।

মহিমের দেহমন রি-রি করে জ্বলছে। সাতু ঘোষ তো অনেক ভাল—সে ঠকায় শক্ত-সমর্থ মানুষদের। নিষ্পাপ অবোধ ছেলেপুলে নিয়ে খেলায় না। এ চাকরি আর নয়। শহর ছেড়ে মফস্বলের কোন শান্ত অঞ্চলে চলে যাবেন

মহিম। ঠাণ্ডা গাছের ছায়া, স্নিগ্ধ নদীর কূল, ছোটখাট ইস্কুল একটা—আশ্রমের পরিবেশ। সেখানে কৃষ্ণকিশোর না হন, সূর্যবাবুর মতো মিলে যেতে পারে কাউকে। শহরে এইসব হাঁকডাকের ইস্কুলের খুরে দণ্ডবৎ রে বাবা! আগা প্যান্তালা বিষে জরজর—এর মধ্যে মানুষ বাঁচে কেমন করে।

হেডমাস্টার এবারে নতুন সার্কুলার দিয়েছেন, শুধুমাত্র নম্বর জমা দিলেই হবে না, উত্তরের খাতা ফেরত দিতে হবে ছেলেদের। যা দেখে ভুল কোথায় তারা ধরতে পারবে, ভবিষ্যতের জন্য সামাল হবে। প্রোমোশানের এক হপ্তা আগে একটা তারিখ দেওয়া হল—ঐ দিন ক্লাস বসবে খাতা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য।

বোলতার চাকে ঘা পড়ল। দুজন মাস্টার মুখোমুখি হলেই ওই প্রসঙ্গ। দিন-কে-দিন আজব নিয়ম। খাতার ভুল দেখে তো রাতারাতি বিদ্যাদিগ্‌গজ হবে! ওসব কিছু নয়, মাস্টারগুলো জব্দ হয় যাতে। ক্লাস-পরীক্ষা হয়ে গেল, কিন্তু টেস্ট আর ফাইন্যালে বাঘা বাঘা পরীক্ষা দুটো সামনে। উপরের মাস্টার যাঁরা আছেন, টুইশানির ঠেলায় চোখে অন্ধকার দেখছেন তাঁরা। দশটা মিনিট পড়তে চাইত না, দেড় ঘণ্টা পরেও সেই ছাত্রের হাত ছাড়িয়ে ওঠা যায় না। হেডমাস্টারের সন্দেহ, অযত্নে আন্দাজি নম্বর দেওয়া হচ্ছে। ছাত্রের হাতে খাতা দিয়ে সেইজন্য মাস্টার পরীক্ষার নতুন আইন।

টুইশানির শাহান-শা সলিলবাবু—তিনি কিন্তু একেবারে নির্বিকার। ছোকরা মাস্টাররা টুইশানির গরব করেন: আমার তিনটে, আমার পাঁচটা। সলিলবাবু কানে শোনেন আর হাসেন মৃদু-মৃদু। স্বল্পবাক নির্বিরোধী এই মানুষটিকে মহিমের ভাল লাগে। একদিন বললেন, লোকে বলে পুরো ডজন টুইশানি নাকি আপনার?

সলিল হেসে বলেন, তাই কখনো পারে মানুষে?

তবে ক'টা? বলতে কি, কেউ আর কেড়ে নেবে না।

ওসব জিজ্ঞাসা করতে নেই মহিমবাবু। আমি বলতে পারব না, গুরুর নিষেধ।

হেসে আবার বলেন, কত বন্ধুজনের রাতের ঘুম নষ্ট হবে। কী দরকার!

এ হেন সলিলবাবুর মুখে একটি অনুযোগের কথা নেই। যথারীতি মৌখিক পরীক্ষা নিচ্ছেন, পরীক্ষা না থাকলে হল বা লাইব্রেরি ঘরের লম্বা টেবিলে গড়িয়ে নিলেন একটু। আবার তখনই তড়াক করে উঠে চিত্তবাবুর দিকে চোখের

ইঙ্গিত করে বেরিয়ে পড়লেন। বেরলেন টুইশানিতে, চলবে সেই রাত দুপুর অবধি।

মহিম বললেন, সোমবারে তারিখ। সমস্ত খাতা ওইদিন দিয়ে দিতে হবে।

সলিল মাথা নাড়লেন : হুঁ—

আপনার কত খাতা সলিলবাবু ?

সলিল বললেন, বাণ্ডিলের ভিতরে সমস্ত নাকি লেখা আছে। আমি এখনো দেখিনি। শ'-দুয়েকের মতো হবে মনে হয়।

বলেন কি ! বাণ্ডিলই খোলেননি বোধহয়। তবে কি করবেন ?

হাসিমুখে সলিল বললেন, মাঝে রবিবার আছে। দেখে দেব যেমন করে হোক।

সোমবারে ইস্কুলে এসেই মহিম সলিলের খোঁজ নিলেন। হাসিমুখ তাঁর যথারীতি, সামনে প্রকাণ্ড খাতার বাণ্ডিল।

এক দিনের মধ্যে এত খাতা দেখে ফেললেন ?

সলিল বলেন, পুরো দিনই বা পেলাম কোথা ! জানুয়ারীর গোড়ায় টেস্ট— শিরে সংক্রান্তি, এখন কি রবিবার বলে কিছু আছে ? রবিবারেও বেরতে হল। দুপুরবেলা ঘণ্টা তিনেক অনেক কষ্টে একটু ফাঁক করে নিয়েছিলাম।

মারা পড়বেন সলিলবাবু। খাতা ছেলেদের হাতে দিয়ে দেখুন, খুঁড়ে খাবে তারা আপনাকে।

নির্বিকার কণ্ঠে সলিল বলেন, এই কর্মে চুল পাকালাম। কিছু হবে না দেখতে পাবেন।

ক্লাসে গেলেন সলিল। অন্য দিনের চেয়ে বেশি গম্ভীর আজ। সকলকে খাতা দিয়ে দিলেন।

দেখ তোমরা, মনোযোগ করে মিলিয়ে দেখ। মার্কসিট আমার কাছে। ভুল-টুল থাকতে পারে তো—তাই এখনো জমা দিইনি।

ছেলেরা খাতা খুলে দেখছে ! মোটামুটি খুশি সকলে। নম্বর যা প্রত্যাশা করেছিল, তারচেয়ে বেশি বেশি পেয়েছে। ভাল মাস্টার সলিলবাবু, দয়াধর্ম আছে।

একটা ছেলে উঠে দাঁড়াল।

সলিল বলেন, কি গোলমাল আছে বুঝি ?

হ্যাঁ সার ফিফ্‌থ কোয়েশ্চেনে নম্বর পড়েনি।

হতে পারে এই জন্যেই তো মার্কসিট জমা দিইনি এখনো। নিয়ে এস, দেখি।

কাছে এসে ছেলেটা খাতা মেলে ধরে : এই দেখুন স্যার। গ্রামারের এই প্রশ্নে তিন তো পাবই—

নিরিখ করে দেখে সলিল বলেন, তিন কেন, চার পাবে। তাই দিয়ে দিচ্ছি।

চার মার্ক বসিয়ে দিলেন। তার পরেও পাতা উল্টে যাচ্ছেন। বলেন, খাতাটা সত্যি অমনোযোগের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ভুল আরও আছে। এই ব্যাখ্যা করেছিস, সাত নম্বর দেওয়া যায় এতে? পাঁচের বেশি কিছুতে নয়।

সাত কেটে সলিল পাঁচ করে দিলেন।

বনভোজনের এসে লিখেছিস—হুঁ, হুঁ, হুঁ—আরে সর্বনাশ, কী কাণ্ড করেছি, কুড়ির মধ্যে ষোল দিয়ে বসে আছি। সাত-আটের বেশি কিছুতে দেওয়া যায় না—আচ্ছা, নয়ই দিলাম।

ছেলেটা কাঁদো-কাঁদো : একবার যখন দেওয়া হয়ে গেছে—

সলিল হাসিতে গলে গলে পড়ছেন : বলিস কি রে? ভুল করেছি, তার সংশোধন হবে না? গ্রামারের প্রশ্নেও যে মার্ক পড়েনি—দিয়ে দিলাম চার নম্বর। মার্কসিট এই জন্যেই এখনো হাতে রেখে দিয়েছি।

বলছেন, আর পাতার পর পাতা উল্টে খচখচ করে নম্বর কেটে সংশোধন করছেন। কমই হচ্ছে প্রতিক্ষেত্রে। ছেলেটা খারাপ নয়, আগে পেয়েছিল সাতষট্টি। সংশোধনের পর পঁয়তাল্লিশে দাঁড়াল।

খাতা ফেরত দিয়ে মার্কসিটে সাতষট্টি কেটে পঁয়তাল্লিশ করলেন। হাসিমুখ। তারপর সকলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি দেখা কিনা, ভুলচুক অনেক থাকতে পারে। নিয়ে এস যে যে খাতায় ভুল আছে।

সব ছেলে ইতিমধ্যে খাতা ভাঁজ করে পকেটে পুরে ফেলেছে। এমন কি ক্লাসের অপর ছেলেকেও দেখতে দেবে না।

চতুর্দিক থেকে সবাই বলে, ভুল নেই, ঠিক আছে স্যার।

ভাল করে দেখেছিস তো? যাক, নির্ভাবনা হলাম।

টিফিনের সময় সেদিন ছাত্রের ভিড় এক-এক মাস্টারকে ঘিরে। এটা কম হয়েছে, ওটা বাদ গেছে, এখানে যোগের ভুল—মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার যোগাড়। মহিম দু-হপ্তা ধরে এত খেটেখুটে বিচার-বিবেচনা করে দেখলেন, তাঁর কাছেও দলে দলে খাতা নিয়ে আসছে।

কেবল সলিলবাবু একান্তে বসে মৃদু-মৃদু হাসছেন। মহিম গিয়ে তাঁকে ধরেন : কী আশ্চর্য, আপনার কাছে কেউ আসে না!

নির্ভুল দেখেছি যে।

দু-ঘণ্টায় দু-শ খাতা নির্ভুল দেখে ফেললেন, কায়দাটা আয়ত্ত করে দিতে হবে সলিলবাবু।

তাই তো! সলিল একটু ইতস্তত করেন: যাকগে, লাইনে নতুন এসেছেন—গুরুদত্ত শিক্ষা আপনাকেই দিয়ে দিচ্ছি একটু-আধটু। পরীক্ষার নম্বর লম্বা হাতে দিয়ে যাবেন। ঝামেলা আসবে না, ছেলেরা সুনাম করবে। গাঁট থেকে বের করতে হচ্ছে না, তবে আর ভাবনা কিসের?

একটুখানি থেমে হাসতে হাসতে বললেন, দেখুন ভাই, পয়সা খরচা করে পরোপকার করতে পারি নে। সে ক্ষমতা ভগবান দেননি। পেন্সিলের মুখের পাঁচ-দশটা নম্বর—তাতে কঞ্জুসপনা করতে গেলে হবে কেন?

॥ পাঁচ ॥

তেসরা জানুয়ারি। ক্লাস প্রোমোশানের সঙ্গে সঙ্গে ইস্কুল বন্ধ হয়েছিল। খুলেছে কাল। নতুন সেসন, নতুন সব ছেলেপুলে। পুরানোদের অনেক প্রোমোশান পেয়ে উপর ক্লাসে উঠেছে, ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেছে কেউ কেউ, নতুন নতুন ছেলে ভর্তি হয়ে আসছে। আপাতত পুরানো রুটিনে কাজ চলেছে। রুটিনও নতুন হবে—কোন্ ক্লাসের ক'টা সেকসন হয়ে দাঁড়ায়, সেই অপেক্ষায় দেরি করা হচ্ছে। চিন্তবাবুর কাছে ইতিমধ্যেই মাস্টারদের ঘোরাঘুরি আরম্ভ হয়ে গেছে নতুন রুটিনে একটু উঁচু ক্লাস পাবার জন্যে।

মস্তবড় গাড়ি এসে থামল ইস্কুলের গেটে, জানালা দিয়ে গগনবিহারীবাবু তাক করে আছেন। গাড়ি থেকে নামলেন মোটাসোটা প্রবীণ ভদ্রলোক। পিছনে কর্ডের হাফপেণ্ট ও ঘিয়ে-রঙের হাপশার্ট-পরা দুই বাচ্চা ছেলে। দুই ভাই সন্দেহ নেই।

নতুন ফার্স্ট ক্লাসের পড়া শুরু হতে ক'দিন এখনো দেরি আছে। তিন সেকসনের তিনটে ঘরে ছেলে ভর্তির ব্যবস্থা। একটায় গার্জেন ও ছেলেপুলেরা এসে বসছে। একটায় পরীক্ষা। আর একটায় ভর্তির ফরম-পূরণ, টাকার লেনদেন এবং বইয়ের লিস্ট দেওয়া হচ্ছে। বিষম ভিড়। অন্য ইস্কুলের ট্রান্সফার-সার্টিফিকেট থাকলেই হল না, যাকে তাকে নেন না এরা, ছেলে দেখেশুনে বাজিয়ে নেবেন। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা তো বটেই, তাছাড়া আপাদ-মস্তক চেহারাও দেখবেন। যে ক্লাসে ভর্তি হবে, তার মানানসই হওয়া চাই। সমারোহ ব্যাপারে। ভর্তির কাজটা কালাচাঁদবাবু করে থাকেন, এবারও তাঁর

উপরে ভার। পছন্দমতো জন তিনেক মাস্টার নিয়ে পরীক্ষায় বসিয়ে দিয়েছেন। মহিম তার ভিতরে।

গাড়ি থেকে নেমে সেই ভদ্রলোকটি ছোট উঠান পার হয়ে আসছেন। গগনবিহারী দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছেন, সিঁড়ির মুখে গিয়ে ধরবেন। ভূদেববাবু, দেখা গেল, অন্য জায়গায় দাঁড়িয়ে। হাসছেন তিনি গগনবিহারীর দিকে চেয়ে, আর বুড়ো আঙুল নাড়ছেন: তাই-রে নারে নারে-না—সে-গুড়ে বালি। চাকের মধু নেপোয় খেয়ে যাচ্ছে। হবে না, কোন আশা নেই।

গগনবিহারী থমকে দাঁড়িয়ে বলেন, চেনেন বুঝি ওঁদের? অতবড় গাড়ি হাঁকিয়ে এলেন, কে মানুষটা?

ভূদেব বলেন, বড়লোক—সেটা আপনি ঠিকই ধরেছেন। ছেলে ভর্তি করতে আসছেন, তা-ও ঠিক। কিন্তু ড্রাইভারের পাশ থেকে আধ-ময়লা পাঞ্জাবী-পরা ওই যে একজন ছেলে এল, তাকে দেখছেন? ছেলে দুটোর মাথায় ছাতা ধরে নিয়ে আসছে—দোতলা থেকে আমাদের কারো দৃষ্টি না লাগে। মাস্টার ওটি, আমাদের কোন আশা নেই। হবার হলে আমিই আগে ছুটে গিয়ে ওঁদের খাতির করে বসাতাম।

ছত্রধারী লোকটাকে ভাল করে দেখবার জন্য গগনবিহারী ফিরে আবার জানলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। চশমা-পরা রোগা-লিকলিকে মানুষ—চাকর নয়, আরদালী নয়—বলেছেন ঠিক ভূদেববাবু, প্রাইভেট মাস্টার না হয়ে যায় না। ওই মাস্টারের কাছে বাড়িতে পড়েছে বোধহয় এতদিন। বড় হয়ে গেছে বলে এবারে ভর্তি করতে নিয়ে আসছে। কী রকম আগলে নিয়ে আসে—অন্য মাস্টারের যেন ছোঁয়াচ লাগতে দেবে না। আরে বাপু, ক'দিন চলবে অমন সামাল-সামাল করে? তোমার তো সন্ধ্যের পরে একটা স্কুল ফেলে যাওয়ার সম্পর্ক—বারোমাসের ঘরবসত এবার থেকে আমাদের সঙ্গে।

গগনবিহারীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেমন যেন দুষ্টগ্রহের নজর লেগেছে। পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চার-চারটে টুইশানি ছেড়ে গেল—দুই ছাত্রের বাপ গভর্নমেণ্ট-অফিসার, ভিন্ন জায়গায় ট্রানসফার হয়ে গেল। একটা ছেলে রক্ত-আমাশয়ে শয্যাশায়ী, কবে উঠে বসে পড়াশুনা করবে ঠিক-ঠিকানা নেই। আর এক গুণধর বাপের বাক্স ভেঙে নিয়ে কোন অজানা মুলুকে পাড়ি দিয়েছে। চারটে গেছে, সে জায়গায় একটাও গাঁথতে পারলেন না এখন অবধি।

চলে গেলেন কালাচাঁদবাবুর কাছে: বাপরে বাপ, ঘোরতর মচ্ছব আপনার এখানটা।

কালাচাঁদ হাসলেন একটু। অজস্র মানুষ আসছে, জমিয়ে কথা বলার ফুরসত নেই। তিনি ঘর জুড়ে ভর্তির কাজকর্ম, চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছেন সর্বত্র।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম।

কালাচাঁদ বুঝেছেন সেটা। অনেক মাস্টারই আসছেন। ক'টা দিনের মাতব্বরি তাঁর, সবাই এসে এসে খোসামুদি করেন। একপাশে সরে এসে কালাচাঁদ বলেন, বলুন—

বাজার কেমন এবারে? এমনি তো ভিড় দেখা যাচ্ছে।

কালাচাঁদ মুখ বেজার করলেন: দূর মশায়! মুখে রক্ত তুলে খাটছি—কিন্তু আসলের বেলা অষ্টরম্ভা। বাজে মক্কেলের ভিড়—কেরানি দোকানদার এইসব। ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে ফ্রি-হাফফ্রি দরখাস্তের ফরম কোথা মিলবে? দূর দূর—পয়সা দিয়ে প্রাইভেট মাস্টার রাখবার লোক এরা!

শুষ্ক মুখে অসহায়ভাবে গগনবিহারী বলেন, তবে কি হবে কালাচাঁদবাবু? সবাই আমরা আপনার দিকে মুখ করে আছি। ভর্তির সময় দুটো-একটা যদি পাইয়ে না দেন সারা বছর কি খেয়ে বাঁচব?

আরে মশায়, আমার কি অসাধ? দিই নি এর আগে? বলুন। দিন দিন বাজার পুড়েজ্বলে যাচ্ছে। তার উপরে ঘরের পাশের ওই প্রাচীশিক্ষালয়—হাল আমলের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে খৈ কোটায় মুখে মুখে, নতুন সাজসরঞ্জাম, কথায় কথায় খাস দ্বারভাঙ্গা-বিল্ডিং অবধি তদ্বির-তদারকের ব্যবস্থা। আর আমাদের হল বনেদি গয়ংগচ্ছ ব্যাপার। মোটরওয়ালা যত গার্জেন যেন জাল ফেলে মোড় থেকে ওরা ধরে নিচ্ছে। কাল টিফিনের সময়টা বেড়াতে বেড়াতে গিয়েছিলাম ওদের ইস্কুলের সামনে। মোটরে মোটরে ছয়লাপ—দেখে তো চক্ষু কপালে উঠে গেল।

গগনবিহারী বললেন, তা হলেও হাত-পা কোলে করে থাকলে হবে না। রুই-কাতলা না হল, ট্যাংরা-পুঁটি কিছু তো তুলতে হবে! কাল থেকে বরঞ্চ আমায় নিয়ে নিন পরীক্ষার কাজে। নিজে একবার বেয়েছেয়ে দেখি। সবে ধন একটা টুইশানিতে ঠেকেছে। একগাদা কাচ্চাবাচ্চা—বড় ঘাবড়ে যাচ্ছি মশায় এবারে।

কালাচাঁদ বিরক্ত হয়ে বলেন, সলিলবাবু, মহিমবাবু আর বনোয়ারিবাবু—তিনজন ওঁরা রয়েছেন। আপনি তার উপরে এসে কি করবেন? জলই নেই একেবারে—শুকনো ডাঙার উপরে ট্যাংরা-পুঁটিই বা কি করে ধরবেন?

অর্থাৎ নিরিবিলি বসে আরও বেশি করে তেল দিতে হবে কালাচাঁদকে।

বনোয়ারি ব্যক্তিটি ঘুঘু এক নম্বরের। নিজের পেটে একহাঁটু খিদে—খিদে মিটিয়ে তবে তো পরের ভাবনা! প্রক্রিয়াটি কেমন চলেছে, দেখবার জন্ম গগন-বিহারী পরীক্ষার ঘরে গেলেন। বনোয়ারি ডাকলেন, আসুন—

সেই যিনি বড় মোটরে চড়ে এলেন, তাঁকে নিয়ে চলছে। চিন্তিত ভাবে ঘাড় নেড়ে বনোয়ারি বলেন, মুশকিল হয়েছে সার আপনার ছেলে ইংরেজিতে একেবারে কাঁচা। কী করে নেওয়া যায় বলুন।

বলেন কি মাস্টারমশায়? ইংরেজীই তো জানে আমার ছেলে। রথতলা একাডেমিতে ইংরেজিতে সেকেণ্ড হয়ে আসছে বরাবর।

ওসব পচা ইস্কুলের নাম করবেন না সার। বাঘ-সিংহ পশু আবার ব্যাঙ-ইঁদুরও পশু। দেখলেন তো চোখের উপর—এইটুকু এক প্যাসেজ ডিকটেশন লিখতে দিলাম, তার মধ্যে পাঁচটা ভুল।

ভদ্রলোক বলেন, মাপে এইটুকু হলে কি হবে! ইটপাটকেল সব ছড়িয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে। বাহাদুর ছেলে, তাই পাঁচটা ভুল। ওর বাপ হলে তো পাঁচ গণ্ডায় পার পেত না। নিয়ে নিন মশায়, ভোগাবেন না। প্রাচী শিক্ষালয়ে এই ক্লাসের একটা সিটও নেই, তারা হলে লুফে নিত।

গলা খাটো করে বললেন, ইস্টার্ন প্রডাক্টস বলে যে কোম্পানি, সেটা আমার। জানেন তো, মলটেড মিল্ক বানাচ্ছি এবারে আমরা। হরলিকসকে বসিয়ে দেব বাজার থেকে। যাবেন না ছুটির পর একদিন বেড়াতে বেড়াতে। আলাপ-সালাপ হবে—দুটো বড় শিশি দিয়ে দেব; খেয়ে দেখবেন।

বনোয়ারি নরম হলেন। বলেন, সে যাক এখন। ভর্তির এই ঝামেলা না কাটলে কোনদিকে তাকাতে পারছি নে। কিন্তু ঐ যা কথা হল, ইংরেজির জন্ম ভাল মাস্টার রাখতে হবে। আপনার ছোট ছেলের কথা তো বলছি নে—এই মাস্টারমশায় রয়েছেন, ইনিই চালিয়ে দেবেন যা-হোক করে। বিপদ বড়টিকে নিয়ে। অন্য সব সাবজেক্ট নিয়ে তত ভাবি নে, এই ইংরেজি—

রাখব ইংরেজির মাস্টার। ভর্তি করে নিন।

বনোয়ারি কাঁচা লোক নন, টুইশানি শিকার করে করে চুল পাকিয়েছেন: কাকে রাখবেন? ঠিক করে ফেলুন এখনই। মানে তাকে দায়িত্ব নিতে হবে—হাফ-ইয়ারলি একজামিনে ইংরেজির নম্বর পঞ্চাশে তুলে দেবেন অন্তত। বাইরের আজেবাজে মানুষের কথার কী দাম! আমাদের হেডমাস্টার বড্ড কড়া এসব ব্যাপারে। দুটো পাঁচটা টাকার সাশ্রয়ের জন্ম আপনারা বাইরের লোক খোঁজেন,

কিন্তু তাঁরা কি পায়েন? আমরা ধরুন, জীবন কাটিয়ে দিলাম এই পড়ানোর কাজে।

সঙ্গের সেই মাস্টারের সামনেই এসব হচ্ছে। বলির পাঁঠার মতো অর্থহীন দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন।

গার্জেন ভদ্রলোক বললেন, বাইরের লোক নয়, আপনাদেরই একজনকে—আপনার নিজের সময় থাকে তো বলুন।

আমার? না, আমার সময় আর কোথায়—

পুলকিত হয়ে বনোয়ারি আমতা-আমতা করছেন: অবিশ্যি সকালবেলার একটাকে ছুটির পর যদি ঠেলে দেওয়া যায়—

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলেন, যা-হোক কিছু করে আপনি ছেলেটার ভার নিন মাস্টারমশায়। নিশ্চিন্ত। বাজে লোকের উপর আর আস্থা করা যায় না।

ষোলআনা প্রসন্ন এখন বনোয়ারি: সত্যি, বড় দায়িত্বের ব্যাপার। এখনই ধরুন লেখাপড়ার ভিত গড়া হবে। ভিতের জন্য চাই সেরা মিস্তিরি। উপরে উঠে গেলে বরঞ্চ মাঝারি লোক দিয়ে একরকম চালানো যায়।

ভদ্রলোক জেদ ধরে বলেন, না, উপরেও আপনি। পর-অপর নয়—নিজের ছেলে, আশা-সুখে বড় ইস্কুলে ভর্তি করতে এনেছি, সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থাই করব তার জন্যে।

সে তো বটেই! ক'টি গার্জেন বোঝেন সেটা! আপনার মতো ক'জন? পান খান মশাই—

বনোয়ারি পকেট থেকে পানের কৌটো বের করলেন। খুট করে একটুকু চাপ দিতেই ডালা উঁচু হয়ে উঠল। দু-খিলি পান এগিয়ে দিলেন। আবার এমনি কায়দায় উপরের ছোট্ট খোপটা খুলে বোঁটার আগায় চুন নিলেন। বলেন চলুন তবে ঐ বারান্দার দিকে। কথাবার্তা মিটে যাক।

গগনবিহারীর চোখ জ্বালা করে। চোখের উপরেই গেঁথে ফেলল একখানা। বারান্দায় খুব চলেছে ওঁদের। কথাবার্তা আর হাসি। হাসির ঢঙে বোঝা যাচ্ছে মক্কেল সত্যি সত্যি শাঁসালো। চেয়ারটা সরিয়ে একেবারে জানলার গায়ে নিলেন। কী বলাবলি হচ্ছে, শোনা যায় যদি।

বনোয়ারি বলছেন, পঁচিশের কমে পড়াই নে আমি। সস্তায় মাস্টার আছে বইকি! কিন্তু সে বনোয়ারি রক্ষিত নয়। বিদ্যেসাধ্যি আর পড়ানো দেখেই লোকে বেশি পয়সা দিয়ে রাখে।

গগনবিহারী মনে মনে বলেন, ওরে আমার বিদ্যেধর রে। পড়াও তুমি কচু। শিখেছ ফেরেব্বাজি আর লম্বা লম্বা বচন।

ভদ্রলোক বলেন, কিছু বিবেচনা করুন মাস্টারমশায়। পাঁচটা টাকা কমিয়ে নিন। কুড়ি।

চিংড়িমাছের দরাদরি করবেন না। সময়ই হচ্ছিস না মোটে। আচ্ছা, আপনি বলছেন—পড়ানোর সময়টা না হয় কিছু বাড়িয়ে দিলাম। দু-ঘন্টা। খুশি তো? থাকা হয় কোথায় মশায়ের?

ভদ্রলোক ঠিকানা বললেন।

যাওয়া-আসা কিন্তু আপনার—

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন, কথার অর্থ ধরতে পারেন না। বনোয়ারি তখন বুঝিয়ে দিচ্ছেন: আপনার বাড়ি পড়াতে যাব, পড়িয়ে ফিরে আসব—ট্রামে গেলেও কতক্ষণ লাগবে ভেবে দেখুন। দশ দুয়োরে খেটে খাই আমরা, সময়ের বড্ড টান। আপনারা বাড়ি করবেন, কেউ মাদাগাস্কারের কেউ হনলুলুতে। এই যাতায়াতের সময়টা পড়ানোর মধ্যে কিন্তু ধরে নেব।

ভদ্রলোক হাত জড়িয়ে ধরেন বনোয়ারির: যাওয়া-আসা আর বই খুলতেই তো পুরো সময় চলে যাবে। পড়ানোই হবে না মোটে। সে হয় না।

শেষ পর্যন্ত মিটমাট হল, যাওয়া ও আসার একটা মাস্টারের একটা গার্জেনের। কথাবার্তা চুকিয়ে ছেলে ভর্তি করে দলটি বিদায় হলেন।

কালাচাঁদ লক্ষ্য করছিলেন এতক্ষণ। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, হয়ে গেল পাকাপাকি?

বনোয়ারি বলেন, সঠিক বলা যাচ্ছে না। খদ্দের চরিয়ে খায় ঘুঘু লোক। কথা অবিশ্যি দিয়ে গেছে। কিন্তু পিছিয়ে যায় অনেকে তো? এসে হয়তো বলবে, ছেলের মা বলছে পুরানো একজন আছেন এখন—

কলকাঠি তো আপনাদের হাতে! পড়া ধরে ঘন্টায় ঘন্টায় বেঞ্চির উপর দাঁড় করাতে থাকলে 'বাপ' 'বাপ' বলে মাস্টার ডাকতে দিশে পাবে না।

কাণ্ডকারখানা দেখে মহিম হতবাক একেবারে। তাঁর প্রতি সহসা সদয় হয়ে কালাচাঁদ বললেন, আপনি কিছু করতে পারছেন না। নতুন মানুষ—ঝোপ বুঝে কোপ মারবার ব্যাপার, দু একদিনে এ বস্তু হয় না। ঘাবড়াবেন না, আমি আছি। আমি করে দেব একটা। ভাল দেখে দেব। অবিশ্যি মতিবাবুর মতন না হতে পারে, তা হলেও হেজিপেজি দেব না। টোপ ফেলে বসে আছি বঁড়শির দিকে চেয়ে, ধরি-ধরি করে ধরছে না। আপনার টুইশানি পাওয়া তো সোজা

মশায়। চৌকশ মাস্টার—একাধারে ইংরেজি বাংলা অঙ্ক। এমন ক'টা মেলে? তার উপরে বি. এ. পাশ। এম. এ. হলে বটে মুশকিল ছিল।

মহিম সরলভাবে প্রশ্ন করেন, এম. এ-র মাইনে বেশি বলেই?

উঁহু। এম. এ এমনই কেউ নিতে চায় না—বেশি মাইনে দিচ্ছে কে? ধরুন ইংরেজিতে এম. এ—গার্জেন ভাবেন, শুধু ইংরেজিটা জানে, অন্য কিছু পড়াবে না। তেমনি অঙ্কের এম. এ শুধু অঙ্কই পড়াবে। আর আপনারা হলেন গোলআলু—ঝালে-ঝোলে-চচ্চড়িতে যেমন খুশি চালানো যায়।

॥ সাত ॥

সাতু ঘোষের সঙ্গে প্রথম যে মেসে উঠেছিলেন, মহিম এখানো সেইখানে। সাতু ঘোষ আলাদা বাড়ি ভাড়া করে ভাল অফিস করেছেন। ভূদেববাবু আর জগদীশ্বরবাবু থাকেন এখানে। প্রাচী শিক্ষালয়েরও দু-জন। কলকাতা শহরের অলিতে গলিতে ইস্কুল। পাকাপোক্ত সরকার-জনিত ইস্কুল; তাছাড়া ব্যবসাদারি ইস্কুল অনেক—কোন কান্ত ব্যক্তি একটা বাড়ি ভাড়া করে সন্ত কলেজফেরত ছোঁড়াদের মাস্টার করে নিয়ে ইস্কুল চালায়। বিয়েথাওয়ার ব্যাপারে বাড়ি ভাড়া দেয় ইস্কুলের ছুটি দিয়ে। ভাল রোজগার এই ইস্কুলের ব্যবসায়ে। এমনি সব ব্যবসায় ইস্কুলের মাস্টারও আছেন দশ-বারোটি। মাস্টার মেম্বার মেসের বারো-আনা। শনিবারে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে ওই পথে একটা-দুটো টুইশানি সেরে মাস্টারমশায়রা দেশে চলে যান, রবিবার সন্ধ্যার পর থেকে আবার ফিরে আসতে থাকেন। সোমবার সকালে টুইশানি আছে। শুধুমাত্র মহিম বাদ। তাঁর বাড়ি কলকাতার কাছাকাছি নয়।

জগদীশ্বরবাবু হেসে বলেন, ঠিকই তো। বাড়ি কাছাকাছি করবার ব্যবস্থাও তো করেন না আপনার মা-জননী। ট্রেন থেকে নেমে হন্তদন্ত হয়ে কেন ছুটতে যাবেন আমাদের মতন? কোন লোভে?

সেদিনের ভর্তির ব্যাপার সাঙ্গ করে ইস্কুল থেকে বেরুতে ঘোর হয়ে গেল। সোজা ছাত্রীর বাড়ী গেলেন মহিম, মেসে যাওয়া হল না। ফিরতে সাড়ে-ন'টা। মাস্টার মানুষের পক্ষে এটা নিতান্তই সন্ধ্যাবেলা। অন্য সকলের টুইশানি সেরে বাসায় ফিরবার অনেক দেরি।

রসুই-ঠাকুর বলল, দু-জন বাবু আপনার খোঁজ করছেন বিকাল থেকে।

আপনি ফিরলেন না দেখে ওঁরাও বেরিয়ে পড়েছিলেন। আবার এসেছেন। সতীশবাবুরা তাস খেলছেন, সেই ঘরে বসে খেলা দেখছেন।

দাঁড়াও, কাপড়টা বদলে নিই। তারপর ডেকো ঠাকুর। উঁহু আমি যাব ওখানে।

হেন ক্ষেত্রে একটিমাত্র অনুমান মনে আসে। টুইশানি নিতে বলবেন ভদ্রলোকেরা। ভর্তির পরীক্ষায় মহিম যাদের বাতিল করেছেন, তাদেরই গার্জেন কেউ হয়তো। টুইশানি আর একটা হলে মন্দ হয় না। সত্যিই দরকার, মা'কে কিছু বেশি করে পাঠানো যায় তাহলে। জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য—মা লিখেছেন সেই কথা। তা বলে টুইশানির ঘুষ খেয়ে আজকের বাতিল ছেলে কাল সুপারিশ করে দেবেন—মরে গেলেও তা হবে না। বনোয়ারি রক্ষিত নন মহিম—স্পষ্ট 'না' বলে দেবেন। অবশ্য অন্য রকমের ছেলেও হতে পারে—আসে অমন দু-একটি। ভূদেব এক কাজ করেছেন—মেসের মধ্যে মাস্টারের সংখ্যা বেশি হওয়ায় আগের 'ইম্পিরিয়াল লজ' বদল করে 'টিচারস লজ' নতুন নাম দিয়েছেন। এক টুকরো টিনের উপর নামটা লিখে পেরেক ঠুকে সেঁটে দিয়েছেন দরজার উপর। অঞ্চলের মধ্যে জানিত হয়ে যাক মাস্টারের মেস এটা। যেমন রাঁধুনে-বামুনের দরকার হলে দ্বারিক সরকার লেনের বস্তিতে লোকে যায়, প্রাইভেট মাস্টারের প্রয়োজনে আসবে লোকে এখানে। চাকরে গার্জেনদের অফিস কামাই করে ইস্কুলে যাওয়ার অসুবিধা, সকালে বা সন্ধ্যায় মেসে এসে তাঁর খোঁজ নিতে পারেন। মাস্টারেরও রকমফের আছে এখানে। নর্মাল-ত্রৈবার্ষিক থেকে এম. এ। পাঁচ টাকা থেকে পঁচিশ টাকার। মাস্টার আছেন প্রাচী শিক্ষালয়ের—যেখান থেকে বছরে দুটো-তিনটে স্কলারশিপ পায়; আবার আছে বিন্ধ্যেশ্বরী হাই ইস্কুলের—যেখান থেকে আশিটা ফাইন্যালে পাঠিয়ে উনআশিটা ফেল হয়ে ফিরে এসেছে। কী রকম চাই, বাছাই করুন।

কাপড়টা বড্ড ময়লা, মহিম তাড়াতাড়ি বদলে নিলেন। শীতকাল বলে গলা-বন্ধ কোট গায়ে—এ বস্তু ময়লা হলে ধরা যায় না। মাথায় জলের থাবড়া দিয়ে চুলটা নরম করে আঁচড়ে নিলেন। ভেক নইলে ভিখ মেলে না। উজবুকের মতন গিয়ে দাঁড়ালে—বিশ-পঁচিশ কি দেবে—এক নজর তাকিয়ে দেখেই বলবে হয়তো দশ টাকা।

সতীশবাবু ঘরে গিয়ে দেখেন, ও হরি! গার্জেন নয়, সহপাঠী হিরণ রায়। হিরণ সঙ্গের প্রবীণ লোকটি পরিচয় দিল: আমার মামা। বলে ঘর খুলেছিস মহিম? তোর ঘরে চল, কথাবার্তা সেখানে।

হিরণের মামাকে মহিম প্রণাম করলেন। অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে হিরণ, খুব ফিটফাট বরাবর। একসঙ্গে দু-জনে বি. এ. পাশ করেছেন। মহিমের জবুথবু গেঁয়ো ভাবের জন্য হিরণ মিশত না তাঁর সঙ্গে ভাল করে। সেই মানুষ খুঁজেপেতে যেসবাড়িতে মামাকে নিয়ে এসে উঠেছে, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না ঠিক।

মাতুল তাকিয়ে তাকিয়ে ঘরখানা দেখছেন: দু-জনে থাকা হয় বুঝি এক ঘরে? আর একজন—ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছেন। তা বেশ। তারকবাবু তোমার বোনের ভাসুর বুঝি—আমাদের অফিসের ক্যাশিয়ার। তাঁর কাছে ঠিকানা পেলাম তোমার। হিরণের সঙ্গে কথায় কথায় জানলাম ক্লাসফ্রেণ্ড তোমরা—একসঙ্গে পড়েছ—বলি, তবে আর তারকবাবুকে টেনে নিয়ে কি হবে, তুই চল আমায় নিয়ে। হিরণ তো তোমার কথায় পঞ্চমুখ। ভাল ছেলে তুমি, অঙ্কে অনার্স পেয়েছ।

হিরণ বলে বাড়াবাড়ি রকমের ভাল। খেলা নয়, আড্ডা নয়—মফস্বল-শহর হলেও সিনেমা ছিল সেখানে—বুঝলেন মামা, যে দিকটা সিনেমা-হল সেই পথ দিয়েই মহিম চলাচল করত না।

মামা হাসতে লাগলেন। বলেন, ছেলে সত্যিই ভাল। আর আমার বেবিটা উল্টো একেবারে। শনি কি রবিবারে সিনেমায় একটিবার যেতেই হবে। ওর মা-ই করেছে। নিজের যাওয়া চাই, মেয়েকেও টেনে নিয়ে যাবে। আমাকেও টানতে চায়—আমি বলি, না বাপু, বিষম নেশা। আমারও নেশা ধরে যাক শেষটা। বেবির মা বলে, তাই তো চাই। নিজে যেচে টিকিট করে আমাদের ডাকাডাকি করবে তখন। নেশার ব্যাপারে—তা সে যেমন নেশাই হোক—একা সুখ পাওয়া যায় না, সাথী ডাকতে হয়। তোমার মামির হল তাই। প্রজাপতির নির্বন্ধে এই সম্বন্ধ যদি লেগে যায়, আচ্ছা জব্দ হবে বেবিটা। বাড়িতে গিয়ে বলব।

হা হা করে আবার একচোট হেসে নিলেন। মহিম অবাক। মাস্টার নয়, জামাইয়ের সন্ধানে নড়বড়ে ঐ তক্তপোশের উপর চেপে বসে আছেন। চাকর পাঠিয়ে তবে তো কিছু খাবার আনিয়ে দেওয়া উচিত।

মাতুল প্রশ্ন করেন, কি করা হয় বাবাজীর?

মাস্টার মানেই বুড়োথুথ্‌ড়ে মানুষের একটা যেন ব্যাপার। বিয়ের সম্পর্কে বলতে লজ্জা হয়। তরুণ বয়স তখন মহিমের; বললেন, এই এটা-ওটা—ছেলে পড়িয়ে থাকি একটা।

প্রাইভেট পড়াও ? সে তো সবাই করে থাকে। লাটসাহেবও পেলে বোধহয় করেন একটা-ছটো।

লিখি-টিখি একটু। কাগজে গল্প বেরিয়েছে।

বলছিল বটে হিরণ। এ বয়সে লেখার বাতিক থাকে কারো কারো। সেটা তো কোন কাজ হল না, শখের ব্যাপার! কাজ হল যাতে ছটো পয়সা ঘরে আসে। সেটার কি ?

অগত্যা মহিমের বলতে হয়, একটা ইস্কুলে ঢুকেছি কিছুদিন।

হিরণ হো-হো করে হেসে ওঠে: কলেজ থেকে পাশ করে ফিরে-ঘুরে আবার ইস্কুলে ?

মাতুলেরও মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল: ইস্কুলমাস্টার তুমি ? আর তারকবাবু বলছিলেন কিনা করপোরেশনের লাইসেন্স-ইনস্পেক্টর।

মহিম সঙ্কোচভরে বলেন, চাকরিটা হওয়ার মতো হয়েছিল। অনেক দিন ঘোরাঘুরি করেছি। তারকবাবু ভেবেছেন, হয়েই গেছে বুঝি। এখনো যে আশা ছেড়েছি তা নয়। যদ্দিন না হচ্ছে, প্রভাত পালিতমশায় বললেন, ততদিন ইস্কুলে যাতায়াত করতে থাক। যা আসে মন্দ কি! তিনিই চেষ্টা করেছেন আমার জন্য।

হিরণ চমকিত হয়ে বলে, কোন্ প্রভাত পালিত ?

তিনিই। রায় বাহাদুর—

তিনি চেষ্টা করলে তো লাইসেন্স ইনস্পেক্টর কোন্ ছার—করপোরেশনের চীপ একজিকিউটিভ অফিসার অবধি করে দিতে পারেন।

মহিম বলেন, সেইজন্যে আশা করছি ভাল কাজ একটা জুটে যাবেই। আমার বাবার কাছে উনি পড়েছেন। বাবাকে বড় শ্রদ্ধা করেন।

মাতুল বলেন, ও, বাবাও বুঝি মাস্টারি করেছেন ? ছ-পুরুষের জাত-মাস্টার তোমরা ? ভাল কাজ, চোচ্চুরি-ফেরেব্বাজি নেই ওতে। ছেলেপুলে নিয়ে কাজ, মনটা বড় সাচ্চা থাকে। বেঁচেবর্তে থাক বাবা। রাত হয়েছে—আচ্ছা, উঠি এবারে।

উঠতে উঠতে বলেন, কোথায় কাজ কর, ইস্কুলের নামটা বল দিকি শুনি।

শতমুখে আশীর্বাদ করে মাতুল উঠলেন। হিরণ পিছনে চলল। মহিম মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন: কেন সঙ্কোচ হল মাস্টারির কথা সোজাসুজি বলতে। জেরার মুখে নিরুপায় হয়েই যেন স্বীকার করে ফেললেন। খারাপ হল কিসে মাস্টারি কাজটা ? কত বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি এই কাজ করে

গেছেন। বিদ্যাসাগর কি—মাস্টার তো সংস্কৃত কলেজের। মহামতি গোখলে কি? কৃষ্ণকিশোর নাগ মশায় কি? সূর্যবাবুও মাস্টার, গ্রাম্য ইস্কুলের এক নগণ্য মাস্টার। 'ভারতে ইংরেজ শাসন' বই পড়ানো শেষ করে বলতেন, এগজামিনের জন্য মুখস্থ কর কিন্তু একবর্ণ বিশ্বাস কোরো না, সমস্ত মিথ্যে। ছাপা বই সম্বন্ধে বন্ধ করে তখন মুখে মুখে আসল ইতিহাস পড়ানো শুরু হত। ননী মজুমদার আই. বি. পুলিশের খুব বড় চাঁই। তিনি বলতেন, দশ-বিশটা ছোকরা ধরে কী ছাই হবে? রক্তবীজের ঝাড়—দশটার জায়গায় একশ'টা জন্মাচ্ছে। শাসন করবে তো ইস্কুলগুলো তুলে দাও আগে। ছেলেপুলে না ধরে সূর্যবাবুর মতো মাস্টারদের ধর।

দশটা-পাঁচটা কলম-পেশা ম্যাকিনন কোম্পানির কেরানি—বিদ্যাদান আর বিদ্যাচর্চার মহিমা ওই মানুষ কি বুঝবেন?

॥ এগার ॥

ইস্কুলের বার্ষিক স্পোর্টস্। কাছাকাছি এক বড় পার্কে ফাইন্যাল হবে, প্রেসিডেন্ট নিজে উপস্থিত হয়ে পারিতোষিক বিতরণ করবেন। তার আগে ইস্কুলের পিছন-উঠোনে হিটস হয়ে যাচ্ছে দু-দিন ধরে। অর্থাৎ প্রাথমিক দৌড়ঝাঁপ হয়ে বেশির ভাগ ছেলে বাতিল করে দিয়ে ফাইন্যালের জন্য বাছাই হয়ে থাকছে গোটাকতক।

চিত্তবাবু বেঁটেখাতায় সকলের ডিউটি ভাগ করে দিয়েছেন। স্টার্টে কারা থাকবেন, বিচারক কে কে, কোন্ শিক্ষক কোথায় দাঁড়িয়ে ডিসিপ্লিন বজায় রাখবেন—তন্নতন্ন করে লেখা। তৃথিরাম ছুটোছুটি করে সকলকে দেখিয়ে সই নিয়ে গেল। কাজ আরম্ভ হলে কিন্তু দেখা গেল, আছেন ছোকরা-শিক্ষকদের মধ্যে ক' ন। বুড়োরা হয় বাড়ি চলে গেছেন, নয়তো তামাক খাবার ঘরে বসে হুঁকো টানছেন আর গুলতানি করছেন, নয়তো ঘুমোচ্ছেন অকাতরে লাইব্রেরি-ঘরে পাখা খুলে দিয়ে। হেডমাস্টার নিজেই তো পাথসাট মারলেন। এমনিতরো অবস্থায় ডি-ডি-ডি'র হাবভাব ও কথাবার্তার ধরন একেবারে বদলে যায়। দাশুকে মাতব্বর ধরে হাসতে হাসতে বলেন, আমায় কি বাদ দিচ্ছ? চিত্তবাবু তো কিছু লেখেননি—তোমরা কি কাজ দেবে বল, কোমরে চাদর বেঁধে লেগে যাই।

এর যা প্রত্যাশিত উত্তর—দাশু কৃতকৃতার্থ হয়ে বলেন, না স্যার, আজ

আপনাকে রোদে পুড়তে দেব না। প্রাইজের জিনিসপত্র যা আসবে, কয়ালীবাবু একটা ফর্দ করেছেন। সেটায় চোখ বুলিয়ে দিন একবার। আপনি যাবেন একেবারে ফাইন্সালের দিন। সকালবেলা রোদ বেশি হবে না, গার্জেনরা আর বাইরের ভদ্রলোকেরা আসবেন, প্রেসিডেন্ট বক্তৃতা করবেন। সেইদিন আপনার কাজ।

ভি-ভি-ভি বলেন, বাঁচালে ভাই। একাউণ্টান্ট আসবে এখনই। তিন মাসের বাকি পড়ে গেছে। তার সঙ্গে বসে যাব এক্ষুনি।

পতাকীচরণ মহিমের সঙ্গে বলতে বলতে নামছেন: ফুটো মাতব্বরি দেখলেন তো দাশুর? আমরা সবাই আছি, সকলের হয়ে বলতে যায় কি জন্যে? ও-ই যেন সব। চারগুণ মাইনে হেডমাস্টারের রোদে পুড়বেন না কেন জিজ্ঞাসা করি? আমরা যদি একঘণ্টা রোদে থাকি, উনি থাকবেন চার ঘণ্টা। উঠোনের ঠিক মাঝখানটায় দাঁড় করিয়ে দাও, টাক ফেটে চৌচির হয়ে যাক। কিন্তু হবার জো নেই, খোশামুদেরা আগে থাকতেই···এক-শ গজি দৌড়ে নাম পড়েছে বাহাত্তরটির! কাণ্ড দেখুন দিকি। চার ব্যাচ করতে হবে অন্তত—খাটিয়ে মারবে।

আকস্মিক স্বর-পরিবর্তনে মহিম তাকিয়ে দেখেন, দাশু পিছনে আসছেন। সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় এসে পতাকীচরণের নজরে পড়েছে।

ভি-ভি-ভি'র তিন ছেলে পড়ে ইস্কুলে। জ্যেষ্ঠজন ফার্স্টক্লাসে উঠেছে, সে এসব দৌড়ঝাঁপের তালে নেই। মওকা পেয়েছে তো সিনেমায় চলে গেছে সহপাঠী তিন-চারটে জুটিয়ে নিয়ে। অন্য দু'টি আছে। কাঙ্গারু-দৌড়ের মধ্যে মেজো সজলের নাম। দুই পা রুমালে একসঙ্গে বেঁধে দেবে, থপথপ করে লাফিয়ে ছুটবে। পতাকীচরণ বিচারকের একজন। চুন ছড়িয়ে মোটা দাগে চিহ্নিত করা আছে, ছুটবে সেই অবধি। থামবার সময় মুখ থুবড়ে পড়তে পারে, বিচারকরা তাই এসে পৌঁছানো মাত্র ধরে ফেলেন ছেলেদের। পতাকীচরণ সজলকে ধরেছেন পাঁচ-সাত হাত দূর থেকে—ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন। আর চেঁচাচ্ছেন—সেকেণ্ড, সেকেণ্ড! অর্থাৎ দ্বিতীয় হয়েছে সে প্রতিযোগিতায়। ছেলেরা কলরব করছে: না সার ওর আগে আরও তো তিনজন ছিল, ও পারেনি। পতাকী হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, পারেনি তো মিছে কথা বলছি?

মহিম খাতায় ফলাফল টুকছেন। পতাকী বলেন, নিয়ে নিন সজলের নাম। ওর আগে যারা ছিল, তাদের পায়ের গিঁঠ খুলে গিয়েছিল। তাদের নাম কাটা। ভাল করে দেখে তবে বলছি।

বিচারক যা বলবেন, তার উপরে কথা নেই। লিখতেই হল মহিমকে। মনটা কিন্তু খুঁতখুঁত করে। এটা মিটল, নতুন আর এক দফায় ব্যবস্থা হচ্ছে। পতাকীচরণকে একপাশে ডেকে নিয়ে মহিম বলেন, আমারও যেন সন্দেহ ঠেকছে। আপনি বিচারক—আপনার উপরে বলার অবশ্য এক্তিয়ার নেই। দেখেছিলেন ঠিক তো—সত্যিই গিঁঠ খোলা ছিল আগের ছোঁড়া তিনটের ?

পতাকীচরণ বিরক্ত মুখে বলেন, দেখেছি বইকি ! না দেখলে রক্ষে আছে ? মাইনে বাড়ার ব্যাপার ঝুলছে সামনের মিটিঙে।

ঘুরে কাজে ব্যস্ত দাশুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলেন, একটা কথা বলে দিই মহিমবাবু। দাশুটা হল এক নম্বরের কোটনা। পুটপুট করে সব কথা হেডমাস্টারকে লাগায়। ওর সামনে কথাবার্তা সামাল হয়ে বলবেন। আমার মশায় ঢাক-ঢাক গুড়গুড় নেই, যা মনে আসে বলে ফেলি। ওই যে তখন শুনে ফেলল, সমস্ত গিয়ে বলবে। আরে বলে করবি কি তুই ? সজলও বাড়ি গিয়ে বলবে আমার কথা। সে হল নিজের ছেলে—তার চেয়ে তোর কথার দাম বেশি হবে ?

এরপর আর আর এক রকমের দৌড় হল। তিন-পায়ের দৌড়—থ্রি-লেগেড রেস। ডি-ডি-ডি'র ছোট ছেলে কাজল তার মধ্যে। কাজলের বাঁ-পায়ে টান—ডি-ডি-ডি'র ছেলে বলে খোঁড়া বলা চলবে না ! দাশু ওদের ক্লাস-টিচার—সে-ই কাজলের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে। হেডমাস্টার বললেন, না হে দাশু, নাম কেটে দাও। কাজল দৌড়বে কি, পড়ে গিয়ে কাণ্ড ঘটাবে একখানা।

দাশু অভয় দেন ওই জন্যেই থ্রি-লেগেড রেসে দিয়েছি সার। জোড়া গেঁথে দৌড়বে—যে পাখানা ইয়ে মতন আছে, সেটা অন্য ছেলের পায়ের সঙ্গে বাঁধা থাকবে। খাসা দৌড়য়—বাতাসের আগে দৌড়চ্ছে, দেখতে পাবেন। সব ছেলে ছুটোছুটি করবে, ও বেচারি একলা মুখ চুন করে বসে থাকবে, সেদিক দিয়েও ভাববেন তো কথাটা !

কিন্তু খোঁড়া পা অপরের সমর্থ পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিয়েও জুত হল না। হেরে গিয়ে হেডমাস্টারের ছেলে মুখ চুন করে থাকবে, সেটা উচিত হয় না। স্টার্ট দিয়ে দাশুও তাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়চ্ছে—বাঃ, বেশ হচ্ছে, দিব্যি হচ্ছে। উৎসাহ দিয়ে চেঁচাচ্ছে শেষটা : জোরে, আরও জোরে, এই তো—আরও আরও জোরে। তাতে কুলায় না তো কণ্ঠুয়ের নিচে হাত ঢুকিয়ে শূন্যের উপর দিয়ে ছুটিয়ে এনে কাজল আর তার জুড়িকে ফার্স্ট করে দিল।

নবীন পণ্ডিতমশায় দোতলা থেকে নামলেন। জনকয়েক টিচার পরম ভক্ত

তাঁর। খবরের কাগজ পড়ে পড়ে তাঁদের বোঝাচ্ছিলেন। পণ্ডিতের নিত্য দিনের কাজ। হেডমাস্টারমহাশয় অবধি মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে শোনেন। কাগজে যা ছাপে, সেটা কিছু নয়। আসল বস্তু আদায় করে নিতে হয় ওই ছাপার ভিতর থেকে। পড়ে গেলেই হয় না। কাগজখানা ভাঁজ করে বগলে নিয়ে বাড়ি চললেন এইবার। নামলেনই যখন, উঠোনটা ঘুরে ডিউটি করে যাচ্ছেন উঁকিঝুঁকি দিয়ে। দাশুকে ডাকছেন : বলিহারি বাবা দাশু। শোন, এদিকে এস। সাক্ষাৎ ভগবান তুমি। পঙ্কু লঙ্ঘয়তে গিরিম্—একেবারে তাই করে ছাড়লে হে?

বেকুব হয়ে গিয়ে দাশু কৈফিয়ত দেন : এই দেখছেন, আর পতাকীবাবুর কাজটা তো দেখলেন না। মাঝখানের তিনটে চারটে ছেলে একেবার শন্টি হয়ে গেল—তারা নেই। সজল সেকেণ্ড হল! পতাকীবাবু বেশি দিন কাজ করছেন আমার চেয়ে, অভিজ্ঞতা বেশি। তাঁরই নিয়ম ধরে চলেছি। মাইনে-বৃদ্ধির মিটিং হবে শোনা যাচ্ছে, হেডমাস্টারের কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট যাবে। এছাড়া কি করা যেতে পারে বলুন তবে।

রেজাল্টের খাতা মহিমের হাতে। হেডমাস্টারের কাছে জমা দিয়ে যেতে হবে এটা। আসন্ন সন্ধ্যা। মাস্টার-ছাত্র কেউ নেই আর এখন। জমাদার ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, ধুলোয় অন্ধকার। হেডমাস্টারই শুধু আছেন তাঁর কামরার ভিতরে। একাউন্টান্টের আসবার কথা, সে আসেনি। এক প্রাণকেষ্ট। পি. কে. পাবলিশিং হাউসের প্রাণকেষ্ট পাল। মাসখানেক ধরে ডাকাডাকি করছেন, এতদিন তার সময় হল। গরজ মুখ করে এসেছে প্রাণকেষ্ট। পা দিয়েই বলে, মডেল ট্রানস্লেশন ফুরিয়ে এল সার। সামান্য আছে। জায়গায় জায়গায় ঢেলে সাজাবেন বলেছিলেন, কপি তৈরী থাকে তো দিয়ে দিন। প্রেসে দিতে হবে। আর দেরি করা যায় না।

প্রাণকেষ্টকে দেখে ডি-ডি-ডি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন, এরপর কিছু ঠাণ্ডা হলেন। এডিশন কাবার হয়ে নতুন এডিশন হওয়ার মানে প্রাপ্তিযোগ কিঞ্চিত। বললেন, ও-কথা পরে। বইয়ের লিস্ট ছাপতে নিয়ে কী কাণ্ড করেছ! এত বড় সাহস তোমার! তারপর থেকে ডেকে ডেকে আর পাওয়া যায় না।

প্রাণকেষ্ট নিরীহ গোবেচারা মুখে বলে, কি করলাম সার?

মাস্টারমশায়রা মিলে যুক্তিপরামর্শ করে পাঠ্য বই ঠিক করে দিলেন, সে সমস্ত বই বাদ দিয়ে অন্য বই ঢুকিয়েছ।

আজ্ঞে না। তাই তো আছে। ছাপার ভুলে একটু-আধটু হেরফের হতে পারে।

একটু-আধটু ? পাঁচ-পাঁচটা বই বদল হয়ে গেছে।

নির্লজ্জ প্রাণকেষ্ট দাঁত বের করে হাসে : হয় ও-রকম স্যর। কম্পোজিটার-গুলোর মাথায় যদি কিছু থাকে ! ক-এর ই-কার অ-এর ঘাড়ের উপর নিয়ে চাপায়।

'সাহিত্য পাঠ' ছিল, সে জায়গায় হয়ে গেছে 'নীতিবোধ'। এসব ছাপবার ভুল ? যে পাঁচটা বই ঢুকেছে, সমস্ত তোমার কোম্পানির।

বাজে কম্পোজিটার দূর করে দেব ছাপাখানা থেকে। আর এমন হবে না।

ডি-ডি-ডি বলেন, খুব হয়েছে, আবার তোমার হাতে পড়ি ! মাস্টারমশায়রা বলছিলেন, এসব বই তো আমরা দিইনি। তখন সেক্রেটারির নাম করে বাঁচি : তিনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন ছাপার মুখে। সেক্রেটারির এ রকম অভ্যাস আছে—লিস্টের বই কেটে দিয়ে খাতিরের বই ঢোকান অনেক সময়। এইসব বলে আপাতত রক্ষে হল। তবু বলা যায় না, কমিটির মুকাবেলায় কখনো যদি কথা উঠে পড়ে, খবর পৌঁছে দেবার মানুষ তো আছে—

ভাল মতো জানেন ডি-ডি-ডি সেই মানুষগুলোকে। সামনে একেবারে ভিজে-বেড়াল, মনে মনে জিলিপির প্যাঁচ। এক নম্বর হলেন কালীপদ কোনার —কমিটিতে আছেন, মেম্বারদের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে, সন্দেহ হলে তিনি বলে ফেলতে পারেন কারো কাছে। আর ঐ দাশু—শুধু হেডমাস্টারের কাছে যাওয়া-আসা নয়, সেক্রেটারির বাড়ি যায়। ও-বাড়ির পুরুতবংশের ছেলে। বিয়ে-শ্রাদ্ধ-অন্নপ্রাশন, লক্ষ্মীপুজো সরস্বতীপুজোয় হামেশাই দাশুর বাপের ডাক পড়ে ! সেই সূত্রে দাশুও যায়—ভিতর-বাড়ি মেয়েমহল অবধি যাতায়াত। কালাচাঁদ চাটুজ্জে সেক্রেটারির ছেলেকে পড়াতে যান ওখানে। নাছোড়বান্দা টিউটর। সে ছেলে প্রাচী শিক্ষালয়ের ছাত্র। সেই ইস্কুলের টিচারও আছেন পড়াবার জন্য। তবু সন্ধ্যার পরে কালাচাঁদ কোমর বেঁধে গিয়ে পড়বেন। ছেলের পড়ার ঘরে ঢুকে বই খুলে নিয়ে বসেন ইস্কুলে এসে লম্বা লম্বা কথা : সেক্রেটারি নিজে নাকি ডেকে বলেছেন, আপনার মতন ইংরেজি কেউ জানে না কালাচাঁদবাবু, মাঝে মাঝে এসে গ্রামারটা বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন ওকে। মাস পুরতে না পুরতে খামের মধ্যে তিনখানা নোট ভরে সেক্রেটারি নিজে নাকি টেবিলের উপর রেখে যান। মিছে কথা, টাকা দেবার লোক বটে সেক্রেটারি ! কোন ধোপাকেও নাকি

কাপড় কাচিয়ে নিয়ে পয়সা দেননি—বলেছিলেন, তোর ছেলেকে ফ্রী করে নেব ভারতী ইস্কুলে। সেই মানুষ আপসে নোট রেখে যাবেন টেবিলে! বি. টি. পাশ করার পর ছেলে ফ্রী পড়িয়ে নানান রকমে সেক্রেটারির তোয়াজ করে কালাচাঁদের কাজ হাসিলের মতলব। আড়ালে আবার হাসিমস্করা করতেও ছাড়েন না। কালা বামুন আর কটা শুদ্দুর—সাংঘাতিক চিজ ওঁরা। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট গঙ্গাপদবাবু অথর্ব হয়ে পড়েছেন, সেই পদটা চান। হয়তো বা আরও উপরে হেডমাস্টারি অবধি নজর। ওই মানুষকে সেজন্য তোয়াজ করে চলতে হয় খানিকটা। করতে হবে আর বোধহয় মহিমকেও। প্রেসিডেন্টের মানুষ যখন। এইসব প্রাইভেট ইস্কুলের হেডমাস্টারি—ইস্কুলের কাজ কতটুকু! না করলেও চলে। বাইরের বারো কর্তার মন জোগাতে প্রাণান্তকর পরিচ্ছেদ।

এইসময় বাইরে থেকে মহিম সাড়া দিলেন, আসব?

কি মহিমবাবু, হয়ে গেল আজকের মতন? আমি দেখুন বসে আছি আপনার জন্যে। এতক্ষণ হিসেব নিয়ে পড়েছিলাম। নেমে গিয়ে একটিবার চোখের দেখা দেখে আসব, সে ফুরসত হল না। রোদে সমস্তদিন আপনারা ভাজা-ভাজা হয়েছেন। দুখিরামটা গেল কোথা রে—তিন কাপ চা এনে দিক। তুমি বুঝি উঠছ প্রাণকেষ্ট? দু-কাপই আসুক তবে। মহিমবাবু, ডেকে বলে দিন তো দুখিরামকে।

মহিম ঢুকতেই প্রাণকেষ্ট উঠে দাঁড়িয়েছিল। অন্য লোক এসে পড়ায় বেঁচে গেল। বলে, ট্রানস্লেশন কত ছাপা যায়—দোকানে একদিন পায়ের ধুলো দেবেন, পরামর্শ করা যাবে।

মহিম বলেন, আজকের হিটসের রেজাল্ট দেখুন স্যার—।

ক্লান্ত স্বরে ডি-ডি-ডি বলেন, ঠিক আছে। আপনারা করে এনেছেন দেখতে হবে কেন? বসুন, একটা পরামর্শ আছে। ফাইন্যালটা এর পরের রবিবারে যদি করা যায়। আপনি তো যান প্রেসিডেন্টের বাড়ি—খোঁজ নিয়ে আসবেন, আঠাশে সকালবেলা কোন এনগেজমেণ্ট আছে কিনা। এরপরে আমি নিজে অবশ্য যাব। কার্ড ছাপা, গার্জেনদের কাছে কার্ড পাঠানো, প্রাইজ কেনাকাটা—হাঙ্গামা অনেক। আগে থাকতে তারিখ পাওয়া দরকার।

চা এসে গেল। চা খেতে খেতে বলছেন, শুনুন, আজ এক ব্যাপার হল এই খানিকক্ষণ আগে। এক ভদ্রলোক এসে আপনার যাবতীয় খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। কদ্দিন আছেন ইস্কুলে, মাইনেপত্তর কত, স্বভাবচরিত্র কেমন, বাড়ির

খবর কম্যুনিস্ট জানি—এইসব। জেরার রকম দেখে মোটেই ভাল লাগল না। ভাসা-ভাসা জবাব দিয়ে বিদেয় করলাম। পলিটিক্স করেন নাকি মশায়, গোপন-দলের সঙ্গে যোগসাজশ আছে? থাকে তো ছেড়েছুড়ে দিয়ে বিয়েথাওয়া করুন, ছেলেপুলে গড়ে তোলবার ব্রত নিয়ে এসেছেন, মনেপ্রাণে লেগে পড়ুন সেই কাজে। আমার কিন্তু মনে হল আই. বি. পুলিশের লোক। আপনার পিছন ধরে আছে।

ভাবতে ভাবতে মহিম মেসে ফিরলেন। আলতাপোল হাই ইস্কুলে পড়তেন ছেলেবয়সে। গাঁয়ের ছেলে, বাইরের খবর কিছু জানতেন না। বাহির বলতে কেশবপুরের গঞ্জ—বাড়ি থেকে ক্রোশ আড়াই দূর। বড় বড় চালানি-নৌকা এসে গঞ্জের ঘাটে কাছি বেঁধে থাকত। পাকা-রাস্তা ধরে ঘোড়ার গাড়ি আসত সদরের বাবুভায়াদের বয়ে নিয়ে। তারপরে মোটরবাস চলতে লাগল। জানা এই অবধি। বয়স বেড়ে আরও দূরের খবর আসতে লাগল ক্রমশ। প্রমোশন পেতে পেতে উপরের ক্লাসে উঠলেন মহিম, সূর্যবাবু সে ক্লাসে পড়াতেন। একটা অধ্যায় পড়িয়ে বই মুড়ে ফেলে বলতেন, সব মিথ্যে, বাজে ধাপ্পা। কর্মভোগ আমাদের, এগজামিনে আসে বলে এই সমস্ত পড়াতে হয়।

ছুটিতে অমুক-দা তমুক-দা সব এসে পড়তেন গাঁয়ে—কলেজের ছাত্র। এসে আত্মোন্নতি-সঙ্ঘ গড়লেন। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর বসা হত সকলে একত্র হয়ে। সৎপ্রসঙ্গ হত। বই পড়া হত। স্বামী বিবেকানন্দ ও সখারাম গণেশ দেউস্করের বই। টডের রাজস্থান, ম্যাট্‌সিনি ও গারিবল্ডির জীবন-কথা। চণ্ডীচরণ সেন ও যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের বই। বিদ্যাভূষণের নামই বোধহয় জানে না শহরের এইসব ছেলেরা। দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মা—অতএব দেহচর্চাও করতে হত আত্মোন্নতির কারণে। শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্। কুস্তি লড়তে হত, ডাম্বেল-মুগুর ভাঁজতে হত। চারু-দা রিভলভার জুটিয়েছিলেন কোত্থেকে—এঁদো পুকুর-পাড়ে কসাড় ভাঁটবনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একদিন বস্তুটা দেখালেন। হাতেও ছুঁতে দিলেন। ঘোড়া টিপলে খুটখুট করে গুলির চেম্বারগুলো ঘুরে যায় কেমন। পকেট থেকে বের করে দেখালেন। ছোট্ট লম্বাটে ধরনের জিনিস। একদিন চারু-দা বললেন, ঘর-সংসার আমাদের জন্য নয়, সারা দেশের মানুষজন নিয়ে আমাদের সংসার। হাজার-লক্ষ মানুষ নিয়ে দেশাত্মা—সকলকে গড়ে তুলতে হবে। আত্মোন্নতির মানেই হল তাই। দরকার হলে প্রাণ দেব তাদের সেবায়। গাঁয়ের ইস্কুলের নিভৃতে সূর্যবাবু পড়াতেন—আর ভারতী ইনস্টিটুশনে আড়ম্বরের পড়ানো কান

পেতে শোন গিয়ে। ইস্কুল নয়, কারখানা একটা। মাস্টার নয়—মিস্ত্রি, কারিগর। হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে কাজ চলছে। দেড়-শ দু-শ ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসেছে প্রতিবার। এ চাকরি মহিমের ভাল লাগে না। প্রায় তো সাতু ঘোষের চাকরির সমান। ছেড়ে দেবেন। নিশ্চয় ছাড়বেন।

॥ বারো ॥

ক'দিন পরে হেডমাস্টার মহিমকে ডেকে বললেন, একি মশায়, আপনি বললেন আঠাশ তারিখে কোন এনগেজমেন্ট নেই। আজ সকালে আমি নিজে গিয়েছিলাম। চন্দননগরে কোন মক্কেলের বাড়ি নেমন্তন্ন সেদিন। আপনি কী দেখে এলেন ?

প্রেসিডেন্টের বাড়ি যাননি মোটে মহিম। গিয়ে তো বসতে হবে—ওয়েটিং-রুমে নয়, বাইরে বারান্দার উপর বেঞ্চি ও বেতের চেয়ার ক'খানা আছে সেই জায়গায়। সাহেবি ঠাটবাটের অমন বাড়িতে ইচ্ছাসুখে কে যেতে চায় ? নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যেন। ভয় করে নিঃশ্বাস নিতে—এই রেঃ, নিঃশ্বাসের হাওয়ার টানে আদব-কায়দার পলেস্তারা বসে গেল বুঝি খানিকটা !

কিন্তু এই মনোভাব ভাঙেন না কারো কাছে। শিক্ষাটা করালীবাবুর কাছ থেকে : পশার ছাড়বেন না মশায়। তাহলে ওরা পেয়ে বসবে। বেঁটেখাতায় সিসার মেরে মেরে চোখে সর্ষেফুল দেখিয়ে দেবে। যান না যান গল্প করবেন খুব। আজ এই কথা হল প্রেসিডেন্টের সঙ্গে, আজ প্রেসিডেন্ট এই জিজ্ঞাসা করলেন ইস্কুলের সম্পর্কে তাহলে দেখবেন, হেডমাস্টার থেকে দুখিরাম অবধি কী রকম খাতির জমাবে আপনার সঙ্গে !

না গিয়েই হেডমাস্টারকে যা হোক একটা আন্দাজে বলে দিয়েছিলেন। বলা যখন হয়েছে, সেই টান ধরে চলতে হবে। হেডমাস্টারের জবাবে মহিম বললেন চন্দননগর ? স্টেনো সতীশবাবু বললেন, আঠাশে ফাঁকা আছে। আমি আরও বললাম, ভাল করে দেখে বলুন, বড় দায়িত্বের কাজ। আলুনি ভাবে বললে হবে না। সরুন, আমি নিজের চোখে দেখি একবার। এনগেজমেন্ট-বই নিজে দেখে এসেছি স্যার, আঠাশে জানুয়ারি গড়ের মাঠের মতন ফাঁকা।

ডি-ডি-ডি বলেন, আমার যেতে দুটো দিন দেরি হয়ে গেল, তার মধ্যেই ভরাট হয়ে গেছে তবে। পরের হপ্তায় চৌঠা ফেব্রুয়ারি ছাড়া তারিখ দিতে পারেন না। তাই পাকা করে এলাম, কি করব।

মহিম বললেন, সাতটা দিন দেরি হয়ে গেল। তাতে ক্ষতি হবে না। গরম পড়ে গেলে মুশকিল ছিল।

ভি-ডি-ভি বলেন, সাতদিন বলে তো নয়। ওর আগের দিন তেসরা মেয়ের বিয়ে আমার। যোগাড়যন্তর বিলিব্যবস্থা সমস্ত একটা মানুষের উপর। আড়াই কামরার ভাড়া-বাড়িতে বিয়ে হতে পারে না, সেজন্যে কোন্নগরে পৈতৃক বাড়ি সকলকে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেখান থেকে যাতায়াত। কাজটা আঠাশে যদি চুকে যেত, ভেবেছিলাম পাঁচ-সাতদিন ছুটি নেব বিয়ের সময়টা। কিন্তু যে রকম দাঁড়াল, বিয়ের দিন তেসরাই হয়তো বা আসতে হয়।

মহিম বলেন, সে কী কথা। আমরা সব রয়েছি। এত ভাবনা করেন কেন?

ভি-ডি-ভি গদগদ হয়ে উঠলেন: ভরসা তো তাই। আপনাদের পেয়েছি ছোট ভাইয়ের মতন। নইলে এ যা চাকরি! বরাত ভাল যে প্রেসিডেণ্ট তেসরা ফেব্রুয়ারি তারিখ দেননি। তাহলে বোধহয় মেয়ের বিয়েয় থাকা হত না। চাকরির চেয়ে তো মেয়ের বিয়ে বড় নয়।

তারপরে মনে পড়ে যায় একটা জরুরি কথা। বললেন হয়ে হয়েছে, মহিমবাবু, প্রেসিডেণ্টের বক্তৃতাটা লিখতে হবে। বললেন, কত শিক্ষক আছেন কাউকে বলে দেবেন? প্রেসিডেণ্টের মুখ দিয়ে বেরুবে, যাকে তাকে দিয়ে সে জিনিষ হয় নাকি? আপনার সেই গল্পটা দেখেছি, খাসা বাংলা আপনার। ইংরেজি হলে তো আমি কলম ধরতাম। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট বলে দিলেন, ওই দিনটা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসে বক্তৃতা করবেন। পাবলিক এইসব চাচ্ছে আজকাল। ইংরেজি বলতে গেলে হয়তো বা হৈ-হৈ করে উঠল: বাংলায়—বাংলায়। যত মুখ্যু নিয়ে কাজকারবার তো! সভা-সমিতির আর কোন ইজ্জত থাকতে দিল না।

করালীকান্ত এসে পড়েছেন ইতিমধ্যে। তিনি টিপ্পনী কাটেন: দেশের কী হাল হচ্ছে সার। বিয়ের মন্তোরও এর পরে বাংলায় পড়তে বলবে। পাবলিক যেটা বোঝে।

দিনকে দিন বাংলা চালু হচ্ছে, এই নিয়ে হাসাহাসি চলল খানিকটা। দুঃখের কারণও বটে! কাজকর্ম কিছু আর হবার জো নেই। বেশি দূরে যেতে হবে কেন—ইস্কুল-কমিটির-মিটিং হয়ে থাকে, সেই ব্যাপারটা ধর না। এঁর আগের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন অত্যন্ত কড়া ধাঁচের মানুষ—নিজের বাড়ি কি করতেন জানা যায় না, কিন্তু বাইরের কাজকর্মে ইংরেজি ছাড়া বলতেন না।

মিটিঙের মধ্যেও নিয়ম ছিল, যত কিছু কথাবার্তা ইংরেজিতে। আধ ঘণ্টার ভিতর দশটা আইটেম খতম হয়ে যেত। নিতান্ত দরকারি কথা ছাড়া কেউ কিছু বলত না—ইংরেজি গ্রামার ভুল করে হাস্যাস্পদ হয়ে যায় পাছে। বাংলা হয়ে এখন ভয়-ভাবনা ঘুচে গেছে। দেদার বলে যাও, দরকার না থাকলেও মাতব্বরি দেখাবার জন্যে বল। একটা আইটেম সারা হতে এখন দুটি ঘণ্টার ধাক্কা। কাজকর্ম হবার জো আছে!

হেডক্লার্ক অমূল্য এমনি সময় এসে ঢুকল। গলার চাদরটা নিজের চেয়ারের উপর ফেলে অর্থাৎ উপস্থিতির পরিচয় রেখে আবার তক্ষুণি নিচে তামাক খাবার ঘরে ছোটে। হেঁটে এসে ক্লান্ত হয়েছে—মউজ করে পুরো একটি ছিলিম টেনে তবে কাজে বসবে। কাজ ঘোড়ার ডিম—সেকেণ্ড-ক্লার্ক ফকিরচাঁদের কাছে কাজের কথা শোন গিয়ে। বড় গলায় হুকুম হাকাম ছাড়া—ওটার কি হল, এটা হয় নি কেন? আর কথায় কথায় সেক্রেটারির দোহাই পেড়ে আসর গরম করা। যখন খুশি আসে, যখন খুশি চলে যায়। মাথার উপরে হেডমাস্টার একজন রয়েছেন তাঁকে একটা মুখের কথা বলে যাওয়ার ভদ্রতা নেই।

চা খাওয়ার অনেকগুলো দল মাস্টারমশায়দের ভিতর। ফকিরচাঁদের পিছনে জনকয়েক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেয়ে যান। পয়সা জমা থাকে ফকিরের কাছে, ঘণ্টা বাজবার মুখে সে চা আনিয়ে রাখে, মাস্টারমশায়রা যেমন যেমন আসেন গেলাসে চা ঢেলে দেয়। ফকিরচাঁদ নাকি-কান্না কাঁদে এঁদের কাছে: অমূল্যবাবু কিছুই করেন না, একলা আমার কাঁধে যত চাপ।

ভূদেব বলেন, খুঁটোর জোরে মেড়া লড়ে। ইস্কুলে একবার করে আসছে, সেই তো ঢের।

কালাচাঁদ বলেন, উঁহু অমূল্য খাটে না একথা কদাচ বোলো না ফকির। অমূল্যর খাটনি অনেক বেশি তোমার চেয়ে। আমি দেখে থাকি। সকাল সন্ধ্যা সেক্রেটারির বাড়ি তিথিকাকের মতো পড়ে থাকা। ইস্কুলের টাইপরাইটার সেক্রেটারি বাড়ি নিয়ে রেখেছেন—সে কি অমনি অমনি? চিঠিপত্তর, আর ওর কী ঘোড়ার ডিমের থীসিস আছে গাদা-গাদা সেই সমস্ত টাইপ করা। তার উপরে হল বা, কাছাকাছি বাজার আছে—এক ছুটে গিয়ে চাট্টি মাছ-তরকারি এনে দেওয়া। আর সেক্রেটারি সেই যখন বাড়ি বানাচ্ছিলেন—ওরে বাবা!

একটা গল্প খুব রসিয়ে করে থাকেন কালাচাঁদ। সেক্রেটারির নতুন বাড়ি হচ্ছে। কালাচাঁদ সেই সময়টা ইস্কুলের চাকরির উমেদার—তাঁর কাছে

দিনরাত হাঁটাহাঁটি করছেন। যখনই যান অমূল্য হাজির। একদিন কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন, এখানেই তো পড়ে থাকেন ইস্কুলে যান কখন আপনি ?

অমূল্য বল, হাঁা, যেতে হয় বই কি ! পয়লা তারিখ, মাইনে নেবার দিন যাই। বলল বড় বেদনার সঙ্গে। যেন মাইনেটা বাড়ি পেঁৗছে না দেওয়ায় বিষম অত্যাচার হচ্ছে তার উপরে।

সেক্রেটারির যত কিছু মন্তব্য অমূল্যের মুখ দিয়ে এসে পেঁৗছয়। তাকে অতএব সমীহ না করে উপায় নেই। চৌঠো ফেব্রুয়ারীর কথা ডি-ডি-ডি কাল নিজে গিয়ে সেক্রেটারির টেবিলে লিখে রেখে এসেছেন। অমূল্যর কাছে খবরটা নিতে হবে। প্রেসিডেন্ট তারিখ দিয়ে দিয়েছেন—সেক্রেটারির আপত্তি না থাকে তো হুড়োহুড়ি এবারে। নিমন্ত্রণ পত্র ছাপতে দিতে হবে আজকেই। করালীবাবু মেডেলের কথা তুললেন : চাঁদিরূপোর হলে প্রত্যেকটা আট-দশ টাকা পড়বে। আবার আট আনা থেকেও আছে। বাজেট বুঝে বলুন এবারে স্যার, কি রকমের ক'টা আনবে।

ডি-ডি-ডি বলেন, বড়-মেজো-সেজো কমিটির সব কর্তা সেদিন আসবেন। ইস্কুল-বাড়িও হয়তো ঘুরে ঘুরে দেখবেন। চারদিক সাফসাফাই থাকে যেন করালীবাবু। আমতলার জঞ্জালের গাদা যেন সরানো হয়। ক'টা ডাল নিচু হয়ে পড়েছে, কেটে দেবেন ওগুলো। ক্লাসের দেওয়ালে আর পায়খানায় ছেলেরা এটা-ওটা লেখে, চুনের পোঁচ টানিয়ে দেবেন তার উপর। ফুলের মালা আর তোড়া যা লাগবে, সে ভার মহিমবাবুর উপর দিন। কবি মানুষ, পছন্দ করে কিনবেন। আর একটা কাজ—আপনি শুনে নিন মহিমবাবু। ফাইন্যালের ছেলেগুলোকে লিস্ট ধরে আগে থাকতে নাম বলে দেবেন। সেদিন সকাল সকাল সকাল তারা ইস্কুলে চলে আসবে। ইস্কুল থেকে একত্র করে নিয়ে পার্কে একটা জায়গায় জমায়েত করবেন। ছড়িয়ে থাকলে কাজকর্মে দেরি হয়ে যায়। আপনি দাশু আর পতাকীবাবু তিনজনের উপর ভার। আর যাকে দরকার মনে করবেন, নিয়ে নেবেন আপনাদের সঙ্গে।

অমূল্য ফিরছে এতক্ষণে তামাক খাওয়া সেরে। ডি-ডি-ডি কাছে ডাকলেন : আমার চিঠি দেখেছেন সেক্রেটারি ? কি বললেন ?

বিরক্ত ভাব কেমন যেন। বললেন, চিঠি লেখালেখি করে হবে না, অনেক পরামর্শ আছে। সন্ধ্যেবেলায় আজ আবার যেতে বলেছেন। বলে তিলাং সময়ক্ষেপ না করে অমূল্য নিজের চেয়ারে চলে গেল।

নিমন্ত্রণ-পত্র কেমন হবে ডি-ডি-ডি তার মুশাবিদা করছিলেন। কলম থামিয়ে ক্ষণকাল গুম হয়ে রইলেন। তারপর মৃদু স্বরে বলেন, বিরক্ত হলে আমি কি করতে পারি? কালকে গিয়ে মশায় দেড় ঘণ্টা বসে থাকার পর শুনলাম রুগি দেখে ফিরলেন। খবর পাঠালাম—বলে, খেতে বসে গিয়েছেন। তারপরে বলে, নতুন রেকর্ড কিনে এনেছেন, খাওয়ার পর গান শুনছেন। সকলে মিলে। আমার ট্রেনের সময় হয়ে যায়—কি করি লিখে রেখে চলে এলাম। এতবড় গবর্নমেণ্ট চলছে লেখালেখির উপর, আমাদের তাতে হবে না—

মহিম সহানুভূতির স্বরে বললেন, বাড়িতে কাজ। এই সময়টা রোজ রোজ গিয়ে বসে থাকা।

রাত পোয়ালে কাল পাত্রপক্ষ পাকা দেখতে আসছে মেয়েকে। বাড়ি থেকে বলে দিয়েছে আজ সকাল সকাল ফিরতে। আর উনি বললেন, চিঠি লেখালেখি করে হবে না—নিজে যেতে হবে। না হলে আর কি করছি! যাব তাই, বদ্যিনাথের মন্দিরের মতো হত্যে দিয়ে পড়ে থাকিগে। মেয়ের পাকা দেখা যেমন হয় হবে।

মহিম অনেকক্ষণ চলে গেছেন। কাজকর্ম অনেকটা বুঝে নিয়ে করালীও উঠছেন। ডি-ডি-ডি বলেন, বসুন না একটু। অনেকগুলো বিল জমে আছে। নিরিবিলি আছি—দুজনে ওইগুলো দেখে পাশ করে রাখা যাক।

করালী কেটে দেন সঙ্গে সঙ্গে: আমি তো রেট দেখে একবার মিলিয়ে দিয়েছি। আর যা দেখবার আপনি দেখুন স্যার।

আবার বলেন, সেক্রেটারি আটটার আগে বাড়ি ফিরবেন মনে হয় না। এতক্ষণ কোথায় বসে থাকেন আপনি একা একা; মুশকিলের কথা হল। মাস্টারমশায়রা টুইশানিতে বেরবেন, খুন হয়ে গেলেও এসময় কাউকে পাবেন না। আমি থাকতে পারতাম। কিন্তু ওই যে বললেন চুনের পোঁচ টেনে দেওয়ালের লেখা ঢেকে দিতে হবে—রাজমিস্তিরির খোঁজে বেরব এখনই। কোঠাকুঠি লেনে না পেলে সেই পার্কসার্কাস অবধি দৌড়তে হবে।

সাড়ে সাতটা। গড়ের মাঠে খুব কষে আজ সান্ধ্যভ্রমণ করেছেন ডি-ডি-ডি। সেখান থেকে সোজা কালীবাড়ী গিয়ে মায়ের দর্শন সারলেন। তারপরে হাঁটতে হাঁটতে এসেছেন সেক্রেটারির বাড়ি অবধি। সময় কিছুতেই কাটতে চায় না, ঘড়ির কাঁটা যেন টিকিয়ে টিকিয়ে চলছে। ঠিক সাড়ে-সাতটার সময় এসে ডি-ডি-ডি বসে পড়লেন অবনীশের-বৈঠকখানায় নয়, সিঁড়ির মুখে দরোয়ান যে

বেঞ্চিখানায় বসে তার উপর। বৈঠকখানায় ঢুকে চুপচাপ বসে থাকেন, আর সেক্রেটারি এদিক দিয়ে বাড়ির ভিতর চলে যান। চাকরবাকরগুলোকে খবর দিতে বললে গা করে না। ভারতী ইনস্টিট্যুশনের সকলকে তারা চিনে রেখেছে, মানুষ বলে ধরে না এঁদের।

আছেন দারোয়ানের বেঞ্চিতে। গেটের কাছাকাছি কতবার গাড়ি থামবার শব্দ হয়, ডি-ডি-ডি উঠে দাঁড়ান। কিছু নয়, রাস্তায় চলতি গাড়ি কি কারণে থেমে গিয়েছিল একটু। আটটা বেজে যাওয়ার খানিক পরে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হল—এসেছেন। ডি-ডি-ডি'কে দেখে বললেন, কী আশ্চর্য এখানে কেন মাস্টারমশায় ? ভিতরে গিয়ে বসুনগে ! যাচ্ছি আমি।

শোনা গেল, খেতে বসেছেন অবনীশ। ডাক্তার মানুষ—স্বাস্থ্যের নিয়ম ষোল আনা মেনে চলেন। খাওয়া সাড়ে-আটটার মধ্যে সারবেনই। যত কাজই থাকুক।

বসে আছেন ডি-ডি-ডি। আজ যখন স্বচক্ষে দেখে গেছেন, খাওয়া অন্তে রেকর্ড বাজাতে বসবেন না। তাই বটে। চাকরের উদয় হল ভিতরের দিক থেকে। ক্ষীণ আলো জ্বলছিল, খুট করে সুইচ টিপে পাঁচ-বাতিওয়ালা ঝাড়টা জ্বেলে দিয়ে চলে গেল। অবনীশ এলেন। নমস্কার বিনিময় হল, কিন্তু বড় গম্ভীর। আলমারির কাছে গিয়ে খুঁজে খুঁজে এক ডাক্তারি বই নিয়ে বসলেন। পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় এসে গিয়েছেন। পড়ছেন। পড়তে পড়তে পাতা উল্টাচ্ছেন।

দেয়াল-ঘড়িতে টকটক করে পেণ্ডুলাম দুলছে। ডি-ডি-ডি ওদিককার একটা চেয়ারে থাণুর মতো বসে। চোখের ঠিক সামনে দেয়াল-ঘড়ির কাঁটা কেঁপে কেঁপে এগিয়ে চলছে। তা সত্ত্বেও নিজের বাঁ-হাত ঘুরিয়ে হাত-ঘড়ি দেখছেন বারবার।

এই বন্ধ করে অবনীশ উঠে দাঁড়ালেন। সাহস করে ডি-ডি-ডি ডাকলেন, স্পোর্টসের কথাটা সার।

হুঁ—বলে সাড়া দিয়ে অবনীশ পুনশ্চ আলমারির ধারে গেলেন। হাতের বইটা যথাস্থানে রেখে এবারে একটা চটিপ বই বের করে নিয়ে চেয়ারে ফিরে এলেন।

ফাঁক পেয়ে ডি-ডি-ডি অনেকগুলো কথা বলে ফেললেন : চৌঠা স্পোর্টসের ফাইন্যাল। প্রেসিডেন্ট তারিখ দিয়েছেন। সার আমায় আসতে বলেছিলেন এই ব্যাপারে।

হচ্ছে—বলে চাউশ বইটা খুলে অবনীশ তার মধ্যে আবার ডুবে গেলেন। সাড়াশব্দ নেই।

মরীয়া হয়ে ডি-ডি-ডি বলেন, আমায় সার কোন্নগর যেতে হবে। সেখান থেকে যাতায়াত। এখানকার বাসা তুলে দিয়েছি।

হুঁ, জানি—বলে আঙুল জিভে ঠেকিয়ে অবনীশ ফসফস করে বইয়ের তিন-চার পাতা উল্টে গেলেন।

আরও অনেকক্ষণ গেল। ডি-ডি-ডি কাতর হয়ে বলেন, শেষ লোকাল বেরিয়ে গেছে। আর দেরি হলে বাসও পাওয়া যাবে না।

অবনীশ নিবিষ্ট একেবারে। ডি-ডি-ডি'র মনে হ'ল ভ্রূ দুটো তাঁর কুঞ্চিত হচ্ছে পাঠের মধ্যে বারংবার ব্যাঘাত ঘটানোর দরুন। কিন্তু নিরুপায় হেডমাস্টারকে তবু বলতে হয়, মেয়ের পাকা-দেখা কাল সকালবেলা। ট্রেন পাব না, হাওড়া থেকে শেষ বাস ছাড়বে ঠিক সাড়ে-ন'টায়। আর পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে যদি উঠতে পারা যায়—

না রাম না গঙ্গা—কোন রকম জবাব নেই ও-তরফের। কানেই পৌঁছল না হয়তো। কি করবেন ডি-ডি-ডি, বসেই আছেন। আর মনে মনে ভারতী ইনষ্টিটুাশনের হেডমাস্টারির চাকরির মাথায় ঝাড়ু মারছেন।

ঘড়িতে ঠিক সাড়ে ন'টা, সেই সময় অবনীশ মুখ তুললেন। ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, কি আশ্চর্য! এত রাত হয়ে গেছে, খেয়াল ছিল না। আপনাকে তো অনেক দূর যেতে হবে। চলে যান আপনি। আজকে আর হল না, কাল আসবেন।

ডি-ডি-ডি আহত কণ্ঠে বলেন, এখন হাওড়া অবধি গিয়ে বাসও পাওয়া যাবে না। সে যা হয় হবে। অনেকক্ষণ বসে আছি, স্পোর্টসের কথাবার্তাগুলো হয়ে গেলে ভাল হয়। কাজে লেগে পড়তে হবে এইবারে তো!

প্রতিবাদের কথায় অবনীশ অসহিষ্ণু হলেন। বলেন, দু-হপ্তা সময় আছে, তাড়াতাড়ি কিসের? একটা শক্ত কেস নিয়ে পড়েছি, সঠিক ডায়োগনেসিস হচ্ছে না, মানুষের জীবন-মরণের ব্যাপার। আজ হবে না, আপনি কাল আসবেন মাস্টারমশায়।

মাঘের ওই অত রাত্রে ছাড়া পেয়ে ডি-ডি-ডি কী বিপাকে পড়লেন, সে জানেন তিনি আর জানেন অন্তর্যামী ভগবান। কিন্তু পরদিন ইস্কুলে গিয়ে দেখা গেল, জানতে কারও বাকি নেই—ইস্কুলময় চাউর হয়ে গেছে। অমূল্য ঠিক সাড়ে দশটায় হাজিরা দিয়েছে আজ। তারই কাণ্ড। দাঁত কিলফিল করে

বলে গেলেন, মাস্টারদের সঙ্গে সে খুব হাসাহাসি করছিল এই নিয়ে। আজকেও নাকি সারকে যেতে হবে। কতবার গিয়ে কাজ মেটে তাই দেখুন। আসল ব্যাপার, এত বড় ইস্কুলের হেডমাস্টারের দিনে রাতে কখন কি দরকার পড়ে— কোন্নগর থেকে এসে কাজ করা সেক্রেটারির গরপছন্দ। পাড়ার মধ্যে আবার সারকে বাড়িভাড়া করতে হবে—তা সে যেমন খরচাই হোক।

সেক্রেটারির বাড়ি যেতে যেতে ডি-ডি-ডি মনে মনে ঠিক করছেন, একটা কথা ওঁকে আজ স্পষ্টাপষ্টি বলতে হবে। আপনি যা করুন আর যা-ই বলুন, অন্য লোকে টের না পায় যেন কিছুতে। জানাজানি হলে কেউ আর মানতে চাইবে না। অতগুলো ছাত্র-শিক্ষক চালিয়ে নিয়ে বেড়ানো অসম্ভব হবে তার পরে।

কিন্তু কোনকিছু বলবার অবকাশ হল না, এক কথায় সেক্রেটারি শেষ করে দিলেন। বললেন, পার্কে ব্যবস্থা করেছেন শুনলাম। ফাঁকা জায়গা—মাথার উপর একটা আচ্ছাদন থাকে যেন। রোদের বেশ চাড় হয়েছে।

এই মাত্র। এই পরামর্শের জন্য ডি-ডি-ডি তিনটে দিন নাজেহাল হলেন। অবনীশ চাটুজ্জের এই স্বভাব। ক্ষমতা আছে সেইটে জাহির করা। কাজকর্ম করা উদ্দেশ্য নয়, বোঝেনও না কিছু। অন্যের অসুবিধা ঘটিয়ে আনন্দ।

॥ তের ॥

বক্তৃতা একটা দাঁড় করিয়েছেন মহিম। নাম হল দেহচর্চা। প্রেসিডেন্টের মুখ দিয়ে বেরবে, যে-সে ব্যাপার নয়। খুব খেটেখুটে লিখেছেন। স্বদেশি দাদাদের কাছে সেইসব পুরানো আলোচনা ও পড়াশুনো বেশ কাজে লেগে গেল। খাসা উৎরেছে লেখাটা। হেডমাস্টারকে দিচ্ছেন, পড়ে কি বলেন তিনি শোনা যাক।

দেখুন দিকি কি রকম হল?

আমার দেখে কি লাভ? আসল মানুষে দেখলেই হবে। না দেখে কি তিনি নিজের নামে চলতে দেবেন?

মহিম বলেন, অতবড় লোকের হাতে যাবার আগে আপনি একবার চোখ বুলিয়ে দিলে নিশ্চিন্ত হতে পারি সার।

বড্ড ব্যস্ত, দেখতে পাচ্ছেন তো! পরে!

ডি-ডি-ডি খপ করে লেখাটা নিয়ে পকেটে ঢোকালেন। করালীবাবুর সঙ্গে কিসের একটা ফর্দ হচ্ছিল তখন। গম্ভীর কণ্ঠে করালী বললেন, ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তে পড়তে হবে, তাড়াহুড়োর মধ্যে হয় না। সার রেখে দিলেন, কাজ সারা হলে পড়ে দেখবেন।

খানিক পরে কাজকর্ম সেরে করালীকান্ত ঘরের বাইরে এলেন। মহিম ঘোরাঘুরি করছেন তখনও— এমন চমৎকার লেখাটা হেডমাস্টারকে পড়ে শোনাতে পারলে তৃপ্তি হত। কল্পনার চোখে দেখতে পান, হেডমাস্টারের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শুনতে শুনতে। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলছেন, ওয়েল ডান ইয়ংম্যান—প্রতিভা আপনি একটি!

করালীবাবুকে বললেন, এইবারে যাওয়া যায় বোধ হয়। কি বলেন?

করালী না বোঝার দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন, কোথায়?

তারপর মহিমকে টেনে নিয়ে চাপা গলায় বললেন, ঘণ্টা, ঘণ্টা! কী শুনবেন উনি, আর কী বুঝবেন! লেখাপড়া জানেন নাকি? পাঁচলাইন ইংরেজি লিখতে তিনটে ভুল। দেশবন্ধুর মৃত্যু হল, ছুটির সার্কুলারে দেশবন্ধুর কোন বিশেষণ দেওয়া যায়—তিলকের মৃত্যুতে সেই কোন কালে সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল, পুরানো খাতা ঘেঁটে ঘেঁটে সার্কুলার খুঁজে বেড়ান। আর আপনার ও-জিনিস তো বাংলা—জন্মে এক পাতাও পড়েন নি বোধ হয়। কমিটিও ঠিক এই রকম চান। পণ্ডিত হেডমাস্টার তো পড়াশুনো নিয়ে থাকবেন, এত বড় ইস্কুল সামলানো তাঁর কর্ম নয়। চাই এখানে দারোগা হেডমাস্টার। ভাল ভাল টিচার রয়েছেন, পড়াবেন তাঁরাই। ওঁর কাজ খবরদারি করা—টিচাররা ফাঁকি না দেয়, ছেলেপুলে হৈ-চৈ না করে। তার পরে সন্ধ্যাবেলা গিয়ে নিয়মিত তেল দিতে হবে সেক্রেটারিকে, ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সঙ্গে উপমা দিতে হবে। না দিতে পারলে বিগড়ে যাবেন। হেডমাস্টার স্কলার হলে ওইসব করতে আত্মসম্মানে বাধবে।

স্পোর্টসের ছেলেরা ব্যবস্থা মতো সকাল সকাল এসেছে। ইস্কুলের হলঘরে মহিম নিয়ে বসিয়েছেন। এদের মধ্যে মলয় চৌধুরী। ফুটফুটে দেবশিশুর মত চেহারা, থোপা থোপা কোঁকড়া চুল, নিষ্পাপ সরল চাউনি! এ শরীরে দৌড়-ঝাঁপ হয় না, মলয় নেইও তার মধ্যে। মহিম তাকে আসতে বলেছেন, প্রেসিডেন্টের গলায় মালা পরিয়ে দেবে এই জন্যে।

কখন সে ইতিমধ্যে উঠে গিয়েছিল। রামকিঙ্কর হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলেন।

হল কি রামকিঙ্করবাবু?

অনেক বিদ্যে শেখাই তো আমরা। পায়খানার দেয়ালের উপর বিদ্যে জাহির করছিল। তামাক খাবার টিকে এনে রাখে, সেই টিকে নিয়েছে একখানা। আমায় দেখে টিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আবার চোখ রাঙায়ঃ আমি নই স্যার, অন্য কে লিখেছে।

করালীবাবু কোন দিকে ছিলেন। দেয়ালে লেখার কথা কানে গিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এলেন: অ্যা, কাল সন্ধ্যেবেলা মিস্তিরি চুনটানা সাদা করে দিয়ে গেল—নচ্ছার ছেলেপুলে চব্বিশ ঘন্টাও দেয়াল সাদা থাকতে দেবে না? বিচ্ছের জাহাজ সব! দুখিরাম কোথায় গেলি রে? চুনের বালতি নিয়ে আয়, আর পোঁচড়াটা। একটান টেনে দিয়ে আসি। দত্তবাড়ির ছেলে হয়ে মিস্তিরিগিরিও কপালে ছিল রে!

দুখিরামকে নিয়ে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফিরলেন। মহিমকে বলেন, আসুন মশায়। একটি বার যেতে হবে। আপনাকে না দেখিয়ে ও-জিনিস মোছা যায় না তো!

বজ্রমুষ্টিতে মলয়ের হাত এঁটে ধরলেন। নরম হাত গুঁড়ো হয়ে যায় বুঝি! মহিম আর্দ্রকণ্ঠে বললেন, অত রাগ করছেন কেন? নতুন লিখতে শিখে ছেলেমানুষে লেখে অমন যেখানে-সেখানে।

করালী বলেন, লেখা বলে লেখা! রীতিমতো সাহিত্য একখানা। আপনি সাহিত্যিক মানুষ কদর বুঝবেন। ফুলের মালা দেবার জন্য একে আনিয়েছেন, মালা এরই গলায় পরিয়ে দিতে হবে।

ইঙ্গিত বুঝে রামকিঙ্কর এবং আর যে দু-তিনটি শিক্ষক ছিলেন, সবাই চললেন দেখতে। লেখা পড়ে মহিমের আপাদমস্তক রি-রি করে জ্বলে ওঠে, বিষম এক চড় কষিয়ে দিলেন মলয়ের গালে। পাঁচ আঙুলের দাগ লাল হয়ে ফুটে উঠল।

রামকিঙ্কর শশব্যস্ত হয়ে কানে কানে বলেন, সামলে মহিমবাবু। বড়লোকের ছেলে মারধোর করবেন না, গার্জেনের চিঠি নিয়ে আসবে।

মহিম গর্জন করে ওঠেন, খুন করে ফেলব ওকে।

বড্ড ভয় পেয়েছে মলয়। ঘাড় নেড়ে সে প্রবল প্রতিবাদ করে: আমি লিখি নি স্যার। লিখেছে অন্য কেউ। আমি জানি নে।

সব ছাত্রই সমান শিক্ষকের চোখে। এ-বস্তু যে ছেলের হাত দিয়েই বেরুক, ক্ষিপ্ত হয়ে যাবার কথা। তবু মহিম একান্তভাবে চাচ্ছেন, মলয় না হয় যেন।

যে ছেলে নতুন এসে তাঁর গায়ে হাত রেখেছিল : ভাল লাগে না স্যার, বাড়ি যাব, মায়ের জন্য প্রাণ পুড়ছে···

মহিম বলেন, দাঁড়া ওই লেখাটার সামনে। দেখব।

যেইমাত্র দাঁড়ানো, ঠাঁই-ঠাঁই করে আরও তিন-চারটে চড়। ঘাড়ে ধরে গেটের বাইরে দিয়ে এলেন। আর গর্জাচ্ছেন : মালা ওকে ছুঁতে দেব না। স্কুল অপবিত্র হয়ে যাবে।

শাস্তির বহর দেখে করালী দয়ার্দ্র হয়ে বলেন, রামকিঙ্করবাবু চোখে ভাল দেখেন না, না-ও হতে পারে ও-ছেলে—

মহিম বললেন, তাই আমি দেয়ালে দাঁড় করিয়ে দেখে নিলাম। অন্যায় করেছে, আবার মিথ্যা বলে ঢাকতে চায়। ও-ছেলে অধঃপাতে গেছে।

শার্লক হোমস দেয়ালের লেখা দেখে বলে দেন, লোকটা লম্বায় কত। দাঁড়িয়ে লিখতে গিয়ে সাধারণভাবে লোকে চোখের সামনে দিয়েই লাইন ধরে। বিলিতি নবেলে পড়া এই পরীক্ষা অনেক ক্ষেত্রে খাটিয়ে দেখেছেন মহিম। মলয়ের বেলাতেও ঠিক ঠিক মিলে গেল।

রামকিঙ্করের দিকে চেয়ে মহিম বলেন, কোন জহ্ন ছাত্র নিয়ে আপনার তো বড্ড দেমাক—

রামকিঙ্কর সগর্বে বলেন, তার নাম সুখময় চক্কত্তি। আমারই হাতে মানুষ। ভর্তি হবার সময় এসেছিল এক নম্বরের হাঁদারাম, সেই মাল শেষ অবধি জহ্ন হয়ে উতরে বেরুল।

করালী রামকিঙ্করের কথাই ঐ সঙ্গে জুড়ে দেন, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া।

মহিম বলেন, কোনকালে কি হয়েছিল জানি নে। সে দিনকাল উল্টে গেছে। এখন আমরা করে থাকি, ঘোড়া পিটিয়ে গাধা। এক বছরে চোখের উপর অন্তত এই একটাকে দেখলাম।

একটুখানি থেমে আবার বলেন, আমার কি মনে হচ্ছে জানেন, মাস্টারি করা পাপের কাজ।

পার্কের একপ্রান্তে রঙিন চাঁদোয়া খাটানো। অবনীশের যেমন নির্দেশ। পিছন দিকে পর্দা, থিয়েটারের সিনের মতন কতকটা। রাজ-সিংহাসনের ধাঁচের একখানা চেয়ার। আশেপাশের চেয়ারগুলোও খারাপ নয়। এই চাঁদোয়ার নিচে প্রেসিডেন্ট ও কমিটি-মেম্বাররা বসবেন। বিশিষ্ট কেউ যদি আসেন, তাঁকেও আহ্বান করে বসানো হবে এখানে। চাঁদোয়ার বাইরে দু-সারি হালকা

চেয়ার, গুণতিতে খান পঞ্চাশেক। নিমন্ত্রিত গার্জেনদের জায়গা। দেড় হাজার চিঠি ছাড়া হয়েছে—কুলাবে না সেটা আগে থাকতেই জানা। লোক-দেখানো —জায়গা করে রাখতে হয়, তাই। না কুলালো তো দাঁড়িয়ে থাকবেন এধারে-ওধারে। দাঁড়াতে না চান, চলে যাবেন। মাথার দিব্যি কে দিয়েছে থাকবার জন্যে?

এই যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর বলা যায় করালীকান্তকে। সাজগোজে আজকে বড্ড বাহার। চুলের ঠিক মাঝখান দিয়ে টেরি চালিয়ে দু-পাশ ফাঁপিয়ে দিয়েছেন। এলবার্ট কাটা বলে এই পদ্ধতি—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী এলবার্ট নাকি এমনি টেড়ি কাটতেন। প্রেসিডেন্টের চেয়ারের সামনে প্রকাণ্ড টেবিলের উপর প্রাইজের জিনিসপত্র সাজানো। করালীবাবু সেই সমস্ত আগলে আছেন। যথাসময়ে মহিম নাম ডেকে যাবেন, আর করালী প্রাইজগুলো চটপট প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দেবেন, তিলেক দেরি না হয়। মহিম ওদিকে স্পোর্টস শেষ হওয়া মাত্র ছেলেগুলোকে ফের এক জায়গায় এনে লাইন সাজিয়ে লিষ্টি সাজিয়ে ফেলবেন। সময় বেশি দিতে পারবেন না প্রেসিডেন্ট, অন্যত্র কাজ আছে। শিক্ষক আরও পাঁচ-সাতজন একদিকে ছুটাছুটি করছেন এমনি নানা কাজকর্মে। বাকি সব মাঠের ডিসিপ্লিন রাখছেন। তার মানে মজা তাঁদের। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মজা করে দৌড়ঝাঁপ দেখবেন।

এর মধ্যে করালীবাবু একবার মহিমকে বললেন, আরে মশায়, আপনার সেই লেখা নিয়ে তো বিস্তর কথাবার্তা—

মহিম পুলকে ডগমগ হয়ে বলেন, কি রকম, কি রকম? কে কি বললেন শুনি।

বলছিলেন নবীন পণ্ডিত। হেডমাস্টার ওঁকে দেখতে দিয়েছিলেন। যা ওঁর স্বভাব—অন্যের কিছু ভাল দেখতে পারেন না। বললেন, ছ্যা-ছ্যা—এই ছেঁদো জিনিস প্রেসিডেন্টের হাতে দেওয়া যায় না। ছিঁড়ে ফেলে দিন।

মুখ কালো করে মহিম বললেন, পড়ে দেখে বললেন এই?

পড়েন কি আর উনি? বিদ্যাসাগর মশায়ের পরে কে কবে বাংলা লিখল যে উনি পড়তে যাবেন! হেডমাস্টারের খাতিরে চোখ বুলিয়েছিলেন হয়তো একটু। বক্তৃতাটা ওঁরই লেখবার কথা। উনি পাকসাট মারলেন বলে আপনার ঘাড়ে এসে পড়ল। তাই বললেন হেডমাস্টার: আপনি করলেন না, মহিমবাবু যা-হোক একটা দাঁড় করিয়েছেন। এর উপরে কিছু দাগরাজি করে আপনি চলনসই করে দিন, প্রেসে পাঠানো যাক। আমিও সাহস দিলাম: প্রেসিডেন্ট

বাংলা স্টাইলের কি জানেন! কোনদিন পড়েছেন ওঁরা বাংলা? যা হাতে দেবেন, সোনা হেন মুখ করে পড়ে যাবেন।

মহিম সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। নবীন পণ্ডিতের দাগরাজিতে কী দশা দাঁড়াল লেখাটার! প্রেসিডেন্ট এসে কতক্ষণে বক্তৃতা করবেন—ছাপা বক্তৃতার প্যাকেট তার আগে খোলা হবে না।

অবশেষে এলেন প্রেসিডেন্ট। সেক্রেটারি অবনীশ ও হেডমাস্টার পার্কের দরজা অবধি ছুটে গিয়ে এগিয়ে আনলেন। করালীবাবু এবং দাশুও ছুটেছেন। এঁরা দু-জন বিষম কাজের মানুষ, ছুটাছুটি ও হাঁকডাকে জাহির করছেন সেটা কর্তাদের সামনে। কী তাজ্জব, যা বলেছিলেন একেবারে ঠিক তাই—ধুতি-পাঞ্জাবি পরা প্রভাত পালিত। স্পোর্টসের চেয়ে এইটেই যেন বড় দর্শনীয় বস্তু, আঙুল দিয়ে এ-ওকে দেখাচ্ছে। কে একজন বলে উঠল, সবে তো কলির সন্ধ্যে। আসছে বারে দেখো খদ্দর পরে মাথায় গান্ধিটুপি জড়িয়ে আসবে এই মানুষ।

গলা শুনে মহিম মুখ ফিরিয়ে তাকালেন মানুষটির দিকে। আবার কে—তারক কর মশায়—ম্যাকলিন কোম্পানির ক্যাশিয়ার, বড় বোন সুধার ভাসুর। তারক-দাদা বলে ডাকেন তাঁকে। থাকেন বেহালার দিকে—এ তল্লাটে নয়। ভারতী ইনস্টিট্যুশনে তাঁর ছেলেপুলে পড়ে না, নিমন্ত্রণ-পত্রও যায় নি। তবু এসে জুটেছেন তিনি, এক চেয়ার দখল করে জাঁকিয়ে বসে আছেন। নিজেই বলছেন, রবিবার গঙ্গার ধারে হাওয়া খাই। ফিরে যাচ্ছি, দৌড়ঝাঁপ দেখে বসে পড়তে হল। আমারও খুব নাম ছিল এক সময়, খুব দৌড়তে পারতাম। তা দেখ, শহরে থেকে ট্রামে-বাসে চড়ে চড়ে শরীরে কিছু পদার্থ থাকে না। হাঁটতেই দম বেরিয়ে যায়, তার দৌড়নো। দূর দূর, এসব নচ্ছার জায়গায় মানুষ থাকে!

ট্রাম-বাসের উপর দোষ দিচ্ছেন, কিন্তু বয়স এদিকে ষাটের কাছাকাছি এল, সে কথা ভাবছেন না তারক-দাদা। মাথায় একগাছি কালো চুল নেই, চোখের নিচে চামড়া ঝুলে পড়েছে। কোন বয়সে দৌড়তে পারতেন—তার পরে কত কত কাল কেটে গেছে, সেটা খেয়াল থাকে না তাঁর।

একটা কিছু বলতে হয়, মহিম তাই বললেন, অনেক দিন আপনার বাসায় যাওয়া হয়নি। একের পর এক এইসব চলছে। আজ রবিবারেও এই দেখছেন। ফুরসত পাই নে।

তারক বলেন, তোমার একটা বিয়ের সম্বন্ধ করছিলাম। তোমার মা খুব করে বলেছিলেন। উচিত বটে! পাশ করেছ, চাকরি হয়েছে—

বলতে বলতে থেমে গিয়ে আবার বললেন, চাকরি না হলে কিন্তু বিয়েটা

ঠিক লেগে যেত। আমাদের এক্সপোর্ট সেকসনের বড়বাবুর সেজো মেয়ে। মেয়েটা ভাল—ইস্কুলে পড়ে ফার্স্ট ক্লাশে। এক্সপোর্টের কাজে ভাল রোজগার —পাওনা-থাওনার দিক দিয়ে ভালই হত। কিন্তু ফেঁসে গেল, ইস্কুল-মাস্টারকে মেয়ে দেবে না।

মহিম বলেন, বিয়ে আমি করব না তারক-দাদা। মা বললে কি হবে। কিন্তু আমার ব্যাপার বলে নয়। শিক্ষক শুনেই বিগড়ে যান কেন, সেইটে জিজ্ঞাসা করি। ছেলে মানুষ করা মহৎ কর্ম! পুণ্য কর্ম। দেশের কাজও বটে।

তারক বলছেন, তোমায় দেখে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। ক'দিন আগে নিজে তোমাদের ইস্কুলে গিয়ে হেডমাস্টারের কাছে খোঁজখবর নিয়ে এসেছেন। ভেবেচিন্তে শেষটা আমায় বললেন, না ভাই, মেয়ে তো শত্রু নয়। উপোস করে শুকিয়ে মরবে, জেনেশুনে সেটা হতে দিই কেমন করে?

মহিম রাগে গরগর করছেন। বলেন, শিক্ষক না হয়ে করপোরেশনের লাইসেন্স-ইনস্পেক্টর—নিদেনপক্ষে মার্চেন্ট-অফিসের বিলক্লার্ক হলেই মেয়ে বোধ হয় রাজ্যসুখ ভোগ করত! আমার কথা হচ্ছে না, আমি তো বিয়ে করবই না। লোকের এমনি ধারণা মাস্টারের সম্পর্কে। বললেন না কেন দাদা, হেডমাস্টারের কাছ থেকে মাইনের কথা শুনে ঘাবড়ে গেলেন, কিন্তু মাস-মাইনের ওই ক'টা টাকা আমরা অন্ধ-খঞ্জকে দান করে আসতে পারি পয়লা তারিখ। মাইনের টাকা ফাউ, আসল রোজগার সকাল-সন্ধ্যায়। একদিন শুনিয়ে দেবেন, ইস্কুলের মাস্টার ও-রকম ফুটো বড়বাবুকে বাজার-সরকার করে পুষতে পারে।

এসবে কান না দিয়ে তারক কতকটা নিজের মনে চু-চু করছেন: বড্ড কাঁচা কাজ হয়ে গেছে। এবারে সম্বন্ধ এলে ঘুণাক্ষরে মাস্টারির কথা বোলো না। বরঞ্চ বোলো, বেকার হয়ে ঘুরছি। তাতেও একটা আশা থাকে। কিন্তু পাত্র মাস্টারি করে শুনলে একেবারে বসে পড়ে মেয়ের বাপ।

জবাব অনেক ছিল, বলতেন মহিম অনেক কথা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়িয়েছেন বক্তৃতার জন্য। কী বিষম জরুরি কাজ, বক্তৃতা সেরে দিয়েই উনি চলে যাবেন। প্রাইজ বিলি করবেন সেক্রেটারি। ছাপা বক্তৃতার প্যাকেট খুলে করালীকান্ত বিতরণের জন্য ছাড়ছেন এবার। মহিম এক গোছা নিয়েছেন। শতেক হাত বাড়ানো নানান দিকে। মাংনা-পাওয়া জিনিস কেউ ছাড়ে না! কিছু না হোক কান চুলকানো যাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাকিয়ে নিয়ে।

বক্তৃতার শেষ দিকে সেই মোক্ষম জায়গাটা। দেহের সঙ্গে চরিত্র চর্চার কথা।

এসে পড়েছে। খুব হাততালি প্রভাত পালিত যখন পড়ছেন। তারক অবশ্যি ঘাড় নেড়ে তারিফ করছেন, না, ভেবেছে সত্যি লোকটা। নতুন কথা বটে! এতদূর কেউ তলিয়ে ভাবে না।

ভাবনাটা বক্তারই বটে! মহিম মুচকি মুচকি হাসেন। ভাবনা নয়, চাক্ষুস অভিজ্ঞতা। যাঁদের মুখের কথা এ সমস্ত—শুধুমাত্র কথা বলেই খালাস নয়, দেহ-মনের অপরূপ সমন্বয়ে বিরাট চরিত্র তাঁরা এক একটি। সেই যে বলে থাকে, বজ্রের চেয়ে কঠিন ফুলের চেয়ে কোমল—একেবারে তাই। কিন্তু খুলে বলা তো চলে না। মহা চরিত্রবান পুরুষ প্রভাত পালিত ভেবে ভেবে এইসব লিখেছেন, জানুক তাই সকলে। হাততালি পড়ুক।

কাজকর্ম চুকে গেল। বক্তৃতা জমেছে ভাল, মহিমের শ্রম সার্থক। কিন্তু তার মধ্যে তারকের কথাগুলো খচখচ করে এক একবার মনে বিঁধছে। মাস্টার না হয়ে বিল-সরকার কিংবা পুরোপুরি বেকার হলেও মেয়েওয়ালার এত বিতৃষ্ণা হত না। শুধু মেয়েওয়ালা কেন—যে-কেউ মাস্টারির কথা শোনে, মুখে ভক্তি-গদগদ ভাব: এমন আর হয় না। মনের ভিতরে করুনা: লেখাপড়া শিখে মরণদশা—আহা বেচারি গো!

বোঝেন সেটা মহিম, যোলআনা অনুভব করেন। হিরণের মামার প্রশ্নে বরাবর তাই পাশ কাটিয়েছেন—টুইশানি করি, গল্পটল্প লিখি। পুরো মাস্টার—জেরার গুঁতোয় শেষটা স্বীকার করতে হল। ফৌজদারি উকিলকে হার মানিয়ে যান বড়বাবুটি। আর নয়, ছেড়ে দেবেন ইস্কুলের চাকরি। ঐ যে 'মাস্টারমশায়' 'মাস্টারমশায় করে পার্কের এদিক-ওদিক থেকে ডাক উঠছিল, মাস্টারমশায়, আমায় একটা কাগজ দিন, ও মাস্টারমশায়—মহিমের কানের ভিতর সিসা ঢেলে দেয় যেন ওই ডাকে। খোঁচা-খোঁচা গোঁফদাড়ি নিরীহ-নির্বিষ কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ একটা নরচিত্র মনে আসে ওই ডাকের সঙ্গে। তাঁর এই বয়সে অবিরত 'মাস্টারমশায়' ডেকে ডেকে জরার পথে ঠেলে দিচ্ছে—'মহিমবাবু' বলে ডাকবে না, যেমন অন্য চাকরকে ডাকে লোকে। মাস্টারি ছাড়বেন, এ-ও এক কারণ তার বটে। চাকরির জন্য উঠে পড়ে লাগতে হবে আবার। স্পোর্টসের দরুন কাল ইস্কুল বন্ধ। সকালের দিকে রমেনকে গিয়ে ধরবেন কোন নতুন খবর আছে কিনা করপোরেশনের।

হেডমাস্টার ডাকলেন, শুনে যাবেন মহিমবাবু। আপনি বক্তৃতা লিখেছেন, তার বড্ড নিন্দে হয়েছে।

মহিম আকাশ থেকে পড়লেন। বলেন, ছেড়ে দিন নবীন পণ্ডিত মশায়ের

কথা। ওঁরা সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার স্টাইল ধরে বসে আছেন। গালভরা কথা না হলে মন ওঠে না। পড়া শেষ হয়ে গেলে বত্রিশ পাটি দাঁতের সবগুলো যদি টিকে রইল তবে আর কি হল!

নবীন পণ্ডিত সরে পড়েছেন, অতএব এ-জায়গায় স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলতে বাধা নেই কোন রকম।

হেডমাস্টার বললেন, পণ্ডিতমশায়ের কথা নয়। নিজে খোদ প্রেসিডেন্টের মুখে। রাগই করে গেলেন: এরকম শয়তানি জিনিস লেখাবেন জানলে আমি নিজে ব্যবস্থা করে নিতাম।

সভয়ে মহিম বলেন, ওর মধ্যে আপত্তিকর কোন কথা—কই, আমি তো কিছু জানি নে।

আপত্তিকর কি একটা দুটো যে মাইক্রোস্কোপে খুঁজে বেড়াতে হবে? রাগে রাগে হেডমাস্টার পকেটের ভিতর থেকে ছাপা অভিভাষণ একখানা বের করলেন। মেলে ধরে মহিমকে দেখান: পাতা ভরে কড়াই-ভাজা ছড়িয়ে রেখেছেন—আর বলছেন, জানেন না কিছু। এই, এই দেখুন 'বজ্রনির্ঘোষ', এই 'উপচিকীর্ষা' এই হলগে 'প্রতিদ্বন্দ্বী', আর এটা কি হল? দেখুন আমিই পেরে উঠছি নে—'অবিমৃষ্যকারিতা'। বাপের বাপ, এক একখানা উচ্চারণ করতে কালঘাম ছুটে যায়। তাই তো প্রেসিডেন্ট বললেন, শয়তানি করে এক একটা শক্ত শব্দ বসিয়ে রেখেছে। যাতে উচ্চারণ আটকে গিয়ে সভার মধ্যে অপদস্থ হই।

মহিম বলেন, কী সর্বনাশ! আমার কথা এর একটাও নয়। নবীন পণ্ডিতমশায়কে দিয়েছিলেন, বিদ্যে জাহির করেছেন তিনি।

হেডমাস্টারও ভাবছেন, তাই হবে। জোলো ভাষা পণ্ডিতমশায় নিরেট করে দিয়েছেন।

মহিম বলেন, আমার মূল লেখা বের করুন। মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বিচার হবে। 'অবিমৃষ্যকারিতা' বানান করতে আমিই তো মুখ থুবড়ে পড়ব। কিচ্ছু জানি নে আমি, কোন দোষে দোষী নই। প্রেসিডেন্টের কাছে মিছিমিছি আমায় বদনামের ভাগী হতে হল।

হেডমাস্টার সরে গেলে করালী খলখল করে হাসলেন: কিছু না ভায়া, চুপ করে থাকুন, আপনার কিছু হয় নি। মরতে মরণ হেডমাস্টারের। আপনার নাম করবেন—উনি সেই পাত্র কি না! নিজে লিখেছেন বলে যশ নিতে গিয়েছিলেন। ইস্কুলে যে যা ভাল করবে—নিজের বুকে থাবা দিয়ে বলবেন,

আমি করেছি। হয়েছে তেমনি এবার। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আমি ছিলাম সেই সময়টা হাসি আর চেপে রাখতে পারি নে।

॥ চোদ্দ ॥

পরদিন সকালবেলা মহিম রমেনের বাসায় গেলেন। করপোরেশনের খবরাখবর নেবেন। লাইসেন্স অফিসার শ্বশুর কি বললে—খালি-টালি হল এদ্দিনে ?

রমেন অবাক হয়ে বলে, অমন সোনার চাকরি পেয়ে গেছ, আবার চাকরির খোঁজখবর কেন! তাই দেখছি, মানুষের লোভের কোন মুড়োদাঁড়ী নেই।

চাকরি তো ইস্কুলের মাস্টারি। সোনার চাকরি বলছ একে ? রমেন বলে কোন ইস্কুল, বল সেটা একবার। কত নামডাক! ওই শুনতেই কেবল। তালপুকুরের ঘটি ডোবে না। মাইনে কত দেয় জান ?

রমেন বলে, মাইনে কি শোনাবে আমায়! এখানকার চাকরির আগে কিছুদিন ইস্কুলে কাজ করে এসেছি। সবাই করে থাকে। সে আবার তেমনি ইস্কুল! তোমার মতন কপাল-জোর ক-জনার—তিরিশ টাকা খাতায় লিখে পনের টাকা নিতে হয় না, পুরো মাইনে একদিন একসঙ্গে হাতে গণে দিচ্ছে। তার উপরে টুইশানির টাকা মাস ভোর চলেছে। আমাদের কি—পয়লা তারিখে পকেট ভরে টাকা নিয়ে এলাম চিনির বলদের মতন। মুদি-গয়লা বসে আছে বাড়িতে, সন্ধ্যের পর ঠিকে-ঝি আর কয়লাওয়ালা এল, রাত না পোহাতে বাড়িওয়ালা। সমস্ত ভাগযোগ করে নিয়ে নিল—সারা মাস তার পরে খালি পকেটে ডন কষে বেড়াও। দুই পয়সার ট্রামে চড়ে অফিস যাব, সে উপায় থাকে না, পায়ে হেঁটে মরতে হয়। ঝাড়ু মারি চাকরির মুখে—তোমার সঙ্গে বদলাবদলি করে নিতে রাজি আছি ভাই।

এ মানুষ কিছু করবে না, বোঝাই যাচ্ছে। খালি বকবকানি। উঠানে কলের ধারে বসে গেঞ্জি আর রুমালে সাবান দিতে দিতে কথা বলছে। উঠে দাঁড়িয়ে চৌবাচ্চায় মগ ডুবিয়ে জল ঢালে এবার মাথায়। এর পর খেতে বসবে। জল ঢালা বন্ধ রেখে রমেন বলে, একটা উপকার কর মহিম সন্ধ্যের একটা টুইশানি জুটিয়ে দাও আমায়। ইস্কুল-মাস্টার না হই, গ্রাজুয়েট তো বটে! টুইশানি বরাবর করেও এসেছি। এখনই পাই নে তোমাদের মাস্টারদের ঠেলায়। রাঘববোয়াল যত—একজনে আট-দশটা করে ধরবে, তোমাদের মুখ ফসকে এলে

ভরে তো হাইকোর্টের লোকের। ঘাঁটি আগলে আছ তোমরা। তা ভাই দয়াধর্ম করে দিও একটা আমার দিকে ছুঁড়ে। চালাতে পারছি নে।

মেসে ফিরেছেন মহিম। কালাচাঁদ ইতিউতি চেয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে পথ চলেছেন।

কী মশায়, কোত্থেকে ?

হেসে কালাচাঁদ বলেন, বলুন না।

তা কেন বলা যাবে না! জিজ্ঞাসা করার বরঞ্চ মানে হয় না। মাস্টার মানুষ বেলা সাড়ে-ন'টায় চলেছেন—নিশ্চয় টুইশানি।

যাচ্ছি টুইশানিতে, না ফেরত আসছি ?

মহিম একটুখানি ইতস্তত করছেন তো কালাচাঁদ উচ্চ-হাসি হেসে উঠলেন: ভেবে বলতে হবে ? না মশায়, বছর ঘুরে গেল কিছু এখনো শিখতে পারলেন না। হাঁটা দেখেই তো বুঝবেন, ফেরত চলেছি এখন। টুইশানিতে যাবার হলে কি কথা বলতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ? সাঁ করে বেরিয়ে যেতাম। খুব পেয়ারের লোক হলে একটা আঙুল তুলতাম মানুষটার দিকে, তার অর্থ যা হয় বুঝুক গে।

মহিম বলেন, আমায় একটা টুইশানি দেবেন বলেছিলেন।

সন্ধানে আছি। ভাল না পেলে দেব না। আপনি তো আর উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে বসে নেই। করবেন একটা-দুটো, বেশ ভাল পেলে তবেই করবেন।

পড়াব আর বাড়িতে থাকব, এমনি যদি পান তো ভাল হয়।

কালাচাঁদ প্রশ্ন করেন, কেন মেসে কি অসুবিধা হচ্ছে ?

ল-কলেজে ভর্তি হব সামনের সেসনে। মেসে হৈ-হুল্লোড়—পড়াশুনো হয় না। সেই জন্যে নিরিবিলি কোন বাড়ি থাকতে চাই।

কালাচাঁদ অবাক হয়ে বলেন, আইন পড়ে উকিল হবার বাসনা ? উকিল হয়ে গাদা-গাদা লোক ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে। মক্কেল শিকারের জন্য গাছতলায় সমস্ত দুপুর তাক করে আছে, দেখে আসুনগে একদিন আলিপুর গিয়ে।

মহিম তিক্ত কণ্ঠে, বলেন, তবু উকিল বলে তাদের। মাস্টারমশায় নয়। মাস্টারি আর করতে চাই নে।

বলতে বলতে বলতে চার রাস্তার মোড়ে এসে পড়েছেন। কালাচাঁদ বলেন,

বাড়ি থাকলে যা খাটিয়ে নেয়। তখন আর টাইম-বাঁধা রইল না তো! আমি ছিলাম এক জায়গায়। বাপ এসে বলবে, মাস্টারমশায় ধোবার হিসাবটা ঠিক দিয়ে দিন। ঝি এসে দেশের বাড়ি চিঠি লেখাতে বসবে। পড়াতে হবে এক ঘণ্টার জায়গায় আড়াই ঘণ্টা। এ সমস্ত তার উপরি।

জগদীশ্বরবাবু পিছন দিক দিয়ে নিঃসাড়ে এসে কালাচাঁদের কাঁধে হাত রাখলেন। বাঁ-হাতে তেলে-ভাজা বেগুনি। বললেন, বেড়ে বানায়। খাবেন? কিন্তু ইচ্ছে হলেও খাই বসে কোন্ জায়গায়? শতেক চক্ষু শত দিকে। আর ঠিক এই সময়টা গুরুভক্তি উথলে ওঠে: নমস্কার স্যার! তেলে-ভাজা দেখুন ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর কোন জুত থাকে না।

কালাচাঁদ বলেন, হয়ে গেল এবেলার মতন?

জগদীশ্বর বলেন, হল আর কোথায়! আমার সেই যে আহ্লাদি ঠাকরুনটি আছে—সন্ধ্যায় সিনেমায় যাবে, নয়তো মাসি-পিসি আসবে। আজকে ভাবলাম; ছুটি আছে তো সকালবেলা ঘুরে আসিগে। মেয়ের মা চটে আগুন: সাত সকালে কেন আসেন? ঘড়িতে তখন ন'টা? বলেন, পলির ওঠার দেরি আছে। ভোরে উঠলে সর্দি ধরবে। বাড়ির বাজার-সরকার আমায় ডেকে বলে, আপনার অত কি মশায়—মাইনে তো আগাম পেয়ে যাচ্ছেন। মাস্টার রাখা বড়লোকের ফ্যাশান, তাই রেখেছে। পড়ানোর জুলুম করলে চাকরি কিন্তু না-ও থাকতে পারে। সরকার মানুষটি বড় ভাল। খানিকটা বসে গল্পগুজব করে ফিরে যাচ্ছি।

হঠাৎ এঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, খবর শুনেছেন তো? ছুটি আমাদের বোধহয় বেড়ে গেল।

কেন, কেন?

ছুটির মতন আনন্দ মাস্টার-ছাত্রের অন্য কিছুতে নয়। দু-জনেই প্রশ্ন করছেন কি হয়েছে, বলুন না খুলে।

প্রেসিডেন্ট নাকি এখন-তখন। হয়তো বা টেঁসেই গেল এতক্ষণে। মাস্টার মলেই পুরো দিন ছুটি দেয়। প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এঁদের বেলা নির্ঘাৎ দুটো দিন। কি বলেন?

জগদীশ্বরের পুলকে মহিম যোগ দিতে পারেন না। উপকারী মানুষ প্রভাত পালিত। ইস্কুলের চাকরি তাঁরই দৌলতে। বলেন, কাল পার্কে এসে সভা করলেন, এর মধ্যে হঠাৎ কি হল?

কেলেঙ্কারি কাণ্ডবাণ্ড মশায়। রেবেকা বলে এক ইহুদি মাগি আছে, সেখানকার ব্যাপার। পালিতের বাড়ি থেকে আসল ঘটনা চাউর হতে দিচ্ছে

না। তারা এটা-ওটা বলছে। আমার ছাত্রীর বাড়ি আর প্রেসিডেন্টের বাড়ি একেবারে পাশাপাশি তো—ওঁরা সব জানেন। সরকার সমস্ত বলল আমায়।

শনিবারে কোর্ট করে প্রভাত পালিত কোথায় নিরুদ্দেশ হতেন, সে রহস্য মহিম এত দিন পরে জানলেন। যেতেন কড়েয়া রোডে রেবেকার বাড়ি। সেখান থেকে কখনো বা হাওড়ার পুল পার হয়ে চন্দননগরে—গঙ্গার ধারে কোন এক বাগানবাড়িতে। বাড়ির ছেলেপুলে লোকজন সবাই জানে; গেঁয়ো মানুষ বলে এতবার যাতায়াত সত্ত্বেও মহিম কিছু জানতেন না। প্রভাতের স্ত্রী অনেকদিন গত হয়েছেন। দিনরাত্রির এই খাটুনি, এত রোজগার, এমন নামডাক। সপ্তাহান্তে একটু বিশ্রাম নেবেন, কেউ কিছু মনে করে না এতে। এইবারে কেবল অনিয়ম ঘটল। এক বড় মামলার ব্যাপারে বাইরে থেকে ব্যারিস্টার এসেছেন, শনিবার রাত্রে তাঁর সঙ্গে কনসালটেশন ছিল। রবিবার সকালে ইস্কুলের স্পোর্টসের হাঙ্গামা। বক্তৃতা সেরেই জরুরি কাজের নাম করে ওই যে ছুটলেন, বোঝা যাচ্ছে, মন ছটফট করছিল তখন রেবেকার জন্য।

ইহুদি মেয়ে রেবেকা। বড়মানুষদের সমাগম সেখানে। দেশের বড় বড় সমস্যার আলোচনা ও সমাধান হয় তার ড্রইংরুমে বসে। রেবেকার ভিতর-ঘরের বন্দোবস্ত আলাদা। সেই বন্দোবস্ত-ক্রমে শনিবারের রাত্রিটা এবং পুরো রবিবার প্রভাত পালিতের। প্রভাত উপস্থিত না থাকলেও তাঁর দিন ফাঁকা থাকবে। সেটা হয়নি। অন্যায় রাখাল দাশের। মামলা এবং তদুপরি সভাসমিতির খবর জেনে নিয়ে রাখাল ঢুকে পড়েছিল। হ্যাঁ, রায়সাহেব রাখাল দাশ, পুলিশের বড়-কর্তাদের একজন। এমনি দু-জনে বড় বন্ধু। মোটা দু-জনে, ভুঁড়ি উভয়ের। কিন্তু ও-জায়গায় খাতির নেই।

বলতে বলতে সরকার লোকটা হি-হি করে হাসে। জগদীশ্বর দুঃখিত হয়ে বলেন, মানুষ মারা যায়, আপনার এরকম হাসি আসে কেমন করে?

সরকার বলে, হাসি কি দেখছেন মাস্টারমশায়, কেউ কিছু না বলে তো মালা কিনে প্রভাত পালিতের গলায় পরিয়ে দিয়ে আসি। লড়নেওয়ালা বটে! যা ঘুসোঘুসি হল দুই বন্ধুর মধ্যে! রাখাল শুনলাম, প্রভাতের সাড়া পেয়ে রেবেকার খাটের নিচে ঢুকে যাচ্ছিল। ভুঁড়িতে বাদ সাধল। ভুঁড়ি থেকে পা অবধি খাটের বাইরে মেজের উপর। জুত পেয়ে প্রভাত বেধড়ক পেটাচ্ছেন। রেবেকা মাঝে পড়ে টেনে হিঁচড়ে রাখালকে বের করে দিল। তখন রাখালও আবার শোধ তুলছে। প্রভাত রাখালের হাত দুটো মুচকে ভেঙে দিয়েছেন। যে হাত দিয়ে বেত মেরে মেরে সে স্বদেশি ভলান্টিয়ারদের পিঠের চামড়া তুলে নিত

আর প্রভাতের, ওই তো শুনলেন, এখন-তখন অবস্থা। মরেন তো শহীদ বলে পুজো করব প্রভাতকে। বাড়ির লোকে ঢাকতে গেলে কি হবে—খবর বাতাসে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। ষাটের উপর বয়স—এতদূর বলবীর্য দেখে ভরসা হয়, আমাদের স্বাধীনতা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

শোনা কথায় অনেক রঙ চড়ানো থাকে। বিকালবেলা মহিম নিজে প্রভাত পালিতের বাড়ি গেলেন। অন্য সময় মানুষজনে গমগম করে। আজকে একটি প্রাণীকেও দেখা যায় না। যেন ছাড়া বাড়ি, গা ছমছম করে। অবশেষে পাঁচুলালকে দেখতে পেলেন। কোথা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি খিঁচিয়ে ওঠেন, কি হে কি দেখতে এসেছ? ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে গেছে। এতক্ষণে পোড়ানো শেষ। যাও।

পরদিন কাগজে বেরল, প্রবীণ ও সুবিখ্যাত উকীল প্রভাতকুমার পালিত সোমবার বেলা একটার সময় অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। বহু দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। দাতা ও পরোপকারী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইস্কুলের সামনে সকাল থেকে ছাত্র-শিক্ষক অনেকের আনাগোনা। প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর জন্য ছুটির সার্কুলার লটকে দিয়েছে কিনা। উদ্যোগী কেউ কেউ ভিতরে ঢুকে বুড়ো দারোয়ানের কাছে জিজ্ঞাসা করে এসেছে। না, সেক্রেটারি বা হেডমাস্টার কেউ কোন খবর পাঠাননি, চুপচাপ আছেন, ইস্কুল বন্ধ হবে কিনা বলবার উপায় নেই। কী আশ্চর্য, খবর জানেন না ওরা—সারা অঞ্চল জুড়ে কাল থেকে রসালো কল্পনা-জল্পনা, ওঁরা দু-জন কানে ছিপি এঁটে বসে আছেন নাকি? মৃত্যুসংবাদ খবরের কাগজেও দিয়েছে। পরশুদিন তাঁকে সভাপতি করে বসিয়ে কত মাতামাতি, মরার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পর্ক শেষ? হয় হোকগে, কিন্তু মানুষটার খাতিরে দুটো-একটা দিন ইস্কুলের ছুটি দেবে তো অন্তত?

সার্কুলার যখন নেই,—খেয়েদেয়ে ইস্কুলে আসতে হল সাড়ে দশটায়। এই শোকগ্রস্ত অবস্থায় ভোগান্তি হয়তো বা সেই চারটে অবধি। লাইব্রেরি-ঘরের সামনে ডি-ডি-ডি গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে। তাঁর মুখ থেকে ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল।

অতবড় মানুষটা গেলেন—শুধু এক সার্কুলার ছুঁড়ে ছুটি দেওয়া যায় না। সবাই এসে পড়েছেন—আজকের দিনটা হিসাবে ধরা হবে না। দু-দিন ছুটি—

কাল আর পরশু। আপনারা যে যার ক্লাসে চলে যান তাড়াতাড়ি। ঘণ্টা পড়বে, ছুটির সময় যেমন পড়ে থাকে—একবার দু-বার তিনবার। একটা করে ক্লাস ছাড়বেন—ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে ছেলেরা বেরবে। শোকের ব্যাপার, টু-শব্দটি না হয়। আর ততক্ষণ প্রেসিডেন্টের গুণপনা বুঝিয়ে বলুনগে ক্লাসের ছেলেদের কাছে।

ভূদেববাবু বললেন, শনিবারেও ছুটি আছে স্যার। খৃষ্টান-পরব। বুধ-বিষ্যুৎ না করে এই ছুটি যদি বিধ্যুৎ আর শুকুরবারে করে দিতেন, একসঙ্গে চারদিন পড়ত। অনেকে বাড়ি যেতে পারতেন।

ডি-ডি-ডি বলেন, সেক্রেটারিকে না বলে আমি পারি নে। তিনিও করবেন না। শোকের ব্যাপার মুলতুবি রাখা যায় কেমন করে?

ক্লাসে যেতে যেতে জগদীশ্বর মহিমকে বলেন, আপনি তো গল্পটল্প লেখেন! বানিয়ে দিন না একটা গল্প!

কিসের গল্প?

প্রেসিডেন্টের গুণপনা ছেলেদের বোঝাতে হবে। হেডমাস্টার বলে দিলেন। কি বোঝাব, বলুন দিকি? রাখাল দাশকে ঠেঙানি দিয়ে আত্মদান করেছেন? ষাট বছর বয়সের মধ্যে এই একটা বোধহয় ভাল কাজ করেছেন উনি। কিন্তু ছেলেদের কাছে রেবেকার বাড়ির কথা বলা ঠিক হবে কি? তাই বলছিলাম, কল্পনায় আপনি কিছু বানিয়ে দিন।

এক-একটা ক্লাস করে ছেলেরা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ইস্কুলের দোর্দণ্ড-প্রতাপ হেডমাস্টার ডি-ডি-ডি সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। বাইরে গিয়ে চেঁচামেচি করছেঃ কী মজা! স্পোর্টসের ছুটি কাল গেছে। আবার এই প্রেসিডেন্টের ছুটি। নিত্যি নিত্যি একটা করে হয় যদি এমনি।

সলিলবাবু সই করে ছাতা তুলে নিয়েছেন, ডি-ডি-ডি বলেন, উহু, আপনারা চলে যাবেন না। অতবড় মানুষ—রীতিকর্ম আছে তো একটা! চলুন সকলে ফার্স্ট-বি ঘরে। ক্ষুদিরাম, মাস্টারমশায়দের ডেকে নিয়ে এস। যে যেখানে আছেন, ফার্স্ট-বি ঘরে চলে আসুন। রেজল্যুশন লেখা আছে, দু-মিনিটে হয়ে যাবে।

করিৎকর্মা লোক ডি-ডি-ডি। বক্তৃতা-টক্তৃতা নয়, তিনি মাত্র দুটো কথা বললেন। প্রেসিডেন্ট কতবড় লোক, সবাই আমরা জানি। পরশুদিন সভাপতি হয়ে বক্তৃতা করলেন, কত নীতি-উপদেশ দিলেন। শোক-প্রস্তাব পাস করে

দিয়ে চলে যান আপনারা। শুক্রবারে আসবেন। মিস্টার পালিতের ছেলেদের কাছে প্রস্তাবটা আমি পাঠিয়ে দেব।

সভাভঙ্গ হল। অনেকেই টুইশানিতে ছুটলেন। ছেলেরা ছুটি পেয়ে বাড়ি যাচ্ছে, তাদের পিছন ধরে গিয়ে চুকিয়ে আসা যাক রাত্রের কাজটা। আরেশি দশ-বারোজন রইলেন, দুপুরের রোদে যাঁরা বেরতে চান না। করালীকান্তকে ধরেছেন: প্রাইজ তো সুভালাভালি মিটে গেল। আপনি কর্মকর্তা—খাওয়ালেন কই? আজকে এমন সুবিধা আছে। ভিড়ও নেই। খাওয়ান।

করালী বলেন, খাওয়াচ্ছি। তার জন্যে কি! দত্তবাড়ির ছেলে—আমার বাপ-পিতামহ খাইয়েই ফতুর। ফতুর হয়ে গিয়ে এখন মাস্টার হয়েছি। এই দুখিরাম, চা এনে দাও মাস্টারমশায়দের। আট আনার চা আর আট আনার বিস্কুট।

সত্যি, অবস্থা পড়ে গেছে—কিন্তু বংশের ধারা যাবে কোথায়? করালীবাবুর মেজাজ আছে। এক কথায় এই ষোল আনা বের করে দিলেন, দৃক্‌পাত করলেন না। কে দেয় এমন!

চা-বিস্কুট এল। মাস্টার, কেরানি ও দরোয়ান-বেয়ারায় উপস্থিত আছেন জন কুড়ি। বিস্কুট একখানা করে হাতে হাতে নিলেন সকলে। আর আধ-ভাঙা মিলে কাপ বেরল চারটে। আর গেলাস ছ'টা। অনেক হয়ে গেল। পুরো এক কাপ নিলে সকলের ভাগে হবে না। আধ কাপ আন্দাজ ঢেলে ঢেলে নিচ্ছেন। খাওয়া হয়ে গেলে কাপ ও গেলাস জলে ধুয়ে অন্যের হাতে দিলেন। দিব্যি জমানো গেল যা হোক এই ছুটির দুপুরটা।

॥ পনের ॥

কালাচাদ মহিমকে টুইশানি দিয়েছেন। খাওয়া-থাকা ছাত্রের বাড়ি। বনেদি গৃহস্থ, এখন ফোঁপরা হয়ে গেছেন। বাড়ির কর্তা পরিমলকে চাকরি করে খেতে হয়। রেলের চাকরি—এমন-কিছু বড় চাকরি মনে হয় না। পৈতৃক অট্টালিকা। মোটা মোটা থাম, নিচের তলায় পুরু দেয়ালের বড় বড় আধ-অন্ধকার ঘর। দিনমানেও আলো জ্বালিয়ে রাখলে ভাল হয়। মহিমকে তারই একটা ঘর দিল। বাড়ির লোকে দোতলায় থাকে। নিচে রান্নাঘর আর খাবার ঘর। পড়ুন না কত পড়তে চান নিরিবিলি একা একা।

ইস্কুলের ছুটির সঙ্গে সঙ্গে ল-কলেজে বেরিয়ে পড়েন মহিম। পৌনে পাঁচটায় ক্লাস। কলেজ থেকে বাড়ি আসেন না, পুরানো টুইশানিটা সেরে একেবারে ফেরেন। সকালবেলা তো এই বাড়িতে। কথা হয়েছিল, বড় ছেলে পাটুকে এক ঘণ্টা পড়াবেন, তার পরে নিজে পড়াশুনো করবেন। কয়েকটা দিন তাই চলল।

একদিন পাটু ছোট ভাই বটুকে সঙ্গে করে নিচে নামল। বলে, মা পাঠিয়ে দিলেন।

কেন?

ওর মাস্টার ক'দিন আসছেন না। অসুখ করেছে। আমাদের ইস্কুলেই সেভেন্থ ক্লাসে পড়ে। কাল ক্লাসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। মা বললেন, আপনার কাছ থেকে পড়াটা জিজ্ঞাসা করে নিয়ে চলে যাবে। এই বটু, তাড়াতাড়ি কর। আমার আবার আছে আজ অনেক।

বুঝে নিল বটু একটি একটি করে সমস্ত পড়া। তারপরেও চলে যায় না। তক্তাপোশে মহিমের বিছানার উপর বসে পড়ল। পড়া তৈরি করে নিচ্ছে ওখানে থেকে। ক্ষণে ক্ষণে উঠে এসে জিজ্ঞাসা করে নেয়। কী বলবেন মহিম—এমন আগ্রহশীল ছাত্রের কাছে কেমন করে মুখ ফেরান? সত্যি তো ব্যবসা নয় এটা! আগেকার দিন শিক্ষক শিক্ষাদান করতেন, আর আহার-আশ্রয় দিতেন ছাত্রদের। এখন পেটের দায়ে পয়সাকড়ি নিতে হয়, আশ্রয়ও নিতে হয় ছাত্রদের বাড়িতে। তা বলে চশমখোর হওয়া যায় না। পড়ে যাক—কী আর হবে!—বটুর মাস্টার যতদিন সুস্থ হয়ে না আসছেন।

আরও বিপদ। বটুর পিঠোপিঠি বোন মায়া—সে-ও দেখি বটুর পিছনে গুটি গুটি পা ফেলে আসছে। কি সমাচার? ওই মাস্টার তারও—বটু আর মায়া দুজনকে এক মাস্টার পড়ান। তিনি আসছেন না; ইস্কুলের দিদিমণি খুব বকাবকি করেছেন কাল। মায়াকেও পড়া বলে দিতে হবে।

মাসখানেক হতে চলল, ওদের মাস্টার আসেন না কী অসুখ রে বাপু! মাস্টারের বাড়ি খোঁজখবর নিয়ে দেখ—চুপিসাড়ে ভাল-মন্দ কিছু হয়ে গেল কিনা।

সমস্ত সকালটা এমনি ভাবে কেটে যায়। ল-কলেজের লেকচার কানে শুনে এলেন—তারপরে বই খুলে একটু যে ঝালিয়ে নেবেন, সে ফুরসৎ মেলে না। মুট-কোর্ট হয় মাঝে মাঝে—বলা যেতে পারে, কলেজের ভিতরে আদালত-আদালত খেলা। সেই আদালতের হাকিম হলেন প্রফেসর। আর ছাত্রদের

মধ্য থেকে কতক বাদী পক্ষের ব্যারিস্টার, কতক বিবাদী পক্ষের। মহিমের উপর ভার হল, আসামির হয়ে লড়তে হবে। ইস্কুল থেকে হন্তদন্ত হয়ে ল-কলেজ এসে সোজা লাইব্রেরিতে ঢুকে ল-রিপোর্ট এনেছেন, যার মধ্যে এই মামলাটা রয়েছে। কিন্তু একটিবার চোখ বুলিয়ে নেবার সময় হল না। ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে। অতিকায় বইটা হাতে নিয়ে মহিম ঢুকলেন। প্রফেসর তাকিয়ে দেখে বললেন, বোসো ওইখানে। রোল-কল হয়ে গেছে, তা হলেও পার্সেণ্টেজ দেব মুট-কোর্টের কাজ কেমন হয় দেখে।

মূল ক্লাস হয়ে যাবার পর মুট-কোর্ট বসল। ফরিয়াদি পক্ষ তাঁদের কথা বললেন, এবারে মহিমের বক্তৃতা। প্রফেসর চোখ বুঁজে শুনছেন, আর মাঝে মাঝে তারিপ করছেন—বাঃ, চমৎকার! বক্তৃতা অন্তে মহিম বসে পড়লে তিনি চোখ খুলে বললেন, আসামী পক্ষের সুশিক্ষিত কৌন্সিল আইনের জটিল তথ্য সুনিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। আসামি ছাড়া পাবে, কোন সন্দেহ নেই। তবে কিনা—

একটুখানি হেসে মহিমের দিকে তাকালেন: এই মামলা অনেক বছর আগে যখন হাইকোর্টে উঠেছিল, বারওয়েল সাহেব অবিকল এমনিভাবে আসামিকে সমর্থন করেছিলেন। মহৎ ব্যক্তিরা একই রকম চিন্তা করেন। এমন কি, বক্তৃতার ভাষাও হুবহু এক—কমা-সেমিকোলনের পার্থক্য নেই।

ক্লাসশুদ্ধ হেসে উঠল। প্রফেসরটি চতুর। ডেস্কের উপর ল-রিপোর্ট বইটা খুলে রেখে মহিম বক্তৃতা চালাচ্ছিলেন, চোখ বুঁজে থেকেও তিনি সমস্ত জানেন। কিন্তু উপায় কি? দিন রাত্রির নিরেট ঘণ্টাগুলোর মধ্যে এক মিনিটের ফাঁক পাওয়া যায় না। দেখা যাক, পূজোর ছুটি তো সামনে। সেই সময়টা কিছু পড়াশুনো করে নেবেন।

কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করেন, পড়াশুনো কেমন চলছে মহিমবাবু?

আরে মশায়, পড়িয়েই কূল পাচ্ছি নে, নিজে পড়ি কখন? রক্তবীজের ঝাড়? দিন-কে-দিন বেড়েই যাচ্ছে। ভাই-বোনে মোটমাট কতগুলো, ঠিকঠাক একদিন জেনে নিতে হবে।

কালাচাঁদ বলেন, বলেছিলাম না গোড়ায়? আপনারা সকলে মতিবাবুর কথা তোলেন। আরে মশায়, টুইশানি পাওয়ার ভাগ্য। মতিবাবুর মতন রাজসিক টুইশানি ক'জনের ভাগ্যে ঘটে থাকে!

ওই মায়ার সঙ্গেও বিপদের শেষ নয়। ক'দিন পরে আবার একটি মায়ার পিছন ধরে আসে। নন্তু।

মায়া বলে, বড্ড জ্বালাতন করে নন্তুটা, কাজকর্ম করতে দেয় না। মা তাই বলে দিলেন, বসে থাকবে এখানে চুপচাপ। বই এনেছিস কইরে নন্তু।

হেসে বলে, অ-আ পড়ে। এক-আধবার দেখিয়ে দেবেন, তাতেই হবে। মা বলে দিলেন।

রীতিমতো এক পাঠশালা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধৈর্য থাকে না। বলেন, আর ক'টি আছে বল দিকি ?

মুখের দিকে চোখ তুলে চেয়ে মায়া বলল, ভাই-বোন ক'টি আমরা, জিজ্ঞাসা করছেন মাস্টারমশায় ?

তাই বল।

এই তো, চারজনে পড়তে আসি। এরপরে অন্তু আর ছায়া আছে।

সে দুটি আসবে কবে থেকে ?

মায়া খিল খিল করে হেসে উঠল : তারা কেমন করে আসবে মাস্টারমশায় ? ছায়া আট মাসের—কথাই ফোটেনি। আর অন্তু এই সবে হাঁটতে শিখেছে।

মহিম তিক্ত কণ্ঠে বলেন, ব্যস ব্যস ! হাঁটতে শিখেছে যখন হেঁটে হেঁটে চলে এলেই তো পারে।

বাড়ির লাগোয়া এঁদেরই এক শরিকের বাড়ি। মহিমের ঘরের পূবদিকে গলি—সেই গলির পথে তাঁদের যাতায়াত। একদিন যথারীতি সমারোহের সঙ্গে পড়ানো চলেছে। গঙ্গাস্নানের ফেরত বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা ভিজা কাপড় সপসপ করতে করতে ঘরে এসে ঢুকলেন। ছেলেমেয়েরা জ্যাঠাইমা জ্যাঠাইমা করে উঠল।

মহিলা মধুর হেসে বললেন, আমি জ্যাঠাইমা এদের। আমার দেওরের বাড়ি এটা। গঙ্গায় যাই আমি—জানলা দিয়ে তোমায় দেখতে পাই বাবা। বড্ড যত্ন করে পড়াও তুমি, আমার খুব ভাল লাগে। রোজ ভাবি, গিয়ে কথাবার্তা বলে আসি ; আবার ভাবি, কী মনে করবে হয়তো। আমাদের সংসারে সব পুরানো রেওয়াজ—আজকালকার মতন নয়। মেয়েরা বাইরের কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। শেষটা আমি সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দিলাম। আমার ছেলে মধুসূদনের বয়স হবে তোমার। ছেলের সঙ্গে মা কেন কথা বলবে না ? তাই এসেছি বাবা।

মহিম বলেন, সে তো সত্যি কথা। এবং উঠে গিয়ে পায়ের গোড়ায় টিপ

কষে প্রণাম করলেন। ধবধবে গায়ের রং, যেন অন্নপূর্ণা ঠাকরুণ। বনেদি বাড়ির ছাপ সর্বাঙ্গে।

এইবারে আসল কথা পাড়লেন তিনি: আমার মেয়ে মঞ্জুরাণীকে তুমি পড়াও! বড্ড ভাল পড়ানো তোমার! মাস্টার পড়াত—যেমন বজ্জাত, তেমনি ফাঁকিবাজ। সেটাকে দূর করে দিয়েছি। মেয়ে ম্যাট্রিক দেবে এইবার।

ম্যাট্রিক দিচ্ছে সেই মেয়ে পড়বে তাঁর মতন ছোকরা-বয়সি একজনের কাছে! অস্বস্তি লাগে মহিমের। বললেন, সময়তো নেই। এই দেখুন, সকালবেলাটা যায় এদের নিয়ে। সন্ধ্যায় ল-কলেজে যাই।

জ্যাঠাইমা বলেন, আমার ছেলেও ল-কলেজে গিয়েছিল কিছুদিন। সে তো বেশি সময়ের ব্যাপার নয়। কলেজের পরে কি কর তুমি?

বলবার ইচ্ছা ছিল না যে বাইরে আরও টুইশানি করে বেড়ান। কিন্তু কথার বঁড়শি দিয়ে যেন টেনে বের করলেন জ্যাঠাইমা। বললেন, সেইটে ছেড়ে দিয়ে আমার মঞ্জুরাণীকে পড়াও। ছুটোছুটি করে বেড়াতে হবে না, একটা জায়গায় হয়ে গেল! গলির মধ্যে এই বাড়ির লাগোয়া।

মহিম বললেন, অনেকদিনের পুরানো ঘর কিনা, তাই ভাবছি পূজো তো এসে গেল। নিজের পড়াশুনোর জন্য থাকতে হবে কলকাতায়। ছুটির মধ্যে দুপুরবেলার দিকে সাহায্য করতে পারি। ছাড়া না ছাড়া ছুটির পর ভাবা যাবে।

জ্যাঠাইমা বললেন, এরা সব বাইরে যাবে পূজোয়। পরিমল রেলের পাশ পায় কিনা, পূজোর সময় কলকাতায় থাকে না। কোথাও না কোথাও যাবেই!

পাটু বলে উঠল, চুনারে যাচ্ছি এবার আমরা। শেরশা'র ফোর্ট আছে গঙ্গার উপর। আপনি চলুন না মাস্টারমশায়। বড় সুন্দর জায়গা, বাবা বলছিলেন।

লোভ হয় বটে! নিজে খরচা করে দেশ-বিদেশ যাওয়া কোনদিন হয়তো হবে না। দোমনা হলেন মহিম: অনেক পড়াশুনা রয়েছে। সময় পাই নে, ছুটিতে পড়ব বলে ভেবে রেখেছি। বাইরে গিয়ে তো হৈ-হুল্লোড়—পড়াশুনো ঘটে উঠবে কি? তা দেখ তোমাদের মা-বাবাকে বলে। তাঁরা কি বলেন—

ছাত্র-ছাত্রী পুরো এক গণ্ডা, কেউ-না-কেউ বলে থাকবে মায়ের কাছে। ক'দিন পরের কথা। পরিমল ভাত খেতে বসেছেন। মহিম কলঘর থেকে শুনতে পাচ্ছেন কর্তা-গিন্নির কথাবার্তা। গিন্নি বললেন, নিয়ে গেলে হত

মাস্টারকে। ছেলে-মেয়ে এই চার হপ্তা বইপত্তর ছোঁবেও না দেখো। ইস্কুল খোলার পরেই এগজামিন।

পরিমল বলেন, ক্ষেপেছ! বিদেশ জায়গা—একটা মানুষ টেনে নিয়ে যাওয়ার খরচ কত! ঝিটা শুধু যাবে। একজন ঠিকে-ঠাকুর আর এক ঠিকে-মাস্টার দেখে নেব ওই ক'দিনের জন্যে।

কলের জল অঝোর ধারে মাথায় ঢেলেও মহিমের মনের উত্তেজনা কাটে না। পায়ে ধরে সাধলেও যাবেন না ওদের সঙ্গে। ছি-ছি, রসুই ঠাকুর আর তাঁর একসঙ্গে নাম করল! মানুষের এমনি মনোভাব মাস্টারের সম্বন্ধে! টাকা দেয় না মাস্টারকে—কিন্তু তার চেয়েও বড় দুঃখ, কণিকা প্রমাণ সম্মানও দেয় না। ওকালতি পাশের যেদিন খবর বেরবে, মাস্টারিতে ইস্তফা সঙ্গে সঙ্গে।

মহালয়ার আগের দিন সন্ধ্যেবেলা পরিমলরা রওনা হয়ে গেলেন। বাড়ি ফাঁকা। ঠাকুরকে ছুটি দিয়ে গেছেন; শুধু পুরানো চাকরটা আছে। কোন গতিকে সে নিজের মতন দুটো চাল ফুটিয়ে নেয়। মহিম মেসে গিয়ে খেয়ে আসেন দুবেলা। আইনের বই-টই খুলে নিয়েছেন।

জ্যাঠাইমা পরের দিনই এসে পড়লেন: কই বাবা? কথা দিয়েছিলে যে!

মহিম বলেন, এ-বাড়ির এরা নেই যখন, সকালবেলাই একবার গিয়ে পড়িয়ে আসব। কাল থেকে যাব!

কাল কেন বাবা? এখনই চল না আমার সঙ্গে। পড়া-টড়া নয় আজকে, আলাপ করে আসবে। অফিসের ছুটি, আমার ছেলে মধুও বাড়ি আছে।

গেলেন মহিম। জ্যাঠাইমা তাঁকে একবারে দোতলায় নিয়ে তুললেন! পরিমলের বাড়ি এত দিনের মধ্যে কেউ তাঁকে দোতলায় ডাকেনি। ছবি সোফা ফুলদানিতে সাজানো চমৎকার ঘর। ছুটির দিন হলেও মধুসূদন বাড়ি থাকে না, ছিপ-বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে যায়। জ্যাঠাইমা হেসে বলেন, কী নেশা রে বাপু! সমস্তটা দিন রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে সন্ধ্যেবেলা খালি হাতে ফিরে আসা।

মধুসূদন বলে, মিছে কথা বোলো না মা মাস্টারমশায়ের কাছে। মাছ আনিনি কোনদিন?

আনবে না কেন, বাজার থেকে কিনে এনেছিলে। আমরা টের পাই নে বুঝি!

হাত গণে তুমি সব টের পাও মা—

হাত গণতে হবে কেন? বরফ-দেওয়া চালানি মাছ পুকুর থেকে তোমার ছিপে উঠে আসে—কানকো উঁচু করলেই তো টের পাওয়া যায়।

বেশি কথা বলার সময় নেই এখন মধুসূদনের। হাসতে হাসতে সে বেরিয়ে

গেল। বেশ সংসার! মায়ে ছেলের হাসাহাসি হল কেমন বয়বয়সির মতো।
কিন্তু মাস্টারমশায় বলল মহিমের সম্বন্ধে, এইটে বড় বিশ্রী। চেহারায় সত্যি কী মাস্টারের ছাপ পড়ে গেছে এই বয়সে? তাঁর যেন আলাদা কোন নাম নেই —মাস্টার, মাস্টার, মাস্টার (খাঁটি কলকাত্তাই কেউ কেউ আবার উচ্চারণ করেন, ম্যাস্টার)! শুনলে গা বমি-বমি করে।

ওদিকে মেয়েকে ডাকছেন জ্যাঠাইমা: মঞ্জু আসছিস নে কেন? কী লজ্জা হল! যার কাছে পড়বি, তাকে লজ্জা করলে হবে না তো! চলে আয়।

সর্বরক্ষে, মাস্টারমশায় বলে জ্যাঠাইমা উল্লেখ করেননি এবার। মঞ্জুরাণী এল। রাণীই বটে! জ্যাঠাইমার গর্ভের মেয়ে—সে আর বলে দিতে হয় না। ম্যাট্রিক দেবে, বছর ষোল বয়স হওয়া উচিত—কিন্তু বাড়ন্ত গড়নের বলে কুড়ি ছাড়িয়ে গেছে মনে হয়। ঘর যেন আলো হয়ে গেল রূপে।

মহিম বলেন, কোন্ ইস্কুলে পড়া হয়?

এরকম রূপবতী বড়-ঘরের মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা এই প্রথম। 'তুমি' মুখে আসে না, অথচ ছাত্রীকে 'আপনি' বলাই বা যায় কেমন করে।

জ্যাঠামা বললেন, চাট্টি খেয়ে যাবে বাবা।

মহিম আমতা-আমতা করেন: না না—খাওয়া আবার কি জন্যে?

মেসে গিয়ে খাও তুমি, আমি জানি। তার দরকার নেই। এরা যদ্দিন না ফিরছে দুবেলা এখানে খাবে।

মেসের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে একমাসের মতো—

মানা করে এস। আমার দেওর পরিমলের বাড়ি খেতে পার, আমার বাড়ি খেলে কি জাত যাবে?

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন, কি জাত তোমরা বাবা? সেন উপাধি বদ্যির হয়, আবার কায়স্থেরও হয় কিনা।

কায়স্থ।

আমরাও কায়স্থ। তবে তো স্বজাত আমরা। আমার হাতের রান্না নিরামিষ তরকারি পাতে দিতে পারব। আসছি আমি। তোমরা কথাবার্তা বল। একেবারে খেয়ে যাবে এখান থেকে।

মহিম তাড়াতাড়ি বলেন, চানটান হয়নি—

চান-ঘর এ-বাড়িতেও আছে। আচ্ছা চান করেই এস ও-বাড়ি থেকে। বেশি দেরি কোরো না।

বাপরে বাপ, কী আয়োজন! কতগুলো তরকারি থালা ঘিরে গোল করে

সাজানো! খাওয়ার সময়টা জ্যাঠাইমা সর্বক্ষণ সামনে বসে এটা খাও ওটা খাও করেন। বেশি আদর-যত্ন মহিমের অসুবিধা লাগে। কিন্তু মুখ ফুটে বলাও যায় না কিছু।

শ্যামাপুজো এসে পড়ল। ফট-ফট আওয়াজে বাজি ফুটতে শুরু হয়েছে রাস্তাঘাটে। শ্যামাপুজোর আগের দিন পরিমলরা সব এসে পড়লেন। ইস্কুলে এখনো ছুটি আছে, ছুটি চলবে জগদ্ধাত্রীপুজো অবধি। মা বড্ড চিঠি দিচ্ছেন, দেশে যাবে এইবার ক'দিনের জন্য। সত্যিই তো, একমাত্র ছেলে—ছেলেকে দেখতে ইচ্ছে হবে না মায়ের? বড় বোন সুধাও আর আলতাপোলে থাকতে পারছে না। তার ভাশুর তারক কর মশায়ের সংসার অচল, তিনি তাকে বেহালার বাসায় নিয়ে আসবেন। মা তখন একেবারে একা। তারও একটা বন্দোবস্ত করে আসতে হবে।

মঞ্জুর মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংসারের যাবতীয় খবরাখবর নেন। বলেন, তোমারই তো অন্যায় বাবা। বুড়ো মাকে একলা কেন পাড়াগাঁয়ে ফেলে রাখবে? বাসা কর। আচ্ছা, বিয়েথাওয়া হয়ে যাক, তারপরে বাসা করবে। বিয়ের কথা মা কিছু বলেন না?

মহিম মুখ নিচু করে থাকেন, জবাব দেন না। মঞ্জুর মা বলেন, মা তো আমিও। কোন্ মা চায় যে ছেলে আধা-সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়াক। কিন্তু তোমরা আজকালকার সব হয়েছ, মনের তল পাওয়া যায় না। আমার মধুর জন্যেও মেয়ে দেখছি। তার অবশ্য বলবার কথা আছে—বোনের বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর ভাইয়ের বিয়ে। সেটা ঠিক বটে! মঞ্জুরাণী বড় হয়ে গেছে। নিজের মেয়ের কথা জাঁক করে কি বলব—দেখছ তো তাকে চোখে। পড়াচ্ছ যখন, সবই জান। পাত্তর অনেক এসেছিল, তখন গা করিনি। বলি, পড়ছে পড়ুক না—পাশটাশ করে যাক, বিয়ের কথা তারপরে। কিন্তু পাশ করে তো আর দুখানা হাত বেরবে না। বিয়ে হয়ে গেলে তার পরেও পড়তে পারবে। ভাল ছেলে পেলে দিয়ে দেওয়া উচিত। কি বল?

সে তো বটেই!

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তোমার ইস্কুলের চাকরি কদ্দিন হল বাবা?

মহিম তাড়াতাড়ি জবাব দেন, দু-বছর হয়নি এখনো। ছেড়ে দেব আইন পাশ করে। ভাবলাম, সন্ধ্যেবেলার একটুখানি তো ক্লাস—সমস্তটা দিন বসে-বসে কি করা যায়—

মঞ্জুর মা লুফে নিলেন কথাটা : বেশ করেছ। লেখাপড়া শিখেছ, বাড়ির টাকা এনে শহরে বসে কি অন্ন খাবে? এই রকম ছেলেই আমার পছন্দ। দেশের ঠিকানাটা দাও তো বাবা। আমি তোমার মাকে চিঠি লিখব।

ঘেমে উঠেছেন মহিম, বুকের মধ্যে ঢিব-ঢিব করছে। বলছেন কি ইনি—বনেদি ঘরের এই অপরূপ রাজকন্যা মহিমের মতো মাস্টারের হাতে দেবেন? ম্যাকলিন কোম্পানির হামবড়া কেরানি এক কথায় যে সম্বন্ধ নাকচ করে দিয়েছিলেন।

মঞ্জুর মা বলছেন, একটি মেয়ে আমার—গয়নাগাঁটি মেয়ের পা সাজিয়ে দেব। আমার নিজের পুরানো একসেট জড়োয়া গয়না—তা-ও মেয়ে পাবে। এই পৈত্রিক বাড়ি মধুর। কালীঘাটে আলাদা একটা বাড়ি কর্তা মেয়ের নামে কিনে দিয়ে গেছেন। ভাড়াটে আছে, ষাট টাকা ভাড়া দেয়। মেয়ে আমার শুধু হাতে যাবে না। জগদ্ধাত্রীপুজোর পর ফিরে আসছ—তার মধ্যে তোমার দেশের বাড়ি চিঠি চলে যাবে। মাকে তুমি বুঝিয়েসুঝিয়ে সমস্ত বোলো।

নিচে নেমে মহিম বেরিয়ে যাচ্ছেন। মঞ্জুরাণী লুকিয়ে লুকিয়ে কথাবার্তা ঠিক শুনেছে। দরজার ধারে সে দাঁড়িয়ে। মহিমও থমকে দাঁড়ান। তাকান এদিক-ওদিক। কেউ কোন দিকে নেই।

মঞ্জু বলে, মাস্টারমশায়, আপনার সঙ্গে কথা আছে। আগের মাস্টার পড়াতেন ভাল। শিক্ষিত মানুষ। শেষটা মাইনেও নিতেন না। তবু তাঁকে তাড়িয়ে দিল।

থেমে পড়ল মঞ্জু হঠাৎ। বলে, না, এখন হবে না! মানুষজন চারদিকে। অন্য সময়। আপনাকে বলতে হবে সব কথা—কেন সে মাস্টার তাড়া খেলেন। এমনি তাড়ানো নয়, মেরে বাড়ির বের করে দিল—গ্রামের মানুষ আপনি, ভাল মানুষ—সমস্ত আপনার জানা দরকার।

বলেই চক্ষের পলকে কোন দিকে সে সরে গেল, পাখির মতো ফুড়ুত করে উড়ে পালান যেন।

সেই রাত্রে। গলির জানলায় টোকা পড়ছে, ঘুমের মধ্যে শুনছেন মহিম। খুট—খুট—খুট। আর মাস্টারমশায়—বলে ফিসফিসানি।

ধড়মড়িয়ে মহিম শয্যায় উঠে বসলেন। জানলার ওধারে মঞ্জুরাণী। মনে হচ্ছে স্বপ্ন।

সাঁ করে মঞ্জু একটুখানি পাশে সরে দাঁড়ায়। চাপা গলায় ডাকছে, বাইরে আসুন। কথা আছে—সেই কথা।

ঘুমের আরিজ কাটেনি। কি করবেন মহিম, বুঝে উঠতে পারেন না। মঞ্জুরাণী তাড়া দেয় : আঃ, আমি চলে এসেছি, আপনি আসবেন না ?

তরল অন্ধকার। তার মধ্যে দেখা যায় মঞ্জুকে। দিনমানের ছাত্রী মেয়ে নয়, রাতের রহস্যময়ী। গায়ের উজ্জ্বল রং এখন যেন জ্বলছে।

একেবারে কাছে চলে এল সে। কয়েক ইঞ্চির ব্যবধান। এলোচুল, আলুথালু কাপড়চোপড়। কোন গতিকে কাপড় জড়িয়ে এসেছে। চলার সঙ্গে টলমল করে যৌবন, পাত্র ছাপিয়ে যেন উছলে পড়ে। মহিমের গা শিরশির করে ওঠে।

আগে আগে মঞ্জু নিজেদের বাড়ির সামনে গেল। দরজা ভেজানো, নরম হাতে নিঃসাড়ে খুলে ফেলল। এক পা ভিতরে গিয়ে দরজা ধরে ডাকে, আসুন।

পাথর হয়ে গেছেন মহিম। পা দুখানা অচল।

দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, কে দেখে ফেলবে। ভিতরে চলে আসুন।

ঘাম দেখা দিয়েছে মহিমের। মঞ্জুর মুখে কেমন এক ধরনের হাসি। বলে ভয় করে? তবে থাক। কথা শুনে কাজ নেই। আপনি ঘোমটা দিয়ে বেড়াবেন মাস্টারমশায়। আপনার কাছে পড়ব না।

দরজা বন্ধ করল মঞ্জু ভিতর থেকে। সর্বনেশে ব্যাপার! কথা বলার এই হল সময়? তাড়াতাড়ি মহিম ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। ভাল করলেন কি মন্দ করলেন ভাবছেন। ঘুম আসে না, এপাশ-ওপাশ করেন। সর্বদেহে যেমন অগ্নিজ্বালা। কী কথা ছিল ও রাণীর মতো মেয়েটার, কোন এক গূঢ় বেদনা! যার স্ত্রী হতে যাচ্ছে, মনের গোপন কথা তার কাছে খুলে বলতে চেয়েছিল। মহিম ভয় পেয়ে গেলেন। কলঙ্কের ভয়, ওর, এই উচ্ছল উন্মত্ত যৌবনের ভয়। আশৈশব বাঁধাধরা রীতিনীতির মধ্যে অভ্যস্ত জীবন, তার বাইরে পা বাড়াতে পারবেন না মাস্টার মানুষটি।

॥ ষোল ॥

আলতাপোল গিয়ে মহিম দেখলেন, মা আর দিদি উঠে-পড়ে লেগেছেন তাঁর বিয়ের জন্য। চিঠির পর চিঠি—ঠিক এই ব্যাপারই আন্দাজে এসেছিল। পাড়ার গিন্নিবান্নিরা তাতিয়ে নিচ্ছেন আরও মাকে : পাশ-করা ছেলে, চাকরির পয়সা হাতে রমারম আসছে এখন। না মহিমের মা, মোটে আর দেরি করো না।

কোন সাহসে দেরি কবচ, তা-ও তো বুঝি নে। কলকাতার শহর, শাসন-নিবারণের কেউ নেই মাথার উপরে। কোন ডাকিনির ফাঁদে পড়ে যাবে, ছেলে তখন আর তোমার থাকবে না। তাই বলি, ঘোষগাঁতিতে আমার মামাতো ভাইয়ের মেয়ে—ডাগরডোগর, কাজকর্মে ভাল, দাত চড়ে রা কাড়বে না—মেয়েটা তুমি নিয়ে নাও মহিমের মা। দেবে-থোবেও একেবারে নিন্দের নয়।

ডাকিনীর ফাঁদে পড়ে পেটের ছেলে মাকে দাসী-বাঁদীর মতো জ্ঞান করে—দৃষ্টান্ত তুলে তুলে শোনানো হয়েছে। হরেন আলতাপোল পোস্ট অফিসের পোস্ট-মাস্টার। মহিমের সঙ্গে বড় হয়েছে, একসঙ্গে ইস্কুলে পড়েছে। তাকে ডেকে সেনগিন্নি বললেন, তুমি না লাগলে হবে না হরেন। মহিম বাড়ি এলে দুজনে গিয়ে মেয়েটা দেখে এস। ছেলেয় মেয়েয় দেখাদেখি হয় তো আজকাল—আমাদের পাড়াগাঁয়েও বিস্তর হচ্ছে। ছাড়বে না তুমি, ধরেপড়ে নিয়ে যাবে।

সুধা গিয়ে মহিমের কাছে তুললেন: মেয়ে নিজের চোখে দেখে বিয়েথাওয়া হওয়া ভাল। বাবা কি বড় ভাই মাথার উপরে থাকলে তাঁরাই অবশ্য দেখতেন। একেবারে পরের মুখে ঝাল খাওয়া ঠিক নয়, কি বল?

মহিম সাগ্রহে সমর্থন করেন, ঠিকই তো!

তাহলে যাও ভাই, ঘোষগাঁতির মেয়েটা দেখে এস। 'মঙ্গলে ঊষা বুধে পা'—কাল বুধবার ঘোর-ঘোর থাকতে-বেরিয়ে পড় তুমি আর হরেন। তুমি বাড়ি আসছ, মেয়েওয়ালাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়ে দেখতে পাঠানো হবে, তা-ও তারা জানে।

মহিম অবাক হয়ে বলেন, কী মুশকিল! এতখানি এগিয়েছ তোমরা, আমি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

সুধা মুখ টিপে হেসে বলেন, কি ভেবেছ তবে? মুখে রক্ত তুলে খেটে খেটে সংসারে টাকা পাঠাও, খেয়েদেয়ে আমরা খালি ঘুমোই—এই ভাবতে বোধহয়? হরেন কাপড়চোপড় কেচে তৈরি হয়ে আছে, বলে আসি তাকে।

সত্যি সত্যি তখনই চললেন বুঝি হরেনকে বলতে। ঘাড় নেড়ে মহিম বলেন, কিছু বলতে যেও না দিদি। বয়ে গেছে আমার এগাঁয়ে-ওগাঁয়ে হট্ট-হট্ট করে বেড়াতে। ক'টা দিন বাড়ি এসেছি, শুয়ে বসে থাকব। এক পা নড়তে পারব না।

আরও দু-চার বার বলায় মহিম রাগ করে উঠলেন: বেশ, যেতে বল তো যাচ্ছি একেবারে কলকাতায় চলে। অন্য কোথাও নয়।

মেয়েকে দিয়ে হয় না তো সেনগিন্নি নিজে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

কবে যাবি ঘোষগাঁতি ?

যাব না তো। বলে দিয়েছি দিদিকে।

করবি নে তবে বিয়েথাওয়া ? স্পষ্ট করে বলে দে। লোকের কাছে আমি অপদস্থ হতে চাই নে।

মহিম বলেন, তুমি যে ক্ষেপে গিয়েছ মা! ব্যস্ত কিসের ? সময় হলে হবে।

ক্ষেপে যেতে হয় তোমার কাণ্ড দেখে। সুধা থাকছে না, তার ডাক্তার তাকে বাসায় নিয়ে যাবে। একলা আমি পড়ে থাকব। তখন কেউ খুন করে রেখে গেলে পচে দুর্গন্ধ না হওয়া পর্যন্ত পড়শির কাছে খবর হবে না।

চোখে আঁচল দিলেন মা। মহিম হেসে বললেন, আজেবাজে ভেবে মরা তোমার স্বভাব। একলা কি জন্য থাকতে যাবে ? আমিও বাসা করব কলকাতায়, তোমায় নিয়ে যাব।

মা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন : আমি বুড়ো বয়সে হাঁড়ি ঠেলতে পারব না তোমার বাসায়। হ্যাঁ, সাফ জবাব।

আচ্ছা সে দেখা যাবে হাঁড়ি ঠেলবার মানুষ পাওয়া যায় কিনা কোথাও। এখন তাড়া করলে তো হবে না মা।

ডাক এলে টপটপ করে চিঠির উপর শিলমোহর পড়ে। শব্দ শুনে মহিম পোস্টঅফিসে ছোটেন। হরেনকে বলেন, কলকাতার চিঠিপত্তর আসে না কেন বল তো ?

কেউ দেয় না বলেই আসে না। এত উতলা কেন ? চিঠি দেবার মানুষ জোটাও, ভারি ভারি খাম চলে আসবে রোজ।

মহিম বলেন, ঠাট্টা নয়। একটা জরুরি চিঠি আসার কথা। কাজের চিঠি। তোমার ওই মুখ্যু রানারটা শিল মারে আর বাঁ-হাতে চিঠি ঠেলে দেয়। কোনখানে সেই সময় পড়েটড়ে গেল কিনা কে জানে!

হরেন বলেন, পড়লেও এই ঘরখানার মধ্যে থাকবে। আসেনি, এলে আমি নিজে পৌঁছে দিয়ে আসব।

মহিম গেলেন না তো ঘোষগাঁতি থেকে মেয়ের খুড়ো এসে পড়লেন। হয়তো বা সেনগিন্নিই খবর পাঠিয়েছিলেন সেখানে।

এই ঘোষগাঁতি সূর্যকান্তর বাড়ি। তিনি এখন স্টেশন-মাস্টার ভাইপোর আশ্রয়ে শিলিগুড়ি আছেন। নয়তো মহিম নিশ্চয় চলে যেতেন গেল-বারের মতো। মেয়ের খুড়োর কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সূর্যবাবুর সমস্ত কথা শোনা গেল। বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেছে, বিয়ে করে ফেলেছে লীলা। সূর্যবাবুর প্রপিতামহী

বিধবা হয়ে স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় পুড়েছিলেন, তাঁর মেয়ে বিধবা হবার পর আবার বিয়ে করে সংসারধর্ম করছে। বড় ভাইপো পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টরের সেই শ্যালকটি। কলকাতায় নিয়ে ট্রেনিং-এ ঢুকিয়ে দিয়েছে ঠিকই—তার পরে দুজনে মিলে এক চিঠিতে বাপের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে পাঠাল। সূর্যকান্ত জবাব দেননি। কোন সম্পর্ক নেই ও-মেয়ের সঙ্গে। রাণীর মতো লীলাও মরে গেছে, এই তিনি ধরে নিয়েছেন। শিলিগুলি থেকে ভাইপোর ছেলে-মেয়েগুলোকে পড়ান, আছেন একরকম।

মহিমকে ডেকে সুধা বললেন, মেয়ে তো দেখতে গেলে না—এই দেখ, মেয়ে ওঁরা বাড়ি তুলে এনে দেখাচ্ছেন।

পাত্রীর ফোটো। ফোটো সকলের হাতে হাতে ঘুরছে। নোলকপরা নাকচোখ টানা-টানা ফুটফুটে মেয়ে। নাম সরলাবালা।

মা বলেন, পাকা কথা দিই, কি বল ?

শশব্যস্তে মহিম ঘাড় নাড়েন : না মা। এখন থাক, তাড়াতাড়ি কিসের ?

মুখ কালো করে মা সরে গেলেন। বাক্যালাপ বন্ধ।

দিন তিনেক পরে কলকাতা রওনা হবার সময় মহিম মাকে প্রণাম করলেন। তখনও রাগ পড়েনি। পোস্ট অফিসটা ঘুরে হরেনকে শেষ একবার জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছেন ! না, আসেনি কোন চিঠি।

পরিমলের বাড়ি পা দিয়েই রহস্যের সমাধান হল। মাস্টারমশায় দেশ থেকে ফিরলেন, ছাত্রছাত্রীরা ধুপধাপ করে নেমে এসেছে। মায়া কলকণ্ঠে বলে, ও-বাড়ির মঞ্জুদিদির বিয়ে হয়ে গেল পরশুদিন। বাড়িসুদ্ধ সবার নেমতন্ন। আপনি থাকলে আপনারও হত।

মহিম মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন। ধুলোয় ভর্তি জুতো-জোড়াও খুলে রাখতে যেন ভুলে গেছেন। তারপর বললেন, আমার কথা হয়েছিল নাকি ?

না, হয়নি। যদি থাকতেন, একজনকে কি আর বাদ দিয়ে বলত ?

পটু বলে, ফুলশয্যার আগেই আজ সকালে মঞ্জুদিদি চলে এসেছে। শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা নাকি বড্ড খারাপ। গোঁয়ার-গুণ্ডা লোক। বাবা সেই কথা শুনে খুব রাগ করলেন : দুটো দিনের মধ্যে বিয়ে ঠিক করে ফেলল। কাউকে কিছু বলল না, খোঁজখবর নিল না ভাল করে। হবেই তো এমনি।

মায়া বলে, এসে অবধি যা কান্না কাঁদছে মঞ্জুদিদি ! দেখে কষ্ট হয়। আমি গেলাম, তা একটা কথা বলল না। চিলে কোঠায় উঠে গিয়ে খিল এঁটে দিল।

বিয়ে হতে না হতে এই। মহিমের কষ্ট হচ্ছে মঞ্জুরাণীর জন্তে। এত রূপসী মেয়ে, তার ভাগ্যে এই! রাগ হচ্ছে ওই মা আর ভাইটার উপর। অত আমড়াগাছি করল কি জন্ত তাঁকে? পড়াবার নামে ডেকে নিয়ে গিয়ে—চর্ব্য-চোষ্য খাইয়ে? পড়ানো তো বাজে অজুহাত—বোঝা গেছে সমস্ত। আসলে হল মেয়ে দেখানো, মেয়ের সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে দেওয়া। ইস্কুল-মাস্টার বলে তারপরেও আগুপিছু করছিল বোধ হয়—হঠাৎ ধাপ্পাবাজের পাল্লায় পড়ে সর্বনাশ করল এমন মেয়েটার। মা আর ভাই দুজনে মিলে। দুটোকে কেটে কুচি-কুচি করে আদিগঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে তবে রাগের শোধ যায়।

বেশি নয়, হপ্তা দুই কেটেছে তার পরে। বার্ষিক পরীক্ষা একেবারে ঘাড়ের উপর—ছাত্রদের বড্ড চাড় হয়েছে, প্রাইভেট মাস্টারকে ছাড়তে চায় না, জোঁকের মতন লেপটে থাকে। টুইশানি সেরে মহিম ফিরছেন, রাত্তিরটা বেশি হয়ে গেছে। দেখেন গলির, ঠিক মোড়ের উপর একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। সামনের পিছনের আলো নিভানো। ট্যাক্সির ষণ্ডা ষণ্ডা কয়েকটা লোক শীতের জন্যই বোধ করি গাদাগাদি হয়ে আছে। মহিমের দিকে তারা কটমট করে তাকায়। পথ একেবারে নির্জন। রকম-সকম মহিমের ভাল লাগে না।

অনতি পরেই প্রলয় কাণ্ড একেবারে। চেঁচামেচি মঞ্জুদের বাড়ি থেকে। মহিম ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন, জানালা খুলে ফেললেন। লোক জমেছে, ওদিকে টিনের বস্তিতে ক'ঘর ভাড়াটে ওঁদের—তারা সব এসে পড়েছে। বেশভূষায় রীতিমতো বাবু এক ছোকরা—ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে বের করে দিল তাকে মঞ্জুদের বাড়ি থেকে।

ছোকরা চেঁচাচ্ছে, কোথায় সব? দেখ, মারছে আমার শালারা।

মধুসূদন অগ্রণী। রাগে কাঁপতে কাঁপতে কিল-ঘুসি টিপঢাপ ঝাড়ছে সে ছোকরার পিঠে। ভিড়ের মানুষরাও ছাড়ে না—সুযোগ পেয়ে তারাও যথাসম্ভব হাতের সুখ করে নিচ্ছে।

ছোকরা রাস্তার দিকে মুখ করে হাঁক দেয়: এই, কি করছ সব তোমরা?

পরিমলের উপরের ঘরের জানলা খট করে খুলে গেল: হল্লা কিসের? আরে, কি সর্বনাশ! জামাইকে মারছ মধু?

মাতাল হয়ে এসেছে দেখুন কাকা। বলে, বউ নিয়ে যাব, ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি। ঠাকুর উঁকি দিয়ে দেখে এসে বলল, ট্যাক্সিতে গুণ্ডা বোঝাই। মঞ্জুকে নিয়ে ওরা খুন করে ফেলবে।

জামাই বলে, গুণ্ডা কেন হবে। আমার মাসতুতো আর মামাতো ভাইরা বউ বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। এই, কি করছ তোমরা? বেরিয়ে এস না।

ট্যাক্সি কোথায় তখন! মামাতো মাসতুতো ভাইদের নিয়ে দৌড় দিয়েছে অনেকক্ষণ আগে।

পরিমল তাড়া দিয়ে উঠলেন: এত রাত্রে কিসের বউ নিয়ে যাওয়া? বউ নিতে হলে দিনমানে এস। চলে যাও। ভদ্রলোকের পাড়া—মাতলামির জায়গা নয় এটা।

জামাই ক্ষেপে গেল একেবারে। উপর দিকে মুখ করে আকাশ ভেদ করার মতন কষ্টে চেঁচাচ্ছে: ওরে আমার ভদ্দরলোক! পোয়াতি মেয়ের সঙ্গে ঠকিয়ে বিয়ে দিয়ে এখন ভদ্দর ফলাতে এসেছে। বের করে আনুন মেয়ে—দশজনে দেখেশুনে পরখ করে ভদ্দোরপাড়া থেকে বস্তিতে তুলে দিয়ে আসুক, তবে যাব এখান থেকে।

উজবুকটাকে দূর করে দাও—। সংক্ষেপে আদেশ দিয়ে পরিমল সশব্দে জানলা বন্ধ করলেন। কিন্তু যারা মারধোর করছিল, হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে হাত থেমে গেছে তাদের। মজাদার কথা, রসের খবর। বনেদি ঘরের মেয়ের কুৎসা। জামাই হাঁকডাক করে বলছে, সময় দিচ্ছে সেই জন্যে। বলে নিক শেষ পর্যন্ত। দূর করে দেওয়া মিনিট কতক পরে হলেও ক্ষতি হবে না।

সেই রাত্রেই মহিম পোস্টকার্ড লিখলেন: মা, কখনো আমি কি আপনার কথার অবাধ্য হইয়াছি? আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাই করিবেন। পাত্রী দেখিবার আমি প্রয়োজন মনে করি না···

॥ সতেরো ॥

ম্যাকলিন কোম্পানির বড়বাবু মাস্টার বলে মেয়ে না দিলেন—কিন্তু বাংলাদেশ এটা খেয়াল রেখো। ভাত-কাপড়ের অভাব থাকলেও বিয়ের মেয়ে কত গণ্ডা চাই? সরলাবালার বাপ-খুড়ো কৃতার্থ হয়ে গেলেন কন্যাদান করে। মানুষের মন পড়া যায় এমনিতরো চশমা আজও বেরল না—তাহলে দেখতে আরও কতজন নিজেকে বাপান্ত করছে, টপকে পড়ে এমন পাত্রটা নিজের মেয়ের সঙ্গে গাঁথতে পারেনি বলে।

তারক কর মশার ভ্রাতৃবধূ সুধাকে বাসায় নিয়ে এসেছে। সেনগিন্নি বুড়ো হয়েছেন, তাঁকে এখন সদাসর্বদা দেখাশোনার দরকার। সুধা সেই কাজ করতেন। বুড়ো মায়ের উপরে অধিকন্তু এক ছেলেমানুষ বউয়ের দায়িত্ব চাপিয়ে গাঁয়ে ফেলে রাখা যায় কেমন করে? মহিমকেও বাসা করতে হল অতএব। ইস্কুলের কাছাকাছি নিচের তলায় ছোট একখানা ঘর আর ঘেরা বারান্দা পাওয়া গেছে। ভাল হয়েছে, ইস্কুলে যাতায়াতের সময় লাগবে না। টিফিনের সময়টাতেও এসে একটু গল্পগাছা করা যাবে। সকালবেলা পরিমলের ছেলে-মেয়েদের পড়াতেন, সেখান থেকে চলে এসে ওই সময়টা এখন ছুটো টুইশানি নিয়েছেন। রাত্রের পুরানো ছাত্রীটাও আছে, ছেড়ে দেননি ভাগ্যিস মঞ্জুর মায়ের কথায়।

পয়লা তারিখে মাইনে পাওয়া গেছে। ভারতী ইনস্টিটুশনের এই রীতিটা বড় ভাল, প্রায় যা কোন ইস্কুলে নেই। রসগোল্লা বানাচ্ছিল এক খাবারের দোকানে। বড়ি বড়ি ছানা ফুটন্ত চিনির রসে ফেলছে, ফুলে-ফেঁপে রসে টইটম্বুর হচ্ছে। মাইনে পেয়ে মনমেজাজ আজ ভাল—ছ' আনার ছ'টা রসগোল্লা কিনে খুরিতে নিয়ে বাড়ি চললেন।

সরলাবালাকে বলেন, গরম রসগোল্লা খেয়েছ কখনো? একেবারে হাতে গরম। টুপ করে ছুটো গালে দাও দিকি এখুনি। জুড়িয়ে গেলে আর মজা থাকবে না।

সরলা খুব কথা কম বলে। বড় বড় চোখ তুলে তাকায়, আর মুচকি হাসে কথায়-কথায়। হাসি আর চাউনি ভারি চমৎকার। খুরি নিয়ে সে চলে গেল। ক্ষণপরে বাটিতে করে দুটো রসগোল্লা আর এক গেলাস জল মহিমের সামনে এনে রাখল।

চা খেয়ে এস নি তো? চা করে আনি—

চিনি তো নেই, কাল থেকে শুনছি। চিনি এনে দিই তবে।

উঠছিলেন মহিম। হেসে কাঁধে হাতের মৃদু চাপ দিয়ে সরলাবালা বসিয়ে দিল: এই বলে, এক্ষুনি আবার দোকানে ছুটতে হবে না। রাত্রে বাড়ি ফিরবার সময় আনলে হবে। এখন চিনি লাগছে না, রসগোল্লার রস দিয়ে চা করব। জেনে ফেললে তাই, খেয়ে কিন্তু মোটেই ধরতে পারবে না আসলে চিনির রসের চা।

তাড়াতাড়ি চা করতে যাবে। কিন্তু যেতে দিচ্ছে না মহিম, হাত ধরে ফেললেন।

আমায় তো দিলে। তোমরা খাবে না?

সরলাবালা বলে, মার জন্যে দুটো তুলে রেখে দিলাম এঁটো হবার আগে। সন্ধ্যাহ্নিকের পর দেব।

নিজের কথা বলছ না—তুমি খাবে কখন?

সরলা বলে, কষ্ট করে এলে, তোমায় আগে চা করে দিই। চা খেয়ে কলেজে চলে যাও। আমার খাওয়ার কত সময় রয়েছে।

হাত-পা অলস ভাবে ছড়িয়ে মহিম বলেন, এখন কলেজে গিয়ে কী আর হবে! গিয়ে পৌঁছুতেই তো প্রায় সাড়ে পাঁচটা। পুরো এক ঘণ্টা কোন প্রফেসর ধৈর্য ধরে পড়ান না, আগেভাগে ছুটি দিয়ে দেন। চারতলার সিঁড়ি ভেঙে হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে দেখব, কেউ নেই—ছুটি হয়ে গেছে।

সরলা বলে, পরশু তো কামাই করলে! ও-হপ্তায় করেছ তিন দিন। হত ইস্কুলের মতো: গার্জেনের চিঠি আন, নয় তো বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দেব—তাহলে জব্দ হতে।

মহিম বলেন, কিসের জব্দ? তোমাকেই বলতাম যে চিঠি লিখে দাও—বিষম অসুখ। দিয়ে দেখাতাম, এই যে চিঠি আমার গার্জেনের।

মুখ টিপে হেসে সরলাবালা বলে, তাই বটে! শুয়ে পড়ে থাকার অসুখ নয়, বসে বসে পাগলামি আর ফষ্টিনষ্টির অসুখ। কলেজ কামাই করে নিত্যিদিন তুমি অসুখে ভুগবে, আমার যে এদিকে সৃষ্টি-সংসারের কাজ পড়ে থাকে।

মহিম বলেন, কলেজে একটি দিনও কামাই নেই আমার। তাই দেখ—বাড়ি বসে অসুখে ভুগি, আবার কলেজ করেও যাচ্ছি কেমন একসঙ্গে।

সরলা সেই বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে থাকে, বুঝতে পারে না। মহিম ফলাও করে বোঝাচ্ছেন: আমাদের ল-কলেজে না গিয়েও হাজির থাকা যায়। আমি তবু তো একই কলকাতা শহরের উপর রয়েছি। একজনে ধরা পড়ে গিয়েছিল—বরিশাল শহরের এক বড় ইস্কুলে কাজ করে, দশটায় ইস্কুলে যায় চারটেয় সই করে বাড়ি ফেরে, আবার ঠিক চারটে পঁয়তাল্লিশে কলকাতায় দ্বারভাঙা বিল্ডিং-এ ক্লাস করছে। পুরো দুটো বছর এমনি করে আসছে।

সরলা বলে, কেমন করে হল?

পাকা বন্দোবস্ত। মাসিক একটা বরাদ্দও থাকে—এত করে দেব, রোল্-কলের সময় রোজ 'প্রেজেন্ট' বলে যাবে।

বল কি? প্রফেসররা তো আচ্ছা বোকা, ধরতে পারেন না?

বড্ড ভাল প্রফেসররা। এই কাজে লুকোছাপা কিছু নেই, সকলের জানা।

মস্তবড় ক্লাসঘরে পনেরটি ছাত্র হয়তো টিমটিম করছে। প্রফেসর ষাট-সত্তরটি হাজির লিখেছেন। একটা নাম ডেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, প্রফেসর হেসে বললেন, দুর্ভাগা ভদ্রলোক—একটি বন্ধুও থাকতে নেই ক্লাসে!

তারপর বলেন, এক এক সময় ভাবি, ওই রকম পাকা বন্দোবস্ত আমিও করে ফেলব। কোনদিন কলেজে যাব না, অন্য লোকে প্রক্সি দিয়ে যাবে। রাত্তিরে যে পড়ানোটা আছে, সেটা সাঁজের ঝোঁকে সেরে আসব। পুরো রাত্তির হাতে রইল—গড়ের মাঠে খানিক বেড়ানো গেল। হল বা সিনেমায় গিয়ে বসলাম একদিন।

সরলা বলে পড়াশুনো?

মহিম লুফে নিয়ে বলেন, তাই বলতে যাচ্ছিলাম। আইনের বই এখন ছুঁতেই পারছি নে, প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটাও দেওয়া গেল না। কাজকর্মের ঝঞ্ঝাট সকাল সকাল সেরে রাত জেগে চুটিয়ে পড়া যাবে। উকিল হয়ে না বেরনো পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। মরীয়া হয়ে উঠেছি।

বর উকিল হবে, সরলাবালারও সাধ খুব। উকিল একজন আছেন তাদের ঘোষগাঁতিতে, ছেলেবয়স থেকে দেখে আসছে। মোটাসোটা, গোলগাল, মাথায় টাক। পুজোর সময় বাড়ি আসেন। রেল-স্টেশন থেকে ক্রোশখানেক পথ, সবায় হেঁটে চলে আসে, উকিলবাবু পালকি চেপে আসেন আট বেহারার। আট বেহারা ও-হো ও-হো ও-হো ডাক ডেকে অঞ্চলের মধ্যে সাড়া তুলে গ্রামে আসছে—মাঠ ভেঙে তাড়াতাড়ি সংক্ষিপ্ত পথ, কিন্তু উকিলবাবুর ওই পথে আপত্তি: তা কেন! পৌঁছলে তো ফুরিয়ে গেল। পুবপাড়া পশ্চিমপাড়া উত্তরপাড়া—তিনটে পাড়া বেড় দিয়ে যাও। চোখ টাটাবে কত জনের, বুক ফাটবে, ঘুমতে পারবে না। তবেই তো পয়সা খরচ সার্থক।

সরলাবালার বড় ইচ্ছা, উকিল হয়ে মহিম পাল্কি-বেহারা হাঁকিয়ে একদিন আলতাপোলের বাড়ি যাবেন।

সে যাকগে। পরের কথা পরে। আজ এখন কলেজে যাচ্ছেন না, সেটা ঠিকই। আটটা অবধি আছেন বাসায়। জামা খুলে বারান্দায় একটা পেরেকে ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলেন, সেটা নিয়ে সরলাবালা ভিতরের আলনায় রাখল। ইস্কুলের জুতোজোড়া সরিয়ে নিল: মোটর-টায়ার ফিতের মতন কেটে খড়মের উপর বসানো—সেই বস্তু এনে রাখল মহিমের পায়ের কাছে। বলে, আজকে পয়লা তারিখ, তাই বল। মাইনে পেয়েছ। তা পকেটে অমনভাবে টাকাকড়ি রাখে! বাসন মাজতে মাজতে ঝি'টা তাকাচ্ছিল আড়ে আড়ে। টাকাটা

আমি তুলে রেখে এলাম—সাঁইত্রিশ টাকা একআনা—তাই তো? একটা মনিব্যাগও নেই—পকেটের ভিতর আজেবাজে কাগজের মতন নোটগুলো পড়ে থাকে। রোসো, মনিব্যাগ বুনে দিচ্ছি একটা। দুটো লাটিমের সুতো কিনে এনে দিও তো। কুরুশকাঁটা আছে আমার।

পকেটের টাকা সরলাবালা সাবধান করে তুলে রেখেছে। মহিমের অন্য-কিছু এখন কানে ঢুকছে না। নতুন বউ গণেগেঁথে বরের মাস মাইনে দেখল সাঁইত্রিশ টাকা একআনা। চল্লিশের মধ্যে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আড়াই টাকা এবং রসগোল্লার ছ-আনা বাদ। আর একআনা দিয়ে স্ট্যাম্পের দাম যার উপর সই করে টাকা নিতে হয়। বি. এ. পাশ-করা গ্রাজুয়েট বর—এই মাইনেয় তিনি শহরে চাকরি করেন, বাসা করে বউ নিয়ে আছেন!

মহিম তাড়াতাড়ি বলেন, হাঁা মাইনে তো দিল আজ। মাইনের ভিতর থেকে আটত্রিশটা টাকা মোটে দিল। হতভাগা ইস্কুল পুরো মাইনে একদিনে দিতে পারে না, বলে, আপনার একলার তো নয়, সকলকে কিছু কিছু করে দিতে হবে। তা দিয়ে দেবে আর দুটো তিনটে কিস্তিতে।

ল-কলেজে যাওয়া বন্ধ, প্রক্সি চলেছে সেখানে। ইস্কুল থেকে ফিরে মহিম গল্পগুজব করেন খানিকটা। আটটা নাগাদ বেরোন ছাত্রী পড়াতে। দিন পাঁচেক পরে ইস্কুল থেকে এসে তিনি বলেন, টাকাটা পড়ে আছে গো! আজকে আবার দিল কিছু—পনেরটি টাকা। যেন ফকিরের ভিক্ষে। তুলে রেখে দাও, কী আর হবে!

সকালবেলা যে দু-বাড়ি ট্যুইশানি করেন, তারই এক জায়গায় মাইনে দিয়েছে। পেয়েছেন সকালেই। সারাদিন চেপেছিলেন—ইস্কুল থেকে ফিরে আসার পর তবেই ইস্কুলের মাইনে পকেটে থাকতে পারে।

এর পরে ঠিক এমনি আর দু-কিস্তিতে পনের আর আঠার টাকা মাইনে এসে পড়ল। এবং সরলাবালা পকেট থেকে নিয়ে গণেগেঁথে তুলে রাখল। মোটমাট পঁচাশিতে দাঁড়াল—নেহাৎ নিন্দের নয়। পঁচাশি টাকার স্বামীকে নতুন বউয়ের রীতিমতো মান্য করা উচিত। আরও কত বাড়বে! উকিল হয়ে আদালতে গেলে তো কথাই নেই।

রাত্রে যে পড়ানো, সময় বদলাতে তারা রাজি নয়। পড়ে মেয়ে, সন্ধ্যাবেলা তিনদিন তার গানের মাস্টার আসে। গান যেদিন না হয়, চোর-পুলিশ খেলে ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে। রাত হয়ে গেলে তারা তো ঘুমিয়ে পড়বে! মহিমের কাছে সন্ধ্যাবেলা কিছুতে পড়বে না মেয়েটা।

মা বললেন, তবে আর মিছামিছি কলেজ কামাই করা কেন? আবার যেতে লাগ।

মহিম বলেন, কলেজে গিয়ে লাভ কিছু নেই মা। মিছে ট্রাম-খরচা গোলদীঘি অবধি। এ হলগে ল-কলেজ—অন্য দশটা ইস্কুল-কলেজের মতন নয়। প্রফেসররা হাইকোর্টে সারাদিন মামলা করেন, তাঁরা কেউ পড়াতে চান না। ছাত্র যারা, তারাও চাকরি-বাকরি করে—পড়বার জন্য যায় না কেউ। পড়াশুনো যত-কিছু বাড়িতে। খেয়েদেয়ে শুয়ে শুয়ে খানিকটা আমি পড়ে থাকি।

মা এবার সরলাবালার কানে না যায় এমনিভাবে বললেন, সন্ধ্যাবেলা তবে আর একটা পড়ানো দেখে নে। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। পোয়াতি বউমা খাটতে পারে না বেশি, ঠিকে-ঝি রাখতে হল। বাচ্চা হবার সময় খরচা, হয়ে যাবার পরে আরও বেশি খরচা। ইস্কুলের পর আজেবাজে গল্প না করে ওই সময়টা যাতে দু-পয়সা আসে সেই চেষ্টা দেখ।

বছরের মাঝখানে ভাল ট্যুইশানি মেলে না। সে সব জানুয়ারি মাসে নতুন সেসনের মুখে দেখতে হয়। দু-একটা রদ্দি মাল পড়ে থাকে এখন। অত্যন্ত কম মাইনের বলে মাস্টার জোটাতে পারেনি, অথবা ছেলের বাঁদরামির জন্য টুইশানি ছেড়ে দিয়ে কোন মাস্টার হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। মা যা বলছেন—বউয়ের সঙ্গে হাসি-মস্করায় সময় নষ্ট না করে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই সই। পাওয়া গেল বার টাকার একটা।

মাসের পয়লা তারিখে মহিমের পকেটে যথারীতি মাইনের টাকা সরলাবালা গণেগেঁথে তুলে রেখে এল। এসে মুখ টিপে হেসে বলে, বরাবর আর তিনটে কিস্তি আসে। এ মাসে তার উপরে আবার একটা। কিছু মাইনে-বৃদ্ধিও হয়েছে, কি বল?

ধরণী দ্বিধা হও, মহিম-মাস্টার তন্মধ্যে প্রবেশ করবেন। বউ দেখা যাচ্ছে ভিজে-বেড়াল একটি, জেনেশুনে ন্যাকা সেজে থাকে। মাস্টারি চাকরি কিছুতে নয়, ওকালতিটা পাশ হলে যে হয়। কিন্তু সে আশাও মরীচিকা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এতদিনের মধ্যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটাই দেওয়া ঘটে উঠল না, পার্সেণ্টেজ পচে যাবে। কলেজে প্রক্সি দেবার ভার যার উপর—খবর নেওয়া গেল, সে লোক পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে কোথায় চলে গেছে। সকলের বড় বাধা, ছ-মাস মাইনে দেওয়া হয়নি—কলেজের খাতায় নাম কেটে দিয়েছে। আর সংসার-খরচের যা বহর, টুইশানি আরও একটা বিকালের দিকে জুটিয়ে নেবেন কি না ভাবছেন।

॥ আঠার ॥

ইস্কুলের ঠিকানায় মহিমের নামে একখানা পোস্টকার্ড এল। সুরেশ নামে কে একজন লিখেছে : আপনার শিক্ষক সূর্যবাবু অসুস্থ হইয়া হাসপাতালে আছেন। কার্জন-ওয়ার্ডের আঠাশ নম্বর বেড। আপনাকে তিনি দেখতে চান।

ইস্কুল থেকে সোজা মহিম বেরিয়ে পড়লেন। একটু না হয় রাত হবে টুইশানি শুরু করতে। কামাই হবে না-হয় ছাত্রীদের ওখানে। ঘুরে ঘুরে এনকোয়ারি অফিসে খোঁজখবর নিয়ে অবশেষে জায়গাটায় হাজির হলেন। একতলার একটা ঘরের শেষ প্রান্তে ফ্রী-বেড।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। হাসপাতাল মানুষজনে ভরে গেছে। আত্মীয়-বন্ধুরা ফল নিয়ে ফুল নিয়ে মিষ্টি-মিঠাই নিয়ে রোগিদের দেখতে আসছে। সূর্যকান্তর কাছে কেউ নেই, একলাটি পড়ে আছেন। চিরদিনই রোগা শরীর—এখন যেন বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে আছেন একেবারে। ঠোঙায় করে চারটে কমলালেবু নিয়ে মহিম বিছানার পাশে দাঁড়ালেন।

আয় বাবা—বলে সূর্যকান্ত আহ্বান করলেন। উঠতে যাচ্ছেন, একটু বোধ হয় ঘাড়ও তুলেছেন। কিন্তু সিস্টার তাকিয়ে পড়লেন। যেমন তেমনি শুয়ে পড়লেন আবার তিনি।

অসুখ হয়ে কলকাতায় এসেছেন, কিছুই জানতাম না মাস্টারমশায়। সুরেশ বলে একজন চিঠি লিখেছেন—

সুরেশ আমার ছোট জামাই। আসবে। আলাপ করে দেখিস, বড্ড ভাল ছেলে। অমন ছেলে হয় না। লীলা আর সুরেশ দুজনে এসে যাবে এখনই।

নতুন জামাইয়ের প্রশংসায় শতমুখ। মহিমের বিস্ময় লাগে। প্রপিতামহী সতী হয়েছিলেন—চিরকাল সেই আদর্শের বড়াই করে এসে এখন সূর্যকান্ত বিধবা-বিবাহের পক্ষে। বললেন, বেঁচেছে আমার মেয়েটা। সুরেশের বাপ কর্পোরেশনের বড় অফিসার, তাঁর চেষ্টাতেই লীলার এত শিগগির চাকরি। কিন্তু বিয়ের পর ছেলে-বউকে তিনি বাড়ি ঢুকতে দেননি। বস্তির টিনের ঘর ভাড়া করে ওরা আছে। মাস্টারির হাড়-ভাঙা খাটনি খেটে লীলা পঞ্চান্নটি টাকা আনে। সুরেশ কিছু জোটাতে পারেনি, এখানে-ওখানে বইয়ের প্রুফ

দেখে দু-দশটা টাকা যা পায়। কিন্তু কী আনন্দে আছে যে! চোখে না দেখলে বুঝতে পারবি নে বাবা। টিনের চালের নিচে স্বর্গধাম বানিয়েছে। তাই দেখ —টাকায় কোন সুখ নেই, সুখ মনে। ভাইপোর ওখানে ছিলাম। মাইনে আর উপরি মিলে রোজগার খুব ভাল, কিন্তু ঝগড়া-কচকচির ঠেলায় বাড়ি তিষ্ঠানো দায়।

একটু থেমে বলতে লাগলেন, তবু কিন্তু এখানে সহজে আসতে চাইনি। আমার মনের কথা জানিস তুই—রেখে-ঢেকে আমি কিছু বলি নে, অঞ্চলসুদ্ধ সবাই জানে। অসুখের খবর শুনে সুরেশ টেনেটুনে নিয়ে এল শিলিগুড়ি থেকে। সারাদিন একলা শুয়ে শুয়ে নানান কথা ভাবি। দেখ, আমি ভুল করেছিলাম। কাল তো স্থির দাঁড়িয়ে নেই—এক সময়ের নীতি-নিয়ম আর এক সময়ে বাতিল। লোমশ ম্যামথ হিমযুগের সঙ্গে সঙ্গে বিলয় হয়, লোমহীন হাতী আসে সেই জায়গায়। সমাজের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনি। আমার প্রপিতামহীর আমলে স্বামী ছাড়া মেয়েদের কি ছিল জীবনে? স্বামী অন্তে বেঁচে থাকার যে দুঃখ, তারচেয়ে চিতায় পুড়ে মরা আরামের। কিন্তু আমাদের মেয়েরা জীবনে হাজার পথ খোলা পাচ্ছে। স্বামী ওদের যথাসর্বস্ব নয়, নানা সম্পদের মধ্যে একটি। স্বামী না থাকলেও জীবনের অনেক কিছু থেকে যায়। ওরা কোন্ দুঃখে তবে চিতায় মরবে? কিংবা জীবনে বেঁচে থেকেও মরার মতন থাকবে?

অনেক কথা বলে সূর্যকান্ত ক্লান্তিতে চুপ করলেন। শিয়রে টুলের উপর বসে মহিম ধীরে ধীরে তাঁর কপালে হাত বুলাচ্ছেন। এক সময়ে প্রশ্ন করেন, অসুখটা কি মাস্টারমশায়?

কী আর এমন! খেতে পারিনে, পেটে যন্ত্রণা। অম্বলের দোষ আর কি। হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় লীলাদের গলিতে। সেখানকার ডাক্তারবাবু বললেন, এক মাসের মধ্যে রোগ সারিয়ে দেবেন। কিন্তু ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বিষম ভয়ত্রাসে। জোরজার করে হাসপাতালে এনে তুলল। আর হাসপাতালের এরাও কী লাগিয়েছে আমায় নিয়ে! কত রকমের এক্স-রে ছবি তুলল। নাকের ফুটো দিয়ে পেট অবধি নল ঢুকিয়ে কচ্ছপ চিত করে রাখার মতো ফেলে রাখল পুরো একটা বেলা। ডাক্তার এসে দেখে যান, হাউস-সার্জেন আসে, সিস্টার তো আছেই। তার উপরে আছে ছাত্রেরা—ও এসে নাড়ি টেপে, সে এসে চোখ টেনে দেখে। মচ্ছব লেগে গেছে।

ঝিকঝিকে সাদা দু-পাটি দাঁত মেলে টেনে টেনে হাসতে লাগলেন? বলেন, গাঁয়ের ভাগাড়ে শকুন পড়া দেখেছিস—সেই ব্যাপার।

একটু পরে লীলা আর সুরেশ এসে পড়ল। ইস্কুলের মিস্ট্রেসদের নিয়ে মিটিং ছিল, ঝামেলা মিটিয়ে লীলার বাসায় ফিরতে ছ'টা। সুরেশও কোথা থেকে একগাদা প্রুফ নিয়ে এসেছে আজ, দুপুর থেকে একটানা তাই দেখেছে। রোগির পথ্য দুধ-বার্লি ফুটিয়ে নিয়ে এলুমিনিয়ামের পাত্রে ঢেলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। বাসে যা ভিড়—তিনটে বাস ছেড়ে দিয়ে তবে জায়গা হল দুটো মানুষের একটু দাঁড়িয়ে আসবার।

কী মধুর আলাপ-ব্যবহার। পুরানো মতামত বিসর্জন দিয়ে কেন সূর্যবাবুর অত উচ্ছ্বাস, বুঝতে পারা যায়। বিছানার ধারে বসে লীলা এখন বার্লি খাওয়াচ্ছে বাপকে। মুখ দেখে কে বলবে অত খাটনি খেটে এসেছে—যেন ফুলের বিছানা পেতে সারাদিন সে অলস শয্যায় শুয়ে ছিল। সুরেশও যে ঘাড় গুঁজে সারাক্ষণ প্রুফ দেখেছে, চেহারায় ধরা যাবে না।

মহিম বলেন, মাস্টারমশায় ভীতু বলে তোমাদের নিন্দে করছিলেন। সামান্য একটু অম্বলের অসুখ, হোমিওপ্যাথিতে সেরে যেত—কী কাণ্ড লাগিয়েছ তোমরা তাই নিয়ে!

সামান্যই বটে! সুরেশ বলে, তাই হোক দাদা, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

কানে কানে বলে, ক্যান্সার বলে সন্দেহ করছে।

হাউস-সার্জন ছোকরা মানুষ, অল্পদিন পাশ করে বেরিয়েছে। তার সঙ্গে মহিম দেখা করলেন। রোগ ক্যান্সারই! সারবে না। কয়েকটা এক্স-রে প্লেট নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে অপারেশনের সুবিধা হবে কিনা। নিরাময়ের আশা নেই, অপারেশনে জীবনের মেয়াদ এক বছর দেড় বছর বাড়তে পারে বড় জোর। এর অধিক কিছু নয়।

মহিম অবিশ্বাসের স্বরে বলেন, ক্যান্সারে শুনতে পাই ভয়ানক কষ্ট। এঁর তো কষ্ট কিছু দেখছি নে। হেসে হেসে কতক্ষণ ধরে গল্প করলেন।

আমরাও তাই দেখি। কষ্টের কোন লক্ষণ নেই। কিন্তু হচ্ছে নিশ্চয় কষ্ট, না হয়ে পারে না। চেপে আছেন। অদ্ভুত সহ্যশক্তি।

ধ্বক করে মহিমের মনে আসে, ওঁর ছাত্র চারুও অমনি। গুবরেপোকা নাভির উপর ছেড়ে বাটি উপুড় করে চাপা দিয়ে দেয়। তাতে বড় কষ্ট, স্নায়ুর উপর ভয়ানক প্রতিক্রিয়া—পাগল হয়ে ওঠে মানুষ। চারু-দা'কে তাই করেছিল নাকি। তিনি সর্বক্ষণ হেসেছিলেন, পুলিশ একটা কথাও বের করতে পারেনি।

পরের দিনেও এলেন মহিম। প্রায়ই দেখতে আসেন। ডাক্তার মহিমকে বলেন, অপারেশনের কথাটা ওঁকে শুনিয়ে দেবেন। উনি রাজি আছেন কিনা।

সূর্যকান্ত বলেন, দরকার হলে করবেন বইকি! কিন্তু দরকার আছে বলে তো মনে হয় না।

কথাটা এখন যা-ই ভেবে বলুন, এসব মানুষের দরকার থাকে না কোন-কিছুতে। কোনদিন ছিল না। ঈশ্বর নিয়ে মাথা ঘামান না—ইহকালে যেমন, পরকালের জন্যেও তেমনি কোন প্রার্থনা নেই কারো কাছে। মানুষের যাতে ভাল হয়, তাই চিরদিন করে এসেছেন। কোন রকম উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে, না করে পারবার জো নেই।

অপারেশন আর হল না। এর পরে ক'টা দিন রোগির বেহুঁশ অবস্থায় কাটল। আধেক চক্ষু মেলে নিঃসাড় হয়ে থাকেন, ঘুম কি জাগরণ বোঝা যায় না। মহিম কানের কাছে মুখ এনে প্রশ্ন করেন, মাস্টারমশায়, আমি—আমি মহিম। চিনতে পারেন?

হয়তো বা অতি-অস্পষ্ট হুঁ—আওয়াজ একটু এল।

বাসার ঠিকানা দিয়ে এসেছিলেন মহিম। বিকালবেলা ইস্কুল থেকে সবেমাত্র এসে দাঁড়িয়েছেন, খালি-পা উচ্ছৃঙ্খল-চুল গায়ে শুধুমাত্র একটা আলোয়ান সুরেশ এসে বলে, চলুন দাদা—

সবিস্তারে বলবার প্রয়োজন নেই। ক'দিন থেকেই এখন-তখন অবস্থা। পায়ের জুতোজোড়া খুলে ফেলে মহিম বিনা বাক্যে রাস্তায় নেমে পড়লেন।

অনেকক্ষণ পরে একটা কথা: তোমাকেই আসতে হল?

সুরেশ বলে, লীলাও বেরিয়েছে। কাঁধে করে নিয়ে যাবার চারটে মানুষ চাই অন্তত। কলকাতার মত শহরে তা-ও জোটানো দায় হয়েছে।

জুটে গেল অবশ্য। সুরেশকে যেতে বলে দিয়ে মহিম পুরানো মেসে চললেন। মড়া পোড়ানোর কাজে ভূদেববাবুর উৎসাহ খুব—এক কথায় তাঁকে রাজি করানো গেল। তিনি কাঁধ দেবেন। রাত্তিরের টুইশানি কামাই হবে। হোকগে। তা বলে এত বড় একজন শিক্ষকের গতি হবে না? কাঁধে গামছা ফেলে মহিমের পিছু পিছু ভূদেব ট্রামে গিয়ে উঠলেন।

লীলাও কোথা থেকে আর ছটিকে জুটিয়ে এনেছে। একসময়ে ছাত্র ছিল তারা সূর্যবাবুর। পুরুষ পাঁচজন হল—আবার কি! আর মেয়ে লীলা।

ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে হাসপাতালের ছাড় করে বেরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে

গেল। মড়ি-বওয়া খাটিয়া আনল সুরেশ। অত্যন্ত ছোট, দামে যত সস্তা হয়। সূর্যকান্ত ছোটখাট মানুষটি—কুলিয়ে যাবে একরকমে। বরঞ্চ ভালই হল, হালকা জিনিস কম মানুষে বয়ে নিতে কষ্ট হবে না। চারজনে কাঁধ দিয়েছে, আর একজন পিছু পিছু যাচ্ছে। কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়লে তার সঙ্গে বদলাবদলি হবে।

শ্মশানে সেদিন বড় ভাঁক। মস্ত এক বড়লোক এসে পড়েছেন ভবলীলা সাঙ্গ করে। লোকারণ্য। কীর্তনের দল তিন-চারটে। বৃষ্টির ধারার মতো খই আর পয়সা ছড়াতে ছড়াতে এসেছে সমস্ত পথ। শ্মশানবন্ধুদের মধ্যে কয়েকটা ছোকরা এখন ঘাটের বাঁধানো চাতালের উপর বসে সিগারেট ধরিয়েছে, আর হাসাহাসি করছে, নেপাল-দা গোপাল-দা বড্ড যে দিলদরিয়া। বুড়ো বাপ এদ্দিনে সিঙে ফুঁকল সেই আনন্দে নাকি ?

আর একজন বলে, কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না। আমার ভয় করছে মাইরি। মড়ি পাশমোড়া দিয়ে বসে হয়তো বা হুমকি দিয়ে উঠবে। চিরকেলে কঞ্জুষ মানুষ, ট্রামে সেকেণ্ড ক্লাসের উপরে কোন দিন চড়েন নি—সেই তিনি চোখ বুঁজলেন, অমনি যেন, দেখিয়ে দেখিয়ে সারা পথ পয়সার হরির লুঠ দিয়ে এল। পরলোকে ওঁর কি ভাল ঠেকছে একটুও !

মোটরগাড়ি সঙ্গে এসেছে অমন বিশখানা। সামনের রাস্তাটার আগাগোড়া জুড়ে আছে। বড় দরের আত্মীয়কুটুম্ব ও মেয়েরা এসেছে গাড়িতে। গয়না কত মেয়েদের গায়ে—ঝিকমিক করছে। নজর করলে পাউডারের গুঁড়োও দেখা যাবে ঘাড়ে গর্দানে। পাঁচ-দশ জন চোখ মোছামুছি না করছে এমন নয়। ওদিকে গঙ্গার একেবারে উপরে ধুনি জ্বেলে এক সাধু বসে আছেন। সাধুবাবার কাছাকাছি কয়েকটা বাবু মানুষ বুঝি বোতল বের করে বসল।

একটা গাছের তলায় সূর্যকান্তকে নামিয়ে রেখে মহিম আর ভূদেব যাচ্ছেন ডেথ সার্টিফিকেট দেখিয়ে দাহের জন্য অফিসে টাকা জমা দিতে। এই সমারোহ দেখতে দেখতে যাচ্ছেন। ভূদেব বলে উঠলেন, আমাদের মাস্টারমশায় এসেছেন, কেউ একেবারে টেরই পেল না।

মহিম বলেন, জীবন চুপিসারে কাটালেন, মরণেও ঠিক তাই। যে আমলের গ্রাজুয়েট, ইচ্ছে করলে কেষ্টবিষ্টু একজন হতে পারতেন। কিন্তু গাঁয়ের মধ্যে ছেলেপুলে নিয়ে চিরকাল পড়ে রইলেন।

ঘোষগাঁতির বাড়ি সেই একদিন কথাবার্তা হয়েছিল, মহিমের মনে পড়ে যায়। খুব বড় শিল্পী সূর্যকান্ত—কচিকোমল শিশুদের হাতে নিয়ে বছরের পর বছর ধীরে

ধীরে মানুষ গড়ে তুলতেন। শ্রমের পুরস্কার অর্থে নয়, সৃষ্টির সফলতায়। সকলের চেয়ে বড় পুরস্কার বোধ হয় চারু-দার কাজকর্ম নিজেকে সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখে। গুলিগোলায় ভয় ছিল না, ভয়াতেন কেবল প্রশংসায়। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত এক বুড়িকে দিনরাত্র সেবা করেছিলেন, কেমন করে সেটা চাউর হয়ে গেল। চারু-দা ঘাড় নেড়ে মহাবেগে না না—করতে লাগলেন : আমি কিছু করিনি, আমি কিছু জানি নে। কিন্তু অনেকে সমস্বরে একই কথা বলছে—চারু-দা'র অবস্থা তখন চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ার মতন। মুখ-চোখ রাঙা করে সকলের সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচলেন। এই একটি দিনের ব্যাপার দেখেছিলেন ? হিম।

সূর্যকান্তও তাই। গুরুর এবং ছাত্রের জীবনে এক মন্ত্র—আত্মা-বিলুপ্তি। আধময়লা জামা-কাপড়, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি—হঠাৎ দেখে কে বলবে মানুষটির কিছুমাত্র মূল্য আছে। কথা বলতে যাও, মিনমিন করবেন অচেনা লোকের কাছে। কিন্তু ক্লাসের ছাত্র হয়ে পড়ানো শোন একদিন এই মানুষটির—সে আর-এক মূর্তি। গলার স্বরও যেন সেই সময়টা একেবারে আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু সে হল গ্রাম্য ইস্কুলের ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে ক্লাস, বাইরের গণ্য-মান্যেরা কী খবর রাখেন !

মহিম ও ভূদেব ইতিমধ্যে অফিসে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কাউন্টারের মানুষটির হাড়সর্বস্ব আগুনে-ঝলসানো চেহারা। চিতার ধোঁয়া খেয়ে খেয়ে এমনি হয়েছে বোধ হয়। আজকের আগন্তুক ওই বড়লোকটির প্রসঙ্গ হচ্ছে পাশের একজনের সঙ্গে : হুঁ :, ভারি দেমাক দেখাতে এসেছে ! বিহারের এক জমিদারকে নিয়ে এল সেবার—একমানুষ সমান চন্দনকাঠের চিতে, আর টিন টিন ঘী। হাতের হীরের আংটি ঘুরিয়ে এরা এসে বলছে, ডবল-চিতের খরচা ধরে নিন। আরে ডবল হোক যা-ই হোক, আমকাঠের উপরে তো নয়। আমার কাছে কেউ যেন ফুক্কুড়ি করতে না আসে। আজকের চাকরি নয়। সকাল নেই রাত্রি নেই, চিতে আর চিতে। ষাট-সত্তর হাজার হয়ে গেছে। পুরো এক লক্ষ পুড়িয়ে তারপর নিজে একদিন চিতের উপর চড়ে বসব। সেই শেষ।

সূর্যকান্তর কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে ঘাড় তুলে মহিমের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, পুরো না ঠ্যাং-ভাঙা ?

মহিম জানেন না ব্যাপারটা। বহুদর্শী ভূদেব বুঝিয়ে দিলেন। মড়ি পোড়ানোর দুই রকম রেট। এক হল সাড়ে-তিন টাকা—তাতে ঠ্যাং ভেঙে পোড়ানো হবে। ঠ্যাং ভাঙার দরুণ মড়ির দৈর্ঘ্য কমে গিয়ে চিতার সাইজ

ছোট হয়, কম কাঠ লাগে। সস্তা সেইজন্য। পুরোপুরি লম্বা করে শুইয়ে পোড়াবেন তো আর এক টাকা বেশি—সাড়ে-চার। কীভাবে পোড়াতে চান বলুন—সেইমতো রশিদ কাটা হবে।

ফিরে এলেন তাঁরা পরামর্শের জন্য। সুরেশ-লীলাও আনাড়ি—এ সম্বন্ধে সঠিক জানা ছিল না, ফুল কিনে বাড়তি খরচ করে ফেলেছে। এ-ওর মুখে তাকাতাকি করছে। মহিম পকেট থেকে আনা আষ্টেক বের করে দিলেন। অফিসে গিয়ে বলেন, ঠ্যাং-ভাঙার রশিদ কাটুন মশায়। সাড়ে-তিন টাকা।

চিতা জ্বলল! মহিমের মনে হচ্ছে, প্রাচীন এক আদর্শবাদ আগুনে তুলে দিয়েছেন। অতবড় ভারতী ইনস্টিট্যুশন—এক গঙ্গাপদবাবু ছাড়া শিক্ষক তো মেলে না সেখানে। মিস্ত্রি-কারিগর সকলে। ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়ে গেছে—ক্বচিৎ বা মাটি খুঁড়ে কঙ্কালের অল্পসল্প পাওয়া যায়। কৃষ্ণকিশোর সূর্যকান্ত একে একে সবাই তো চলে গেলেন। লোকের মুখে মুখে গল্প হয়ে ঘুরবেন কিছুকাল।

॥ উনিশ ॥

সতের বছর কেটেছে তারপর। প্রথম সন্তান মেয়ে—মহিম নাম রাখতে চাচ্ছিলেন সরস্বতী। সে নামে বাতিল করে সরলাবালা শৌখিন নাম দিল দীপালী। বলে, নামে তো পয়সা খরচা নেই, তবে বাগড়া দাও কেন? সেকেলে নামে পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতে এগুবে না। বিয়ের মুখে নাম বদল করতে হবে। সেই ঝামেলা গোড়াতেই চুকিয়ে রাখা।

দীপালির পিঠে ছেলে—শুভব্রত। তারপর যমজ মেয়ে হল। দুটোই মরে গেছে। তাদের পরে পুণ্যব্রত—চার বছরেরটি এখন। পুণ্যব্রত হল, আর মহিমের মা সেনগিন্নিকে গঙ্গায় নিয়ে গেল তার ঠিক দুটো দিন পরে। সরলা-বালার শরীরও ভাঙল সেই থেকে—জ্বর গেঁটেবাত, লিভারের ব্যথা—উপসর্গ একটা না একটা আছেই। অনেকদিন বাদ দিয়ে এই এবারে মেয়ে হয়েছে। কিন্তু আঁতুড় থেকে বেরিয়ে সরলাবালা উঠে বসতে পারেনি আর একদিনও। ঘুসঘুসে জ্বর সর্বক্ষণ নাড়িতে। তেজপাতার মতন ফ্যাকাসে চেহারা, শরীরে একফোঁটা রক্ত নেই—উঠতে গেলে পড়ে যায়। কোলের মেয়েটা কিন্তু দিব্যি হয়েছে। ধবধবে রং—মেমদের মতো। সরলাবালা এই অবস্থার মধ্যেও

দীপালির সঙ্গে নামকরণের কথা বলে, রূপালি দিলে কেমন হয় রে? দীপালির বোন রূপালি—কি বলিস?

মা শয্যাশায়ী, সংসার দেখবার দ্বিতীয় মানুষ নেই। সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে তারপর থেকে দীপালি আর ইস্কুলে যায় না। আঁচলে চাবি বেঁধে গিন্নিপনা করে বেড়ায়। শুভব্রত পড়ে ভারতী ইনষ্টিটুশনে। মাস্টারের ছেলে বলে মাইনে লাগে না। বইও কিনতে হয় না, মাংনা পাওয়া যায়। ইস্কুলের শিলমারা চিঠি নিয়ে পাবলিশারদের কাছে গেলেই হল: একটি গরিব মেধাবী ছাত্রের জন্য একখানা করিয়া বই দিবেন। বাপ-বাপ বলে তারা দেবে, নয়তো আগামী বছর বই কাটা পড়বে লিস্ট থেকে। মেধাবী ছাত্র শুভব্রত, সেটা কিন্তু মিথ্যা নয়। ক্লাসের মধ্যে ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয়। চেক চালাচলি করতে হয় না, বিনা তদ্বিরেই হয়ে থাকে।

কিন্তু মুশকিল হল সকলের ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে। যার নাম রূপালি। একফোঁটা মায়ের দুধ পায় না। দিন দিন সলতে হয়ে যাচ্ছে। মাস্টারদের মধ্যে পতাকীচরণ মানুষটা তুখড়। যত ছাত্র আর গার্জেন, নাড়িনক্ষত্রের খোঁজ রাখেন তিনি সকলের। দুনিয়াসুদ্ধ লোকের সঙ্গে মেলামেশা। করেনও তিনি পর-অপরের জন্য। মহিম তাঁকে গিয়ে ধরলেন: বাচ্চাকে তো বাঁচাতে পারি নে পতাকীবাবু। ওর মা'র যা দেখছি, নিজের অসুখের যন্ত্রণার চেয়ে বাচ্চার জন্য দুঃখটা বেশি। হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল কাল। তারপরে সারা রাত্রি আর ঘুম হল না। সত্যি, কী জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের! পড়ানো আর পড়ানো—সাংসারের দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখার সময় হয় না।

কাতর অনুনয়ের কণ্ঠে বললেন, ঘাঁতঘোঁত সমস্ত আপনার জানা। একটা উপায় করে দিন পতাকীবাবু। দিতেই হবে।

পতাকী হাসিমুখে নির্বিকারভাবে বললেন, কি চাই সেটা তো খুলে বলবেন—

গ্লাসকো কিংবা ঐ জাতীয় কিছু।

ক'টা চাই?

মহিম অবাক হয়ে বলেন, লোকে তো চৌপর দিন মাথা খুঁড়ে একটাই যোগাড় করতে পারে না।

আবার কায়দা জানলে ডজন ডজন যোগাড় হয়ে যায়। আচ্ছা, কাল বলব আপনাকে।

পরদিন পতাকী বলেন, হবে। দুটো বা তিনটে আপাতত।

কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে মহিম বলেন, ওঃ বাঁচালেন ভাই। শিশুর প্রাণদান করলেন।

পতাকী বলেন, দরকার হলে পরে আরও পাবেন। কিন্তু দামটা কিছু চড়া।

মহিম ভীতস্বরে প্রশ্ন করেন, কত? আড়াই টাকা তিন টাকার জিনিস ছ-সাত টাকায় কিনছেন নাকি কেউ কেউ। মরি-মরি করে তা-ই না হয় দেওয়া যাবে। প্রাণের বড় কিছু নয়।

পতাকীচরণ দরাজ ভাবে হাসতে লাগলেন: কার কাছে শোনেন মশায় ছ'টাকায় পাওয়া যায়, কে এনে হাতে তুলে দিচ্ছে? বাঘের দুধ হয়তো জোটানো যায়, কিন্তু এই সমস্ত ফুড কি দরকারি অষুধ-পত্তর একরত্তি বাজারে পাবেন না। যদি পান, ভেজাল মাল। কিন্তু দরদাম আমি টাকার হিসাবে বলছি নে। টেস্ট-পরীক্ষা দিয়েছে—পাশ করিয়ে একেবারে 'সেণ্ট আপ' করে দিতে হবে ছেলেটাকে।

ফিসফিস করে পতাকীচরণ ছেলের নাম বললেন। অলককুমার ঘোষ।

মহিমের চমক লাগে: আরে সর্বনাশ, সেই দামড়া ছেলেটা তো! ছেলে আর বলছেন কেন তাকে—বয়সের গাছ-পাথর নেই। ম্যাট্রিক দিতে চায়, কিন্তু বি. এ পাশ করলেই মানান হত বয়সের পক্ষে।

পতাকী বলেন, সেই ম্যাট্রিকও তো দিতে দিচ্ছেন না আপনারা। টেস্টে ফেল করিয়ে আটকে রাখবেন। বয়স বেড়ে গেছে, আরও বাড়বে। আবার তা-ও বুঝুন—বাপের কালোবাজারি কারবার। সেই বাপের মাথায় হাত বুলিয়ে মাল সরিয়ে এনে দেওয়া। একফোঁটা পুচকে ছোঁড়া হলে পারত এই কাজ?

মহিম বলেন, আপনি টাকায় দেখুন পতাকীবাবু। ছ'টাকায় না হল তো আরও কিছু বাড়ানো যাবে।

পাবেনই না মোটে। হাত ঘুরিয়ে ব্যঙ্গের স্বরে পতাকী বলেন, বিশ বছর মাস্টারি হতে চলল, এখনো সলজ্জ নববধূটি! ঝামেলা বেশি-কিছু নয়—আজেবাজে ইস্কুলে ফেল করে করে বয়স বেড়ে গেছে। কালাচাঁদবাবুকে টিউটর রেখে তবে এদ্দিনে এই ইস্কুলে ঢুকতে পারল। গোড়া বেঁধে সব কাজকর্ম। কালাচাঁদবাবু হিস্ট্রীর খাতা দেখছেন, এক'শর কাছাকাছি তো পাবেই। নবীন পণ্ডিত মহাশয়ের সংস্কৃত—কালাচাঁদবাবু, দেখেননি, ঘুণ হয়ে বসে তাঁর খবরের কাগজের ব্যাখ্যা শোনেন—সেটা এমনি নয়। পাশের নম্বর আদায় হয়ে যাবে পণ্ডিতমশায়ের কাছ থেকে! বাংলায় তো আপনি আপনি পাশ হয়ে যায়, ফেল

কপ্পানোই বরঞ্চ মুশকিল। বাকি আর কি রইল তবে? অঙ্ক আর ইংরেজি। অঙ্ক আপনি দেখেছেন, ইংরেজি দাশুর কাছে। নতুন সুপারিন্টেডেণ্ট হয়ে দাশুর পায়াভারি—কালাচাঁদবাবুর উপর রাগও আছে, ওকে টুইশানি জুটিয়ে দেননি। আরে ফাঁকিবাজ মাস্টার—ছেলেরা চায় না, কালাচাঁদবাবুর কি দোষ? সে যাই হোক, দাশুরটা আপনাকে দেখতে হবে মশায়। কালাচাঁদবাবু পড়ান, সেটা টের না পায়। টের পেলে আর হবে না। চেষ্টা করে দেখুন, না হলে কী করা যাবে! এক সাবজেক্টে ফেল—কালাচাঁদবাবুই তখন হেড মাস্টারকে গিয়ে বলবেন।

মহিম দোমনা হলেন। ওর চেয়ে ভাল ছেলেরা পড়ে থাকবে, আর তদ্বিরের জোরে ড্যাং-ড্যাং করে বেরিয়ে যাবে অলক। অন্যায়, অধর্ম।

মনের কথাটা কেমন করে বুঝে নিয়েই যেন পতাকী বললেন, আরও দশজনার গরজ আছে বেবি-ফুড সকলকে বাদ দিয়ে আপনি নিচ্ছেন—এটাও ধর্মকাজ নয়। এত খুঁতখুঁতানি বলেই আমাদের মাস্টারদের কিছু হয় না। বলি, ব্যাপার হল তো কিছু মার্ক দেওয়ার! নিজে দেবেন, আর কিছু পাইয়ে দেবেন। সত্যি কথা বলুন মহিমবাবু, দেননি কোনোদিন কারো নম্বর বাড়িয়ে? খাতিরে দিতে হয়েছে। এখানেও তাই, বাচ্চা মেয়েটাকে বাঁচানোর খাতিরে দেবেন।

…অবোধ শিশু ক্ষিদের জ্বালায় সারারাত্রি কেঁদেছে কাল, চিলেকোঠা থেকে শুনতে পেয়ে মহিম নিচে নেমে এলেন। রোগার্ত সরলাবালা বুক ছেড়ে দিয়ে কাঁদছেন। ঘুম থেকে উঠে চোখ মুছতে মুছতে দীপালিও ভেবে পায় না, কী করা উচিত। উনুন ধরিয়ে বার্লি ফুটিয়ে তাই খানিক গেলানো হল বাচ্চাটাকে…

মহিম রাজি। অলক ছেলেটা বিনয়ী, কথাবার্তা বলে খাসা। বলল, লজ্জার ব্যাপার স্যার। আপনি নেবেন, আপনার লজ্জা; আমি দেব, আমারও লজ্জা। শখের ব্যাপার তো নয়, তাহলে একাজে যেতাম না। অসুধ না হলেও পথ্যি। খালের উপর বটগাছ আছে, সন্ধ্যের পর বটতলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। গায়ে আলোয়ান থাকে যেন স্যার।

খিদিরপুর বাজারের পিছন দিকে খুব নিরিবিলি জায়গা। জায়গাটা অলক ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। রাতের টুইশানি সেদিন কামাই করতে হল। পরীক্ষা হয়ে গেছে, ফল বেরোয়নি—এখন এক আধবেলা কামাই করলে তত

বেশি আপত্তি হয় না। দাঁড়িয়ে আছেন মহিম। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, রাস্তা নয় বলে আলো দেয় না এদিকটা। ঝাঁকড়া বটগাছ মাথার উপরে ডালপালা মেলে আছে। অন্ধকারের মধ্যে সাঁ করে অলক চলে এল। ফিসফিস করে বলে, তিনটে হল না সার, আজকে দুটো নিয়ে যান। আলোয়ান জড়িয়ে ফেলুন গায়ে, আলোয়ানের নিচে ঢেকে নিন। বেরিয়ে পড়ুন, দেরি করবেন না। পুলিশ অনেক সময় ঘাপটি মেরে থাকে।

কৌটো দুটো পর পর কাগজে জড়িয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে এনেছে— আলোয়ানের নিচে হাতে ঝুলিয়ে নিতে অসুবিধা নেই। এদিকটায় মহিমের আসা যাওয়া খুব কম। ঘুরে এসে রাস্তায় পড়লেন। হনহন করে চলেছেন। পিছন থেকে কে ডাকছে, মহিম না? দাঁড়াও মহিম, অত ছুটছ কেন? তোমায় আমি খুঁজছি।

সাতু ঘোষ। প্রথমটা মহিম চিনতে পারেননি। সাতু ঘোষ ইদানীং দাড়ি রাখেন—পাকা দাড়ি। নৈমিষারণ্যবাসী পৌরাণিক ঋষিতপস্বীর মতন। এমন চেহারায় এক নজরে চিনবেন কি করে?

সাতু বললেন, আমি খোঁজাখুঁজি করছিলাম। তারপরে শুনি, ভারতী ইস্কুলের মাস্টার হয়েছ, প্রাইভেট পড়ানোয় খুব নাম করে ফেলেছ। ইস্কুল থেকে তোমার বাসার ঠিকানাও এনে রেখেছি। যাব-যাব করছিলাম। আমার ছেলেটাকে এবার ওই ইস্কুলে ঢুকিয়েছি। জানব কি করে তুমি ওখানে—তাহলে তো কম ঝামেলায় হয়ে যেত। চালানি কারবার একটা ফেঁদেছি এই বাজারে। এস আমার সঙ্গে। কথা আছে।

বৃহৎ টিনের ঘর।—সামনের দিকে তিন-চারটা খোপ—একটায় অফিসের মতন চেয়ার-টেবিল সাজানো। সাতু ঘোষ এক চেয়ারে বসে পড়লেন। মহিমকে বলেন, মেসের সাইনবোর্ডে মার্চেন্টস লিখেছিলাম, মনে পড়ে? সেই গোড়ার আমলেই এত সব ভেবে রেখেছি। একটা একটা করে সবগুলো ফলে যাচ্ছে। ব্যাঙ্কার্স লিখেছিলাম—ব্যাঙ্কও হয়েছে একটা। কল্যাণশ্রী ব্যাঙ্ক— নাম শোননি? বোসো—বসো না হে ভাল করে। ম্যানেজার, এই মহিমকে আমিই প্রথম কলকাতায় নিয়ে আসি। আজকে গণ্যমান্য হয়েছে! এক কাপ চা দিতে বল তাড়াতাড়ি।

ম্যানেজার খুব বিচলিত। বলে, এ যে দিনে-ডাকাতি হতে চলল। এক ডজন গ্লাকসো ঘণ্টা খানেক আগে বের করে দিয়েছি। ক্যানিঙের ক্ষুদিরাম সাহার ঘরে উঠবে—এখন মিল করতে গিয়ে দেখছি দুটো কম।

সাতু ঘোষ অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, ন্যাকামি রাখ ওই সমস্ত। এটা যাচ্ছে—ওটা যাচ্ছে—যত চোরের আড্ডাখানা হয়েছে। এক ঘণ্টার মধ্যে যায় কোথায়। কৌটোর গায়ে পাখনা গজায়নি, উড়ে যেতে পারে না। কাউকে বেরিয়ে যেতে দেবে না, সার্চ করব সকলকে। শীতকাল বলে মজা হয়েছে—আলোয়ান গায়ে ঘোরাফেরা করে, তার নিচে মাল সরায়। কে কে ছিল ও-ঘরে ?

ক্যাশিয়ার চুনিবাবু—

তাঁকে বাদ দাও। আর কে ?

হাজারি আর কুলচন্দ্র বওয়াবয়ি করছিল। আর শুনলাম খোকাবাবু একবার এসে ঢুকেছিলেন।

সাতু ঘোষ ভ্রূকুটি করলেন : খোকাবাবু মানে তো অলক ? বাড়িতে পড়াশুনা করবে, সে কি জন্য আসতে গেল এখানে ? মানা করে দিয়েছি তো, গুদামের ওদিকটা তাকে ঢুকতে দেবে না—কী দরকার, আগে জিজ্ঞাসা করে নেবে।

ম্যানেজার বলে, আমি তখন ছিলাম না। আর চুনিবাবুকে জানেন তো—খোকাবাবু ঢুকতে গেলে পথ আটকাবেন, তাঁর কি সেই তাগত আছে ?

আচ্ছা, খুঁজে দেখগে ভাল করে—

বলে ওই প্রসঙ্গ চুকিয়ে দিয়ে সাতু ঘোষ মহিমের দিকে তাকালেন : জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে কেন ? বোসো।

ছেলে পড়ানো আছে। ছুটতে হবে এখনই।

সাতু জিজ্ঞাসা করেন, এদিকে কিজন্যে এসেছিলে ?

অদৃষ্ট ভাল, মিথ্যেকথা চট করে এসে গেল মহিমের : ডায়মণ্ডহারবার রোডে এক বন্ধুকে দেখতে এসেছিলাম। অসুখ তার।

সাতু ঘোষ বলেন, ভাল হল তোমায় পেয়ে। শোন, আমার ছেলে টেস্ট দিয়েছে তোমাদের ইস্কুলে। তাকে পড়াতে হবে।

কালাচাঁদবাবু তো পড়িয়ে থাকেন।

বোলো না, বোলো না ! ওরকম ফাঁকিবাজ জন্মে দেখিনি।

এটা-সেটা লেগেই আছে, কামাই-এর অন্ত নেই। ওঁকে মাস্টার রেখে এক মাসের মাইনে অগ্রিম দাদন দিয়ে তবে ভর্তি করতে পেরেছি। এখনো টেনে যাচ্ছি—টেস্ট দিয়েছে, ফাইন্যালেও যদি গিয়ে বসতে দেয়। কালাচাঁদবাবুর মাইনে আমি পড়ানোর হিসাবে ধরি নে, তদ্বিরের খরচা। তা দেখ, দুজন মাস্টার রেখে পড়াবার ক্ষমতা আছে আমার। উনি পড়ালেন না পড়ালেন গ্রাহ্য করি নে। তোমায় পড়াতে হবে ভাই।

বলেন, এক ছেলে ওই আমার। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওই যে ব্লাকলোর কথা শুনলে—কৌটো ফুটো অন্য কেউ নয়, অলকই সরিয়েছে। তোমার কাছে গোপন কি—কারবারে যথেষ্ট উন্নতি করেছি, কিন্তু মনে শান্তি নেই। ছেলেটা চোর হয়ে গেল, হামেশাই জিনিসপত্র সরায়। সিগারেট ফোঁকে, সিনেমায় যায়, অসৎসঙ্গে পড়ে গেছে।

কাতর হয়ে বলতে লাগলেন, তুমি সাধুচরিত্র। ম্যানেজারকে দেখলে—আমার সঙ্গে থেকে ওই লোকও কলকাতার উপর একখানা বাড়ি তুলেছে। তোমারই তো এসব হবার কথা। কিন্তু টাকাপয়সা হাতের ময়লা তোমার কাছে। বড় আদর্শ নিয়ে সৎ-জীবনযাপন করছ। ওতেই সুখশান্তি—বুড়ো বয়সে আজকে তা বুঝতে পারছি। ছেলে টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছে, পাশ করে ভালই। কিন্তু সেটা নিয়ে তত মাথা ঘামাই নে। তোমার দৃষ্টান্তে অলক মানুষ হয়ে উঠুক, এই আমি চাই। তুমি ওর ভার নাও। কথা না পেলে কিন্তু উঠতে দেব না ভাই।

কথা দিয়ে আসতে হল। নয়তো হাত জড়িয়ে ধরতে যান (হাতে কৌটা ফুটি)। সেই ভয়েই তাড়াতাড়ি কথা দিতে হয়।

টুইশানি ইদানীং আসে অনেক। শুষ্ক মুখে হাসি টেনে এনে অন্য মাস্টাররা বলেন, টুইশানি-রাজ্যের সার্বভৌম সম্রাট। আগে ছিলেন সলিলবাবু, সেই সিংহাসনে এখন মহিমবাবু বসেছেন। সত্যি খুব জমে গেছে। বিশেষ করে এই সময়টা—টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা সামনে। টিউটরদের লগনসা হল এই তিনটে মাস। কত রকমের কত টুইশানি আসে, কিন্তু অলকের এই টুইশানি এসে গেল মজার অবস্থায়। সাধুত্বের প্রশংসা করেছেন সাতু ঘোষ। আর সেই সময়ে আলোয়ানের নিচে বুকের উপর ব্লাকলোর কৌটো ফুটো চেপে ধরে আছেন, বুক ধড়াস-ধড়াস করছে মহিমের। হাঁ—বলে ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে এসে বাঁচলেন।

একদিন দাশুর বাড়ি গেলেন অলকের ইংরেজির তদ্বিরে। ভাল ভাল খোশামুদি কথা মনে মনে তালিম দিয়ে এসেছেন। আগের মতন শুধু দাশু নয়—দাশুবাবু বলতে হবে।

এত বড় ইস্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হলে দাশুবাবু, ভগবান তোমায় বড় করেছেন। বড্ড খুশি আমরা সকলে।

ভগবান এমনি-এমনি বড় করলেন? খেয়ালখুশি মতো?

ইঙ্গিত বুঝে মহিম তাড়াতাড়ি বলেন, গুণ না থাকলে কি কেউ বড় হয় ? গুণীর উপর ভগবানের দয়া। তবে দয়াটা আদায় করে নিতে হয়। তোমার ভাই গুণ রয়েছে, সেই সঙ্গে উদ্যোগও রয়েছে : এই বয়সে সকলের মাথার উপরে। একটা দরবারে এলাম দাশুবাবু। আমার ছাত্রের পাশ-নম্বর করে দিতে হবে।

বড় পদে উঠে গিয়ে দাশু ন্যায়নিষ্ঠ হয়েছেন। এক কথায় কেটে দিলেন : নম্বর দেবার মালিক আমি তো নই। নম্বর সে নিজে নেবে, নম্বর আছে তার খাতায়। যেমন লিখেছে, ঠিক সেই রকম পাবে।

আরও গম্ভীর হয়ে বলেন, অন্য কথা থাকে তো বলুন। প্রবীণ শিক্ষক হয়ে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিচ্ছেন, দেখে দুঃখিত হলাম। এসব কথা উপরে চলে গেলে চাকরি নিয়ে টান পড়বে।

মহিমের হঠাৎ কী রোখ চেপে গেল, উচিত জবাব না দিয়ে পারেন না। বললেন, উপর অবধি কেন যাবে দাশুভাই ? তেমন সম্পর্ক আমাদের মধ্যে তো নয়। প্রথম যেবার এখানে আসি—ইস্কুলের হালচাল কিছু জানি নে, মাস্টারি মহৎ কর্ম বলে মনে করি, প্রেসিডেন্টের বাড়ি সর্বদা যাতায়াত তখন—তুমিই একটা ছাত্রের ব্যাপারে গিয়েছিলে আমার কাছে। সেসব কথা প্রেসিডেন্ট অবধি যায়নি, এখন কিজন্য তবে যাবে ?

দাশুর কিছুই মনে পড়ছে না।

মহিম বলেন, ছাত্রেরনামটা বলে দিচ্ছি। মলয় চৌধুরি ফুটফুটে পদ্মফুলের মতো ছেলে। সেই ছেলে একদিন পায়খানায় খারাপ কথা লেখার জন্য ধরা পড়ে গেল।

দাশু বলেন, ও। কিন্তু নম্বর কমানোর জন্য বলেছিলাম, বাড়াতে বলিনি তো। তাতে দোষটা কি হল ? একশ টাকা পাওনার জায়গায় পঞ্চাশ নিলে দোষ হয় না, পঞ্চাশের জায়গায় একশ দাবি করলেই দোষ দাঁড়ায়।

কি ভেবে দাশু উঠে দাঁড়িয়ে আলমারির মাথা থেকে খাতার বাণ্ডিল নামালেন।

কোনটা আপনার ছাত্র ?

অলককুমার ঘোষ—এই যে।

ছত্রিশ পেলে পাশ, সাঁইত্রিশ করে দিলাম। হল তো ?

ভিতরে কি আছে, দেখলে না তো ?

দাশু বলেন. দেখতে হয় না। ছেলেদের নাড়ি নক্ষত্র জানা। ক্লাসে দিনের পর দিন দেখছি—এখন আবার খাতা খুলে নতুন কি দেখব ? এই অলক ঘোষ

পাবে সাত কি আট—ফেল মানে একেবারে জব্বর রকমের ফেল। বিশ্বাস না হয়, আপনার সামনে পাতায় পাতায় নম্বর দিয়ে যাচ্ছি। আটের উপরে সিকি নম্বর পায় তো বুঝতে হবে টুকে মেরেছে।

কেল্লা ফতে করে মহিম প্রসন্ন চিত্তে ফিরলেন। টুইশানিতে পারতপক্ষে তিনি না বলেন না। টাকার বড় প্রয়োজন। মায়ের শ্রাদ্ধ বেশ জাঁকিয়ে করেছিলেন। গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ শান্তি হল। মৃতের কল্যাণে ভূরিভোজন—এখানকার বাসায় মাস্টারমশায় সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন, আবার আলতাপোল গিয়ে চারখানা গাঁয়ের সমাজ ডাকলেন। মোটা দেনা হয়েছিল, টুইশানির টাকায় সমস্ত শোধ করে এনেছেন। মেয়ে সেয়ানা হয়েছে, তার বিয়ের জন্য সঞ্চয় এবারে। পাখি যেমন বাসার জন্য খড়কুটো বয়ে আনে, মহিম তেমনি দশ বাড়ি পড়িয়ে এখান থেকে দুখানা ওখান থেকে আড়াইখানা নোট এনে এনে জমাচ্ছেন। মবলগ টাকার ব্যাপার। কন্যাদায় চুকে গেলে তার পরে আবার ছেলের দায়। শুভব্রতকে মানুষ করতে হবে। নিজের যত কষ্টই হোক, ছেলের শিক্ষা-ব্যাপারে কৃপণতা করবেন না। যতদুর পড়তে চায় পড়বে। ছেলে মানুষ হলে দুঃখ ঘুচে যাবে তাঁদের।

॥ কুড়ি ॥

ডি-ডি ডি অবসর নিয়েছেন অনেকদিন। নতুন হেডমাস্টার এখন—কমবয়সি চটপটে মানুষ। পাশ করানোর ব্যাপারে মহিমের দক্ষতা তাঁরও কানে গিয়েছে। টেস্ট পরীক্ষায় ছেলে এক বিষয়ে কম নম্বর পেয়েছে—হেডমাস্টার বলে দিলেন, মহিমবাবুকে ধর, উনি যদি ভার নেন, পাশ করিয়ে দেবেন। আমার কাছে বলে যান, তবে তোমায় পাঠাতে পারি। হেডমাস্টারের কাছ থেকে এসে ছেলে মহিমকে ধরে। হাসতে হাসতে বিপুল আত্মতৃপ্তির সঙ্গে মহিম বলেন, হেডমাস্টার মশায় জানেন কিনা! তিনি তো বলবেনই। কিন্তু কতজনের ভার নেব, বল্ দিকি! মেরে ফেলবি নাকি আমায় তোরা?

আপনি বললে তবেই হেডমাস্টার পাঠাবেন। বলে দিন কবে থেকে যাবেন।

মহিম আপাতত তা-না-না-না করে ছেড়ে দিলেন। ঘুরুক দুটো-একটা দিন, দর উঠুক। নাছোড়বান্দা ছাত্র পরের দিন বাড়ি থেকে অভিভাবক সঙ্গে নিয়ে আসে। বাবা, কাকা কি দাদা।

মহিমবাবু আপনি ? নমস্কার ! চোখে না দেখেও নাম জানি খুব। ছেলে বলে, আপনি যাদের পড়ান তাদের কেউ ফেল হয় না। অফিস কামাই করে এসেছি, অসিতের অঙ্কটা আপনি না দেখলে কিছুতে হবে না।

মহিম বলেন, আপনারা আগে কোথায় থাকেন বলুন তো ? ভাল পড়াচ্ছি কি এই টেস্টের রেজাল্ট বেরনোর পর থেকে ? মার্চের প্রথম হপ্তায় ফাইন্যাল—এর মধ্যে কি শেখাব, আর কতই বা নম্বর পাওয়াব ?

অভিভাবক বলেন, শেখাতে হবে না মাস্টারমশায়। পাশ-টাস করে নিয়ে কপালে থাকে তো ধীরেসুস্থে পরে লিখবে। শেখার কি শেষ আছে জীবনে ? নম্বর পেলেই হল—টায়েটায়ে পাশের নম্বরটা নয়, তার কিছু উপরে।

আরে মশায়, নম্বর দেবে তো য়্যুনিভার্সিটি। নম্বর কি আমার বাক্সে তোলা রয়েছে যে বের করে এনে দিলেই হল।

অভিভাবক হেসে বলেন, ছেলে যেমনধারা বলে, তাতে তো মনে হয় তাই—আপনার বাক্সের নম্বর !

কাজের কথা এবারে, মহিম গম্ভীর হলেন : কম সময়ের ভিতর কাজ দেখাতে হবে। এর আলাদা রেট—কণ্ট্রাক্টের কাজের মতন।

রেট শুনে অভিভাবকের চক্ষু কপালে ওঠে : শিক্ষক আপনারা, ছাত্র-শিক্ষা দিয়ে পুণ্যকর্ম করছেন। নিতান্ত কাটথোটের মতন হয়ে যাচ্ছে যে মাস্টারমশায়।

দু বছর ধরে টিউটর রেখে যা পেতেন, তিনটে মাসে তাই আদায় হয়ে যাচ্ছে। মাইনেটা দু' বছরের হিসাব ধরুন, খুব সস্তাই ঠেকবে।

সত্যিই অদ্ভুতকর্মা মহিম। অঙ্ক ইংরেজি বাংলা তিনটে বিষয়ে চৌকোস মাস্টার— বেঁটেখাতায় লিসার মারতে চিত্তবাবুর সুবিধা। বলেন, গোলআলু—ঝাল-ঝোল-চচ্চড়িতে যেমন খুশি লাগিয়ে দেওয়া যায়, ভাবতে হয় না। মহিম ভেবে ভেবে কয়েক ধরনের অঙ্ক কষবার সংক্ষিপ্ত নিয়ম বের করেছেন—মাথা ঘামাতে হয় না, ছকে ফেলে দিলে আপনি হয়ে যায়। আর যেন একটা তৃতীয় দৃষ্টি খুলে গেছে—ফাইন্যাল পরীক্ষায় কি কি আসতে পারে দাগ দিয়ে দেন, তারই পনের আনা এসে যায়। এক-আধ বারের কথা নয়, বছর বছর এমনি হয়ে আসছে। তাতেই আরও নাম হয়ে গেল ছেলেমহলে।

লাইব্রেরি ঘরে টিফিনের সময় দাশু জিজ্ঞাসা করেন, এবারে কতগুলো গাঁথলেন মহিমবাবু ?

সামান্য—

ভজন পুরল ?

হাঁা তাই বুঝি পারে মানুষ !

হুবহু সলিলবাবুর মুখের কথা। একবার মহিম চোখ বুলিয়ে নিলেন অন্যান্য মাস্টারের উপর। কতজনে একটা দুটো টুইশানিও জোটাতে পারে না, তাঁর বেলা এমন হয়েছে ঠেলে সরিয়ে কুল পাচ্ছে না।

ক'টা হল, বলুন না—

আসছে যাচ্ছে, জোয়ার-ভাঁটার খেলা—এর কি হিসাব থাকে দাশুবাবু ?

গঙ্গাপদবাবু দেহ রেখেছেন, দাশু তাঁর জায়গায় নতুন সুপারিন্টেন্ডেন্ট। বেশি টুইশানি করলে ইস্কুলের কাজ হয় না, এই দাশুর ধারণা। বলেও থাকেন তাই। পতাকীচরণ চুপিচুপি বলেন, নিজে পায় না বলে হিংসে। অমন ফাঁকিবাজ মাস্টারকে কে ডাকবে ? খোশামুদি করে কমিটির মন ভেজানো যায়, কিন্তু ছেলের বাপ ভিজবেন ছেলে যদি কিছু শিখতে পারে তবেই।

একটা জিনিষ মহিমকে বড় ভাবিয়ে তুলেছে। দাশুকে বলেন, চোখ দিন-কে-দিন খারাপ হয়ে পড়ছে। কী করা যায় বল দিকি ?

দাশু এককথায় জবাব দেন : চোখ খাটাচ্ছেন যে বড্ড। বিশ্রাম নিন। টুইশানির—অর্ধেক নয়, একেবারে বারো আনা ছেঁটে ফেলুন।

পতাকীচরণ টিপ্পনী কেটে ওঠেন : চোখের খাটনি কিসে ? মহিমবাবুর পড়াতে চোখ লাগে না। সবই ওঁর মুখস্থ—চোখ বুজে বুজেই উনি পড়ান।

কথা মিথ্যে নয়। পড়িয়ে পড়িয়ে এমন হয়ে গেছে—অ্যালজাব্রা না দেখেই বলতে বলতে ক্লাসে ঢোকেন, তিনশ-ছিয়াত্তরের পাতায় সাতাশ নম্বরের অঙ্ক, লিখে নে। এ-কিউব থ্ইস এ-স্কোয়ার বি···দীর্ঘ অঙ্কটা বলে যাচ্ছেন। বই খুলে মিলিয়ে দেখ, একটুকু হেরফের নেই।

মহিমের বাসা আগে ইস্কুলের কাছাকাছি ছিল, এখন সেই সানগরের দিকে গিয়ে বাড়ি ভাড়া করেছেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করে, অত দূরে কেন মাস্টারমশায় ? কাছাকাছিই তো বেশ ছিল। অনর্থক হয়রানি।

শুধুমাত্র ছাত্রের বাড়ি ছাড়া মহিম কথাবার্তা ইদানীং কমিয়ে দিয়েছেন। ফুসফুস যন্ত্রকে বিনামূল্যে খাটাতে যাবেন কেন ? মৃদু হেসে তিনি বলেন, হুঁ—

দুই রকমের হাঁটনা মহিমের। সব টিউটরেরই। একসময় দেখবে, গতিবেগ মোটরগাড়ি হার মেনে যাচ্ছে। ছাত্রের বাড়ি চলেছেন সেই সময়। এক বাড়ি সারা করে অন্য ছাত্রের বাড়ি যাচ্ছেন, গতিবেগ ডবল হয়ে গেছে তখন। আবার

একসময় সেই মানুষ ছ্যাকড়া-গাড়ির ঘোড়ার মতন খুটখুট খুটখুট পা ফেলে চলেছেন। সেটা নিশিরাত্রে। বুঝে নেবে, কাজকর্ম শেষ করে ঘরে ফিরছেন এবারে।

একতলার ছাতে চিলেকোঠায় মহিমের নিরিবিলি ঘর। একা শোন ওই ঘরে। ঘুম থেকে উঠে পড়েন, পুরোপুরি দিনমান নয় তখনও। পোহাতি তারা পশ্চিম আকাশে জ্বলজ্বল করছে। ওই শেষরাত্রেই স্নান করে চালের কলসি থেকে গোণা বারো-চোদ্দটি চাল মুখে ফেলে ঢকঢক করে এক গেলাস খেয়ে কাঁধে চাদর ও হাতে ছাতা তুলে নেন। দুর্গা-দুর্গা—বলে দেয়ালে টাঙানো পটের দিকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়েন এবার। যাওয়ার সময় মেয়ের নাম ধরে ডেকে যান, ওরে দীপালি, দুয়োর খোলা রইল। ওঠ এইবার তোরা। বেলা হয়েছে, উনুনে আগুন-টাগুন দে।

ডাকলেন এইমাত্র—তাকিয়েও দেখলেন না তাঁর আহ্বান কানে গেল কি না। দেখার ফুরসত কই? ঢং করে সাড়ে-চারটে বাজার আওয়াজ হল কোন বাড়ির ঘড়িতে—কে যেন সপাং করে চাবুক মারল মহিমের পিঠে। হাঁটা নয়—দৌড়চ্ছেন একরকম। এমন শক্তি শীর্ণ দীর্ঘ পা-দুটোর!

পাড়াটা তীরবেগে অতিক্রম করে মহিম তিন তিনটে চৌমাথায় এসে পড়েন দিনের প্রথম পড়ানো এইখানে—ডানদিকের দোতলা বাড়িটায়। ছাত্রের নাম প্রবোধ। আগের বছর ফেল হয়েছিল, তার পরেই মহিম-মাস্টারের খোঁজ পড়ে। মহিম বলেছিলেন গায়ে ফুঁ দিয়ে কেউ পাশ করতে পারে না বাবা। বিশেষ করে তোর মত অঘা ছেলে। রাত থাকতে উঠে পড়বি। চারদিক ঠাণ্ডা থাকে তখন খুব মুখস্থ হয়। পড়েই দেখ না ক'দিন—হাতে হাতে ফল পাবি।

প্রবোধ অসহায়ভাবে বলে, ইচ্ছে তো করে মাস্টারমশায়, কিন্তু উঠতে পারি নে। ঘুম ভাঙে না কিছুতে।

তাই তো! বাড়ির লোককে বলে রাখতে পারিস, তাঁরা তুলে দেবেন।

আমার উপর দিয়ে যান তাঁরা। আমি যদি সাতটায়, বাবা ওঠেন আটটায়। মা সাড়ে ন'টায়।

মুশকিল তবে তো! একটুখানি চিন্তা করে মহিম বললেন, আচ্ছা, নিচের ঘরে—এই পড়ার ঘরে শুবি তুই। শেষরাতের দিকে উঠিস তো একবার—খিলটা তখন খুলে রেখে দিবি। আমি এসে ডেকে তুলব।

আপনি স্যার এই শীতের রাত্রে—শীতটা বেশি পড়ে গেল হঠাৎ আজ ক'দিন—

কি করব বাবা, উপায় নেই। ভার নিয়েছি যখন, তোর বাবার কাছে কথা দিয়েছি পাশ করিয়ে দেব।

মহিম-মাস্টারের কর্তব্যজ্ঞান দেখে প্রবোধের বাড়ির সকলে অবাক হয়ে গেছে। মাস্টার এসে পড়িয়ে যান, কেউ তা জানতে পারে না। প্রবোধ তারপর থেকে গলা ফাটিয়ে পড়তে লাগে। কিন্তু শেষরাত্রি থেকে না ধরলে মহিম যে কোনরকমে সময় কুলিয়ে উঠতে পারেন না। এতগুলোর দায়িত্ব নিয়েছেন, নিদেনপক্ষে এক ঘণ্টা করে পড়াবেন তো প্রতি জায়গায়। না হল পঞ্চাশ মিনিট। মুশকিল হয়েছে, বিধাতা মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় দিনরাত্রি করেছেন —এর ভিতর থেকেও খাওয়া ও ঘুমে ঘণ্টা আষ্টেক বাজে খরচ হয়ে যায়। আবার ইস্কুলে আছে সাড়ে-দশটা থেকে চারটে।

প্রবোধকে শেষ করে মহিম পথে বেরোন, রাস্তায় তখনো গ্যাসের আলো। কালীঘাট মুখো ছুটেছেন। এবারের বাড়িটায় সুবিধা আছে—কর্তাবাবু ভোরবেলায় ট্রামে উঠে চাঁদপালঘাটে বড়-গঙ্গায় নাইতে যান। তার আগে নিজের হাতে কড়া তামাক সেজে খেয়ে নেন এক ছিলিম। শয্যাত্যাগ করে উঠে ছেলেকেও ডেকে তুলে দেন। মহিমের কড়া নাড়া শুনেই ছাত্র এসে দুয়োর খুলে দেয়।

পড়বার ঘর উপরে—দোতলার সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়, এই এক হাঙ্গামা আর কিছু না হোক, ওঠানামায় খানিকটা সময় নষ্ট তো বটে!

এখানে থেকে ছুটলেন সিংহিবাড়ি অভিমুখে। সিংহিরা নাম-করা বড়লোক, কিছু সাহেব ঘেঁষা। পৌনে-আটটা থেকে পড়াবার কথা। অল্পসল্প রোদ উঠেছে, মহিম ছাতা খুলেছেন। ছাতা সর্বক্ষণ মহিমের হাতে, ছাতা বাদ দিয়ে মহিম-মাস্টারকে ভাবা যায় না। একই ছাতা বছর কয়েক ঘুরছে তাঁর হাতে, আরও ছ-বছর ঘুরবে এমন আশা করা যায়। ছাতার কাপড়ের কালো রংটা কেবল ধূসর হয়ে গেছে, তা ছাড়া অন্য কোন খুঁত নেই। শীত-গ্রীষ্ম বসন্ত-বর্ষা সর্বঋতুতে সমান ছাতার ব্যবহার। বর্ষায় ছাতা মেলেন বৃষ্টির জন্য, অন্য সময় রোদ ঠেকাতে। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে রাত্রিবেলাও ছাতা খুলে চলেন। মাথার উপরে ছাতা ঠিক খাড়া থাকে ছবিতে-দেখা পৌরাণিক রাজছত্রের মতন। খোলা ছাতা কাঁধের উপর ঠেসান দিয়ে চলা তাঁর অভ্যাস নয়। ছাতা দেখেই দূর থেকে বুঝতে পারা যায়—ছেলেরা বলে, মহিম-মাস্টার আসছেন।

সিংহিবাড়ির বুড়ো কর্তা চন্দ্রভূষণ সিংহ বারাণ্ডায় টেবিলের ধারে খবরের

কাগজ পড়েন। মহিমকে উঠতে হয় বারাণ্ডার অন্ত প্রান্ত দিয়ে। দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকান সেই সময় চন্দ্রবাবু! পৌনে-আটটার পরে দুটো মিনিট হয়ে গেল অমনি হাঁক ছাড়বেন, শুনে যান মাস্টারমশায়, এইদিক হয়ে যাবেন। কাছে এলে দেরি হবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। দু-একথায় শেষ করে চলে যাবেন সে উপায় নেই। চন্দ্রবাবু এক সময় বড় উকিল ছিলেন—রিটায়ার করেছেন, কিন্তু জেরার অভ্যাস যায় নি। দু-মিনিট দেরির জন্য যথোচিত কৈফিয়ৎ দিয়ে পড়ার ঘরে যেতে মিনিট দশেক লেগে যায়। অবশ্য তাড়াতাড়ি গিয়ে যে কোন লাভ আছে, তা নয়। জলি সিং পড়ে না প্রায়ই। বলে, আজকে থাক সার। শরীরটা বেজুত লাগছে। বসুন, চায়ের কথা বলে আসছি। চায়ের কথা বলতে জলি বেরিয়ে যায়। চা সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে, কিন্তু জলি হয়তো আর ফিরে এল না।

অথবা ফিরে এসে বলল, মাস্টারমশায়, আপনি পড়ে যান—আমি শুনি। শুনে শুনেই শিখে ফেলব। বলে সে ইজিচেয়ারে সটান গড়িয়ে পড়ে। মহিম পড়িয়ে যাচ্ছেন, ছাত্র ওদিকে খেলার ক্যাটলগের এ-পাতা ও-পাতা উল্টাচ্ছে মাঝে মাঝে মহিমের মনে বিবেকের দংশন-জ্বালা—এখন এই গোলামির বেহদ্দ, আর একদিন তিনি সাতু ঘোষের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। বড্ড রাগ হয় নিজের উপরে। আর এই ছেলেটার উপরেও বটে! থাপ্পড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মুখে এতটুকু বিরক্ত প্রকাশ করবার উপায়ও নেই। বাড়ির একমাত্র ছেলে—সকলের আদরের। মাইনে ভালই দেয়—সুতরাং যা করে চুপ করে সয়ে যেতে হবে। সিংহিবাড়িতে পড়ানো নয়—মোসাহেবি অনেকটা।

একটার পর একটা সেরে যাচ্ছেন, আর ইস্কুলের দিকে এগোচ্ছেন ক্রমশ। ছাত্রের বাড়ি হিসাব করে মহিম এমনভাবে পর পর টুইশানি সাজিয়ে নিয়েছেন। বিশেষ করে সানগরে বাসা ভাড়া করাও সেই কারণে। সিংহি-বাড়ির পরে বলরাম মিত্তির লেনে রবীনকে পড়ান। সকালবেলায় এই শেষ। মণি ঘোষের ছোট ভাই রবীন—মাস্টারির প্রথম দিন গার্জেন ভেবে মহিম যাকে খাতির করেছিলেন। এম. এ. পাশ করে গেছে মণি, স্বাস্থ্য সেই আগের মতোই ফেটে পড়ছে। কিন্তু হলে কি হবে—সংসার করল না, দেশের কাজ নিয়ে মেতে আছে। মহিমকে দেখলে গড় হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নেয়। সাতু ঘোষের অসাধু কাজ ছেড়ে দিয়ে ইস্কুল মাস্টারি নেবার কথা কার কাছে শুনেছে সে—মহিমই কোন দিন বলে থাকবেন। সেই থেকে তার

বড় সম্ভ্রম। বলে, আপনারাই তো শাস্ত্র আলো দেখান. বড় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বার শক্তি পাই। মণিদের বাড়ির অবস্থা ভাল। রবীনকে পড়ানোর ভার মণির জন্যেই নিতে হয়েছে।

এই এক মজার বাড়ি। খুব ভাল ছেলে রবীন—পড়াশুনোয় ভাল, ব্যায়াম-চর্চা করে, মজবুত গড়ন শরীরের, একটা মিথ্যে কথা পর্যন্ত কখনো বলে না। রবীনের মায়ের কিন্তু সন্তোষ নেই। পূর্বদিন থেকে আজকের এই অবধি রবীনের যাবতীয় অপরাধের ফিরিস্তি পাঠিয়ে দেন চাকর অথবা ছোট-মেয়েকে দিয়ে। অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় কখনো বা এক টুকরো কাগজে স্বহস্তে আনুপূর্বিক লিখে পাঠান। সেই সঙ্গে মোটা বেতের লাঠিও আসে। ইঙ্গিত অতিশয় স্পষ্ট। অতএব কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম সমাধা করে ঠিক দশটার সময় মহিম উঠলেন ও-বাড়ি থেকে।

মেস সামান্য দূরে এবং ইস্কুল তার পরেই। রবীনের বাড়ি থেকে সোজা মেসে এসে ঢুকে পড়লেন। রান্নাঘরের সামনের বারাণ্ডার ফালিতে আসন পাতা আছে ব্যবস্থামতো। গেলাসে জল দেওয়া। মহিম জুতো খুলে টাঙানো দড়ির উপর কাঁধের চাদর ছুঁড়ে দিয়ে আসনে বসে পড়লেন। ভাতের থালা এসে গেছে ইতিমধ্যে—ডাল-মাছ-তরকারি সমস্ত ঠাকুর একবারে সাজিয়ে নিয়ে আসে। বারংবার এসে দেবার ফুরসত হবে না। এইবারে হাতের খাটনি মহিমের—থালার ভাত অতি দ্রুত মুখ-বিবরে পৌঁছে দেওয়া; এবং মুখের খাটনিও—দ্রুত চিবিয়ে গলাধঃকরণ করে পরের আমদানির জন্য জায়গা খালি করে ফেলা। দুই অবয়বে পাল্লা চলেছে যেন—সে এক দেখবার বস্তু। খাওয়া অন্তে জোরে একবার গলা-খাঁকারি দিয়ে হাতে-মুখে হড়হড় করে মগ দুই জল ঢেলে চাদরকাঁধে ফেলে জুতো পায়ে ঢুকিয়ে মহিম সাঁ করে বেরিয়ে যান। ওয়ার্নিং-বেল পড়ে গেছে ইস্কুলে। নাম সই করে খড়ি আর স্কেল হাতে মহিম চেঁচাতে চেঁচাতে ক্লাসে ঢুকলেন; আঠাশের থিয়োরেম—একশ বারোর পৃষ্ঠা খুলে ফেল। লেট এ-বি-সি বি এ ট্রায়েঙ্গেল—

খড়ি দিয়ে খটাখট ত্রিভুজ এঁকে ফেললেন ব্লাকবোর্ডের উপর। পড়ার ঐ ধরতা দিয়ে দিলেন—তারপরে ডেকে তুলবেন একে ওকে তাকে। এক-জনের দুটো লাইন বলা হয়েছে কি না—তাকে বসিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে তুলবেন। আগের জন যে জায়গায় ছেড়েছে—বাক্য শেষ না হয়ে থাকলে সেই মাঝের শব্দ থেকেই বলতে হবে পরের জনকে। লাইন ধরে পর পর ডেকে তুলছেন তা নয়—এখান থেকে একটি, ওখান থেকে একটি।

ক্লাসের সব ছেলেকে তটস্থ থাকতে হয় সেইজন্য—পড়া টনটনে মুখস্থ করে কান পেতে থাকতে হয়। কী জানি, তারই বা ডাক পড়ে এবারে!

ব্লাকবোর্ডের ধারে দাঁড়িয়ে মহিম অবিরত পড়া ধরছেন: স্টাণ্ড আপ—ইউ, ইউ সেকেণ্ড বয় অব দ্য সেকেণ্ড বেঞ্চ। হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি। বলে যাও তারপর থেকে। ভেরি গুড, সিট ডাউন। নেক্সট—থার্ড বয় অব লাস্ট বেঞ্চ। কি হে, শুনতে পাচ্ছ না, লাস্ট বেঞ্চির ওই মোটা ছেলেটা—

সে ছাত্র ওঠে না কিছুতে। এতবার বলছেন, ঘাড় তোলে না। তার মানে, কিছু করে আসেনি বাড়ি থেকে। ফাঁকিবাজ ছেলে, ন্যাকা সেজে আছে। এমন ঢের ঢের দেখা আছে—

মহিম গর্জন করে ওঠেন: স্টাণ্ড আপ আই সে। তবু সে বধির হয়ে আছে। আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, স্টাণ্ড আপ অন দ্য বেঞ্চ—বেঞ্চির উপর দাঁড়াও দুর্বিনীত ছোকরা।

ক্লাসের সমস্ত ছেলে মরে আছে যেন। টু শব্দটি নেই। স্কেল নিয়ে মহিম ছুটে আসেন ক্লাসের শেষ প্রান্তের সর্বশেষ বেঞ্চিতে। দেবেন স্কেলের একটা-দুটো ঘা কষিয়ে—হাল আমলের আইন-টাইন মানবেন না। কান ধরে তারপর তুলে দেবেন বেঞ্চির উপর।

একেবারে কাছে গিয়ে উঁচিয়ে-তোলা স্কেল নামিয়ে নিলেন: আপনি সার?

হেডমাস্টারই ঘাড় নিচু করে বসে আছেন ছেলেদের মধ্যে। কোন কথা না বলে তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এ-ও এক কায়দা মাস্টারদের কাজকর্ম দেখবার। ছেলে হয়ে বসে থাকা। তবে মহিমের মতো ক্ষীণদৃষ্টি না হলে আগে থাকতে দেখে ফেলে। বাইরে এসে দাশুকে হেডমাস্টার বলেন, আপনি যা বললেন ঠিক অতখানি নয়। মহিমবাবু ক্লাস ফাঁকি দেন না। তবে পড়ানো একেবারে পুরানো ধাঁচের। ছেলেদের মুখস্থ করান, বোঝাতে কই দেখলাম না।

দাশু টিপ্পনী কাটেন: ক্লাসেই সব বুঝে গেল তো বাড়িতে ডাকবে কেন? বিস্তে ছাড়েন ওঁরা টুইশানির সময়।

হেডমাস্টার ঘাড় নেড়ে বলেন, মতলব করে কিছু করেন, সেটা মনে হল না। তবে চোখের দৃষ্টি বড় খারাপ। কাছে গিয়েও ঠিক চিনে উঠতে পারেন না।

বলতে বলতে হেসে ফেললেন: আমার সত্যি ভয় হয়েছিল দাশুবাবু। স্কেলের এক ঘা মেরেই বসেন বা। মোটের উপর আপনার কথাই মানি আমি।

নতুন রুটিনে উঁচু ক্লাস দেওয়া চলবে না। চোখের এই অবস্থায় কষ্ট হবে ওঁর। চিত্তবাবুকে তাই বলে দেব।

ক্লাস থেকে বেরিয়ে মহিম তেতলায় যাচ্ছেন। থার্ড ক্লাস ই-সেকসন এবার। আরও ক-জন উঠেছেন তেতলায়। গগনবিহারী বলেন, কাল ছাব্বিশে জানুয়ারি—স্বাধীনতা-দিবস। স্ট্রাইক হবে নাকি ইস্কুলে। আপনি কিছু শুনেছেন মহিমবাবু?

পাশ থেকে জগদীশ্বর বলে ওঠেন, ফুলচন্দন পড়ুক মশায় আপনার মুখে। ছুটিটা নেই—নিরম্বু ক্লাস চলল সেই মার্চ অবধি। এইসব আছে বলে তবু বাঁচোয়া।

মহিম চিন্তিত ভাবে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, চোখ নিয়ে তো মুশকিল হল গগনবিহারীবাবু। বড্ড খারাপ হয়ে পড়ছে। কাছেও এখন ঝাপসা দেখি। বিপদ ঘটাল দেখছি।

গগনবিহারী বলেন, ছানি পড়েছে বোধ হয়। কাটিয়ে ফেলুন, ঠিক হয়ে যাবে।

জগদীশ্বর বলেন, শীতকাল, এইতো হল কাটাবার সময়। হাসপাতালে চলে যান। সেকেণ্ড-বি'র সুশীল সরকারের বাপ হলেন সার্জন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন গিয়ে।

মহিম বলেন, ওরে বাবা, রক্ষে রাখবে তাহলে! এই সময় হাসপাতালে গিয়ে উঠলে ছেলেরা আর তাদের বাপ-দাদারা তেড়ে গিয়ে পড়বে না?

হেসে একটু রসিকতা করেন: মরে গেলে সাবিত্রীর মতন যমরাজের পিছন পিছন ধাওয়া করবে। বলবে, ফাইন্যাল এগজামিনটা কাটিয়ে দিয়ে তবে যান।

থার্ড-ই ক্লাসের সামনে এসেছেন। জগদীশ্বর মহিমের হাত এঁটে ধরলেন: দাঁড়ান না মশায়। কী হয়েছে!

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে মহিম ব্যস্ত হয়ে বললেন, উঁহু, তিন মিনিট হয়ে গেছে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঢুকে পড়লেন ক্লাসে।

জগদীশ্বর বিরক্ত হয়ে বলেন, ক্লাস যেন আমাদের নেই! ক্লাস আছে বলেই ঘোড়দৌড় করতে হবে? বিদ্যে-দান সেই তো শেষরাত্তির থেকে চলছে, ঘেন্না ধরে না মানুষটার!

জগদীশ্বর আর গগনবিহারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। কালকের স্ট্রাইকের প্রসঙ্গ। প্রাচী শিক্ষালয় তো ছুটি দিয়ে দিচ্ছে শুনলাম। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স-ডে সোজাসুজি বলতে পারেন না—ভাইস-প্রেসিডেন্টের খুড়ো না কে মরছে,

সেই ছুতো দিয়ে মোর্নিং-তে। আমাদের এতজনের খুঁজলে কি মন্বা-ছাড়া একটা পাওয়া যেত না? ইস্কুল খুলে রেখে নিরর্থক ঝামেলার সৃষ্টি।

গগনবিহারী বলেন, খুলে কি ইচ্ছে করে রাখে! ছেলেরা ছুটি চায়, আমরাও দিতে চাই। গোল বাধায় শুধু হতভাগা গার্জেনগুলো। যত বেটা খয়ের খাঁ ইস্কুলে ছেলে দিয়েছে। স্বাধীনতা-দিবস বলে ছুটি দিলে কলেজ ফেটে চৌচির হবে না?

জগদীশ্বর বলেন, দেখুন তাই। ত্রিদশ্ দেয়ার এ ম্যান হুজ সোল সো ডেড —কিন্তু বলে দিচ্ছি মশায়, ইস্কুল কাল কিছুতেই হবে না। মাঝ থেকে সকাল সকাল খেয়ে এসে ছেলেগুলো পার্কে ঢুকে গুলি খেলবে।

গগনবিহারী বলেন, আর কতক টালিগঞ্জে সিনেমা স্টুডিও-য় গিয়ে দরজায় ভিড় করে স্যুটিং দেখবার জন্যে। কত উন্নতি যে হয়েছে!

দাশু হঠাৎ হনহন করে তেতলায় চলে এসেছেন। পিছনে জমাদার। উভয়ে সরে পড়ছিলেন, দাশু তার আগে গেলেন!

আরে মশায় জগদীশ্বরবাবু, ফিফথ ক্লাস ছিল আপনার আগের ঘণ্টায়। অত আগে ক্লাস থেকে বেরিয়ে পড়লেন—

জগদীশ্বর আকাশ থেকে পড়েন: কে বলল? এইতো—এইমাত্র এসেছি। আঁা, কি বলেন গগনবিহারীবাবু?

দাশু বলেন, পাশের ক্লাসে পড়ানো যাচ্ছিল না গণ্ডগোলের চোটে।

বনোয়ারি বলেছে? কোটনার কথায় কান দিও না দাশুবাবু। নিজে ক্লাসের মধ্যে থাকে, তখনই তো হাট বসে যায়। আমরা তার জন্তে পড়াতে পারিনে। কি বলেন গগনবিহারীবাবু, আঁা?

এ পিরিয়ডেরও পাঁচ-সাত মিনিট হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনারা গল্প করছেন!

বলে দাশু আর দাঁড়ান না। কোথায় ওদিকে একটা ছেলে বমি করেছে। বমি পরিষ্কার করতে হবে, ছেলেটাকে লাইব্রেরি-ঘরের টেবিলে নিয়ে শুইয়ে রাখতে হবে কিছুক্ষণ। দৃষ্টির আড়াল হলেই জগদীশ্বর ফেটে পড়লেন। গগন-বিহারীকে বলেন, ছুটছেন কেন মশায়, অত ভয় কিসের? হাতে মাথা কাটবে নাকি? ফিফথ ক্লাস আগে ছেড়ে থাকি তো থার্ড ক্লাসে এই পরে যাচ্ছি। চুকেবুকে গেল। মুখে এসে গিয়েছিল, তা যেন চেপে নিলাম। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে নিজে তো একটা ক্লাসেও যায় না। কাজ হচ্ছে ফপরদালালি আর মাস্টারদের পিছনে লাগা।

চারটের শেষ ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে মহিম আবার টুইশানিতে চলেছেন।

জগদীশ্বর পিছন থেকে ডাকেন, ও মহিমবাবু, নোটিশ দেখলেন? প্রাচী শিক্ষালয় অবধি ছুটি দিয়ে দিল, আমাদের উল্টো। একঘণ্টা আগে সাড়ে ন'টার সময় কাল হাজিরা।

ততক্ষণে মহিম অনেকটা এগিয়ে গেছেন। ঘাড় নেড়ে হুঁ—বলে দিলেন। বাক্যটুক শোনা গেল না, ঘাড় নাড়াটা দেখা গেল শুধু।

দৌড়চ্ছেন যে মশায়, কে তাড়া করল? পতাকীচরণ হি-হি করে হাসছেন। বললেন, না দেখেশুনে পার হতে গিয়ে একটা লোক সেদিন চাপা পড়ল মোড়ের মাথায়। আপনার তো আবার চোখ খারাপ।

এবারও ঘাড় নেড়ে মহিম বললেন, হুঁ—

কথা বলার ফুরসত নেই। চাপা পড়লেও দেখেশুনে ধীরেসুস্থে রাস্তা পার হবার সময় হবে না। পার হয়ে গিয়েই গোয়ালপাড়া লেন বেরিয়েছে বড়রাস্তা থেকে। একটা হিন্দুস্থানি খাবারের দোকান সেখানে। কচুরি ভাজছে দেখা যাবে। মহিম-মাস্টারকে চেনে তারা। রাস্তা পার হচ্ছেন দেখতে পেয়েই শালপাতার ঠোঙায় খানিকটা আলু-কুমড়োর ঘাঁট ও তিনখানা কচুরি দিয়ে এগিয়ে ধরবে। ঠোঙা হাতে নিয়ে দাম মিটিয়ে দিয়ে মহিম ছুটেছেন গলি ধরে। ছুটছেন আর কচুরি কামড়ে নিচ্ছেন। গলি শেষ হয়ে হরি চাটুজ্জে স্ট্রীট। খাওয়া শেষ হয়ে যাবে সেই সময়—ঘড়ি ধরে যেন হিসাব করা। সেই মোড়ের উপর কল আছে। ঠোঙা ফেলে দিয়ে কল টিপে ঢকঢক করে জল খেয়ে নিলেন মহিম। দুটো বাড়ি ছাড়িয়ে বারান্দাওয়ালা বাড়ি একটা। ছাত্রটি বাইরের ঘরে বই খুলে বসে আছে। আগে থেকে দাগ দিয়ে রেখেছে কোনটা বুঝে নিতে হবে মাস্টারের কাছ থেকে। সময়ের অপব্যয় নেই। সত্যি ভাল ছেলে, নইলে বিকেলবেলা না বেরিয়ে খেলাধুলা না করে বই খুলে বসে মাস্টারের অপেক্ষায় থাকে!

এর পরে একটি মেয়ে—সুলতা। বাড়িমুখো মুখ ফিরিয়েছেন এবার। আর যত টুইশানি, শেষ করতে করতে বাড়ির দিকে এগোবেন। সুলতান পড়ানোর মধ্যেই রাস্তায় ওদিকে গ্যাস জ্বেলে দিয়ে গেছে। যাবার সময় মেয়েটা এককাপ চা এনে দেয়। গরম চা খেয়ে তাজা ভাবটা ফিরে আসে। বেশ খানিকটা গিয়ে এইবারে নাড়ু ঘোষের বাড়ি। অলক পড়বে। ভোরবেলাকার প্রথম সেই গতিবেগ ফিরে এসেছে আবার চায়ের গুণে।

রাত্রি সাড়ে দশটা বাজে। শেষ ছাত্রের বাড়ি সপাকে বই বন্ধ করে মহিম উঠে

পড়েন সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু আজকে সেটা হল না। ত্যাঁদড় ছেলে জ্যামিতির তিনটে এক্সট্রা বের করে বসল—বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে। এমন ঢের ঢের দেখা আছে। কাল হবে বলে চাপা দিয়ে আসতে হয় এমনি ক্ষেত্রে। অন্য সময় করেনও তাই। কিন্তু ছাত্রের বাবা বসে আছেন এই ঘরে—এত রাত্রি অবধি অফিসের কাগজপত্র লিখছেন। অতএব দরদ দেখিয়ে বসে পড়তে হল আবার। এগারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দিল। ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। পথ অবশ্য বেশি নয়, কিন্তু মহিম অন্যদিন ট্রামে ফিরে যান এই পথটুকু।

পা দুটো যেন অসাড়—বেতো ঘোড়ার মতন কিছুতে এগুতে চায় না। ঘোড়ার পিঠে যেমন চাবুক মারে, কাঁধের চাদর পাকিয়ে দড়ির মতো করে দুই ঠ্যাঙের উপর দেবেন নাকি ঘা কতক? থপথপ করে যাচ্ছেন। পথ বেশি-বেশি লাগছে। রাত্রিবেলা কোন কুহকমন্ত্রে পথ যেন মহিম-মাস্টারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লম্বা হয়ে উঠছে।

বায়োস্কোপ ভেঙে লোকজন বেরিয়ে আসে। হাস্যমুখ এতগুলো নরনারী —কোন এক আলাদা দুনিয়া যেন।

জনতার মধ্যে দাশুকে দেখে চমক লাগে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে এই জায়গায়! একা নয়, পাশে মেয়েলোক একটি—দাশুর বউ। নিশিরাত্রে বউ নিয়ে টকি-বায়োস্কোপ দেখতে এসেছে।

মহিম ডাকছেন, দাশুবাবু—

কলকাতায় প্রথম যখন বাসা করেন, সরসীবালাকে নিয়ে মহিম এসেছিলেন একদিন। কিন্তু মাস্টার মানুষের ছেলে পড়ানো ছাড়া আর কিছু করবার জো আছে। বেইজ্জতি হতে হয়। তারপরে আর কখনো টকি দেখেননি।

এই যে দাশুবাবু, এদিকে—এদিকে—

দাশু আগেই দেখতে পেয়েছেন, না দেখার ভান করে সরে পড়ার তালে ছিলেন। রাত্রি অনেক। বউ দাঁড় করিয়ে রেখে ভ্যানর-ভ্যানর করবার সময় এখন নয়। কিন্তু টুইশ্যান ফেরত বাড়ি চলেছেন মহিম—দুটো কথাবার্তা না বলে কি অমনি ছাড়বেন? সাড়া না পাওয়া অবধি ডাকাডাকি চলবে।

বায়োস্কোপ দেখা হল বুঝি? বিজ্ঞানের কী অসাধ্য-সাধন! তোমার বউদিদিকে নিয়ে আমি একবার এসেছিলাম। কী পালা ভাল, নাম মনে পড়ছে না। ছবিতে তড়বড় করে কথা বলতে লাগল। দশমহাবিদ্যা—কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী ফসফস করে একের পর এক আবির্ভূত হচ্ছেন। যত বুড়োবুড়ি গদগদ হয়ে মা-মা করছে। কিন্তু ফষ্টিনষ্টি আছেও তো।

আবার! অন্ধকার করে দিয়েছে, সিটি মারছে আমার পিছনে। অসভ্য কথাবার্তা বলছে। খানিক পরে আলো জললে দেখি আমাদের ইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাস সি-সেকসনের দুটো ছেলে। বলে, নমস্কার সার! লজ্জায় আমি মুখ তুলে তাকাতে পারি নে! তোমার বউদিদি এখনো বলে, আর একদিন দেখে আসি চল না। রক্ষে কর, একদিনে যথেষ্ট হয়েছে, আর কাজ নেই!

দাশু বলেন, রাত্রের শো-তে ছেলেপুলে থাকে না। তাছাড়া আমি যখন গিয়ে বসেছি, হলের মধ্যে টুঁ শব্দ করার তাগত আমার ইস্কুলের কারো হবে না।

বউ একটু সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেদিকে চেয়ে দাশু বলেন, এই যাচ্ছি। চল, রিকশাই করা যাক একখানা।

চলে যাবার স্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েও ছাড়বেন কি মহিম! বললেন, কী নোটিশ বের করেছ আজ তোমরা, আমি কিছু দেখিনি।

এক ঘণ্টা আগে কাল হাজিরা। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স-ডে'র ঝামেলা। বাইরের লোক আসবার আগে গেট চেপে থেকে ছেলে ঢোকাতে হবে আমাদের।

বলে সুপারিন্টেন্ডেন্ট দাশু বলে উঠলেন: নোটিশ দেখবেন কেন! ইস্কুলের কোন-কিছু দেখেন কি চোখ তাকিয়ে? মন উড়ু উড়ু—ঘণ্টা বাজতে না বাজতে ছুটতে শুরু করে দেন।

রাগ না করে মহিম কাতর হয়ে বলেন, যা বলেছ দাশুবাবু। আর পারছিনে, সত্যি কথা বলছি। বি. এ. পাশ করলাম ভালভাবে, অঙ্কে অনার্স পেলাম। ইস্কুল-কলেজে ছুটোছুটি দৌড়ঝাঁপ করিনি কোনদিন—খালি পড়েছি। এখন দেখছি, অনার্সের জন্য মরণ পণ না করে টু-টোয়েন্টি আর ফোর-ফরটি রেস দুটো রপ্ত করে রাখলে কাজ দিত। যত পড়াই, তার তেদুনা দৌড়ই। ছেড়ে দেব, বুঝলে ভায়া, ছ্যা-ছ্যা—শিক্ষিত লোকের কাজ নাকি এই!

রিকশা একটা যাচ্ছিল অদূরে। দাশু তাড়াতাড়ি ডাকলেন। বউকে বলেন, উঠে পড়, রাত হয়ে গেছে। বউকে তুলে নিজে উঠে পাশে বসলেন। পায়ে হেঁটে যেতেন বাড়ি অবধি। কিন্তু ওঁর খপ্পর থেকে বেরবার জন্য রিকশা নিতে হল। গচ্চা গেল আনা তিনেক।

বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তে সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল। দীপালি জেগে বসে আছে। আহা, কী কষ্ট এইটুকু মেয়ের! ভিতরে গিয়ে মহিম দেখলেন, শুভব্রতও আছে দিদির সঙ্গে। রাত বড্ড হয়ে গেছে, তারা এতক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে বসেছিল।

দীপালি কেঁদে পড়ে: এই খানিক আগে কী কাণ্ড মাকে নিয়ে! পু[illegible]

খাইয়ে দিয়ে বামুনমাসি চলে গেলেন। শুভোর পড়া-টড়া হয়ে গেলে তারপরে আমরা দু-জনে খেতে বসেছি। দুম করে এক আওয়াজ। ছুটে এসে দেখি, মা মেঝেয় পড়ে গেছে। কথা বলতে পারছে না—চোখ ঘুরিয়ে কেমন করে তাকায়, আর গোঁ-গোঁ করে। শুভো কাঁদতে কাঁদতে গোবিন্দ ডাক্তারবাবুর বাড়ি ছুটল। তিনি ভাগ্যিস বাড়ি ছিলেন এসে ওষুধ-টষুধ দিলেন। সকালবেলা দেখা করতে বলে গেছেন ডাক্তারবাবু।

মহিম ব্যস্ত হয়ে বলেন, এখন আছে কেমন রে? জেগে না ঘুমিয়ে? তাই তো, ছেলেমানুষ তোদের ছিল্লেয় রেখে যাওয়া—আমারও তেমনি মরণ-বাঁচন এই তিনটে মাস, নিঃশ্বাস ফেলার ফাঁক দেয় না। বেহালায় গিয়ে তোদের পিসিমাকে নিয়ে আসব, তা এমনি হয়েছে—

বকতে বকতে তাড়াতাড়ি জুতো-জামা খুলছেন। ঘরের মধ্যে বড় তক্তা-পোশের মাঝখানটায় সরলাবালা—একপাশে বাচ্চা মেয়েটা, অন্য পাশে পুণ্যব্রত। পুণ্যও দেখা যায় চোখ পিটপিট করছে, ঘুমোয়নি। কিংবা ঘুমিয়েছিল, জেগেছে শব্দ-সাড়া পেয়ে। মায়ের ব্যাপারে ভয় পেয়ে গেছে—মুখে চোখে এখনও আতঙ্কের ভাব।

মহিম বলেন, শরীর খারাপ করল আজ?

সরলাবালা ম্লান হাসি হাসল: ওদের যেমন কথা! আজকে বরঞ্চ ভাল অন্য দিনের চেয়ে। আমিই একটা অন্যায় করে বসলাম। মেয়েটা মুখে রক্ত তুলে খাটে, খেতে বসেছে ওরা—বলি, ভাল যখন আছি, একটু জল ফুটিয়ে রূপালির ফুডটা হাতে হাতে বানিয়ে নিইগে। যেই মাত্র ওঠা, মাথার ভিতর চিড়িক দিয়ে উঠল। ডাক্তার-টাক্তার এনে খুব হৈ-চৈ করেছে ওরা। ছেলেমানুষ তো!

গায়ে হাত দিয়ে মহিম বলেন, গা পুড়ে যাচ্ছে তোমার।

ও কিছু নয়। রাত্রিবেলা মাথায় জল ঢালাঢালি করেছে। দুর্বল শরীর তো তাই একটু গরম লাগে।

বলে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে পুণ্যব্রতের দিকে চেয়ে সকৌতুকে বলে, কে বল্ দিকি পুণ্য?

মহিম বলেন, কী যে বল। আমায় যেন চেনে না!

চিনবে কি করে? দেখতে পায় কখন বল! ভোর না হতে বেরিয়ে যাও, তখন পড়ে পড়ে ঘুমোয়। রাত্তিরবেলা ফেরো, তখনও ঘুমোয়। একটা দিন রবিবার—পোড়া টুইশানির সেদিনও ছাড়ান নেই। বাপে ছেলেয় দেখা হবে কেমন করে?

মহিম বলেন কী করি, তবু তো খাপ খাওয়াতে পারি নে। কত টুইশানি হপ্তায় চারদিন করে। সোম থেকে শনির মধ্যে তিনদিন সেরে দিই। বাড়তি একদিন রবিবারে। মবলগ টাকার দরকার—মেয়ের বিয়ে দেবার টাকা, ছেলে মানুষ করবার টাকা। ম্যাট্রিক পরীক্ষা না হওয়া অবধি এই রকম, তারপরে খানিকটা ফাঁকা হয়ে যাবে।

বলতে বলতে একটু দেমাকও এসে যায় কথার ভিতরে ; ইস্কুলে ক্লাস পড়াবার রুটিন করে। আমার টুইশানির জন্যে রুটিন করতে হয় তেমনি। অথচ দেখগে, একটা টুইশানির জন্য কত মাস্টার দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তবু পায় না।

দীপালি আর শুভব্রতের দিকে নজর পড়ে মহিম তাড়া দিয়ে উঠলেন : তোরা হাঁ করে কেন দাঁড়িয়ে ? শুয়ে পড়গে যা। রাত জেগে তোরাও একখানা করে বাধা, কাজকর্ম ছেড়ে হাত-পা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বাড়ি বসে থাকি আমি তখন।

সরলাবালা বলে, দেখ দীপালি একলা আর কত পারে ! ঠাকুরঝিকে কদ্দিন থেকে আনবার কথা হচ্ছে—

চিঠি লেখা আছে তারক দা'কে। শুধু যেতে পারছি নে। দেখছ তো অবস্থা ! তুমি এই পড়ে আছে, এক দণ্ড একটু কাছে বসতে পারি নে। দেখি, কাল শুনেছি স্ট্রাইক হবে। ফাঁকতালে যদি ছুটি পাওয়া যায়, কালই দিদিকে নিয়ে আসব।

মহিমের ডান হাতখানা দু-হাতের মুঠিতে ধরে আছে সরলাবালা। চোখের কোণে হঠাৎ জল গড়িয়ে পড়ে। আঁচলে জল মুছে সরলা বলে, দেখ, একটা কথা বলছি তোমায়। আর বলতে পারি না পারি—

স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি সামলে নেয় : প্রায় তো সেরে উঠেছি। সেরে গিয়ে তখন মনে থাকে না থাকে—সেইজন্যে বলে রাখি। আমার শুভো আর পুণ্য কক্ষনো যেন মাস্টার না হয়।

মহিম উত্তেজিত হয়ে বলেন, ওরা বলে কেন, কেউ কক্ষনো ইস্কুল-মাস্টার না হয় যেন। অতি বড় শত্রুর জন্যেও ওই কামনা করি নে। ছ্যা-ছ্যা—একটা জীবন নাকি !

বলতে বলতে অন্য কথা এসে পড়ে : সেরেসুরে ওঠ, টকি-বায়োস্কোপে নিয়ে যাব। সেই যে গিয়েছিলে মনে নেই—কালী-তারা-ভুবনেশ্বরীরা সব আসতে লাগলেন ! ম্যাট্রিক পরীক্ষা চুকে-বুকে যাক—রাখি তো সন্ধ্যের দিকে মাত্তর একটা টুইশানি রাখব। সেইটে সেরে টকিতে গিয়ে বসব দুজনে। বেশি রাত্রে ছাত্রের ঝামেলা থাকে না। মাস্টারদের সময় তখন।

টং-টং করে কাদের ঘড়িতে বারোটা বাজে। কাজ বাকি আছে মহিমের। ঢাকা নামিয়ে ভাত ক'টা গবগব করে গিলে ছাদের উপর সংকীর্ণ চিলেকোঠায় গিয়ে উঠলেন। আলো জেলে আরও অনেকক্ষণের কাজ—আলো চোখে পড়ে অন্যের ঘুমের অসুবিধা হয়, সেজন্য এই ঘরে সরু একখানা তোষকের উপর বসে কাজ করেন। কাজের শেষে গড়িয়ে পড়েন সেখানে। কাজ এখন সারা দিনের জমাখরচ লেখা। দীপালি মোটামুটি টুকে রেখেছে—হিসাবের পাই-পয়সা অবধি বড় খাতায় লিখে রাখবেন এবারে। দিনের পর দিন বছরের পর বছর লিখে যাচ্ছেন এমনি। মুক্তার মতো পরিচ্ছন্ন গোটা গোটা অক্ষর। সমস্ত জমাখরচের খাতা সযত্নে রাখা আছে শিয়রে কাঠের বাক্সের ভিতর। অদৃশ্য বিধাতাপুরুষের জন্য মহিম যেন নির্ভুল কৈফিয়ৎ রচনা করে যাচ্ছেন। জীবনের একটা মুহূর্তও অনর্থক নষ্ট করেননি, একটা পয়সাও অন্যায় পথের উপার্জন নয়, এক পাই-পয়সারও অপব্যয় হয়নি কোনদিন—তার এই অকাট্য দলিল।

জমাখরচ হয়ে গেলেও চিলেকোঠার আলো জ্বলে কোন কোন দিন। পড়াশুনো করেন—নেসফিল্ডের গ্রামার, ভূগোল, মেকানিক্স। টুইশানির জন্য দেখে নিতে হয় মাঝে মাঝে। ভাল দেখতে পান না, বই তাই একেবারে চোখের উপরে নিয়ে পড়েন।

॥ একুশ ॥

হুকুম হল, সাড়ে ন'টায় ইস্কুলের হাজিরা—সময়ের ঠিক এক ঘণ্টা আগে। কর্তারা ভাবলেন, ঘণ্টাগুলো মাস্টারদের নিজের এক্তিয়ারে—ইচ্ছে করলেই আগুপিছু করা যায়। একটি ঘণ্টা হেরফেরের জন্য বিশ গণ্ডা কৈফিয়ৎ দিতে হবে—কি হয়েছিল মাস্টারমশায়? ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসবে ছেলে—এখন একটা দিন যে এক মাসের সমান। তা সে যা-ই হোক, মূল ইস্কুল আগে বজায় রাখতে হবে, টুইশানির ডালপালা পরে। টুইশানি কত আসছে যাচ্ছে, ইস্কুল অনড়। ইস্কুলের কাজটা আছে বলেই টুইশানি। রবীন ঘোষকে পড়ানো এবং মেসের আহারটা বাদ দিয়ে মহিম ইস্কুলে ছুটলেন।

তবু একটু দেরি হয়ে গেছে। লোকারণ্য রাস্তায়। ভিড় ঠেলে এগুনো যায় না। যাচ্ছেন কোন রকমে। গেটের কাছাকাছি হয়েছেন—নানান দিক থেকে বলছে, ঢুকবেন না সার—ঢুকবেন না সার। কিন্তু যেতেই হবে। না,

গেলে বলবে, মহিম-মাস্টার তলে তলে স্বদেশি—স্ট্রাইক করে আজ ইস্কুলে আসে নি। স্বদেশি হওয়া একটা খারাপ গালাগালি চাকরির ক্ষেত্রে। কনুই ঠেলে এগুচ্ছেন মহিম। ছেলেরা গেট জুড়ে শুয়ে পড়েছে। বলে, আমাদের মাড়িয়ে ঢুকতে হবে সার, এমনি যেতে দেব না। একটি ওদের মধ্যে চেনা—ধ্রুব। এখান থেকে পাশ করে গিয়ে কলেজে পড়ছে। বড় অফিসারের ছেলে, বাপের হাজার টাকার উপর মাইনে।

হকচকিয়ে গেলেন মহিম। অনেক মাস্টার ঢুকে গেছেন ইতিমধ্যে, ভিতর উঠানে তাঁদের দেখা যাচ্ছে। খোলা গেটের এদিকে আর ওদিকে মানুষে মানুষে পাঁচিল গেথে আছে যেন। বাইরে ভলন্টিয়াররা আটকে আছে—ছাত্র-মাস্টার কাউকে ঢুকতে দেবে না। ভিতর দিকে মাস্টার আর দারোয়ান-বেয়ারাদের নিয়ে দাশু রয়েছেন—ছাত্র-শিক্ষক ছাড়া বাইরের কেউ কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়তে না পারে। লড়াইয়ে দু-পক্ষের সৈন্য যেন মুখোমুখি। হেডমাস্টার আর চিন্তবাবু দোতলার জানলায়—সেনাপতিরা রণক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করেন বোধ করি এমনি উঁচুতে দাঁড়িয়ে। এমনি দূরবর্তী থেকে।

এ বড় ফ্যাসাদ হল তো! মহিমের মন খারাপ। সেই এক বাড়ি পড়ানো বাদ গেল, অথচ কাজের কাজ কিছু হয় না। হেডমাস্টার নজর রাখছেন কে কে ইস্কুলে এসেছে, কারা এল না। গোপন খাতায় হয়তো বা টুকে রাখছেন। আরও ঘণ্টাখানেক আগে এলে ঢোকা যেত। কিন্তু টুইশানি কামাই হত আর এক জায়গায়। কামাই করলেই হয় না, আবার তা পুষিয়ে দিতে হবে। সময় কোথা? রবিবারের দিনটাও তো পনের আনা ভরতি হয়ে আছে?

হেডমাস্টার উপর থেকে হাঁক দিয়ে উঠলেন: বেয়ারা, ঘণ্টা দিয়ে দাও। সাড়ে দশটা বাজল। মাস্টারমশায়রা যে যার ক্লাসে চলে যান এইবারে।

মহিম ছটফট করছেন। ব্যূহভেদ করে কোন কৌশলে ঢুকে পড়েন? ভূদেব কোন দিক দিয়ে এসে হাত ধরলেন। চাপা গলায় বলেন, চলে আসুন না মশায়। হাওয়ার গতিক বুঝতে পারেন না? ঢুকতে পারি নি বলে কি ফাঁসিতে লটকাবে?

মহিম আর ভূদেব শুধু নন, আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছেন কিছু দূরে নিরাপদ ব্যবধানে। ইস্কুলের ছেলে একদল ভিড় করে আছে। ভূদেব বলেন, ঢোকা গেল না, কিন্তু বাইরে থেকেও তো কাজ করা যায়। দোতলা থেকে ওই দেখুন দু-জোড়া চক্ষু তাক করে রয়েছে। কাজ দেখান মশায়রা, কাজ দেখান—

বলে সেই উপরমুখো মুখ করে ভূদেব চেঁচিয়ে উঠলেন : ভিড় কোরো না ছেলেরা। পুলিশ এসে টিয়ার-গ্যাস ছাড়বে এখনই। ভিতরে ঢুকে যাও। ঘণ্টা পড়ে গেল, ক্লাস আরম্ভ এবারে, যাও, যাও ঢুকে পড়।

দু-একটা ছেলেকে ধাক্কাধাক্কিও করছেন। ধাক্কা উল্টো মুখো। গলা নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলেন, বাড়ি চলে যা হতভাগারা, উঁহু, ইস্কুলে গিয়ে বিদ্যেসাগর হবেন সব! ছুতো পেলি তো বাড়ি গিয়ে খেলাধুলো কর্‌গে।

হঠাৎ এক কাণ্ড! তেতলার ছাতের উপরে রব উঠল—বন্দে মাতরম্‌। আলসের উপরে উঠে জোয়ান ছেলে তেরঙা নিশান তুলে ধরেছে। উজ্জ্বল রোদ পিছলে পড়ে গৌর দেহে। বহু দূর থেকে, বোধকরি ট্রামরাস্তা থেকেও, দেখা যাচ্ছে তাকে। কে আবার! মণি ঘোষ—জীবনের যে পরোয়া করে না। নিশান পতপত করে উড়ছে। বাজ পড়ে সেজন্য দেয়াল ফুঁড়ে রড বের করা—নিশান ধীরেসুস্থে সেই রডের সঙ্গে বেঁধে দিল। মণি তার পরে নেমে এল তেতলা থেকে দোতলায়, দোতলায় থেকে একতলায়, একতলা থেকে রাস্তায়—সকলের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে। উপরে ছেলেবুড়ো ভিড় করে আছে নিশানের দিকে তাকিয়ে। মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি। ইস্কুলের তরফের সবাই একেবারে চুপ। জানলায় কেউ নেই। ইস্কুলের ভিতরেই আছে কিনা সন্দেহ হয়।

নিশান তুলে দিয়ে রণ-জয় করে ভলন্টিয়াররা চলে গেছে। মহিম, ভূদেব ও অন্যেরা ঢুকে পড়েছেন। রাস্তা-ফাঁকা। গেট বন্ধ হয়ে ডবল তালা পড়েছে। হেডমাস্টার ক্ষিপ্তপ্রায়। সবগুলো বেয়ারাকে ডাকিয়ে এনে হাঁকাহাঁকি করছেন তাদের উপর : বাইরের লোক কেমন করে ঢুকল কম্পাউণ্ডের ভিতরে? ঢুকেছে অত বড় ফ্লাগ নিয়ে। এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় চলে গেল, কারো একটু নজরে পড়ল না। চোখ বুজে থাক সব। দেখাচ্ছি মজা—সেক্রেটারিকে বলে দলসুদ্ধ তাড়াব।

চিত্তবাবু বেয়ারাদের পক্ষ হয়ে বলেন, ওরা কি করবে? কী রকম ত্যাঁদড় মণি ঘোষটা—এইখানে পড়ে গেছে তো! চালার ভিতর রাঁধাবাড়া করছিল ওরা, ঘর খুলে রেখে জমাদার ঝাঁটপাট দিচ্ছিল, পিছনের নিচু পাঁচিল টপকে সেই সময় বোধহয় ঢুকে পড়েছে। ঢুকে লুকিয়ে বসেছিল—সামনের রাস্তায় লোকজন জুটলে সময় বুঝে বুক চিতিয়ে আলসের উপর উঠে দাঁড়াল।

নবীন পণ্ডিত হাতের খবরের কাগজ পাকাতে পাকাতে বলেন; পিনছায়

মুভমেন্ট—আগে পিছে যুগপৎ আক্রমণ। তাইতে কাবু হয়ে গেলাম। সামনে দিয়ে তো একটা মাছি গলতে পারে নি।

চিন্তবাবু বলেন, যা হবার হয়ে গেছে। এখনকার উপায় ভাবুন।

ভাবাভাবির কি আছে! দাশু গর্জন করে ওঠেন: স্যার একটা মুখের কথা বলে দিন, নিশান টেনে নামাচ্ছি।

হেডমাস্টার চিন্তিতভাবে ঘাড় নাড়েন: উঁহু, ছাতের উপরের ব্যাপার। লোকে দেখে ফেলবে। লোক জমে যাবে পতাকার অপমান হচ্ছে বলে। খবরের কাগজে উঠবে।

চিন্তবাবুও সায় দেন: সত্যি কথা। গোঁয়ার্তুমির কাজ নয় দাশু। সমস্ত দিন উড়ুক অমনি, বেয়ারারা রাত্তিরে সরিয়ে ফেলবে।

হেডমাস্টার হায়-হায় করছেন: কী সর্বনাশ বলুন দিকি! এদিককার কোন ইস্কুলে যা হয় নি। প্রাচী শিক্ষালয়ে ছুটি দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু নিউ-মডেল খোলা আছে। নিউ-মডেলের নয়নবাবু জাঁক করছিলেন, বড় বড় লোকের ছেলে পড়ে—বন্দেমাতরম্ আমাদের ইস্কুলে সেঁধুতে পারবে না। কালচাঁদবাবু একবার ঘুরেফিরে দেখে আসুন কোথায় কি হল। অন্য জায়গায় হলে কমিটির কাছে বলবার তবু মুখ থাকে। শিক্ষকদের মাইনে-বৃদ্ধির দরখাস্ত ঝুলছে এই সময়টা—বিপদ দেখুন!

মহিম ক্লাসের দিক থেকে ঘুরে এসে বললেন, ছেলে তো অষ্টরম্ভা! কি করব বলুন চিন্তবাবু, বাড়ি চলে যাই?

ভূদেব বলেন, চলে যাবেন কি মশায়! চা আসছে নবীন পণ্ডিত মশায়ের ওখানে। গগনবিহারীবাবুর মার্কসিট হারিয়ে যায়, ফকিরচাঁদ খুঁজে দিয়েছিল। সেই বাবদে তাঁর কাছ থেকে এক টাকা আদায় হল। চা আনতে বেরিয়ে গেছে।

করালীকান্ত বলেন, ক্ষেপেছেন? চা খাওয়ার জন্য বসে থাকবেন মহিমবাবু? দুটো বাড়ি সেরে নেবেন ততক্ষণে।

মহিম শুষ্ক মুখে বলেন, পড়ানো নয়। বাড়িতে অসুখবিসুখ চলেছে বড্ড। ছুটি পেয়ে যাই তো বেহালা গিয়ে বড়বোনকে বাসায় নিয়ে আসি।

রুটিনের চার্টটা তুলে ধরে চিন্তবাবু আঙুল বুলিয়ে নিরীক্ষণ করছেন: সেকেণ্ড-বি। ফার্স্ট-এ। তারপরে হলগে ফোর্থ-ডি। না, এসব ক্লাসে ছেলে আসে নি। টিফিনের পরে এই যে—থার্ড-বি ক্লাস রয়েছে এই। থার্ড-বি'তে গুটি পাঁচ-ছয় এসেছে, দেখে এলাম।

তিন-চারজনে সমকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, টিফিনের পরেও ইস্কুল চলবে নাকি?

হেডমাস্টার গম্ভীর স্বরে বললেন, চারটে পর্যন্ত ইস্কুল। অবশ্যি যাঁদের ক্লাসে মোটে ছেলে নেই, তাঁরা চলে যেতেন পারেন। ক্লাসের ভিতর একটা ছেলে থাকলেও পড়াতে হবে।

রুটিন দেখতে দেখতে চিত্তবাবু বলে উঠলেন, আপনারও তো থার্ড-বি ভূদেববাবু। এই ঘণ্টায়। ক্লাসে যান নি, বসে আছেন—

ভূদেব আকাশ থেকে পড়েন: আমার? কই—না না, আমার কেন হতে যাবে!

পকেট থেকে ছোট্ট একটু খাতা বের করে মিলিয়ে দেখেন। হপ্তার দুটো দিন থার্ড-বি—আজকেই বটে! জমাটি আড্ডার মধ্য থেকে ভূদেব বিরস মুখে উঠলেন: ওরে বিনোদ, আফ্রিকা আর দক্ষিণ-আমেরিকার ম্যাপ দুটো ক্লাসে পাঠিয়ে দাও!

ক্লাসে গিয়ে মুখের উপর একটুখানি হাসি টেনে এনে ভূদেব বললেন, এই ক'জন এসেছ তোমরা? বেশ, বেশ। কোনও ক্লাসে কেউ এল না, তোমরা ত বেশ এসে গেছ।

ছেলেরা এ ওকে ছাড়িয়ে বাহাদুরি নেবার জন্য ব্যস্ত: কী করে যে ঢুকেছি সার! গেটের সামনে সব শুয়ে পড়েছে—তখন মাথায় এল, পিছন দিকে নিচু পাঁচিল আছে তো। পাঁচিল বেয়ে উঠে টুপটুপ করে সব লাফিয়ে পড়ি। চার-পাঁচ জন পড়তে ভলান্টিয়াররা টের পেয়েছে। রে-রে করে এসে পড়ল। তার পরে আর কেউ পারে নি। আমরাই ক'জন শুধু।

ভূদেব উচ্চকণ্ঠে তারিপ করেন: ভাল, ভাল। নিষ্ঠা আছে তোমাদের।

কৃতিত্বের কাহিনী আরও কিছু ফলাও করে বলতে যাচ্ছিল, ভূদেব থামিয়ে দিলেন: গল্প নয়। কত কষ্ট করে এসেছ, পড়া হবে এখন। আফ্রিকার ম্যাপটা টাঙিয়ে দাও বোর্ডের উপরে।

ছেলেরা বলে আফ্রিকা তো ফোর্থ ক্লাসে সারা করে এসেছি।

সে পড়া ধরব। পড়ে-শুনে প্রমোশান নিয়ে এলে, গোড়াটা কি রকম আছে দেখে নিতে হবে না? আফ্রিকা হয়ে গেলে দক্ষিণ-আমেরিকা—তাও ম্যাপ এনেছি। ম্যাপ পয়েন্টিং হবে—এক-একটা জায়গার নাম করব, মুখের কথা মুখে থাকতে ম্যাপে দেখাবে। এই যাঃ, পয়েণ্টার আনা হয় নি তো! নিয়ে আসছি। কারো যদি একটা ভুল হয়, আগাপাস্তলা পেটাব পয়েণ্টার দিয়ে। থার্ড ক্লাসে উঠে বড্ড বাড় বেড়েছে! ভুল হলে বুঝব, টুকে পাশ করে এসেছিল। পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলব, আসছি দাঁড়া—

রাগে গরগর করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। আবার মুখ ফিরিয়ে বললেন, চুপচাপ বসে বসে বই দেখ ততক্ষণ। ম্যাপের জায়গাগুলো দেখে রাখ—হ্রদ, নদী, পর্বত, রাজধানী এই সমস্ত।

বিনোদের কাছ থেকে ভূদেব পয়েণ্টার নিয়ে নিলেন একটা। পয়েণ্টার হল কাঠের বেঁটে লাঠি, মাথার দিকে সুঁচাল করা। ম্যাপ দেখাতে হয় ওই বস্তু দিয়ে, দরকার মতো বেতের কাজও হয়। ক্লাসে বেত আনা বন্ধ, কিন্তু পয়েণ্টার স্কেল এইসব অস্ত্র চালু রয়ে গেছে।

হেডমাস্টার আর চিত্তবাবু ইতিমধ্যে কামরায় ঢুকে গেছেন। সেক্রেটারির কাছে কি পরিমাণ রেখেঢেকে আজকের রিপোর্ট যাবে, তার শলাপরামর্শ হচ্ছে। অতএব ওদিকটা আপাতত বাঁচোয়া। ভূদেব উঁকিঝুঁকি দিয়ে নবীন পণ্ডিতের ওখানে ঢুকলেন। চা এসে গিয়েছে। আফিঙের ডেলা মুখে ফেলে পণ্ডিতমশায় একটু একটু চায়ে চুমুক দিচ্ছেন আর লড়াইয়ে হারতে হারতে ইংরেজ কোন কায়দায় জিতে গেল সেই তত্ত্ব বোঝাচ্ছেন। বসবার জায়গা নেই এ-ঘরে, খান দুই মাত্র চেয়ার। মাস্টাররা তবু ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন নবীন পণ্ডিতকে ঘিরে।

আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে সকলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পণ্ডিত বলেন, হেঁ হেঁ, খবরের কাগজ তো অনেকেই কেনেন—পড়তে পারেন ক'জনে শুনি? পড়তে জানা চাই! যা ছাপা থাকে সমস্ত মিথ্যে। সত্যি খবর ছাপে না কাগজে, ছাপবার জো নেই। ছাপা জিনিসের ভেতর আকারে-ইঙ্গিতে বলে, মনোযোগ করে পড়ে বুদ্ধি খাটিয়ে বের করে নিতে হয়। ইংরেজিতে যাকে বলে টু রিড বিটুইন দ্য-লাইনস। উপরে নিচে দুটো লাইনের মাঝখানে তো ফাঁক—তার মধ্যে সত্যি খবর সাদা কালিতে ছাপা থাকে।

চোখের উপরে কাগজখানা মেলে ধরে নবীন পণ্ডিত অনর্গল বলে যাচ্ছেন সেই সাদা কালিতে ছাপা সত্য: হিটলার শুদ্ধি করে হিন্দু হয়েছিল, বক্ষে স্বস্তিকচিহ্ন ধারণ করত। বগলামুখী কবচও ছিল কোটের নিচে; মাইনে-করা জ্যোতিষী ছিল। কাশী এসে একবার মদনমোহন মালবীয়কে প্রণাম করে গিয়েছিল লড়াই বাধবার অনেক আগে…

হাতে চায়ের বাটি নিয়ে ভূদেবও মগ্ন হয়ে শুনছেন। কিন্তু ঈর্ষী লোকের অন্যের সুখ সহ্য হয় না। দাশু বলে উঠলেন, আপনি ক্লাস নিচ্ছিলেন ভূদেববাবু। ক্লাস ছেড়ে চলে এলেন?

ও, হ্যাঁ—যাচ্ছি। ম্যাপ পয়েন্টিং হবে, পয়েণ্টার নিতে এসেছি।

লাইব্রেরি-ঘরে মহিম একাকী চোখ বুঁজে বসে আছেন। সময়ের অপব্যয়

করেন না, কাজকর্ম না থাকলে বসে বসেই একটু ঘুমিয়ে নেন। দরকার মতন দাঁড়িয়েও ঘুমতে পারেন বোধহয়। আজ কিন্তু ঘুম নয়, জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছেন বুঝি। কী যেন নেশায় পড়েছেন ওই মণি ঘোষ ছেলেটাকে নিয়ে। জ্যোতির্ময় ছেলে! ছাতের আলসের উপর দাঁড়িয়েছিল নিশান হাতে। বীরমূর্তি। ঠাকুর দেবতার ছবিতে যেমন দেখা যায়—ঠিক তেমনি রোদের আলো পড়েছিল তার মুখখানা ঘিরে। দীপালিকে ঐ ছেলের হাতে দেবেন। মণির মা দরজার আড়াল থেকে কথা বলেন, তাঁর কাছে কথাটা তুলবেন একদিন। দীপালি নিন্দের মেয়ে নয়, কনে পছন্দ হয়ে যাবে ওঁদের। মহিমকে মণি বড় মান্য করে, সে-ও নিশ্চয় 'না' বলবে না। ছেলেটাকে বাড়ি ডেকে নিয়ে সরলাবালাকে একদিন দেখিয়ে দেওয়া দরকার।

ভূদেব দাঁড়ালেন। মুখে হাসি ধরে না। মহিমকে বলেন, চলে যেতে পারেন মহিমবাবু। পয়েণ্টার নিতে এসেছিলাম, থার্ড-বি সেই ফাঁকে ভেগে পড়েছে। চালাক ছেলে সব, বুঝে নিয়েছে। আমিও যথেষ্ট সময় দিয়েছিলাম।

মহিম বলেন, কিন্তু গেট তো তালা-বন্ধ। গেল কি করে?

গেট দিয়ে তো ইস্কুলে আসেনি। এসেছিল পাঁচিল টপকে, গেছেও সেই পথে। ছুটি করে দিলাম, একদিন চা খাওয়াতে হবে।

সুধাকে নিয়ে মহিম বাসায় যাচ্ছেন। ট্রামে যাচ্ছেন। সারা পথ কেবল ওই মণি ঘোষের কথা: তুমি যাচ্ছ দিদি, ভাল হয়েছে, ছেলেটাকে বাসায় এনে তোমাদের দেখিয়ে দেব। বর আর কনের বয়সের তফাৎটা ভাবছ। কিন্তু চোখে দেখ একবার মণিকে, বিদ্যে-বুদ্ধির কথা শোন, তারপরে ওসব কিছু মনে আসবে না। কোন এক অজুহাতে বাসায় ডেকে আনব, আমি বললে, ঠিক সে আসবে। মেয়েমানুষের মতন চোখ তো পুরুষের নয়—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিও যত খুশি। তোমরা ননদ-ভাজে ছেলে পছন্দ করলে তারপরে আমি কথা পাড়ব। আগে কিছু বলছি নে। দীপালির চেহারা ভাল—ওদের ঠিক চোখে লেগে যাবে।

. সুধার কানের কাছে মুখ সরিয়ে এনে বলেন, মাস্টার বটে, তা বলে নিতান্ত শুধু হাতে মেয়ে দেব না দিদি। রাতদিন মুখে রক্ত তুলে খাটি—সে ওই মেয়ের বিয়ের জন্য, আর ছেলে দুটো মানুষ করার জন্য। গয়নায় নগদে যদ্দুর পারি সাজিয়েগুজিয়ে দেওয়া যাবে।

পাড়ায় ঢুকতে গোবিন্দ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। ডাক্তার বেরিয়ে পড়েছেন।

মহিমকে দেখে গাড়ি থামিয়ে বললেন, এই এখন বুঝি আসছেন মাস্টারমশায় ? যান।

কথার ধরন ভাল লাগে না। শুষ্ককণ্ঠে মহিম বলেন, খবর কি ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার খিঁচিয়ে ওঠেন : অতবড় রোগি বাচ্চা ছেলেমেয়ের উপর ফেলে রাতদিন পয়সা-পয়সা করে ঘুরছেন। শিক্ষিত মানুষ আপনি—দেখুন কিছু মনে করবেন না, বস্তির মিস্ত্রি-মজুরের মধ্যেও একটা কর্তব্যজ্ঞান থাকে, এতদূর পাষণ্ড তারা নয়। কাল বলে এসেছিলাম, সকালবেলা আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। করেছেন ?

গাড়ি বেরিয়ে গেল। মহিম ব্যাকুল হয়ে বলেন, কী বলে গেলেন দিদি, মানে কি ওসব কথার ? কাল রাত্রে তোমাদের বউ টরটর করে কত কথা বলল। কত গল্প : বলল, অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি ভাল। তবে ডাক্তার গালিগালাজ করেন কেন ?

বাড়ি ঢোকবার দরজা হা-হা করছে। পাশের ভাড়াটেদের বড় বউয়ের কোলে বাচ্চা মেয়েটা—সরলাবালার সাধের রূপালি। আরও তিন-চারটে মেয়েছেলে দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ছোকরা কয়েকটি। মহিমকে দেখে শুভো-পুণ্য-দীপালি হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

সরলাবালার আধেক-বোঁজা দৃষ্টি। মারা গেছে, মনে হবে না। ঘুমিয়ে পড়েছে যেন। কাল রাত্রেও এত কথা—কথা সে আর বলবে না।

॥ বাইশ ॥

পরের দিন সারা বেলাটা মহিম বাসায় শুয়ে-বসে কাটালেন। দশ-বারো বছরের মধ্যে এ রকম হয়েছে, মনে পড়ে না। খুব যখন কম ভিড়, তখনও রবিবারে দু-এক বাড়ি যেতে হয় অন্তত। সরলাবালা মরে গিয়ে একটা দিনের পুরো ছুটি দিয়ে গেল। হাত-পা মেলে জিরানোর ছুটি।

সন্ধ্যার পর বাইরে থেকে ডাকাডাকি করছেন—কী আশ্চর্য, সাতু ঘোষের গলা। বড়লোক হয়েও, দেখ, বিপদ শুনে ছুটে এসেছেন। তাড়াতাড়ি মহিম দরজা খুলে দিলেন। মোটরে চড়ে ছেলে অলককে সঙ্গে নিয়ে বাসা খুঁজে খুঁজে এসেছেন। মহিম তাঁদের দেখেন না, তাঁদের মোটরগাড়িখানা দেখেন, ভেবে পান না। কত বড় অবস্থা আজ সাতু ঘোষের! আর সেই প্রথম বয়সে সাতুকে

চাকরি ছেড়ে দেবার পর মহিম মায়ের কাছে বলেছিলেন, উঠে যাবে সাতুর ব্যবসা : অধর্ম করে ব্যবসা হয় না। বইয়ে ভাল ভাল উক্তি পাঠ করে সবে পাশ করে বেরিয়েছেন, সূর্যকান্তর কাছে পড়ে এসেছেন—ঘোরটা কেটে যায়নি তখনো। অধার্মিক সাতুর উন্নতি চেয়ে দেখ আজ চক্ষু মেলে।

সাতু ঘোষ বললেন, কাল পড়াতে যাওনি কেন? দেখ ইস্কুল থেকে পাঠাত না—সে একরকম। পাঠিয়েছে যখন, ছেলে ফাইন্যাল এগজামিনে বসতে যাচ্ছে—বের করে ওকে আনতেই হবে। ওর পিছনে টাকা তো কম খরচ কর'ছি নে!

এক অঞ্চলের মানুষ, মহিমের বাপের কাছে একদিন উপকার পেয়েছেন। তাঁর মুখে অন্তত দুটো সান্ত্বনার কথার প্রত্যাশা ছিল। কী বলবেন মহিম চুপ করে আছেন।

রুক্ষ গলায় সাতু বলছেন, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে যাচ্ছি। দু-দুটো মাস্টার রেখেছি। কালাচাঁদবাবু এক নম্বরের ফাঁকিবাজ—একদিন এলেন তো দুদিন আসেন না। আমি বাড়ি না থাকলে ঢকঢক করে এক কাপ চা গিলেই সরে পড়েন। চেনা-জানা মানুষ বলে তোমায় রাখলাম, তুমিও দেখছি ওই দলের। তাই আজ নিজে এসে পড়লাম। না এলে যা করতে সে তো জানি। আরও দু-একদিন কাটিয়ে নিয়ে চান না করে দাড়ি না কামিয়ে উপস্থিত হতে—কী ব্যাপার? না, অসুখ করেছিল। ছুতো বানাতে তোমাদের জুড়ি নেই। এইজন্যে কিছু হয় না মাস্টারদের—সারা জন্ম দুয়োরে দুয়োরে বিদ্যে বিক্রি করে বেড়াতে হয়। নাও, ওঠো গাড়িতে।

যেন আকস্মিক বজ্রপাত। পিছন দিকে দীপালি কখন এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলে উঠলো, বাবা যাবেন না।

সাতু ঘোষ অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, যাবে না মানে? দয়া করে পড়ায় নাকি? মাসে মাসে মাইনে খায়—যাবে না অমনি বললেই হল! ওই বুঝেই গাড়ি নিয়ে নিজে চলে এসেছি—আজেবাজে বলে কাটিয়ে দিতে না পারে।

মানুষের সুখ-অসুখ থাকে। যেতে পারবেন না আজ বাবা। কঠিন ভাবে কথাগুলো বলে মেয়ে বাপের হাত ধরে টানল।

মহিম আস্তে আস্তে হাতখানা ছাড়িয়ে নিলেন। নিয়ে দীপালির মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। বলেন, কিছু মনে করবেন না দাদা। ওদের মা মারা গেছে। ছেলেমানুষ, কেমন ভাবে কথা বলতে হয় জানে না। আপনারা ঘরে এসে বসুন।

সাতু নরম হয়ে গেলেন : ইস, সে খবর তো জানি নে! কি হয়েছিল? তাহলে অবিশ্যি যেতে পারা যায় না।

কাল কামাই হয়েছে, আজকেও যেতে পারছি নে দাদা। ছেলে-মেয়ে সবগুলোই অপগণ্ড—বড্ড কান্নাকাটি করছে। আবার মুশকিল, কেঁদে কেঁদে ছোট ছেলেটার জ্বর এসেছে, জ্বরে হাঁসফাঁস করছে। একশ-চার পয়েণ্ট ছয় এখন।

সাতু ঘোষ বললেন, আচ্ছা, কাল যেও তবে। এগজামিন এসে পড়েছে। একেবারে শিরে-সংক্রান্তি কিনা, নয়তো বলে দিতাম রবিবার অবধি থেকে সোমবারে যেও একেবারে।

তারপর নিঃশ্বাস ফেলে দার্শনিকসুলভ কণ্ঠে বলেন, যে চলে যায় সে-ই শুধু থাকল না। বাকি সমস্ত পড়ে থাকে, সব-কিছু করতে হয়। কাজকর্মের মধ্যে থাকলে বরঞ্চ কেটে যায় ভাল, শোকতাপে কাবু করতে পারে না। কাল সন্ধ্যাবেলা যাবে, এই কথা রইল।

গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন, এই বুঝি বড় মেয়ে? মেয়ে বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। দেখতেও খাসা। টান খুব তোমার উপর—কী রকম মারমুখি হয়ে পড়ল! আমি তো কিছু জানতাম না, জানলে কি আর বলতাম? কি নাম তোমার মা?

আজকে আর শেষ-রাত্রে নয়, ফর্সা হয়ে গেলে তবে মহিম পড়াতে বেরলেন। প্রবোধকে ডেকে তুলতে হল না, নিজেই উঠে বই নিয়ে বসেছে। পড়াতে শুরু করে মহিম হঠাৎ চুপ করে যান। বারংবার হচ্ছে এইরকম। অবাধ্য মনটাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে কাজে লাগাতে হচ্ছে। বৃত্তান্ত শুনে প্রবোধ বলে, আপনি চলে যান মাস্টারমশায়। কিছু কাজ দিয়ে যান, করে রাখব।

এর পরের ছাত্রের বাড়ি আর গেলেন না। ছুটতে পারছেন না, থপথপ করে যাচ্ছেন। সিংহিবাড়ির সময় হয়ে এল। দু-দিন কামাইয়ের অপরাধ, তার উপরে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেলে কৈফিয়তের বোঝা বিষম ভারী হয়ে দাঁড়াবে। সিংহিবাড়ির বিশেষ সুবিধা, পৌঁছলেই হয়ে গেল। আর খাটনি নেই, জলি পড়ে না। খানিকটা সময় কাটিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়েন। এর পরে তো রবীন—রবীনকে আজ মারলেন না। নেপথ্যবর্তিনী মাকে বললেন, বাড়িতে অশৌচ, কয়েকটা দিন এখন মারধোর রেহাই দিতে হবে মা।

ইস্কুল থেকে এক ঘণ্টা আগে ছুটি নিয়ে ট্রামে চেপে সোজা বাসায় চলে এলেন। বিকালের দুটোও পড়াবেন না আজ, যা হবার হোকগে। ভোরবেলা পুণ্য ঘুমচ্ছিল। গায়ে হাত দিয়ে দেখে গেলেন—জ্বর ধাঁ-ধাঁ করছে। গোবিন্দ এসে বসলেন।

একগাদা কমলালেবু আর বেদানা, একবাক্স বিস্কুট—ও দিদি, তোমার কিছু

পয়সা আছে জানি, তাই বলে পাহাড় কিনে এনে তাকের উপর তুলছ! এক বাচ্চা অত খাবে ক'মাস ধরে?

সুধা বলেন, আমরা কিনিনি। সাতু ঘোষের ছেলে তোমার ছাত্র অলক হাতে করে এসেছিল। বাপের মতন চশমখোর নয়, ছেলেটা বড় ভাল।

অলকের প্রশংসায় সুধা শতমুখ: অমন ছেলে হয় না। কী মিষ্টি মুখের কথা! পিসিমা বলে আমায় গড় হয়ে প্রণাম করল। বলে, ফলটল আমি কেন আনতে যাব পিসিমা, আমি কি জানি? মা সমস্ত শুনেছেন, তিনি এসব পাঠিয়ে দিলেন। গোবিন্দ ডাক্তারবাবু এসে প্রেস্কৃপসন লিখে দিলেন, শুভোর, হাত থেকে কাগজটা ছোঁ মেরে নিয়ে অলক ছুটল। বলে, গুরুদশা চলছে—খালি পায়ে ধড়া-গলায় শুভোর রাস্তায় যেতে হবে না। ওষুধ নিয়ে এসে দামের কথা কিছুতে বলে না, হবে-হবে করে কাটান দেয়। দুপুরবেলা থেকে এতক্ষণ ধরে কত গল্প—এই একটু আগে উঠে গেল। বলে, মাস্টারমশায় গিয়ে পড়বেন এইবার, আমায় না পেলে ভয়ানক রেগে যাবেন।

মহিম বলেন, এমনিও রেগেছি। কিছু তো জানে না বোঝে না—মাথা-ভরা গোবর। তার উপর এইরকম আড্ডা দিতে লাগলে কোন পুরুষে ওর পাশ করতে হবে না।

সুধা তাড়াতাড়ি বলেন, এ নিয়ে তুমি কিছু বলতে যেও না অলককে। খবরদার, খবরদার! খাসা ছেলে। ওর মা পাঠিয়েছিলেন, ও কি করবে? পরের অসময়ে যারা দেখে ভগবান তাদের ভাল করেন। পড়ার ক্ষতি-লোকসান ভগবান পূরণ করে দেবেন। রোজ কি আর আসতে যাচ্ছে এখানে?

চাদর কাঁধে তুলে নিয়ে মহিম এবার উঠলেন। সোজা সাতু ঘোষের বাড়ি—অলকের কাছে। ছেলেটা বই-টই গুছিয়ে নিয়ে বসে আছে। অত্যন্ত সহজ জিনিসটাও হাতুড়ি পিটিয়ে পেরেক বসানোর মতো করে ওর মাথায় ঢোকাতে হয়। কিন্তু আজ অলককে নতুন চোখে দেখছেন। মাথা না থাক, মস্ত বড় হৃদয় আছে ছেলেটার।

বললেন, আমাদের বাসায় তুমি গিয়েছিলে, দিদি খুব প্রশংসা করছিলেন।

ইস্কুল থেকে বাসা হয়ে এলেন বুঝি?

মহিম বলেন, পুণ্যের আবার অসুখ করে বসল, মন খুব খারাপ, তাই একবার দেখে এলাম ছেলেটাকে। মায়ের বড্ড ন্যাওটা ছিল কিনা, মা-মা করে সারাক্ষণ কেঁদে কেঁদে জ্বর হয়েছে। জ্বরের গতিকও ভাল নয়। কিন্তু তুমি বাবা ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ এনে দিয়ে দাম নিলে না কেন?

অলক অবহেলার ভঙ্গিতে বলে, নেওয়া যাবে, তার কি হয়েছে!

না বাবা, এটা ঠিক নয়। ফল-টল দিয়ে এলে—মা-জননী পাঠিয়েছেন, মাথা পেতে নিয়েছি। কিন্তু তুমি ছাত্র-মানুষ, কিজন্য পয়সা খরচ করতে যাবে?

অলক বলে, ছাত্র তো ছেলের মতন। সামান্য আট-দশ আনা পয়সার জন্য আপনি মাস্টারমশায় পীড়াপীড়ি করবেন, আমি না হয়ে গুডো হলে কি করতেন?

এমন করে বলছে, ঠিকমতো উত্তর মুখে জোগায় না। মহিম অন্য কথা পাড়েন: তোমার উঁচু মন, বিপদে ছুটে গিয়ে পড়লে। কিন্তু এক-এক মিনিট এখন যে এক-এক ঘণ্টার সমান। বারংবার গিয়ে সময় নষ্ট করো না, আমি তাহলে নিজেকে অপরাধী মনে করব।

পুণ্যব্রতের জ্বরটা বাঁকা পথ নিলে। টাইফয়েড—একেবারে আসল বস্তু নয়, প্যারা-টাইফয়েড। কাজকর্মে তাই বলে কতদিন আর ফাঁক কাটানো চলে! এগজামিন ঘনিয়ে আসছে। ইস্কুল থেকে মহিম টুইশানিতে সোজা বেরিয়ে পড়লেন আগেকার মতো। সেই যে ছেলেটা বই-খাতা নিয়ে বাইরের ঘরে তৈরি হয়ে থাকত, সে নেই। খেলাধুলো করে না, বেড়ায় না—গেল কোথায় তবে? চাকরটা বলে, কোন এক কোচিং-ক্লাসে পড়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছে, সেইখানে যাচ্ছে কাল থেকে।

ইদানীং অলিতে-গলিতে কোচিং-ক্লাস। পাইকারি হারে প্রাইভেট পড়ানো। যেমন ধর, রেলের কামরায় দশজনে একসঙ্গে বসে যায়; আবার বড়লোক কেউ রিজার্ভ করে নেয় একলার জন্যে। একটি ছেলের জন্য এক ঘণ্টার টিউটর রিজার্ভ করার মতো মানুষ কমে আসছে। কোচিং-ক্লাসের পাইকারি পড়ানোর বেশি চাহিদা। পড়ানো তো কচু—একজন মাস্টারকে সামনে বসিয়ে রেখে দশ-বিশটা ছেলের হট্টগোল। তবে সস্তায় হয়। চার-পাঁচদিন মহিমকে না পেয়ে ছেলে কোচিং-এ ঢুকে পড়েছে, সস্তার স্বাদ পেয়েছে। আর ফিরে পাওয়া যাবে না। গেল এটা।

স্বলতার টুইশানিও গেছে। গিয়ে দেখলেন, নতুন মাস্টার এসে তোলপাড় করে পড়াচ্ছে। এটা লিখছে, ওটা বোঝাচ্ছে লাল পেন্সিলে দাগ দিচ্ছে ওখানটা। নতুন নতুন এমনি করতে হয়। মহিমও করেন। তারপরে উৎসাহ ঝিমিয়ে আসে। চার-পাঁচটা দিন বিকালে অবহেলার দরুন পৃথিবী উল্টে যাওয়ার ব্যাপার। টিউটর যেন পড়িয়ে যাবার কল একটা—সংসারধর্ম নেই তার, সংসারে অসুখ-অশান্তি থাকতে নেই। যাকগে, ভালই হল। মেহ কেবল

যেন শিথিল, খাটতে মন লাগে না। ইস্কুল থেকে ফিরে পুণ্যের কাছে বসবেন একটু। সংসারের খবরাখবর নেবেন, দিনের জমাখরচ লিখে রাখেবেন বরঞ্চ বিকালের এই সময়টা।

প্রশ্নকর্তারা প্রশ্ন রচনা করেছেন—য়্যুনিভার্সিটির কর্তারা গোপনে ছাপা শেষ করে অতি-সাবধানে সিন্দুকে তালা এঁটে রেখেছেন, প্রশ্ন পাচার হয়ে না যায়। সেই প্রশ্ন আগেভাগে বের করে এনে উত্তর লিখে ছাত্রকে মুখস্থ করিয়ে দেবেন—মহিমদের এই কাজ। সিন্দুক ভেঙে চুরি করা নয়, প্রশ্নকর্তার মনের ভিতর সেঁধিয়ে হাতড়ে হাতড়ে খোঁজা। বুদ্ধির খেলা—ওঁরা কতদূর লুকোতে পারেন, ইনি কতটা বের করতে পারেন। অনেক রাত্রে কাজকর্ম চুকিয়ে হিসাব লেখা শেষ করবার পর মহিম ছাদের উপর পায়চারি করে বেড়ান। গতবার এই এই প্রশ্ন এসেছিল, তার আগের বার এই রকম—এবারে কি কি আসবে? ভেবে ভেবে ব্যাসকূট ভেদ করে ফেলেন। বছর বছর করে আসছেন। মহিম-মাস্টারের সেইজন্যে নামডাক—এত টুইশানি তাঁর কাছে আসে। অন্য ছেলেরা ঘুন-ঘুন করে মহিমের ছাত্রের কাছে: বল না ভাই কোনটা কোনটা দেগে দিলেন। মহিম যা দেবেন, ছাত্রেরা নিঃসংশয়, তার ভিতর থেকেই প্রশ্ন এসে যাবে। মহিমের ছাত্র মিথ্যে করে উল্টোপাল্টা বলে। অথবা সোজাসুজি হাঁকিয়ে দেয়: মাসের পর মাস মাইনে গনে তবে আদায় হয়েছে, হরির লুঠের মতন ছড়িয়ে দেবার বস্তু নয়।

এমন হয়েছে, এক ঘণ্টা দু' ঘণ্টা ধরে ঘুরছেন ছাতের উপরে। চটির ফটফট আওয়াজ ঘুমের মধ্যে নিচের লোকের কানে যাচ্ছে। সরলাবালা উঠে এলেন হয়তো বা। সিঁড়ির দরজার উপর থেকে শিকল দেওয়া—দরজা ঝাঁকাচ্ছেন। মহিম দরজা খুলে দেন: কী ব্যাপার?

রাত অনেক হয়েছে। শুয়ে পড়।

মহিম বললেন, শোব—

এক্ষুণি শোও। তাই দেখে তবে আমি যাব। আবার তো এক পহর রাত থাকতে ছুটবে। এতে শরীর থাকবে না।

সরলাবালা নেই—প্রশ্ন ভেবে ভেবে আজকে সারা রাত ধরে পায়চারি করলেও সিঁড়ির দরজায় ঝাঁকাঝাঁকি করবে না কেউ এসে। ইচ্ছেও করে না।—পড়িয়ে এসে একটু-কিছু মুখে দিয়েই মহিম শুয়ে পড়েন। অনভ্যাসে সকাল সকাল ঘুম আসে না। সময়ের অপব্যয় হচ্ছে, এপাশ-ওপাশ করছেন। উঠতে ইচ্ছে করছে না তবু, আলস্য লাগে।

ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেল। ফাঁকা এখন। শুধু মাত্র রবীনের ট্যুইশানিটা আছে। আস্তে আস্তে আবার এসে জমবে। কত ছেলে বলে রেখেছে, হাত খালি হলে আমায় নিতে হবে কিন্তু স্যার। দু-একটি গার্জেনও এসে দেখা করে গেছেন। পরীক্ষা হয়ে যাওয়া এবং রেজাল্ট বেরনো—এরই মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলার ফাঁক মেলে কয়েকটা দিন।

বেড়াতে বেড়াতে মহিম সিংহিবাড়ি গেলেন। জলিটা এমনি বেশ চালাক। সবগুলো পেপার জড়িয়ে মোটের উপর কি দাঁড়াল, আলোচনা করে দেখবেন। পরীক্ষা যতদিন চলতে থাকে, তার মধ্যে করতে নেই। কোন একটা ভুল হয়েছে দেখলে ছেলে মুশড়ে পড়ে।

চন্দ্রভূষণের নজরে পড়েছে। বারান্দা থেকে হাঁক পাড়ছেন, শুনুন মাস্টার-মশায়, এইদিক হয়ে যাবেন। কোয়েশ্চেন দেখেছেন তো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

কেমন দেখলেন ?

এ জেরা কোথায় নিয়ে পৌঁছয়—মহিম শঙ্কিত হচ্ছেন। ভাসা-ভাসা জবাব দিলেন, মন্দ কি !

আর আপনি যা সব দেগে দিয়েছিলেন, মনে আছে নিশ্চয়।

মহিম আমতা আমতা করে বললেন, একটা-দুটো জিনিস তো নয়। অত মনে থাকবে কি করে ?

বই-খাতা নিয়ে এসে আমি মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলাম। যা-কিছু দেগেছেন সমস্ত ভুয়ো। একটাও মেলে নি।

কথা সত্যি। মহিম-মাস্টারের এত দিনের নাম ডুবতে বসেছে। প্রশ্নকর্তা যেন তাঁর যাবতীয় ছাত্রের বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখে ঠিক সেইগুলোই বাদ দিয়ে প্রশ্ন ফেঁদেছেন। অজ্ঞতার ভান করে মহিম বলেন, তাই নাকি ? আন্দাজি ব্যাপার বুঝতে পারছেন—প্রশ্ন তো দেখে আসিনি আগেভাগে !

বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে বলেন, টাকা দিয়ে মাস্টার রাখা কেন তবে ? ছেলে নাগাড় সমস্ত পড়ে যাবে—সে কাজ ইস্কুলেই হয়ে থাকে। বেছেগুছে দুটো-চারটে মোক্ষম বলে দেবেন, রপ্ত করে দেবেন সেইগুলো—

তাই তো দিয়ে থাকি সব জায়গায়।

অন্য জায়গার খবরে গরজ নেই। জলিকে দিয়েছেন ঠিক আসলগুলো বাদ দিয়ে। পলিসি মাস্টারমশায়, সে কি আর বুঝি নে ?

হকচকিয়ে গিয়ে মহিম বলেন, পলিসি কি বলছেন ?

লং টার্ম পলিসি। পাশ করলেই তো হয়ে গেল—ফেল করিয়ে করিয়ে ছাত্র জিইয়ে রাখা। চাকরি পাকা হয়ে রইল। এমন সুখ আর কোন বাড়িতে পাবেন। লেট করে করে আসবেন—মাস কাটাতে পারলেই পুরো মাইনে। এখন তদ্বিরে এসেছেন—ফেল হবার পর আবার যাতে ডাকে আপনাকে। অন্য মাস্টারের কাছে না যায়। সেটা আর হচ্ছে না, আমি স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিলাম।

এর পরে আর জলির সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা হয় না। বেরিয়ে এলেন। প্রবোধের বাড়ি যেতে হবে একটিবার। তিন মাসের মাইনে বাকি। বাপের সঙ্গে দেখা হয় না, তাগিদ প্রবোধের মারফতে করতে হত। আজ নয়, কাল—করতে করতে দিব্যি এগজামিন অবধি কাটিয়ে দিল। আর দেরি করলে মোটেই আদায় হবে না।

প্রবোধের বাপকে পাওয়া গেল আজ। বললেন, মাইনের জন্যে এসেছেন? পরীক্ষার খাতায় পাতার পর পাতা রসগোল্লা পাবে, ছেলে বলছে।

মহিম ঘাড় নাড়লেন : তা কেন—

পাবে তাহলে হীরে-চুনি-পান্না? রেজাল্ট বেরুক। আটশ ফুল নম্বরের মধ্যে হাজার দেড় হাজার কত পায় দেখা যাক। তখন আসবেন। একসঙ্গে হিসাব কিতাব করে টাকা নিয়ে যাবেন।

বলতে বলতে আগুন হয়ে ওঠেন : মাস্টার রাখা গোখুরি কাজ হয়েছে। এটা আসবে ওটা আসবে—দাগ দিয়ে দিয়ে মাথাটি খেয়েছেন ছেলের। ও সেইগুলো মুখস্থ করে মরেছে। হলে বসে চোখে অন্ধকার। এমনি হয়তো পড়ত কতক কতক—দু-দশ মার্ক পেত। কিন্তু রাতের কুটুম চুপিসারে এসে ওই যে কোন বুদ্ধি খাটিয়ে সরে পড়তেন, তাতেই সর্বনাশ হয়ে গেল। ন'মাসের মাইনে তো নিয়েই নিয়েছেন—আমার এতগুলো টাকা বরবাদ।

রাতের কুটুম বলা হয় চোরকে। মহিমকে ভদ্রলোক চোর বলে দিলেন। বছরের পর বছর ধরে যশের সৌধ গড়ে তুলেছিলেন—মহিম-মাস্টারের হাতে ছেলে ফেল হয় না। একটা ঝড়েই ভেঙে সমস্ত চুরমার।

অপমানের পর অপমান। আজ কার মুখ দেখে বেরিয়েছেন না জানি। তবু একবার যেতে হয় সাতু ঘোষের বাড়ি। অলকের খবর নিতে হয়। খবর যা হবে সে তো সকলের জানা। সাতু ঘোষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তিনিও কি জানেন না? অন্য জরুরি ব্যাপার আছে—সাতু ঘোষের ভারি বিপদ। কল্যাণশ্রী ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে। সরলাবালার মৃত্যুর পর তার বিপদের দিনে অলক গিয়ে

পড়েছিল বাসায়। কত করেছে! মহিমেরও সাতুর বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নেওয়া উচিত।

গিয়ে কিন্তু বিপদের লক্ষণ কিছু দেখেন না। সাতু ঘোষ পাশা খেলছেন। কচ্চে বারো—হাঁক শোনা যায় রাস্তা থেকে। মহিমকে দেখে সাতু একগাল হেসে বলেন বোসো। অলক তো খুব লিখে এসেছে। বলল নাকি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করবে। তুমি সমস্ত তৈরি করিয়ে দিয়েছিলে। বোসো একটুখানি, সব কথা শুনব। এই হয়ে গেল—এক ঘুঁটি আছে, এক্ষুণি ঘরে উঠে যাবে।

খেলা শেষ হয়ে গেলে সাতু ঘোষ উঠে এলেন। মহিম বলেন, কল্যাণশ্রী ফেল হয়েছে. কাগজে দেখলাম।

সাতু হেসে বলেন, তাতে তোমার কি? টাকাকড়ি রেখেছিলে নাকি? আমায় তো কোনদিন কিছু বল নি।

না দাদা, মাস্টারি করে ব্যাঙ্কে রাখবার টাকা কোথায় পাব?

সাতু বলেন. তাহলে ভাল। ন্যাড়ার নেই বাটপাড়ের ভয়। টাকাকড়ি খুব পাজি জিনিস। আমি ডিরেক্টর—আমার কিছু নয়। কত জনে টাকা রেখেছিল ব্যাঙ্কে—তাদেরই মুশকিল। একেবারে যাবে না, পাবে হয়তো কিছু কিছু। কিন্তু লিকুইডেটরের হাতে গেলে কোন যুগে বেরুবে, সে কিছু বলা যায় না।

গলা নামিয়ে বললেন, শোন, ব্যাঙ্কে কিছু থাকে তো তুলে ফেল তাড়াতাড়ি। ব্যাঙের ছাতার মত ব্যাঙ্ক গজিয়েছে, লড়াই অন্তে এবার ডুবে যাবে একে একে।

অলকের পরীক্ষার কথা উঠল। সাতু বললেন, শুনে তো তাজ্জব লাগে ভাই। ওর বাপ-ঠাকুরদা চোদ্দপুরুষের মধ্যে কেউ পাশ করে নি—ও কি করে ফার্স্ট ডিভিশনে যাবে, ভগবান জানেন।

মহিমের পিঠ ঠুকে দিয়ে বলেন, তুমি ছাড়া অন্য কেউ পারত না! আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সন্দেশ কিনে তোমার বাসায় গেল। বলে পায়ের ধুলো নিয়ে আসি মাস্টারমশায়ের।

বাসায় ফিরে মহিম দেখলেন, তখন অবধি রয়েছে অলক। সন্দেশ খাওয়াখায়ি আর খুব গুলতানি হচ্ছে। এর পরে প্রস্তাব আছে, সুধা আর দীপালিকে নিয়ে অলক সিনেমায় যাবে। শুভব্রত ভাল ছেলে, সে যাবে না পড়াশুনা ছেড়ে। পুণ্য যেতে পারে মহিম যদি অনুমতি দেন।

মহিমকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে অলক পায়ের ধুলো নিল। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, সমস্ত অঙ্ক মিলিয়ে দেখেছি। পঁচাশি নম্বর রাইট। আশির নিচে পাব না। অঙ্কে নিশ্চয় লেটার পাব মাস্টারমশায়।

মহিম বলেন, তাই তো শুনে এলাম সাতু-দার কাছে। হল কি করে বল তো? টুকে মেরেছিস নিশ্চয়।

অলক আহত স্বরে বলে, কি বলছেন সার! আপনিই তো করে দিলেন সমস্ত।

আমি? সজোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, বরাবর তাই তো হয়ে এসেছে বাবা। কিন্তু এবারে কি হল—দীপালীর মা নিজে গেল, আমাকেও মেরে রেখে গেছে একেবারে।

অলক তর্ক করে: আপনি ভুলে গেছেন। অঙ্ক কষে দিয়েছেন, গ্রামারে দাগ দিয়ে দিয়েছেন, ইতিহাস সংক্ষেপ করে লিখে দিয়েছেন। যা বলেছেন, অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে। হুবহু লিখে দিয়ে এসেছি। পিসিমাকে তাই বলছিলাম, ফার্স্ট ডিভিশন কেউ রুখতে পারবে না।

সকল ছাত্র গালিগালাজ করছে: মহিম-মাস্টারের আর কিছু নেই। চোখের দৃষ্টি যায় নি শুধু, মাথার ঘিলুও শুকিয়ে গেছে। অলকের মুখে উল্টো কথা। সকলকে বাদ দিয়ে গুহ্য পাঠ একলা অলককেই দিলেন কেবল? স্বপ্নে বলে দিয়েছেন? কিছু না ধুরন্ধর ছেলে টুকে মেরেছে। নিজের বিদ্যেয় করেছে, কেউ বিশ্বাস করবে না। মহিমের গুণগান করে সামাল দিচ্ছে এখন।

॥ তেইশ ॥

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বেরল। মহিমের কাছে যারা প্রাইভেট পড়েছে, সবগুলো ফেল। অঙ্কে তো অলকের আশি পাবার কথা, নম্বর আনিয়ে দেখা গেল আট পেয়েছে, এবং কোন বিষয়েই পাশ-নম্বর নেই। তা বলে দৃকপাত নেই ছেলেটার। মহিমের বাসায় এখনো আসে। সুধাকে বলে, কী জানি, বুঝতে পারছি নে পিসিমা কিসে কি হয়ে গেল। অঙ্কের উত্তর সমস্ত আমি মিলিয়ে দেখেছিলাম। খাতা যে আমায় দেখতে দেবে না—তা হলে বুঝতে পারতাম। যাকগে, পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না তো! এবারে হল না তো আসছে বার। মা'কে বলে রেখেছি, মহিমবাবু মাস্টারমশায় ছাড়া অন্য কারো কাছে আমি পড়ব না।

কিন্তু মহিমই যাবেন না আর ওখানে। সব বিষয়ে ফেল, কোন মুখ নিয়ে সাতু ঘোষের কাছে দাঁড়াবেন? নতুন টুইশানি একটাও আর আসে না। ছাত্র আর গার্জেন কত জনে বলে রেখেছিল, একটি প্রাণীরও এখন দেখা নেই। শুধুমাত্র

রবীন আজে। সকাল থেকে সন্ধ্যায় বদল করে নিয়েছেন তাকে—সন্ধ্যাবেলায় এই একটুখানি কাজ। রবীন আসছে-বছর ফাইন্যাল দিয়ে বেরিয়ে যাবে—তারপরে যে রকম গতিক, হাত-পা ধুয়ে থাকতে হবে সমস্ত সময়। আজকে সরলাবালা নেই—তখন একটা মিনিট চোখের দেখা দেখতে পারেননি। সারা জীবন তাই নিয়ে কত অনুযোগ। কত মুখভার করেছে কতদিন। আজ যদি বেঁচে থাকত, সকাল-বিকাল সারাক্ষণ তার শয্যার পাশটিতে বসে থাকতাম।

কিন্তু রবীনের টুইশানিও সেই ফাইন্যাল অবধি থাকে কিনা দেখ। একদিন পড়াতে গিয়ে মহিম শুনতে পেলেন, দুই ভাই মণি আর রবীনে কথাবার্তা হচ্ছে। তাঁকে নিয়ে কথা, বাইরে দাঁড়িয়ে শুনে নিলেন একটুখানি: মহিমের কাছে আর পড়তে চায় না রবীন; অন্য কাউকে দেখ দাদা। অলক্ষুণে মাস্টার। এত জনের মধ্যে একটা ছেলেও পাশ করল না ওঁর কাছ থেকে।

মণি বলছে, মহিমবাবুর মত শিক্ষক অন্য কোন ইস্কুলে আছে কিনা জানি নে, তোদের ইস্কুলে তো নেই। পুরো তিনটে বছর পড়েছি ওঁর কাছে। যে-কোন ক্লাসে গিয়ে যে-কোন সাবজেক্ট পড়িয়ে আসতেন। সে কী পড়ানো! সবাই মগ্ন হয়ে শুনত, ক্লাসের ভিতর একটা সূঁচ পড়লে শোনা যেত।

রবীন বলে, কবে কী ছিলেন, জানিনে। এখন ফিফথ ক্লাসের উপরে ওঁর রুটিন নেই। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে—তাই সামলাতে হিমসিম হয়ে যান। উপর ক্লাসে কি পড়ানো হয়, একেবারে কিচ্ছু জানেন না। উনি থাকলে আমি কখনও পাশ হব না।

মহিম আর দেরি করলেন না। গলা খাঁকারি দিয়ে ঢুকে পড়লেন। দেরি হলে আরও কত কি শোনাবে কে জানে। সে আমলের এই একটি ছাত্র—মণি তাঁর ক্ষমতার সাক্ষি। নিন্দের নিন্দেয় মণিরও কান ভারী করে তুলছে—মহিম যতক্ষণ পাবেন, সেটা ঠেকিয়ে রাখতে চান।

পড়ানোর পরে আজ চিত্তবাবুর বাড়ি চললেন। পুরানো আমলের আর একজন। চিত্তবাবুরই কত ক্লাস পড়িয়ে এসেছেন—ক্ষমতা জানেন তিনি মহিমের। কিন্তু কোথায় চিত্তবাবু এখন! পড়াতে বেরিয়ে গেছেন। মহিমের মতো নিষ্কর্মা নন। মহিমের চেয়ে চিত্তবাবু বয়সে অনেক বড়। অথচ কেমন শক্তসামর্থ। চিরদিন ক্লাসে ফাঁকি দিয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে কাটাগেন, সেজন্য চশমাটাও লাগে না এতখানি বয়সে। হাতে কাজ আছে বলেই টুইশানির ডাক।

অ্যাসিস্ট্যান্ট-হেডমাস্টার, মানুষ—জানে, এই লোকের কাছে প্রাইভেট পড়লে টেস্টে পাশ হয়ে অন্ততপক্ষে ফাইন্যাল পরীক্ষায় গিয়ে বসতে পারবে। সেই নিশ্চিন্ত, পরের ভাবনা পরে।

কাঁচা নর্দমার উপর কালভার্ট—চিত্তবাবুর বাসায় ঢোকবার পথ। নাকে কাপড় চেপে সেই কালভার্টের উপর মহিম বসে আছেন। রাত দুপুর হয়ে গেল —ব্যাপার কি। পড়ানোর পরে কোন আড্ডায় জমে গেলেন নাকি চিত্তবাবু?

কে?

অবশেষে দেখা পাওয়া গেল। মহিম বলেন, অনেকক্ষণ বসে আছি চিত্তবাবু।

চিত্তবাবু বলেন, ঘরে আসুন। ওখানে কি জন্যে বসে? বললেই দুয়োর খুলে দিত।

বসতে হবে না। সামান্য একটা কথা, কথাটা বলবার জন্য কখন থেকে পথ তাকিয়ে আছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হয়ে যাবে।

ঢোক গিলে নিয়ে বলেন, নতুন রুটিনে আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। কোন দোষঘাট হয়েছে বলুন। আপনি যখন যে ক্লাসে দিয়েছেন, কোনদিন তো আপত্তি করেনি। বলুন, করেছি কি না।

প্রবীণ শিক্ষক রাত দুপুরে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে এমনি করছেন, চিত্ত গুপ্ত বিব্রত হয়ে পড়লেন। বলেন, আমি কি করব বলুন। আমার হাতে কিছু নেই। কাকে কোন ক্লাস দিতে হবে, হেডমাস্টার সমস্ত বলে দেন; আমি জুড়ে-গেঁথে দিই এইমাত্র।

মহিম হাহাকার করে ওঠেন: অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছি। ফিফথ ক্লাসের উপরে পড়াবার বিদ্যে কি নেই আমার? বলুন।

বিদ্যে নিয়ে কথা নয়। পড়ানো চায় না তো ইস্কুলে। মুশকিল কি জানেন —আপনি ক্লাস ম্যানেজ করতে পারেন না মোটে। ফিফথ ক্লাসেও তো গণ্ডগোল—হেডমাস্টারের কাছে হররখত রিপোর্ট এসে যাচ্ছে।

চোখে ঠাহর করতে পারি নে, ছানি পড়েছে। চোখ ভাল থাকলে দেখে নিতাম বিচ্ছুগুলোকে। আগে হয়েছে এমন? এই শীতকালে ছানি কাটিয়ে ফেলব। আমায় মারবেন না চিত্তবাবু।

খপ করে তাঁর হাত জড়িয়ে ধরছেন। বলেন, সত্যি সত্যি মরে যাচ্ছি। একটা টুইশানি জোটে না। গার্জেন খবর নেয় কোন ক্লাসের মাস্টার। ফিফথ ক্লাসের মাস্টারকে কে ডাকে বলুন, ক'টাকাই বা দেয়? একটা-দুটো উঁচু ক্লাসে নেহাত বুড়ি ছুঁইয়ে রাখুন—লোককে যাতে বলতে পারি।

চিত্তবাবু হাত এঁড়াবার জন্তই বললেন, আচ্ছা, এবারে যা হবার হয়ে গেছে। দেখা যাক, আসছে-বছরের রুটিনে কি করতে পারি।

আসছে-বছর নাগাত ধুলিসাৎ হয়ে যাব চিত্তবাবু। বউ মরেছে, ছেলেমেয়ে ক'টাও না খেয়ে মরবে। রুটিনে না হল, বেঁটেখাতায় মাঝে মাঝে মারুন। আপনার দুটো-একটা ক্লাসে দিয়ে দেখুন না। আগে যেমন দিতেন।

কী করেন চিত্তবাবু! বাড়ি বয়ে এসে পড়েছেন। রাজি হতে হল।

সেই শুভক্ষণ এল দিন চারেক পরে। বেঁটেখাতার মারফতে উঁচু ক্লাসে। চিত্তবাবুরই অঙ্কের ক্লাস। এমন-কিছু উঁচু নয়—থার্ড ক্লাস বি-সেকসন। মহিমের কাছে তাই আজ এভারেস্ট-কাঞ্চনজঙ্ঘা। ফিফথ ক্লাসের দু-দুটো ধাপ উপরে। ভাল কাজ হলে আবার গিয়ে খোশামুদি করবেন আর এক ধাপ উপরে তুলতে। ছেলেরা জানবে, হাঁ, উঁচু মাস্টার বটে!

মাস্টারির প্রথম দিন এই থার্ড ক্লাসেই অঙ্ক কষিয়েছিলেন মহিম। বজ্জাত ছেলেগুলো অঙ্ক কষার কায়দা দেখে মোহিত হয়ে গেল। একটা পিরিয়ডের ভিতরেই রণ-বিজয়। আজকে কিন্তু জুত হচ্ছে না সেদিনের মতো। কাল বদলেছে, বয়স বেড়ে গেছে। ছেলেদের দোষ কি—ক'টা দাঁত পড়ে গেছে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে আওয়াজ বেরিয়ে যায়। তারা কথা বুঝতে পারে না।

আবার বলুন সার—

গলায় যত জোর আছে, সর্বশক্তিতে মহিম পড়াচ্ছেন। চোখ এত খারাপ হয়েছে—কী সর্বনাশ! ব্লাকবোর্ডের মোটা মোটা লেখাও ঝাপসা।

আলজাব্রার বই বদল হয়ে গেছে, এ নতুন বইয়ের ভিন্ন পাতায় আলাদা রকমের অঙ্ক। পাতা না খুলে আগের দিনের মতন মুখস্থ বলে যাবেন, সে উপায় নেই। পাতা খুলে তো বলতে পারেন না, না পড়তে পারলে কি বলবেন?

বেঞ্চিতে বসা সারি সারি ছেলেগুলোর দিকে তাকালেন। ছাত্র নয়, নির্মম বিচারক। মুখ তাদের ভাল করে দেখতে পাচ্ছেন না—কিন্তু এটা জানেন, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মহিমের অঙ্ক কষার দিকে। দেখেশুনে রায় দেবে। কী ছাই কষবেন তিনি—এটা-ওটা লিখে সময় কাটানো, ঘণ্টা কাবার করে দেওয়া। মহিমের পা দুটো কাঁপছে ঠকঠক করে, ঘাম ফুটেছে সর্বাঙ্গে।

মিউ—

মহিম আগুন হলেন: বেড়াল ডাকছ তোমরা? আমি মহিমারঞ্জন সেন, অঙ্কে অনার্স সহ গ্রাজুয়েট—থার্ড ক্লাসের এইটুকু-টুকু ছেলে ইয়ার্কি করছ আমার

সঙ্গে? মূর্খস্য মূর্খ, তোমরা বুঝবে কি—তোমাদের বাপ-দাদাদের জিজ্ঞাসা কোরো মহিম মাস্টারের কথা। আমি যে কায়দায় অঙ্ক কষে দেব, খোদ নিউটন তা পারবেন না। আমি যে অঙ্ক দাগ দিয়ে দেব, য়্যুনিভার্সিটি থেকে বাপের ঠাকুর বলে ঠিক সেই ক'টা অঙ্ক কোয়েশ্চেন-পেপারে বসিয়ে দেবে।

বলতে বলতে গলা ধরে আসে। কী সব দিন গিয়েছে! থার্ড ক্লাসে এসে হিমসিম খাচ্ছেন, আর ফার্স্ট ক্লাসে সেকসনের পর সেকসনে রাজচক্রবর্তীর মতো পড়িয়ে ফিরছেন একদিন। বাঘ বাঘা মাস্টার অনুপস্থিত—চিত্তবাবু বলছেন, যাবেন নাকি মহিমবাবু?

বললে কেন যাব না?

জিওগ্রাফি কিন্তু—

হবে।

রুটিন দেখে সংশোধন করে চিত্তবাবু বলেন, উঁহু, ভুল হয়েছে। জিওগ্রাফি নয়, পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন।

তা-ও হবে।

হেসে ফেলে চিত্তবাবু বলতেন, পণ্ডিতমশায়ের সংস্কৃতের ক্লাস হয় যদি?

তা-ই পড়াব।

থার্ড ক্লাসের বাচ্চা বাচ্চা ছেলে—শুভব্রতের চেয়ে অনেক ছোট, বিড়াল ডাকে আজ সেই মানুষের ক্লাসে!

ছেলেরা কিন্তু বিড়াল ডাকেনি। সত্যি সত্যি এক বিড়ালছানা জানলা দিয়ে ক্লাসের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। দারোয়ান বিড়াল পোষে, তার ছা-বাচ্চা। ডাকছিল-সত্যিকার বিড়ালেই—চোখে দেখেন না বলে মহিম ছেলেদের অকারণ গালিগালাজ করলেন।

আর, সেইজন্য পেয়ে বসল তারা।

মিউ-মিউ—

মহিম ক্ষেপে গেলেন। স্কেল নিয়ে ছুটোছুটি করছেন আওয়াজ আন্দাজ করে। এবারে ছেলেই ডাকছে, কিন্তু একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে স্কেলের বাড়ি খাবে, এমন আহাম্মক ছেলে নয়।

মিউ-মিউ—মিউ-মিউ—

একজন থেকে চার-পাঁচটা জুটেছে। দিব্যি এক খেলা দাঁড়িয়ে গেছে—কানামাছি খেলার মতো। মহিম পাক দিচ্ছেন, তারা পলাপলি খেলছে। পাগলের মতো হয়ে মহিম শাপশাপান্ত করছেন: সর্বনাশ হবে বুঝলি, মুখে রক্ত

উঠবে। বাড়ি গিয়ে সকলের মরা-মুখ দেখবি। তখন আর একটা ছেলেও বাকি নেই, সারা ক্লাস জুড়ে চলেছে : মিউ-মিউ, মিউ-মিউ, মিউ-মিউ—

ছুটোছুটির ক্লান্তিতে অবশেষে মহিম ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন।

আর আসব না তোদের ক্লাসে। মাস্টারি আর করব না। গুখুরি করেছি এমন কাজে এসে। ছ্যা-ছ্যা, এ কি ভদ্রলোকের কাজ!

একটা ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে ভাল মানুষের ভাবে বলে, অন্যায় রাগ করছেন সার। ডাকছে বেড়ালই। বেড়াল আপনার কোটের পকেটে। সেখান থেকে ডাকছে।

গলায় চাদর, গলাবন্ধ ঢিলে কোট গায়ে। মাস্টারির পোশাক—ভি-ডি-ভি যে রেওয়াজ রেখে গেছেন। কোটের পকেটের ভিতরে সত্যিই কখন বিড়াল-ছানা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

ইস্কুল থেকে মহিম ট্রামে উঠলেন না। সকাস সকাল বাসায় এসে কি করবেন? অকারণ পয়সা-খরচ শুধু। লজ্জাও করে ছেলেমেয়েদের কাছে হাত-পা কোলে করে বসে থাকতে। বড় হয়েছে তারা ; ভাববে, বাবাকে কেউ ডাকে না আজকাল—বাতিল করে দিয়েছে। মহিম হেঁটে হেঁটে চললেন তাই। বলরাম মিস্তির লেনে রবীনকে অমনি সেরে যাবেন। অঢেল সময়, আস্তে আস্তে চলেছেন।

কি ভেবে ডাইনের গলিতে বাঁকলেন। পুরানো দিনের এক ছাত্রের বাড়ি। পাশ করার কোনও আশা ছিল না। পাশ করলে ছাত্রের বাপ নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন তাঁকে। ঢুকে গেলেন সোজা সেই বাড়িতে।

ভূপতিবাবু আছেন?

ভূপতি সবে অফিস থেকে ফিরছেন। অবাক হয়ে বললেন, কি খবর মাস্টারমশায়?

আপনার ছোট ছেলে তো এবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠল। টিউটর রাখবেন না?

রয়েছেন একজন।

দক্ষ লোক রাখুন মশায়। অমিয় পাশ করলে আপনি বলে রেখেছিলেন, মিহিরকেও পাশ করিয়ে দিতে হবে।

খবরাখবর না নিয়েছি, তা নয়। সহসা কণ্ঠে কোমল দরদের সুর এনে ভূপতি বললেন, শরীরটা আপনার বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছে মহিমবাবু। কদ্দিন

আর এই উঞ্ছবৃত্তি করবেন? বিস্তর খেটেছেন, এখন বিশ্রাম নেওয়া উচিত! এসেছেন যখন, একটা মিষ্টি খেয়ে যান।

মিষ্টি খেয়ে ঢকঢক করে পুরো এক গেলাস জল খেয়ে মহিম আবার হাঁটছেন। সন্ধ্যা হয়েছে, আলো রাস্তায় রাস্তায়। একদল ছেলে, রংবেরঙের জার্সি-পরা, খেলা করে ফিরছে মাঠের দিক থেকে। ছড়া কাটছে, মহিম শুনতে পেলেন—

মহিম সেনের চোখ কানা
পকেটে তার বিড়ালছানা।

দৃষ্টি নেই, তাই চিনতে পারেন না ছেলেগুলোকে। থার্ড-বি'র গুণধর কেউ কেউ আছে, সন্দেহ নেই। ঘণ্টা তিন-চার আগেকার ব্যাপার—এর ভিতরেই ছড়া বাঁধা হয়ে গেছে। ছোঁড়াগুলো স্বভাব-কবি দেখা যাচ্ছে, পদ্য গাঁথতে দেরি হয় না।

রবীনের পড়ানো শেষ করে বাসায় ফিরে এলে সুধা বললেন, সিঁদুর-কৌটো এনেছ?

সিঁদুর-কৌটো কেন? ও হ্যাঁ, তাই তো—

তারক করের ছেলে মন্মথর বিয়ে হয়ে গেছে পরশুদিন। বিয়ের দিন মহিম সুধাকে নিয়ে বেহালায় গিয়েছিলেন। বর-বিদায়ের পর তক্ষুনি আবার ফিরে আসতে হল। রূপালিকে নিয়ে মুশকিল, সে কার কাছে থাকে? দিনমান আর অল্প সময় বলে দীপালির কাছে রেখে গিয়েছিলেন, তাতেই দীপালি হিমসিম খেয়েছে। বউভাতে বাড়িসুদ্ধ নেমন্তন্ন। কাল বৃহস্পতিবার বউ-ভাতের তারিখ বটে।

সুধা বলেন, ভুলে গিয়েছ? সকালবেলা তবে কিনতে হবে। আজকেও মন্মথ এসেছিল—দীপালি শুভো পুণ্য সবাই যাতে যায়। বলে দিলাম, বাচ্চা মেয়েটা রয়েছে, রাত্রে তো থাকতে পারব না। কাজের বাড়ি বাচ্চা নিয়ে যাওয়াও যায় না। দুপুরের পর গিয়ে রাত্রিবেলা আমরা ফিরে আসব। কাল তুমি সকাল সকা ছুটি নিয়ে এস মহিম। রূপালি তোমার কাছে থাকবে।

মহিম বললেন, যাবই না কাল ইস্কুলে। ইস্কুলে যাওয়া কবে যে একেবারে বন্ধ হবে, তাই ভাবি!

॥ চব্বিশ ॥

সেদিন রাত্রে মহিম চিলেকোঠায় ঘুমচ্ছেন। ঘুমের ভিতর মনে হয়, কে যেন ছায়ার মতো ঘুরঘুর করছে ঘরের মধ্যে। ছায়া যেন তাঁর নিজের শিয়রে এসে বসল।

কে, কে তুমি?

ছায়া তাঁর কপালে হাত বুলায়, মাথায় স্বল্প চুল ক'টা কোমল আঙুলে চিরুনির মত নাড়াচাড়া করে।

ঘুমসনি তুই দীপালি?

ঘুম হচ্ছিল না বাবা। ঘরের মধ্যে বড্ড গরম। ছাতে উঠে বেড়াচ্ছিলাম। দেখলাম, ঘুমের মধ্যে বড্ড এপাশ-ওপাশ করছ। হাত-পা টিপে দিই একটু?

সিঁড়ির দরজায় শিকল দেওয়া ছিল। খুললি কি করে তুই?

কাঠি ঢুকিয়ে খোলা যায়। আমি পারি।

দীপালি পা টিপতে লাগল। মহিম-মাস্টারের মনটা কেমন করে ওঠে। ক্লাসের ছেলেরা নাস্তানাবুদ করেছে তাঁকে। ছড়া কেটে পথের উপরে অপমান করেছে। টুইশানির আশায় পুরানো ছাত্রের বাড়ি উপযাচক হয়ে গিয়ে মুখ ভোঁতা করে ফিরে এলেন। কোনকিছুই চোখে জল আনতে পারেনি। কিন্তু মা-মরা মেয়ে ঘুমের মধ্যে এসে পড়ে এই মমতা দেখাচ্ছে, অত্যাচারিত অসহায় একটি শিশুর মতন গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঠাণ্ডা করছে—মহিম-মাস্টারের চোখ শুকনো রাখা দায় হয়ে উঠল অতঃপর। পাশবালিশ আঁকড়ে ধরে তিনি কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন।

অনেকক্ষণ পরে উঠে দাঁড়াল দীপালি। কী একটু ভাবল। বলে, কাল আমরা তো সব বেহালায় বউভাতে যাচ্ছি। তুমি যাবে না বাবা?

বুড়োমানুষ, চোখে দেখতে পাই নে। আমি কোথা যাব কাজের বাড়ির ভিড়ের মধ্যে? বিয়ের দিন একবার তো দেখা দিয়ে এসেছি।

একা থাকবে বাসায়?

আমি আর রূপালি—একলা কিসে হল মা? সে-ই বা কতটুকু সময়! রাত্রিবেলা তোরা সব ফিরে আসছিস।

ক'দিন পরের কথা। বেঁটে খাতাটা চোখের কাছে নিয়ে মহিম ঠাহর করে দেখে নিচ্ছেন কোন্ ক্লাসে এবারে। দাশু খুব হাঁকডাক করছেন ওদিকে:

মাস্টারের নামে ছড়া লেখে—কী আস্পর্ধা! ক্লাসের দেয়ালে লিখে রেখেছে। পায়খানায় লিখেছে। কাগজে লিখে নোটিশ-বোর্ডের উপর সেঁটে দিয়েছে। আমার হাতে নিস্তার পাবে না, ঠিক ধরে ফেলব। ধরতে পারলে রাষ্টিকেট করা হবে ইস্কুল থেকে।

মহিমকে দেখেই যেন বেশি চেঁচাচ্ছেন। কথাগুলো সহানুভূতির, কিন্তু ঠোঁটে বাঁকা হাসি। অমন গগনভেদী চিৎকারের অর্থ: হেডমাস্টার চিত্তবাবু এবং মাস্টারদের কারো যদি নজর এড়িয়ে থাকে, কানে শুনে নিন। এবং স্বচক্ষে দেখে কৌতূহল মিটিয়ে আসুন লেখাগুলো নষ্ট হবার আগে।

একটা জায়গায় লেখা মহিমকে ধরে নিয়ে দেখাচ্ছেন: কী বাঁদর ছেলেপুলে মশায়। ধরে আগাপাস্তলা ঠেঙালে তবে রাগ মেটে।

মহিম আর পারেন না—তিক্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, বাহাদুরি আমাদের দাশুবাবু। নর গড়তে বাঁদর গড়ি। বাহাদুর কারিগর আমরা। বিশ্বকর্মা কত বড় কারিগর, হাতপা-ঠুঁটো জগন্নাথের মূর্তি গড়ায় তা মালুম।

বলতে বলতে দ্রুত ক্লাসে চললেন। নাইন্থ ক্লাস—যার নিচে আর নেই। চিত্তবাবু লিস্‌ট মেরে এখানে দিয়েছেন। তাঁর দোষ নেই, জিজ্ঞাসা করেছিলেন মহিমকে। প্রবীণ শিক্ষক বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে উঁচু ক্লাসের জন্য এত করে বললেন—কিন্তু উঁচু ক্লাসে পাঠিয়েও তো ফ্যাসাদ। সেইজন্য জিজ্ঞাসা করতে হল: চারজন মাস্টার আসেননি, থার্ড পিরিয়ডটা নিতে হবে মহিমবাবু। ফোর্থ-বি'র ইতিহাস কিংবা নাইন্থ-এর বাংলা—কোনটা দেব?

নাইন্থ ক্লাস মশায়। আর নিচু থাকলে তাই আমি চেয়ে নিতাম।

নাইন্থ ক্লাসের নিতান্ত অবোধ শিশুগুলো। মহিমের কেমন যেন আক্রোশ—মনে মনে বলছেন, দাঁড়াও না বাছাধনেরা কটা বছর সবুর কর। কী মাল বানিয়ে দিই বুঝবেন তোমাদের গার্জেন। বুঝবে তোমরা বড় হয়ে।

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন বই খুলে ফেল। গোড়া থেকে দশ পৃষ্ঠা খাতায় লেখ। ধরে ধরে লিখবি—বানান ভুল না হয়, লাইন না বাঁকে। মেরে ভূত ভাগাব তাহলে।

নিশ্চিত জানা আছে, চল্লিশ মিনিটের পিরিয়ডে দশ পৃষ্ঠা কি তার অর্ধেক পাঁচ পৃষ্ঠাও লেখা হবে না। রামকিঙ্করবাবুর কাছে সেই প্রথম দিনের শিক্ষা। পুণ্যাত্মা শিক্ষক স্বর্গলাভ করেছেন। মহিম-মাস্টার নিশ্চিন্তে পা দুটো টেবিলের উপর তুলে দিলেন, চোখ বুজলেন।

কিন্তু হবার জো আছে! বেয়ারা একটা স্লিপ নিয়ে এসে হাজির। হেডমাস্টার ডেকে পাঠিয়েছেন।

জ্বালাতন। ঘণ্টার পরে গেলে চলত না? ক্লাস ছেড়ে গেলে কাজকর্ম হয়? আচ্ছা, বলগে আমি যাচ্ছি।

বেজার মুখে উঠে ছেলেদের বললেন, বসে বসে লেখ। জায়গা ছেড়ে উঠেছিস কি মুখে একটা কথা বেরিয়েছে—পিটিয়ে তক্তা করব ফিরে এসে।

হেডমাস্টারের কামরায় এসে মহিম দেখলেন, সাতু ঘোষ অপেক্ষা করছেন। হেডমাস্টারের ডাক তাঁর গরজেই। সাতু রেগে আগুন হয়ে আছেন। বলেন, এখানে নয়—এখানে কথাবার্তা হবে না। বাইরে এস।

সজোরে মহিমের হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে চললেন।

অলক লিখেছে, পড়। এলাহাবাদ ডাকঘরের ছাপ—শয়তান-শয়তানী এলাহাবাদ অবধি পৌঁছে গেছে। ছেলে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, ভাবনায় পড়েছিলাম। এ চিঠির পরে ভাবনা-চিন্তা থাকল না।

একটা খামের চিঠি মহিমের হাতে দিলেন। তিক্তকণ্ঠে বললেন, কি ডাকিনী মেয়ে তোমার! ছি-ছি-ছি, ভদ্রলোকের মেয়ে এমনধারা হয়! আমার একমাত্র ছেলে—বিয়ে দেব বললে কত বড় বড় জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসত। সমস্ত বরবাদ করল। ঘন ঘন যাতায়াত তোমার বাসায়, মাস্টার বলে ভক্তিতে গদগদ—ষড়যন্ত্র অনেক দিন ধরে চলেছে, কেমন?

বলে সাতু ঘোষ এমনভাবে তাকালেন, মহিমও যেন সেই ষড়যন্ত্রের ভিতর।

মহিম বললেন, দীপালির ভাগ্য খারাপ, তাই সে এক গাছমুখ্যু বাঁদরের ধাপ্পায় ভুলে গেল। আমি মামলা করব। আপনার ছেলেকে জেলে পাঠিয়ে তবে ছাড়ব।

বেহালায় তারক করের বাড়ির বউভাতে গিয়েছিল অন্য সকলে রাত্রে চলে এল, দীপালি রয়ে গেল সেখানে। নতুন বউ দীপালির সমবয়সি—বাড়ির মধ্যে একজন সঙ্গিনী পেলে বউয়ের ভাল লাগবে। এই সমস্ত ভেবে তারকই বলেছিলেন কয়েকটা দিন থাকবার জন্য। সুধা তাকে রেখে এসেছেন। দিন পাঁচ-ছয় পরে বউ বাপের বাড়ি গেলে দীপালি ফিরে আসবে তখন। কিন্তু আর সে ফিরছে না অলকের চিঠি পড়ে বোঝা গেল। কালীঘাটের মন্দিরে গোপনে মালা-বদল হয়ে গেছে, দুজনে এখন পশ্চিমে চলল। ষড়যন্ত্র তো বটেই—অনেক দিন ধরে চলেছে ওদের সলাপরামর্শ।

মহিম ক্লাসে ফিরে গেলেন সাতু ঘোষের সঙ্গে আর একটি কথাও না বলে। গিয়ে চেয়ারের উপর ঝিম হয়ে বসে রইলেন। ছেলেরা স্তব্ধ। হাত নেড়ে

একটি ছেলেকে কাছে ডেকে হেডমাস্টারের নামে এক টুকরা কাগজে লিখে পাঠালেন : মাথা ধরেছে, বাড়ি চললাম।

ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মহিম বেরিয়ে গেলেন, হেডমাস্টারের হুকুম আসবার অপেক্ষা করলেন না।

অসময়ে বাসায় চলে এলেন। সুধাকে ডাকলেন : শুনেছ দিদি ?

দীপালি জলে-ডুবে মরেছে। তারকদার বেহালার বাড়ি থেকে।

বল কি ?

জলও নয় পচা পাঁক।

হাতের মুঠোর মধ্যে পাকানো অলকের চিঠি। চিঠি ছুঁড়ে দিয়ে আর কিছু না বলে মহিম গম্ভীরভাবে ছাতে উঠে গেলেন। সিঁড়ির দরজায় শিকল তুলে দিলেন। বেলা পড়ে এসেছে। ছাতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি পায়চারি করছেন অবিরত। মাথা ধরার নাম করে ইস্কুল থেকে এসেছেন—সত্যিই এখন মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। শুয়ে পড়লেন চিলেকোঠায় গিয়ে।

শান্ত হয়েছেন এতক্ষণে একটু, ভাবতে পারছেন ? মায়ামমতা, সেবাযত্ন, পুরানো কালের নীতিনিয়ম সমস্ত বুঝি বাতিল এখন—শুধুমাত্র অভিনয়ের বস্তু! হিমযুগের সঙ্গে ম্যামথের যেমন বিলয় ?

ভাবছেন, বেশ হয়েছে, ভালই তো হয়েছে। নিখরচায় কন্যাদায় কেটে গেল। যা-কিছু সঞ্চয় শুভব্রতের কাজে লাগুক। আসছে-বার সে ফাইন্যাল দেবে। ভাল ছেলে, ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয়। ভালভাবে পাশ করবে, সন্দেহ নেই। স্কলারশিপও পেতে পারে। তারপরে ডাক্তারি পড়াবেন, কাম্বেল মেডিক্যাল ইস্কুলে ভর্তি করে দেবেন তাকে। সরলাবালার বড় ইচ্ছা ছিল, মাস্টারের ছেলে মাস্টার না হয়ে দশজনের একজন হয় যেন! ক্যাম্বেলে ঢোকবার তোড়জোড় এখন থেকেই শুরু করবেন। তদ্বিরের জোর ছাড়া জগতে কিছু হয় না। কত ছাত্র কত দিকে আজ কৃতী হয়েছে, তাদের সাহায্য নিয়ে শুভোকে নিশ্চয় ঢোকানো যাবে! দেরি নয়, কাল-পরশু থেকে খোঁজখবর নিতে থাকবেন।

পাশবালিশটা কোলে টেনে নিলেন। আঙুল দিয়ে টিপে টিপে দেখেন তুলোর ভিতর। জোড়ের মুখে নজর পড়ে চমকে উঠলেন, নতুন সেলাই যেন সেখানে। সেলাই খুলে ফেলেন তাড়াতাড়ি, তুলো টেনে টেনে বাইরে ফেলেন। ব্যাঙ্কের গোলমাল শুনে আঠারখানা একশ টাকার নোট তুলে এনে রেখেছিলেন। পাশ-বালিশের ভিতরে। বারোটা বছর মাসের পর মাস ধরে জমানো। নোট-ভরা এই পাশবালিশ বুকে জড়িয়ে ধরে নিশ্চিন্তে ঘুমোতেন। দীপালি টের

পেরেছিল কেমন করে। রাত্রিবেলা ছাতে ঘুরঘুর করে বেড়ানো, বাপের পা টেপা, মাথায় হাত বুলানো—সমস্ত এই জন্যে ?

খলখল করে আপন মনে হেসে উঠলেন মহিম। বরপণের টাকা নগদ আঁচলে বেঁধে তবে মেয়েটা বিদায় হয়েছে। দুহিতা কিনা—যথাসর্বস্ব দোহন করে নিয়ে দু-জনে পশ্চিম অঞ্চলে হনিমুনে বেরিয়ে পড়ল।

॥ পঁচিশ ॥

ঠিক এক বছর পরে।

মহিম আর ইস্কুলে যান না। পড়াবার ক্ষমতা নেই, অথর্ব হয়ে পড়েছেন। চাকরিটা ছাড়েন নি, লম্বা ছুটি নিয়ে আছেন।

শুভব্রত ইতিমধ্যে তিনটে লেটার পেয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করল। স্কলারশিপ অল্পের জন্য ফসকে গেছে। সেক্রেটারির কাছে মহিম হাঁটাহাটি লাগালেন: আমাদের এই অবস্থা, চালাতে পারছি নে সার। ছেলের একটা-কিছু করে দিন।

সেক্রেটারি বলেন, একেবারে ছেলেমানুষ যে! তার উপরে ভারতী ইনষ্টিটুশনের নিয়ম হয়েছে, গ্রাজুয়েটের নিচে মাস্টার নেওয়া হবে না।

সে আমি জানিনে সার। সারা জীবন আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে না খেয়ে মরে যাব বুড়ো বয়সে।

দয়াবান সেক্রেটারি, পুরানো শিক্ষককে ঝেড়ে ফেলতে পারেন না। চাকরি হল শুভব্রতের। ইস্কুলের থার্ড ক্লার্ক—ক্লাসে ক্লাসে মাইনে আদায় করার কাজ। এ ছাড়া সকালে আর বিকালে অ-আ পড়ানো দুটো টুইশানি। পাঁচ টাকা করে দেয়। তার বেশি কে দিচ্ছে? প্রাইভেটে আই. এ. পড়ছে শুভো। আই. এ. পাশ করুক, বি. এ. পাশ করুক। গ্রাজুয়েট হলে মাস্টার করে নেবেন, সেক্রেটারি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সানগরের পাকাবাড়ি ছেড়ে দিয়ে মহিম ইস্কুলের কাছাকাছি একখানা টিনের ঘরে আছেন। সুধা বেহালায় ভাসুরের বাড়ি উঠেছেন আবার। লোকপরম্পরায় শোনা গেল, সাতু ঘোষের রাগ পড়ে গেছে, ছেলে-বউকে সাদরে ঘরে তুলে নিয়েছেন। নিয়ে থাকেন নিয়েছেন, বড়লোকের ঘরের বউ দীপালি—মহিমের কেউ নয়।

ঝামেলা নেই কিছু এখন। বস্তির টিনের ঘরে দুই ছেলে আর বাচ্চা মেয়ে রূপালীকে নিয়ে আছেন। রান্নাবান্না করেন মহিম নিজে। খেয়েদেয়ে ক্ষুভো বেরিয়ে যায়, তারপরে আর কাজকর্ম থাকে না—পুণ্যব্রতকে নিয়ে বসেন একটু-আধটু। নানান গণ্ডগোলে পুণ্যের এতদিন পড়াশুনো হয় নি। বড্ড পিছিয়ে আছে—প্রথম ভাগ শেষ করে সবে দ্বিতীয় ভাগ ধরল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ।

স্তিমিত দৃষ্টি বইয়ের উপর মেলে ধরে মহিম পড়াচ্ছেন—

সদা সত্য কথা বলিবে। যে সত্য কথা বলে, সকলে তাহাকে ভালবাসে। যে মিথ্যা কথা বলে, কেহ তাহাকে ভালবাসে না, সকলে তাহাকে ঘৃণা করে।

[ঠিক ঠিক! পরম সত্যবাদী সাতু ঘোষ। ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট প্রভাত পালিতও বটে—চরিত্রচর্চার বক্তৃতা করে গিয়েই রেবেকার গৃহে মৃত্যুবরণ।]

বাল্যকালে মন দিয়া লেখাপড়া শিখিবে। লেখাপড়া শিখিলে, সকলে তোমাকে ভালবাসিবে। যে লেখাপড়ায় আলস্য করে, কেহ তাহাকে ভালবাসে না—

[তাই বটে! আমি মহিমারঞ্জন সেন বি. এ.—লেখাপড়ায় আলস্য করি নি, ফার্স্ট হয়েছি বরাবর। চিরদিন 'সত্যপথ ধরে চলেছি, দৈনিক জমাখরচে একটিবার নজর দিয়েই যে-কেউ বুঝবে। দুনিয়ার ভালবাসা তাই আমার উপরে—থার্ড-বি'র বেড়াল-ডাকা ছেলেপুলে থেকে নিজের আত্মজা দীপালির।]

পড়াতে পড়াতে মহিম স্তব্ধ হলেন একমুহূর্ত! বলেন, বানান করে করে পড়, মানে শিখে নে। কিন্তু বিশ্বাস করিস নে। সমস্ত মিছে, সমস্ত ধাপ্পা—

সূর্যবাবু এককালে যেমন. 'ভারতে ইংরেজ-শাসন' পড়াতেন। পড়িয়ে শেষটা বলে দিতেন, 'মুখস্থ করে রাখ, কিন্তু একবর্ণ বিশ্বাস কোরো না, বাজে কথা, সমস্ত ধাপ্পা।